Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩১, [১ম, সংখ্যা

১। নব-বর্ষারম্ভ	... ...	১
২। বঙ্কিম বাবুর প্রভাব	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ	২
৩। আনন্দ মেলা	শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্	৫
৪। সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮
৫। তোমরা কি মানুষ	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	১৪
৬। দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য-সাহিত্য	শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ	১৬
৭। সাধক সঙ্গীত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	২৩
৮। রূপ কথা	স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী	২৪
৯। অক্ষমতা	শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ মিত্র	২৯
১০। স্বাস্থ্য ও সাহিত্য	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস	৩০
১১। শ্রীচৈতন্য	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	৪১
১২। সমালোচনা	... ...	৩২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 17-8-24

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

...৫০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৪৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

...am :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

ঝাপসা হয়ে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
সং

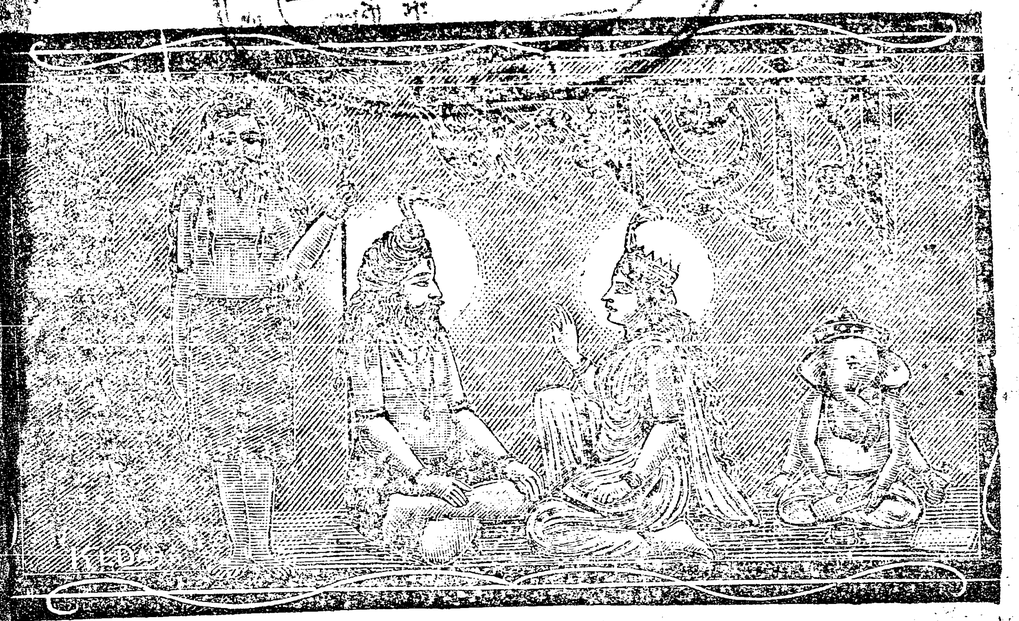

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। | ১৩৩১ সাল, বৈশাখ। | ১ম, সংখ্যা।

নব-বর্ষারম্ভ।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায়,—আমাদের "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকা ঊনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রিংশ বর্ষে উপনীত হইল। নববর্ষের নবীন উষায় মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া নবোৎসাহে আবার জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হইতেছি। মঙ্গলময়ের বিশ্ববন্দ্য শ্রীচরণে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিতেছি :—

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বঙ্কিম বাবুর প্রভাব।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালী জাতিকে নবীন চালে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত ব্যক্তি সমুদ্রের মধ্যে আমিও একটি বিন্দুমাত্র। আমার পিতা বঙ্কিম বাবুর যাবতীয় উপন্যাস, মাসিকপত্র ও প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি আমার দ্বাদশবর্ষ বয়স মধ্যেই সেই সকল উপন্যাস ও মাসিকপত্র, পড়া নয়—মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কাজেই বঙ্কিম বাবু আমার বাল্য বন্ধু।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়িয়া আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভ্রমর মরিল কেন?" পিতা উত্তর করিলেন,—"জগতে সকলে সুখী হইবার জন্য আসে না।" এ কথা আমি তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ভাবি। তাহার কিছুদিন পরে আমি "বঙ্গ-দর্শনের" এক সংখ্যায় দেখিলাম—বঙ্কিম বাবুকেও অনেকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল—"কুন্দ নন্দিনী ম'ল কেন?" বঙ্কিম বাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন, ঘটনায় বৈচিত্র।

তাহার পর ১৩।১৪ বৎসর বয়সে যখন আমি ফলিত জ্যোতিষ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পিতা বঙ্কিম বাবুর জাতচক্রখানি বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের দৃষ্টান্তরূপে আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। এখানে বঙ্কিমবাবু আমার জ্ঞানের আলেখ্য। বঙ্কিমবাবুর জাতচক্র এইরূপ। আমার পিতার "পারাশরীয় সুশ্লোক শতক" হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

শুভমস্তু শকাব্দাদয়ঃ ১৭।৬০।২।১২।৩৯।৩১ মকর লগ্ন, লগ্ন শ্রেষ্ঠ, মকরলগ্নে

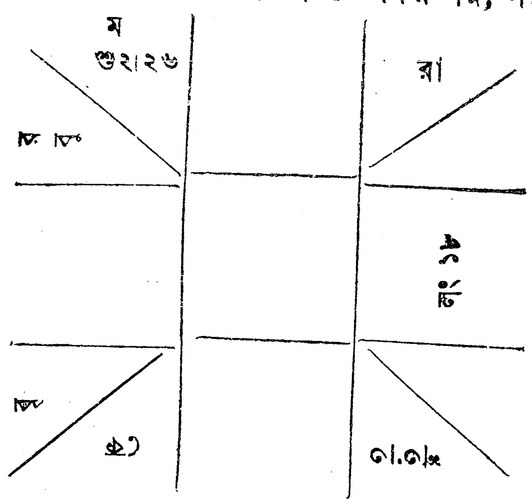

* বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

অসাধারণ ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করেন। মকর লগ্নের স্বয়ং রাজযোগ কারক গ্রহ শুক্র পঞ্চমে স্বক্ষেত্রে থাকায়, "শুক্রেন করি বাগ্মী কাব্যজ্ঞশ্চ"—ইত্যাদি নিয়ম অনুযায়ী তিনি সর্ব্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় কাব্য কলায় কুশল হইলেন। তাহার উপর শনি লগ্নপতি হইয়া একাদশে থাকায় এবং স্বভাবজ মিত্র শুক্রের সহিত পূর্ণ অংশে (২) প্রধান সম্বন্ধ করায়, এই কাব্য কলাদ্বারা তাহার ধনাগম ও জগদ্ব্যাপ্ত নাম হইয়াছিল। তাঁহার যে ফলিত জ্যোতিষেও অসাধারণ অধিকার ছিল, তাহা তিনি "সীতারামে"র প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন।

আমার পিতা কলিকাতায় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি বঙ্কিম বাবুকে দুপাতা ফলিত জ্যোতিষ পড়াইয়া ছিলেন। আমার বাল্য কালে, আমার পিতার পত্রাবলীর মধ্যে, বঙ্কিম বাবুর হাতের লেখা দুই তিন খানি পত্র আমি দেখিয়াছিলাম। আমার পিতা যে বঙ্কিম বাবুকে ফলিত জ্যোতিষ পড়াইয়া ছিলেন,—এ কথা বঙ্কিম বাবুর জীবন চরিত লেখকদের মধ্যে একজন স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়াছি। তাহার পর ১৫।১৬ বৎসর বয়স কালে আমি মস্তিষ্ক বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করি। তাহাতে আমার শিক্ষকগণ আমার সম্মুখে বঙ্কিম বাবুর ফটো-গ্রাফ বা Wood cut ছবি রাখিয়া তাঁহার খগচঞ্চু নাসিকা, তাঁহার অসামান্য কল্পনা শক্তির পরিচায়ক এই কথা আমায় বুঝাইয়া দিলেন। "বালক" ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা—"মুখবন্ধন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আমার ১৯।২০ বর্ষ বয়স কালীন আমার দুইটি কৃতবিদ্য ছাত্র কলিকাতা প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বঙ্কিম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি মনে করে?

ছাত্রদ্বয়। আপনাকে দেখিতে।

বঙ্কিম বাবু। দেখ।

ছাত্রদ্বয়ের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল। কথা ফুরাইয়া গেল, বঙ্কিম বাবুর মত মহাপুরুষের সহিত কি কথা বলিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘামিয়া কোঁথাইয়া তাঁহাকে বলিল,—"লেখক হওয়া যায় কি হইলে?"

বঙ্কিম বাবু। সকলের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলে!

ছাত্রদ্বয় দৌড়াইয়া বাড়ি আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এইবার পণ্ডিত মহাশয়ের উপর জুলুম—যে যাহা বলিবে, তাহাই মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে, এ কথার ভাব কি? এই যে বাড়ির চাকরাণী প্রত্যহ বাজার খরচের হিসাব দেয় তাহাও কি মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে?

আমি বলিলাম—এই যে বাড়ির ঝি, প্রত্যহ বাজার খরচের হিসাব দেয়, তাহাও মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে। সে কেমন করিয়া আমাদের এক একটি পয়সা, অনন্ত মিথ্যা কথা বলিয়া, আমাদের বোকা ভাবিয়া, ফাঁকি দিয়া লইতেছে, লেখক হইতে হইলে, এইরূপ ক্ষুদ্র বিষয়টি পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত লক্ষ্যের বিষয়—ইহাই বঙ্কিম বাবুর অভিপ্রায়।

কলিকাতায় আসিয়া আমারও বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার আর বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবার সাহস হইল না। তবে ঘটনা ক্রমে বঙ্কিম বাবু আমায় একদিন দর্শন দিয়া ছিলেন। প্রতাপ চাটুর্য্যের গলির মোড়েই, তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহার খগ চঞ্চু নাসিকাটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম।

বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" আমি একরূপ মুখস্থ করিয়াছি। আমার যাহা কিছু প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা তাঁহার অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করিয়া। তাঁহার লোক রহস্য ও ঐতিহাসিক রহস্য আমার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। কত লিখিব-- তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধই আমার চিত্তের উপর একটি পদ চিহ্ন করিয়াছে। তাহার মধ্যে আমার বিশেষ চিন্তার বিষয় তাঁহার "সুবর্ণ গোলক" "চিত্তের বিনিময়" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি। এই ক্ষুদ্র গল্পটি তাঁহার নিজস্ব রচনা, কি ইহা কোনও দার্শনিক তথ্য—যাহা তিনি গল্পের আকারে পরিনামিত করিয়াছেন, তাহার আমি এখনও সন্ধান করিতে পারি নাই।

এই গল্পের দার্শনিক তথ্যটি অবলম্বন করিয়া, আমি একটি অসাধারণ পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছি—তাহা আমার প্রবন্ধ—"অজাভির পুরাতত্ত্ব" নামে মেদিনীপুর "সাহিত্য সম্মিলনের" অধিবেশনে পাঠ করিয়াছি। তাহার এক এক কপি আপনাদের দিলাম।

বাল্য কাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত আমি এই ৫০ বর্ষ কাল তাঁহার পুস্তক ও মতের অনুশীলন করিতেছি। আমার মত বাঙ্গালার কত লোকের মনোবৃত্তি, তিনি কত ভাবে পরিচালিত করিতেছেন। আমি তাহাদের একটি বুদ্ বুদ্ মাত্র।

তাহা ব্যতীত যে ভাষায় আজ এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহাও বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস বা মাসিক পত্রের ভাষা। গত বৎসর এই "বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলন" বঙ্কিম বাবুর জন্মভূমিতেই হইয়াছিল! বঙ্কিম বাবু আমাদের জ্ঞান ও ভাষা

দিয়াছেন, তাঁহার নামে সাহিত্য সম্মিলনের উদ্‌যোগীগণ তাঁহার সম্মানার্থ সমাগত, আমাদের আর যাহা বাকি ছিল—প্রচুর আম ও সন্দেহ দিয়া অতিথি সৎকার করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালার জাতীয় জীবন ভাষা ও চিন্তা প্রবাদের জন্মদাতা, তাঁহার সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর কি লিখিবে?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আনন্দ মেলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্।

(১)

কি শুনি রে আজ হর্ষ-কোলাহল,
কাঁঠাল পাড়ায় সঘনে উঠে।
নিভৃত বক্ষ ভেদি সে ভূমির,
নিরিবিলি ভাব ভঙ্গি প্রকৃতির
আকাশ ছাইয়া ভূতলে লুটে!

(২)

বালক বৃদ্ধ যুবকের দল,
সবারি বদন হরষ-ভরা।
কি যেন ব্রত করিতে পালন,
কি যেন দৈন্য করিতে ক্ষালন,
ছুটাছুটি সবে করিছে ত্বরা!

(৩)

হরষে পবন হয়ে মাতোয়ারা,
লহর খেলিয়া বহিয়া যায়!
গুঞ্জরে অলি মধুর স্বননে,
তান তোলে পাখী আপনার মনে,
অমিয়ার ধারা ঝরে গো তায়!

(৪)

কোথা হতে আসি সহসা পুলকে,
চোখের পলকে মেঘের মালা,
দাঁড়াল যেন রে চাঁদোয়া গগনে,
সুখের ছায়ার সুখ পরশনে,
হল ধরাতল মাধুরী ঢালা !

(৫)

চারিদিকে যেন উঠে অনর্গল,
একতানময় মধুর সুর !
দ্বারে দ্বারে দ্বারে ফুলমালা রাজে,
কত চিত হরা মনোরম সাজে,
সেজেছ আজি এ নিরালা পুর।

(৬)

হ্যাদে দেখ তার রাজপথ ছেয়ে,
কতই যাত্রী নিয়ত আসে।
হসিত সবার—বদন মণ্ডল,
যেন শত দল করে ঢল ঢল,
প্রতিভার ভাতি তাহাতে ভাসে।

(৭)

আনন্দের আজি নাহি রে অবধি,
সুধামাখা এই আনন্দ মেলা !
কি যেন শান্তি স্বরগ ত্যজিয়া,
ভাব ভরে এই ভুমেতে আসিয়া,
আপনা ভুলিয়া করিছে খেলা।

(৮)

ভুবনমান্য অতি বরেণ্য,
তুমি গো ধন্য কাঁঠালপাড়া।
শুনিয়া তোমার পূত নাম কাণে,
বল দেখি কোন্ বাঙালীর প্রাণে,
দেয় না ভকতি প্রীতির সাড়া।

(৯)

তোমার আকাশে তোমার বাতাসে,
তব তরুলতা তৃণের দলে,
কি যে এক ভাব চিত বিমোহন,
বিরাজে সতত ভবে অতুলন,
কি এক মহিমা উথলি চলে।

(১০)

তাই সেই ভাবে হইয়ে বিভোর,
আহা বাড়াইতে তোমার মান,
সাহিত্য-সাধক বঙ্কিম হেথায়,
লভিলা সাদ্ধ পূত প্রতিভায়,
ভাবিলে পুলকে শিহরে প্রাণ !

(১১)

তোমার নিভৃত কুঞ্জ কাননে,
সুখদ ছায়ার ফুল মনে,
বসি সেই পিক্ দিক্ দশ পূরে,
গেয়েছিল গান অভিনব সুরে,
বিমোহিত করি জগত জনে।

(১২)

থামেনি থামেনি এখনো সে গান,
থামেনি এখনো সুতান তার !
অই অই শোন আকাশে পাতালে,
সে গানের সুর অই তালে তালে,
উঠিছে বিথারি মাধুরী ভার।

(১৩)

কত মনোরম রতন ভূষণ,
করি আহরণ যতন সঙ্গে,
তিনিই মনের মতন করিয়া,
ভকতির ভরে দেন সাজাইয়া,
বঙ্গবাণীর শোভন অঙ্গে।

(১৪)

সাধনে তাঁরি এ পল্লী ভবনে,
বঙ্গ-দরশন দের গো দেখা।
কত গবেষণা, পুণ্য ইতিহাস,
হইত গরবে তাহাতে প্রকাশ,
কি সে রঙ্গ-রস মধুর লেখা।

(১৫)

তাই বলি ওহে বাঙালী গৌরব,
কীরিতির গুণে অমর তুমি!
ধন্য তোমার লেখনী ধারণ,
ধন্য তোমার সাহিত্য-সাধন,
ধন্য তোমার জনম ভুমি।

(১৬)

প্রীতির অর্ঘ্য দিতে হে তোমারে,
করিতে তোমার মহিমা গান!
শত কাজ ঠেলি সুধীগণ কত,
হয়েছেন আজি হেথা সমাগত;
আজ কি তাদের হৃদয় টান।

(১৭)

সফল হউক এ শুভ মিলন,
পূরুক বাসনা যেমন যার,
হেন মেলা হেথা বরষে বরষে,
যেন রে নিরখি নয়নের হরষে,
দীন কবি কিবা কহিবে আর।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অমৃত তুল্য সঙ্গীত স্বরে কেণারাম ও বিশু গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সাধক দেবীর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান। নয়নে প্রেম-বারি। তাঁহারা

বিভীষিকা দর্শনে হৃত সংজ্ঞ হওয়াতে লজ্জিত হইয়া এখন সাধকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সাধক তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আপনারা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলেন, এত গম্ভীর রাত্রে নিদ্রা না গিয়া থাকা যায় না, আপনাদের এত শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সুখী হইলাম।" কেণারাম সাধকের কৌতুক বাক্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "দেব! শত বজ্রনাদসম সিংহ গর্জ্জন শুনিয়া আমরা মুর্চ্ছিত হইয়া ছিলাম, আমাদের সুকৃতি নাই, আমাদের হৃদয় মোহ কণ্টকাকীর্ণ বনভুমি, সেই সিংহনাদে কম্পিত হইয়াছিল। মহামায়ার প্রভাজালে আপনার হৃদয় আকাশ শারদায় পৌণমাসীর ন্যায় নির্ম্মল। আপনার কর্ণে সেই বজ্রনাদ পটহ শব্দের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল। আবার আমি পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু মস্তক ঘুর্ণন হেতু আমার উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছিল, আপনি কাহার সহিত এতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিলেন। আপনাদের বাক্য সকল আমার কর্ণগোচর হইলেও আমি মস্তক উত্তোলন করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার দর্শন লাভে সক্ষম হই নাই, আপনি তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতে ছিলেন, ঠাকুর তিনি কে? আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।" বিশু কহিলেন, "আমিও তাঁর কতক কতক কথা শুনেছি, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।" সাধক কহিলেন, "তিনি কোন মহাপুরুষ, তিনি আমাকে শৈশবে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর কালক্ষেপ উচিত নহে, আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাদের ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য।" ইহা কহিয়া সাধক কেণারামকে কহিলেন, "ঐ শিবরাম স্বামীর সিদ্ধাসন, আপনি নির্ভয়ে জগদম্বার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ঐ আসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হউন। আপনার পূর্ব্ব তপস্যাবলে, আত্মার সংযম ও অভ্যাস হেতু আপনি নিরাপদে জপ সামাধা করিতে পারিবেন। সাধক বিশুকে কহিলেন, "তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমার জপের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুর সিহত দেবীর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সাধক বিশুর সহিত বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "বিশু! তুমি কি নীল নভোস্থলনয়না, নক্ষত্র দশনা, লতা-পাদপ-বসনা, ভয়ঙ্করী অমানিশি দর্শন করিতেছ, নরশির মালিনী, নিবীড় নিতম্বিনী, শব শবারোহিনী জলদ বরণীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছ? তুমি জান না মা আমার জগন্ময়ী, আমরা অভয়ার পরীর মধ্যে অবস্থান করিতেছি, আমাদের পৃথক অস্তিত্ব কিছুই নাই, সমালস্ত

ময়ীর মধ্যে থাকিয়া ঐরূপ ভয়বিহ্বল হওয়া কি তোমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে ? জগদম্বার চরণে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত ভয়শূন্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। মানুষের মৃত্যুভয় অতি ভীষণ, সেই ভয়কে অন্তর হইতে দূরীভূত করিতে পারিলেই সমুদয় ভয়ই দূরীভূত হয়। শ্মশান ও মৃত্যু এই উভয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সেই মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা হেতু শ্মশান সাধনা কর্ত্তব্য। এই দেবীর মন্দিরের অতি নিকটে শ্মশান, এস আমরা অদ্য রাত্রে সেই শ্মশানে অভয়ার ধ্যানে নিবিষ্ট হইব।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুর সহিত নিকটবর্ত্তী শ্মশানে গমন করিয়া এক অর্দ্ধদগ্ধ পূতিগন্ধময় শবের সন্নিধানে আসন নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কহিলেন, "বিশু ! তুমি এই অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহকে সম্মুখে রাখিয়া মা কালীর ধ্যানে নিরত হও। তোমার একাগ্রতার এই প্রথম পরীক্ষা।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুকে সেই বিভীৎস স্থানে বসাইয়া শ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া শ্মশান বাসিনীর নৃত্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। সাধক কহিলেন, "জননি ! সংসারও শ্মশান এই উভয়ের মধ্যে শ্মশান তোমার এত প্রিয় কেন ? কেনইবা "শ্মশানালয় বাসিনী" বলিয়া তোমার ধ্যান করিতে হয়। তোমার সন্তান অজ্ঞান ও বালক তাহার মনে বড় কৌতুহল জন্মিতেছে, মা জিজ্ঞাসা করি, রত্নরাজি মণ্ডিত, সুধাধবলিত, সুবর্ণময় পানাহার পাত্র পরিশোভিত, সুগন্ধ সম্ভার সংযুক্ত রাজ-রাজেশ্বরের উপাসনা মন্দির অপেক্ষা শ্মশান তোমার এত প্রিয় কেন ? বিনীত ধার্ম্মিক উদার, তোমার নিতান্ত শরণাগত ব্যক্তির প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় মন্দির অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় কেন ? শ্মশানে ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি নাই, অহঙ্কারের তীব্রদৃষ্টি নাই, তাই বুঝি রাজার মন্দির অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয়। ধার্ম্মিকের হৃদয়ের কি অপরাধ মা, সেখানে কেন তুমি সর্ব্বদা থাকিতে চাহ না ? সর্ব্বাসক্তি শূন্য হইয়া তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন না হইলে তুমি তাহার হৃদয়ে বাস ইচ্ছা কর না, একথা সত্য, সংসারে থাকিয়া সর্ব্বাসক্তি শূন্য হওয়া বড় শক্ত, তাই বুঝি ধার্ম্মিকের হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার প্রিয় ! হামা সংসার বিরাগী মায়া মোহ বর্জ্জিত তোমার অতি শরণাগত কিঙ্করের হৃদয়েও তুমি সর্ব্বদা থাকিতে চাহ না। তাহার হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় কেন ? সুখে দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হইলেও শোক সন্তাপ পূর্ণ সংসারের দুঃখ ছায়া মাঝে মাঝে তাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়ে, কিন্তু শ্মশানে সে দুঃখের ছায়া নাই, আছে কেবল বৈরাগ্য ঔদাস্য, পূর্ণানন্দ। তাই বুঝি, তাহার হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় ! বল মা, আর এক কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছি, দেহধারীদিগের হৃদয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু ঐ সব দেবালয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার অধিক প্রিয় কেন ? বিশ্বজননি ! তোমার সন্তান সন্ততিগণ দেবালয়ে আসিয়া নয়নজলে হৃদয়ের ব্যাকুলতা-সহ মনের বাসনা, প্রাণের যাতনা জানায়, কেহ কেহবা নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকে। সংসারীর প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা জানাই-বার স্থান ঐ সকল দেবতা মন্দির। তোমার সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে রূপ রস, গন্ধে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই তোমাকে অর্পণ করিয়া মানুষ সুখী হয়। হা মা, সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয় কেন ? বুঝিয়াছি মা ! তুমি নিবৃত্তি সৌধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্মশান পরমা নিবৃত্তির স্থান। নিবৃত্তি মার্গের পথিকই কেবল তোমার পূর্ণানন্দময়ী জ্যোতি দর্শনে সক্ষম। তাই বুঝি দেবালয় অপেক্ষা শ্মশান তোমার প্রিয়। দেবস্থান হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ বহির্গত হইয়া প্রবৃত্তি সংসার সৌধে ও নিবৃত্তি শ্মশান সৌধে শেষ হইয়াছে। দেব মন্দিরে মানুষের পটুতার পরিচয় আছে, বলদর্পের চিত্র আছে, মর্য্যাদা আছে, মায়ামোহ আছে, আশা ভরসা আছে, ভবিষ্যতে সুখের চিত্র হৃদয়ে লইয়া সংসারী তথায় আগমন করে, সুখের চিত্র খুলিয়া প্রবৃত্তি মার্গ ধরিয়া সংসারে প্রবেশ করে। ঐ সব দেবালয়ে নিবৃত্তি মার্গও আছে, কিন্তু তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, সেই সঙ্কীর্ণ পথ শ্মশান মুখে আসিয়া সুবিস্তৃর্ণ হইয়াছে।

এই শ্মশানে অহঙ্কার নাই, বলদর্পের প্রদর্শিনী নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, মায়ামোহ নাই, আছে কেবল নিবৃত্তি শান্তি। হা মা, আর কথা জিজ্ঞাসা করি, শান্তির আলয় শ্মশানে আসি ! তোমার এরূপ ভয়ঙ্করী বেশ কেন ? লোল রসনা, বিবসনা অট্টহাসিনী, ভৈরব নাদিনী ঘোররবা শিবাগণ পরিবেষ্টিতা নৃত্যপরা যোগিনীগণ সঙ্গিনী, একি ! তোমার নিতান্ত শরণাগত সন্তানগণ শান্তিময় শ্মশানে আসিয়া তোমার ধ্যানে মগ্ন হয়। তুমি তাহাদের একাগ্রতা, নির্ভীকতা, তন্ময়তা পরীক্ষা করিবার জন্য কি ঐ নকল মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাক ? যাহা হউক জননী তুমি আমার মনোসরোবরে শান্তি সরোরূপে স্নেহময়ী জননীর বেশে উদয় হও। আমি তোমার প্রসন্ন বদন স্নেহময় দৃষ্টি দর্শন করিয়া শীতল হই।" ইহা ভাবিয়া সাধক জননীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশু কহিল, "ঠাকুর ! শিবাগণের চীৎকার শুনুন, এরা কি শিবা না সিংহ, আধপোড়া শবটাকে টেনে এনে আমার গায়ে পড়ছে।" সাধক কহিলেন,

"বিশু! তুমি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিও না। চক্ষু কর্ণাদি বাহেন্দ্রিয় গণকে সংযম করিয়া ধ্যানস্থ হও, ভীত হইওনা, ভীত হইলে চাঞ্চল্য ও জীবভাব আসিবে, বিঘ্ন হইবে।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি মরণে ভীত নয়, এই আমি আবার তোমার দেওয়া মহামন্ত্র জপ কর্ত্তে বস্‌লাম।" ইহা কহিয়া বিশুও পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন। ক্রমে রজনীর চতুর্থ প্রহর উপস্থিত হইল। বিভাবরীর অঙ্গ অলস, কবরী শিথিল, খদ্যোতিকা রূপ মণিময় হার প্রভাহীন, শিরোদেশে আকাশ মুকুটে মণিপুংক্তি তারাবলি জ্যোতিহীন, জীবগণ ক্রমে জাগরিত হইতেছে। সাধক বিশুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিশু! মহা নিশি অতীত হইয়াছে, অভয়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যোগাসন পরিত্যাগ কর।" ইহা শুনিয়া বিশু জগদম্বাকে হৃদয়ে লইয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর চরণে প্রণিপাত করিলেন। বিশু ও সাধক দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গণে আগমন করিবামাত্র কেণারাম বাহিরে আসিয়া সাধকের পদস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "জগদম্বার কৃপায় আপনার অনুগ্রহে আমি নিরাপদে জপ সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। দেব, আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া জপারম্ভ করিবামাত্র কি এক অপূর্ব্ব ভাব ও আনন্দের উদয় হইল, তাহা আমি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় আকাশে শত শত প্রেম শশীর উদয় হইয়া আমাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া আমার বোধ হইতেছে, আমি যেন কোন অপূর্ব্ব স্থানে ছিলাম। সে আনন্দ জ্যোতি এখনও আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।" সাধক মৃদু-হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার আশা ফলবতী হইয়াছে। আপনার হৃদয়ের সে আনন্দ জ্যোতি আর কখনও বিলুপ্ত হইবে না। অতঃপর আপনি সংসারকে অন্যভাবে দর্শন কবিবেন। আপনাকে সিদ্ধাসন নির্দ্দেশ করিয়া বিশুকে শ্মশান জপ অভ্যাস করাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী ঐ শ্মশানে গিয়াছিলাম। বিশুও সেখানে নিরাপদে জপ সমাধা করিয়াছে। ঐ দেখুন পূর্ব্বাকাশের গাঢ় তিমির দূরীভূত হইয়াছে। পক্ষীকুল কুলায় বসিয়া কলধ্বনি পূর্ব্বক দিবসপতিকে সম্ভাষণ করিতেছে, নিকটবর্ত্তী লোকালয় হইতে দুই একটী কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। অনন্তর আমাদের গৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য।" ইহা কহিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণ দেশে দাঁড়াইয়া করযোড়ে মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

কালী কত জাগিয়ে ঘুমাও গো।
আমি কেমনে তোমারে জাগাইব॥

তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি, তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও।
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে, কারে ভ্রান্তিরূপেতে ভ্রমাও॥
কারে দেহ মন্ত্র সাধনা মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও।
কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগত নামরসে বিরমাও॥

অতঃপর সাধক কেণারাম বিশুর সহিত দেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

সাধক কিয়দ্দিবস অমরার গড়ে অবস্থান করিয়া বিশু ও কেনারামের সহিত চান্নায় আগমন করিলেন। যৌবনের লীলাভূমি চান্নার দর্শনে তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে বিগত সুখ দুঃখের ছবি ক্ষণে ক্ষণে উদয় হইতে লাগিল। মাতৃরূপিনী জগদম্বার মূর্ত্তি সেই দুঃখের ছবিকে আবরণ করিয়া বসিলেও মায়ার এমন মোহিনী শক্তি সর্ব্বশক্তি শূন্য সাধকের দৃষ্টিকেও সেই দুঃখের ছবি হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। তিনি গৃহে আগমন করিবমাত্র তাঁহার সহোদর অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া সস্ত্রীক যথাশক্তি ভ্রাতার ও তাঁহার অনুগামীগণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ গর্ভধারিনীর ধ্যান ও চরণ বন্দনা না করিয়া নয়ন মুদ্রিত কি গাত্রোত্থান করিতেন না। এক্ষণে গৃহ মধ্যে আসিয়া জননীর অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। জননীর মৃত্যুশয্যার চিত্রও তিনি ভুলিতে পারিলেন না। প্রেয়সীর হাস্যপূর্ণ বদন, প্রেম ও ভক্তিভরা দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় তাঁহার মনকে বিচলিত ও ভীত করিল। তিনি মনে মনে হাস্য করিয়া অন্তর্বাসিনী জগদম্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জননী তোমার আবার একি ভাব, কত রঙ্গ জান, আমি দেখিতেছি, এখন তুমি আমার সেই মা হইয়া আসিতেছ, কাছে বসিয়া আমাকে খাওয়াইতেছ, কমল বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছ, কত বুঝাইতেছ। একি মা তোমার আবার একি ভাব, কালনায় মৃত্যুশয্যা। মায়ের ম্লান মুখ, ক্ষীণ দৃষ্টি, মৃদুস্বরে কমল বলিয়া সম্বোধন! ওঃ অসহ্য। আমি এখনও মায়াকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমার এ গৃহ বাস উচিত নহে। গৃহে থাকিয়া আমার মনক্লিষ্ট হইতেছে। মা মহামায়া! ওই দেখ আবার তোমার কি ভাব। পাণি গ্রহিতার মৃত্যু শয্যা, কাতর দৃষ্টি, জন্মের মত বিদায় গ্রহণের অভিনয়। ক্রন্দন হাহাকার আত্মীয় স্বজনের রোদন। রঙ্গিণী! আবার তোমার এক বর্ত্তমান নবভাব দেখ, সহোদরের সহাস্য-বদন, প্রেমপূর্ণ নয়নে দাদা বলিয়া সম্বোধন। ভ্রাতৃ জায়ার অকৃত্রিব যত্ন। যাহা হউক মা তুমি সব ভাব সম্বরণ কর, এস

এলোকেশে দিকবসনে সহাস্য বদনে আমার হৃদয় আসনে উপবেশন কর। আমি মনে মনে অঞ্জাল অঞ্জলি তোমার চরণে কুসুম দাম অর্পণ করি।" হৃদয় বাসিনী জগদম্বাকে এইরূপে মনের কথা বলিয়া একরাত্রি মাত্র গৃহে অবস্থান করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ওঃ মায়া ত্যাগ কি দুরূহ ব্যাপার। সংসার ত্যাগী পুরুষদিগের দ্বাদশ বৎসর অন্তর জন্মভুমি দর্শনের বিধি আছে। আমার বোধ হয় এ বিধির উদ্দেশ্য ত্যাগী পুরুষের পরীক্ষা। তিনি মায়াকে মন হইতে অপসারিত করিতে পারিয়াছেন কিনা ইহা জন্মভূমির পুনঃদর্শনে তাঁহার উত্তম রূপে ধারণা হয়। এইরূপ ভাবিয়া সাধক সহোদরকে কহিলেন, "ভাই আমার আর সংসার বাস শোভনীয় নহে। আমার মাতৃ বিয়োগের কিছু দিন পরেই দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির আশ্রয় করিয়াছিলাম, এখন আমার ইচ্ছা তথায় দিনেক দুদিন বাস করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিব।" ইহা কহিয়া বিশু ও কেণারামের সহিত দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে আগমন করিলেন। গ্রামের গৌরব অনেক দিন পরে গ্রামে আসিয়াছেন, দেখিয়া, গ্রাম বাসীদগের আনন্দের সীমা রহিল না। এক্ষণে তাঁহারা সর্ব্বদা সাধু সহবাসে সুখী হইতে লাগিলেন। আজ সাধক সকলেরই আপনার লোক, কাহার ভ্রাতা, কাহার খুড়া মহাশয়, কাহারও ভ্রাতুষ্পুত্র, কাহারও দাদা মহাশয়, কাহারও দেবর, কাহারও বা গুরুজন। বিবিধ খাদ্য সামগ্রী, বিবিধ ফলপুষ্প দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির পূর্ণ হইতে লাগিল। শ্যামা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য দূরস্থ বাসীগণ প্রথম অগ্রহায়ণ মাসের তীব্র শিশিরকে অবহেলা করিয়া সন্ধ্যার পর দেবী বিশালক্ষীর মন্দিরে আগমন করিতে লাগিল। গায়ক সাধক, বাদ্যকর কেণারাম, তাল মান ও সুর ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া পশু পক্ষী, বালকেরও হৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। এইরূপ পরমানন্দ সাধক চান্নায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া বিশু ও কেমারামের সহিত বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ

তোমরা কি মানুষ ?

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

যে দিন জ্বলন্ত হুতাশনে স্নেহলতার স্নেহময় দেহ ভস্মীভুত হইয়াছিল, সেদিন একবার বাঙ্গলার জীবন্মৃত জলন্ত তন্দ্রাগ্রস্থ সমাজে একটা চেতনার সঞ্চার

হইয়াছিল। কিন্তু দু'চার দিন গলাবাজির পর সবই আবার নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তার পর কত শত স্নেহলতা জ্বলন্ত পাবকের লেলিহান শিখায় আত্মবলিদান করিল—রাজপুত বালার মত জহরব্রত উদ্‌যাপন করিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও মনে একটুও চৈতন্যের সঞ্চার হইল না। দেশের আশা ভরসা স্কুল যুবকেরা মুখে লম্বা চওড়া স্বার্থত্যাগের কথা বলিলেও দরিদ্র কন্যার পিতার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে তাহারা একটুও পশ্চাৎপদ নহে ক্কচিৎ দুই একটি ছাড়া কোন যুবক এ পর্য্যন্ত বিনাপণে কোন অভাবগ্রস্ত বা দুস্থের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বার্থত্যাগ ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। কন্যার পিতাদের এমনই কুসংস্কার যে, তাঁহারা বালবিধবাকে আমরণ একবেলা পেটে দু মুঠো ভাত দিয়া ঘরে রাখিতে পারেন, কিন্তু বার বছরের জায়গায় ষোল বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েকে ঘরে রাখিতে গেলে তাঁহাদের চক্ষু স্থির হয়। শাক পাতার মত মেয়েও টাকার তোড়া লইয়া বরপক্ষের পায়ে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন না করিয়া যদি তাঁহারা মেয়েদিগকে ঘরে রাখিয়া কিংবা স্কুলে পাঠাইয়া সুশিক্ষা দিয়া সুশিক্ষিতা করিয়া তুলেন তবে গুণবতী শিক্ষিতা মেয়েদিগকে অনেক যুবকও যে বিনাপণে বিবাহ করে, একথা বলাই বাহুল্য।

আবার মেয়েরাও শিক্ষিতা হইলে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বাবলম্বিনী ভাবে নিজেদের গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান নিজেরাই করিতে পারেন। মেয়েদের যেমন বিবাহ দেওয়া দরকার, ছেলেদেরও ত তেমনি মেয়ে দরকার? ছেলেরাই বা কতদিন বিবাহ না করিয়া থাকিবে?

কৌলীন্য প্রথা দ্বারা দেশে মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। কৌলীন্য প্রথা তুলিয়া দিয়া যদি রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয় সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হয়, তাহা হইলে আর পাত্রের এত অভাব হয় না, কিংবা কন্যার পিতার যথাসর্ব্বস্ব উত্তমর্ণের চরণে ঋণ রাখিতে হয় না। কিন্তু এই হতভাগ্য, স্বার্থপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি কি কখনও একই সাম্যবাদের আসনে বসিয়া সকলেই এক ভগবানের সন্তান—উচ্চ, নীচ, ইতর ভদ্র—কুলীন বংশজ ভেদাভেদ নাই—এই মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে? আর যতদিন এ জাতি এইরূপ বৃথা জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া সকলে এক সমতার ক্ষেত্রে না বসিবে ততদিন এ জাতির মধ্যে কিছুতেই একতা স্থাপিত হইবে না। চোখের সাম্‌নে আজ কত শত বালিকা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিতেছে—ইহা

দেখিয়াও যে যুবকের মনে মমত্ব বোধের অঙ্কুর উদ্গত হয় না, সে গোলদিঘীর কারখানার বড় চাপরাশধারী হইতে পারে, কিন্তু তার যে মনুষত্ব বলিয়া কোন জিনিষ আদৌ নাই, তাহা শতবার বলিব। আর যে পিতা মাতা পুত্রের বিবাহে দরিদ্র ঘরের পিতার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লন, তাঁহারা আকারে প্রকারে মানুষ হইলেও চোর, ডাকাত, দস্যু, তস্কর অপেক্ষা তাহারা কোন ক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে।

দীনবন্ধু মিত্রের সাট্য-সাহিত্য।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ।

কবি ও নাট্যকার নীনবন্ধু মিত্রের নাট্যরচনা বাস্তব জীবনের আলেখ্য স্বরূপ। সেই জন্য সেই সময়ের বাঙ্গালীর—সামাজিক অবস্থার আলোচনা না করিলে—তাঁহার নাটকের আদর্শ ও চরিত্রগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না।

তখনকার বাঙ্গলার অবস্থা একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব; ধর্ম্ম ও সমাজ সঙ্কুচিত, কৌলীন্যের বিষময়ফলে ধনী নির্ধনী জর্জ্জরিত,নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষারমোহ প্রবাহে সামাজিক সনাতন আদর্শ পতনোন্মুখ। এই কুরুচি ও অশ্লীলতার আবর্জ্জনার মধ্য দিয়াও যে দীনবন্ধু আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট। দীনবন্ধু গুপ্ত কবির শিষ্য, সুতরাং তাৎকালীক রচনার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেই রচনার গতি ও ভঙ্গী সঙ্কীর্ণতা ও গ্রাম্যতা দোষে দূষিত। দীনবন্ধুর রচনা একেবারে এই দোষ শূন্য নহে।

ইউরোপেও এইরূপ অবস্থা একবার ঘটিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে, দেশের কবি নাট্যকার প্রভৃতি কোন লেখকই উক্ত প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, রুসো, ভলটেয়ার প্রভৃতির রচনা তাহার উদাহরণ। সেই জন্য দীনবন্ধুর রচনা একেবারে দোষ শূন্য না হইলেও যে সামাজিক

* বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মলনে পঠিত।

সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল, ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

তাঁহার প্রাণে সামাজিক অমঙ্গলের তীব্র সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার ফল—জামাই বারিক ও সধবার একাদশী। তাৎকালিক বঙ্গের শোচনীয় অবস্থা আর কেহ এত নিপুণতার সহিত বোধ হয় অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তখন কার বড় লোকেরা কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতেন—এরূপ পাত্রেরা অধিকাংশ নিঃস্ব, মূর্খ, কেবল মাত্র গায়ে কৌলীন্যের ছাপ মারা; এরূপ জামাই সমাজের কণ্টক স্বরূপ, সেই কণ্টক উৎপাটিত করিবার চেষ্টা—"জামাই বারিকে" প্রস্ফুটিত—তবে হাস্য রসের আবরণে কবি নিজেকে আবৃত করিয়া সমাজকে লোকের চক্ষে ধরিয়াছেন—উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা। তাঁহার সধবার একাদশীর "নিমচাঁদ" তাৎকালিক স্কুল আউট যুবকের চিত্র—বড় লোকের ছেলেদের অধঃপতনের চিত্র অঙ্কিত করাই এই প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার লেখা সার্থক হইয়াছিল। সেই সময়ের বড় লোকেরা, অনাচার অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা, অঙ্গের ভূষণ জ্ঞান করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইতেন। এরূপ অধঃপতন বঙ্গের আর কখনও হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কবি ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত বঙ্গের পদ্য কাব্য, পয়ার পাঁচালি, অনেক স্থলে অশ্লীলতা দোষে দুষিত, তখনকার বঙ্গবাসী দিগের মনের খাদ্য সামাজিক আবর্জ্জনা পুষ্ট দ্রব্য বিশেষ, কি বড় লোক ছোট লোক সকলেই এই অনাচারের প্রশ্রয় দিতেন—তখনকার কবি পাঁচালি মনের এমন সুখাদ্য ছিল যে, পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, এই কুৎসিৎ আমোদে যোগদান করিতে সঙ্কুচিত হইত না!!

বাঙ্গলার মহা সন্ধিক্ষণ দীনবন্ধুর জন্ম, এই দিকে পুরাতনের ব্যভিচার, অপর দিকে নূতনের সসঙ্কোচ প্রবেশ। দীনবন্ধু নূতনকে মাথায় লইয়া লেখকরূপে আসরে নামিয়া ছিলেন—তাঁহার প্রথম নাটক "নীলদর্পণ" এই নূতনের অভিব্যক্তি। দেশের লোকদিগের উপর নীলকরের অত্যাচার এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য—কিন্তু এত সুন্দর ভাবের সমাবেশ আর কোন নাটকে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। একটা করুণ সুর, একটা সমবেদনা, একটা আত্ম নির্ভরতা, জাতীয় মহামিলন, এই নাটকের প্রত্যেক স্তরে প্রতিভাত, বঙ্গের সমাজ চিত্র সুবর্ণাক্ষরে লিখিত। এই নাটক প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গের প্রত্যেক নরনারী বুঝিতে পারিয়াছিল দীনবন্ধু ক্ষণজন্মা পুরুষ, দীনবন্ধু বাঙ্গলার নাট্যশালার উদীয়মান

সূর্য্য। এই সূর্য্যের কিরণে বঙ্গের সকল দিক আলোকিত হইয়াছিল,—সকল আবর্জ্জনা কুৎসিৎ আচার, লেখকের কঠোর মধুর কষাঘাতে অপসারিত হইয়াছিল—সেই জন্য বলিয়াছি, দীনবন্ধুর নাট্যকার রূপে লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছিল।

এইবার তাঁহার নাটকের কথা। তাঁহার নাটকের কথা বলিতে হইলে বঙ্গের তাৎকালিক নাটকের অবস্থা ও তৎপূর্ব্ব সময়ের নাট্য সাহিত্যের কথা না বলিলে দীনবন্ধুর নাটকে প্রতিভা ও পার্থক্য বুঝা যাইবে না।

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বহু গীতি কবিতার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই গীতি সাহিত্য তখন বাঙ্গলার অমূল্য সম্পত্তি। সেই চির নূতন ভাব প্রবল রস সিন্ধু হইতে বঙ্গের প্রত্যেক গৃহে প্রেমের মধুর ধারা বহিয়া গিয়াছিল—সেই বিশ্বজনীন প্রেম যখন পুঁথিতে লেখার অক্ষরে স্থান পাইল, তখন যাত্রা ও কথকতার সৃষ্টি হইল। ইউরোপের মধ্যযুগের এইরূপ দিন আসিয়াছিল যখন অত্যাচার নিষ্পীড়িত লোকের মন একটা নূতনের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই নূতন বস্তু কি? mysteries বা miracles plays এই plays এর পশ্চাতে নাটকের অসম্পূর্ণ উপাদান লইয়া সেক্ষ পীয়ারের সময় পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনকে বরণ করিবার চেষ্টা Europe এ Renassance period এ দেখা যায়, বাঙ্গলার দীনবন্ধু যুগে এই চেষ্টার বিশেষ আদর লক্ষিত হইয়াছিল।

যাত্রা ও কথকতা কৃষ্ণ বিষয়কগান ও কথা লইয়া রচিত, তাহাতে নাটকীয় ভাবের ক্রম বিকাশ লক্ষিত হইত না, তবে তাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ লেকের মন সহজেই আকৃষ্ট হইত—যাত্রার যেমন সকল সময়েই গান হৃদয়কে আকৃষ্ট করে না তজ্জন্য সময়ে সময়ে কথা বা বক্তৃতার প্রয়োজন এই দুই ভাবের অভাবে ও প্রয়োগে মনের অবসাদ বা স্ফুর্ত্তি লক্ষিত হইত। এই যাত্রা ও কথকতা বাঙ্গলা নাটকের জন্মদাতা, মধ্য সময়ে কবি ও পাঁচালি, হাফ আখড়াই, তরজা প্রভৃতি গীতি বলুন সাহিত্য বাঙ্গলার নাটকের উপাদান—এই উপাদান লইয়া কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎশিষ্য দীনবন্ধু আসরে নামিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতা দীনবন্ধুর হাস্য রচনা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় dam care পলিশি ধারী ছিল—নিজেদের মাতৃ ভাষা নিজেদের দেশের পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া তখন নূতন আগত ইংরাজী ভাষা ও ভাবকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল—এই বিশাল গ্রাস হইতে বঙ্গভাষাকে

রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন দীনবন্ধু "নিমচাঁদ" চরিত্র উক্ত ভাবের অভিব্যক্তি—ইংরাজীতে কথা কহা, ঐ ভাষায় স্বপ্ন দেখা, ঐ ভাষায় হাস্য করা, তখনকার লোকের অবশ্য কর্ত্তব্যের ভিতর দাঁড়াইয়াছিল। তাই দীনবন্ধু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বলে "নিমচাঁদের" ভিতর দিয়া বঙ্গের সমাজকে অঙ্কিত করিয়াছেন। ধন্য দীনবন্ধু, ধন্য তাঁহার সমাজ অভিজ্ঞতা, ধন্য তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি। চৈতন্য দেবের পরবর্ত্তী সময়ে সংস্কৃত নাটকানুযায়ী পরে বাঙ্গলা ভাষায় নাটক রচিত হয়, তন্মধ্যে ললিত মাধব, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, রত্নাবলী, দানকেলি কৌমুদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত নাটক পয়ারাদি ছন্দে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—কিন্তু অভিনয়ের তাদৃশ উপযোগী ছিল না। পরে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রভৃতি নাটক বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করেন, তখন বাঙ্গলার নাট্য সাহিত্যের নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখন বাঙ্গলা ভাষা বা নাটক সংস্কৃতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

সংস্কৃত নাটকের নান্দী, প্রস্তাবনা, পেটুক বিদূষক, অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা নাটকে স্থান পাইয়াছিল তবে প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষায় নাটক রচনা ইংরাজী আমল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইংরাজী ভাবের সংমিশ্রণে নাটক ইত্যাদি মাইকেল বাঙ্গলায় প্রথম রচনা করেন, আরও সুসংস্কৃত করিয়া সমাজের সহিত সুর বাঁধিয়া প্রকাশ করেন, দীনবন্ধু তাই মাইকেলের নাটক অপেক্ষা দীনবন্ধুর নাটকের এত আদর, এত প্রভাব,—তবে দীনবন্ধু ও তাহার নাটকে তাৎকালিক বঙ্গ-ভাষার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটক প্রহসন অনেকস্থলে শুদ্ধ ও মিশ্র ভাষার সংযোগে রচিত, তাহাতে অভিনয়ের অনেক সময়ে ব্যাঘাত ঘটে—এই সমস্ত দোষ পরে গিরিশচন্দ্র বর্জ্জন করিয়া নাট্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরাজী আমল হইতে ইংরাজী নাটকের ভাব বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল, সেই মত নাটকও রচিত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ বাঙ্গলা ভাষা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের সময় হইতে তেজপুষ্ট হইয়া সাহিত্যের পদবীর স্থান পাইল। এই দুই মহাত্মা যেমন গদ্য সাহিত্যে নিজের নাম চির স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন—তেমনই মাইকেল ও দীনবন্ধু নাট্যকাব্যে নিজের অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তবে মাইকেল যেমন সাহেবী ভাবের আধিক্য, তাঁহার অমর গ্রন্থ মেঘনাদ-বধের মধ্যে প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু দীনবন্ধু তখন নব্যাগত সাহেবী

আব হাওয়ায় প্রবল ঘুর্ণীর মধ্যে যে নিজের নাটক প্রহসন গুলিকে খাঁটী বাঙ্গলার খাঁটী স্বদেশী আবরণে ঢাকিয়া বাহির করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, এই তাঁহার কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব। বাঙ্গলার মধ্য যুগে 'কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ" উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। তখন সংস্কৃতের অনুপ্রাস অলঙ্কার বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর রাজত্ব করিতেছিল, তখন বাঙ্গলা-সাহিত্য কণ্টকাকীর্ণ সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল না। তবে একটা ভাব তখন বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, সেই ভাবের নাম হাস্যরস, এই হাস্যরস না থাকিলে তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্য শুষ্ক হইয়া যাইত—নীরস কর্কশ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়িত। কৃষ্ণচন্দ্রের গোপালভাঁড় ইত্যাদি সময়ে সময়ে আদি রসাশ্রিত হইলেও বাঙ্গলা সাহিত্যকে সজীব রাখিয়াছিল, এই আদিরস কালী কীর্ত্তনের দোহাই দিয়া কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র ও "বিদ্যাসুন্দরে" বন্যার স্রোতের ন্যায় প্রবেশ করাইয়াছেন. সেই জন্য কালি মহিমা এত নীচু হইয়া পড়িয়াছে—আদিরসের মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এই হাস্যরস ক্রমে বাঙ্গলার সাহিত্যের পরিপুষ্ট করিয়াছিল, টেকচাঁদের আলালী ভাষা তাহার নিদর্শন। সেই হাস্যরস দীনবন্ধু কিরূপ পরিমার্জ্জিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রচনা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামি বা buffonery দীনবন্ধুর হাস্যরস humouor অনেক প্রভেদ। বিখ্যাত হাস্যরসিক ও সমালোচক George misdith বলেন যে. But the humuorist, if hignas on embrace of cowtrasts beyond the seope of the Comic poets" তাঁহার মতে সুধু হাসির তরঙ্গে ডুবাইয়া তোলপাড় করা হাস্যরসের মুল উদ্দেশ্য নহে, এই হাস্যরসের নিম্নে সহানুভূতি রস গ্রাহিতা—কারুণ্য ধারা, কৌতুক প্রিয়তা প্রভৃতি বিভিন্ন বৈচিত্রের সমাবেশ থাকিবে, তাহাই হাস্যরসের প্রাণ স্বরূপ। দীনবন্ধুর হাস্যরসের রচনা একটু স্থির ভাবে দেখিলে ঐ সমস্ত বিভিন্ন ভাবগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—তাই তাঁহার রচনা চির আদৃত চির বরেণ্য। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে, Shakespeare এর Faistalf যে সুধু আমোদ প্রমোদ ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার তুলিকায় চিত্রিত, সেইরূপ ভাব লইয়া নবীন তপস্বিনীর "জলধর চরিত্রের সৃষ্টি—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

নবীন তপস্বিনীর চরিত্র পূর্ব্বকালের রাজ সভার চরিত্র চিত্র, "ছোট রাণী বড় রাণীর" পালা হাবাকান্ত রাজার গবাকান্ত মন্ত্রী জলধর তৎসঙ্গে আধুনিক

ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিতের চরিত্র যেন সোণায় সোহাগা হইয়াছে। এই জলধর চরিত্রে কৌতুক প্রিয়তার অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, যে জলধর জগদম্বার সম্মার্জ্জনী আঘাতেও চৈতন্য লাভ করিত না, শেষে পিঞ্জরাবদ্ধ হোঁদল কুৎকুতে পরিণত হইয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। এই নবীন তপস্বিনী নাটকে যেমন একদিকে পতিভক্তি, সুরুচি, কষ্ট সহিষ্ণুতা, অপরদিকে অন্য নারীর লঘুপ্রেম, কুরুচি ও লজ্জাহীনতা স্থান পাইয়াছে, এই দুই বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে নাটকায় চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এলিজাবেথের যুগের ন্যায় দীনবন্ধুর যুগ গঠনের যুগ (Constructive period) সংস্কৃত বহুলভাষা ও ভাব লইয়া বাঙ্গলার তখন নাটকের প্রতিপত্তি ছিল, সেই সকল নাটককে ভাঙ্গিয়া দীনবন্ধু নূতন আকারে গঠিত করেন, সেই জন্য দীনবন্ধুর বাঙ্গলার নাট্য সাহিত্যে স্থান এত উচ্চে, যদিও তিনি নাট্যোপযোগী ভাষা তাদৃশ দক্ষতার সহিত স্থানে স্থানে ব্যবহার করেন নাই, তত্রাচ তিনি খাঁটী ভাব, খাঁটী ভাষা লইয়া স্বদেশের খাঁটী জিনিষকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য দীনবন্ধু অমর। যে হাস্যরসের রচনায় দীনবন্ধুর কৃতিত্ব, সেই হাস্যরস ক্রমশঃ ফিলটারের ভিতর দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে Sultonery. তারপর Humowr, তারপর wit, তারপর safre এই সমস্ত হাস্যরসের সুর তাঁহার রচিত নাট্য সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে—সধবার একাদশী social sufre অতি উচ্চদরের নিজের পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত। নীলদর্পণ প্রথম নাটক হইলেও নাটকীয় কলা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, এই গ্রন্থের তোরাপ আদুরী, নবীন মাধব অত্যুৎজ্জ্বল চরিত্র, তখনকার বাঙ্গলার সমাজের চিত্র, তাই এত মর্ম্মস্পর্শী, এত মিঠে কড়া।

লীলাবতী নাটকে ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন হাওয়ার উন্মেষ দেখা দিয়াছে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তখন বাঙ্গলার অনেক সন্তানকে রক্ষা করিয়াছিল, অনেক পতনোন্মুখ ব্যক্তি ভীষণ অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যখন বাঙ্গলার চারিধারে কৌলীন্যের বেড়া, কুরুচির তরঙ্গ, অশ্লীলতার তুফান, তখন মহাত্মা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গলার সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল, নচেৎ অনেক নীলচাঁদ, জলধর, গোপীনাথ, অটল, বাঙ্গলার আসরে দেখা দিত। তবে লীলাবতী নাটকে গ্রন্থকার কথা বার্ত্তায়, এমন কি বড় ঘরের মেয়েদের ভিতরও শ্লীলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত দোষ তাহার নাটকে চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

মোটামুটি আমরা দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের কথাগুলি বলিয়াছি, কারণ বিস্তৃত সমালোচনা এ প্রবন্ধে অসম্ভব।

এখন যাহা বলিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাঙ্গলা সাহিত্য দীনবন্ধুর নিকট কি বিষয়ে ঋণী, এই বিষয়ে দীনবন্ধু ও গুপ্ত কবি তখন না থাকিলে খাঁটী বাঙ্গলা সাহিত্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না যে সাহিত্যকে তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এমন কি সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা হেয় মনে করিতেন, সেই ভাষাকে দীনবন্ধু অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাই তাঁহার নাট্য-সাহিত্য মাতৃ ভাষার গৌরব, অমূল্য সম্পত্তি। দ্বিতীয়তঃ যে humour ও sabire তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ দরের, তিনি এই জন্য বিখ্যাত হাস্য রসিক molli ere এর সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। তৃতীয়তঃ তাঁহার চরিত্র বৈচিত্র, জলধর নিমচাঁদ Bulfmry ও humour এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই ক্রমশঃ শেষ রচনায় humour কত সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়াছে, এই হিসাবে তাঁহার সধবার একাদশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Comic drama তিনি পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য ভাবের বিনিময়ে ও আদান প্রদানে তাহার নাটক গুলিকে নূতন ছাঁচে গড়িয়াছেন। এই মিলনের সন্দিস্থলে দীনবন্ধুর জন্ম ও কর্ম্ম।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার সমালোচনায় বলিয়াছেন,—"যে ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবিত্ব ভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন. এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার তাহা গুরুর অনুকারী".....

যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর। আমরা বলিতে বাধ্য যে দীনবন্ধু তাহার নাটকে সুরুচি সর্ব্বস্থানে রক্ষা করিতে পারেন নাই, দীনবন্ধু বাবুর চরিত্র অঙ্কন, স্বভাব বর্ণনা, হাস্যরস বিকাশ, অতুলনীয়, কিন্তু রুচি সর্ব্বথা রক্ষা হয় নাই, এই হিসাবে তাহার পরবর্ত্তী নাট্যকার গিরীশচন্দ্র অনেক উন্নত। দিজেন্দ্রলাল সমধিক উন্নত। দীনবন্ধু বাবু পূর্ব্বে "নাটুকে রামায়ণে"র কুলীনকুল সর্ব্বস্ব ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনীত হইত। কিন্তু তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল, কেবল মাত্র দীনবন্ধুই সেই সময় বাঙ্গলা ভাষার উপযোগী করিয়া নাটক প্রহসন রচনা করেন। মাইকেলও দুই একটী প্রহসন রচনা করেন, তবে এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব বেশী, কারণ দীনবন্ধুর নাট্যসাহিত্য

বঙ্গের সকল সমাজের প্রতিচ্ছায়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছিল, তাহার রচিত নীলদর্পণ ও সধবার একাদশী শ্রেষ্ঠ নাটক, করুণ ও হাস্যরসের ফোয়ারা। তখনকার নাট্য সাহিত্য বলিতে গেলে সর্ব্ব বিষয়ে অসম্পূর্ণ ছিল, সংস্কৃতের প্রভাব ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজী ভাবে নাটক প্রণয়ন দীনবন্ধুই প্রথম করেন—সেই জন্য বাঙ্গলার নাট্য সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দীনবন্ধুকে অগ্রে মনে পড়ে, তাঁহার অমূল্য রচনাবলী মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়, তাঁহার স্বদেশ ও সমাজ হিতৈষণা গুরুভারে হৃদয় স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

সাধক সঙ্গীত।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

নববর্ষাগমে "স্বাগতম্।"

ভাল আছ'ত হে ভাই।
জিজ্ঞাসিলে কেন বল "আজ্ঞে হাঁ মশাই॥"
বল দেখি সত্য কথা,
ভায়া, তোমার ভাল কোথা,
পেট কামড়ানি, মাথাব্যথা কখন তোমার নাই॥
কর্ম্মফলে জন্ম নিলে,
ছোট হ'তে বড় হ'লে,
ভেবে দেখ তারই ফলে, পলে পলে কমছে আই॥
বর্ষ গেল, বর্ষ এল,
দিনে দিনে দিন ফুরা'ল,
এই বেলা ভাই ভাব কালো, নইলে তোমার ভালাই নাই॥
শ্রীপদ কাতরে কয়,
সাম্‌লে চল ভেবে ভয়,
শেষটা যেন বল্‌তে না হয়, "বল্ মা তারা কোথায় যাই॥"

রূপ কথা।

লেখিকা—স্বর্গীয়া ইন্দি। দেবী।

একদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সাত রাণীর মধ্যের সর্ব্বের ছোট যে রাণী চন্দ্রকুমারী, তাঁর একটীমাত্র পুত্র জন্মায়, নামটী তাঁর চন্দ্রকুমার।

রাজপুত্রের তো রাজপুত্র! চন্দ্রকুমার তো চন্দ্রকুমার! পূর্ণিমার চাঁদের মতন একেবারে ঢলঢলে রূপ। চাঁদে কলঙ্ক আছে তো চন্দ্রকুমারে কলঙ্ক নেই!

বিয়ের বয়স হলো। রাজার আর তাঁর সাত রাণীর ইচ্ছে একটীমাত্র ছেলের সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে বউটী নিয়ে দুদিন আমোদ আহ্লাদ করেন। ছেলের কিন্তু কোন মেয়েকেই পছন্দ হয় না। দেশ বিদেশের রাজাদের শত শত চিত্র নিয়ে ঘটক এসে ফিরে গেল। কুমারের আর কারুকেই মনে ধরলো না। সাত মায়ের বুক ঠেলে নিশ্বাস উঠে এলো বাপের মুখ বিষণ্ণ হলো।

শেষকালে দুধসাগরের রাজার মস্তবড় সুন্দরী কন্যা চমৎকার কুমারীর ছবি নিয়ে দূত এলো।

মন্ত্রী এসে রাজপুত্তুরের হাতে সেই ছবি দিয়ে বল্লেন, "দেখদেখি রাজপুত্র এবার এই রাজকন্যাকে তোমার পছন্দ হবেই হবে।"

রাজপুত্র ছবির দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচ্‌কোলেন, একি আবার সুন্দর নাকি! আরে ছি! এত একটা কাঠের পুতুল!

"রাজপুত্তুরের চমৎকারেকেও মনে ধর্‌ল না। এর চোখ ছোটও নয়, নাক মোটাও নয়—দাঁত উঁচুও বলা যায় না, তবু এ কাঠের পুতুল। খুঁত বার কোরে ছবি ফিরে দিলেন, বল্লেন, "ওর মুখে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, ওকে কি বিয়ে করে!"

রাজা শুনে রেগে উঠলেন, বল্লেন, "এমন মেয়ে তোর পছন্দ হলো না। একেই বিয়ে তোকে কত্তেই হবে।"

রাজপুত্র কি কর্‌বেন বাপের কথা ঠেল্‌তে পারেন না। ভেবে চিন্তে বল্লেন, "মহারাজ এক বৎসর সময় দিন এর মধ্যে সুন্দরী কন্যা পাই ভাল, না পাই ওই কুঁজো মেয়েটাকে বিয়ে কর্‌ব। রাজা খুসী হয়ে বল্‌লেন, বেশ, আজ থেকে ঠিক এক বছরের মধ্যে ফিরে আস্‌বে। লোক লস্কর, হাতী, ঘোড়া নিয়ে যাও।

রাজপুত্র নমস্কার করে বল্‌লেন, "লোক লস্কর হাতী ঘোড়ার ভার আমার সইবে না। আমি একলাই যাব।" বলে রাত্তিরবেলা যখন চারিদিক্ নিস্তুতি কোথাও লোকের সাড়া শব্দ নেই, তেমন সময় রাজপুত্র মাথায় তাজ, রাজার সাজ, হাতে তীর ধনুক নিয়ে পক্ষীরাজে চড়ে চক্ষের পালক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে পক্ষীরাজ বায়ু ভরে উড়ে চল্‌ল।

কত দেশ, কত নদী, কত পাহাড়, পর্ব্বত, কত রাজার দেশ পেরিয়ে রাজপুত্র ক্রমাগতই চলেছেন। ক্ষুধা পেলে কোন দোকানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করেন, ঘুম পেলে বনের ধারে গাছ তলায় শুয়ে ঘুমোন, আর পক্ষীরাজে চড়ে উড়ে চল্‌লেন! এমন করে কতদিন কেটে গেল, রাজপুত্র দেখ্‌লেন, শেষে বুঝি সুধু হাতেই ফির্‌তে হয়। সুন্দরী কন্যা ত কোথাও নেই। পক্ষীরাজের অবারিত গতি, রাজপুত্র সিপাহী সান্ত্রীঘেরা রাজপুরীর ভিতর থেকে রাজ-কন্যাদের চুপি চুপি দেখেন, আর মুখ ভার করে ফিরে আসেন।

নীল সমুদ্রের ধারে ঘুমন্ত দেশের সাত মহলা বাড়ীর ভিতর সোণার খাটে রাজকন্যা মণিমালিনী সখীদের সহিত ঘুমাইয়া ছিলেন। সোণার খাটে ফুলের বিছানা, ফুলগুলিও সব ঘুমাইয়া আছে। দেওয়ালের ছবি ঘুমন্ত, ঝাড়ের বাতী ঘুমন্ত রাজকন্যার গলার বেলফুলের গোড়ে মালাছড়াটাও ঘুমন্ত সাপের মত লতাইয়া পড়িয়াছে। রাজপুত্র গিয়া শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। একি! মানুষ না দেব কন্যা! মরি, মরি এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই। রাজপুত্র কত ডাকিলেন, বীণা বাজাইয়া কত করুণ সুরে গান গাহিলেন, ঘুমন্ত কন্যার ঘুম ভাঙ্গিল না। না জানাইয়া কুমারী কন্যা স্পর্শ করিতে পারে না। না—রাজপুত্র ব্যাকুল হইলেন! করা যায় কি? মাথার কাছে দুইটি সোণা রূপার কাঠি—ভাবিতে ভাবিতে কাঠি দুইটি তুলিয়া লইলেন, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ সোণার কাঠিটি রাজকন্যার গায়ে পড়িয়া কন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, পাশ ফিরিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পদ্মচক্ষু মেলিয়া কুমারের পানে চাহিয়া দেখিলেন। সাতমহলা নিস্তুতি পুরীর মধ্যে কন্দর্প কান্তি রাজপুত্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন, "কে তুমি দেবতা না মানুষ?" রাজপুত্র সব কথা খুলিয়া বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বড় বাড়ী, এত লোকজন সব দিন রাত এমন করে ঘুমিয়ে আছে কেন?" নিশ্বাস ফেলিয়া চোকের জল রেশমের আঁচলে মুছিয়া কন্যা উত্তর দিলেন, "বাবা আমার সমুদ্রের রাজার সঙ্গে বিবাদ করেছিলেন, তাই সে দুষ্ট বুদ্ধি

আমাদের সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে গেছে। কেবল পূর্ণিমায় এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বিয়ে কর্‌তে বলে। এমন নিষ্ঠুর লোক যে, আমার বাপ মাকে, রাজ্যের সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে যে, তাকে কি আমি বিয়ে কর্‌তে পারি—কথা শুনি না বলে, আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে যায়।" মদনদেব কহিলেন, "এস আমরা দুজনে তুমি মেয়েদের আমি পুরুষদের এই সোণার কাঠি ছুঁইয়ে আবার ঘুমন্তদেশের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিই।"

মহা উৎসাহে দুজনে মিলিয়া তাই করিতে সুরু করিয়া দিলেন। সিংহাসনে রাজা, রন্ধন গৃহে রাণী, পূজারতা রাজমাতা, ঘোড়ার উপর রাজপুত্র যে যেমন অবস্থায় ছিল সমুদ্ররাজা তেমনি অবস্থায় তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছিল। মৃতসঞ্জীবনী সোণার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত দেশ আবার পাঁচমিনিটের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। কাড়া নাগাড়ায় ঘা পড়িল, ঘুমন্ত গাছে কুঁড়ি ছিল, ফুল ফুটিল। রাজ্য জুড়িয়া আনন্দের কলরব জাগিয়া উঠিল। রাজপুত্রের আদর যত্নের আর সীমা রহিল না। শুভদিন দেখিয়া রাজকন্যা মণিমালিনীর সহিত রাজপুত্র মদনদেবের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্রের পণ রক্ষা হইল—এমন রূপ ত পৃথিবীতে নাই। রাজকন্যার বিবাহ সন্দেশ খাইয়া কত পেটুক লোকের পেট ফাটিল। গন্ধতৈলে রাস্তার ধূলা ভিজাইয়া দেওয়া হইল। দেশে আর দিন দুঃখী রহিল না।

রাজপুত্র কহিলেন, "মহারাজ অনুমতি দিন দেশে যাই, বাপ মা পথ চাহিয়া আছেন, বছর পুরিতে বড় বেশী বিলম্ব নাই।"

মেয়ে বিদায় করিতে রাজার চোখের জল পড়িল, রাণীরা অন্ন জল ত্যাগ করিলেন, কন্যার গুণে সবাই মুগ্ধ, আনন্দ আবার শোকে স্থান অধিকার করিল।

রাজা হাতী, ঘোড়া, লোকলস্কর, ধন দৌলত মেয়ে জামাইকে যৌতুক দিলেন। রাজপুত্র হাসিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনার লোকলস্কর, হাতী ঘোড়া আপনার থাক—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যাব পার হবে কিসে, এ সব নেব কোথায়।" বলিয়া বাছা বাছা হীরা জহরৎ খান কয়েক সাত রাজার ধন মাণিক এবং রাজকন্যাকে লইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করিলেন।

স্মরণ মাত্রে পক্ষীরাজ উপস্থিত। রাজপুত্র রাজকন্যা রাজারাণীর চরণ বন্দনা করিয়া পক্ষীরাজে আরোহণ করিলেন। পক্ষীরাজ চক্ষের নিমেষ না ফেলতে উড়ে চল্লো। রাজপুরীর রত্নদীপ নেমে গেল। রাজা রাণী মাটিতে

পড়ে হা কন্যে যো কন্যে বলে কাঁদ্‌তে লাগিলেন। এদিকে পক্ষীরাজ উড়ে চলেচে, রাত নেই, দিন নেই, সমানভাবে বায়ুভরে গতি, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজকন্যা কাতরা আর পারি না স্বামী, এইবার বুঝি মারা যাই। রাজপুত্র বল্লেন, তাইত এস, আমরা নেমে খাওয়া দাওয়া করি—গাঁয়ের বাইরে বনের ধারে পক্ষীরাজ নামিয়ে দিলে সাম্‌নেই দেখেন, দিব্য সরোবর। স্নান করে দুজনে সুস্থ হলেন, রাজপুত্র বল্লেন, তুমি এইখানে থাক আমি বাজার থেকে খাবার কিনে আনি। কিন্তু টাকা কড়িত সঙ্গে নেই—সবই যে মণিমুক্তা।

রাজকন্যা বল্‌লেন, "দেখ সাবধানে বেসাত কোর, বেঁটে কুঁজো, গলায় গরগণ্ড, পায়ে গোদ গজচক্ষু, এমন লেকের কাছে যেওনা। বাইরের লোকের কাছে পেটের কথা ভেঙ্গনা, আপনার পরিচয় কারুকে দিও না। আমার নাম মুখে এনোনা! যাও কথা ক'টি মনে রেখ।"

রাজপুত্র বাজারে এলেন, দেখেন সাম্‌নেই একটা বড় খাবারের দোকানে একটা বেঁটে কুঁজো গলায় গরগণ্ড, পায়ে গোদ লোক বসে জিনিষ বেচে। রাজপুত্র ভাবলেন, তাইত এমন লোকের কাছে যেতে রাজকন্যে বারণ করেছেন, তা করুন গে, মেয়ে মানুষের আবার বুদ্ধি! একাই যাব।

রাজপুত্র জহরৎ বার করে তাই দিয়ে খাবার কিন্‌তে চাইলেন। ধূর্ত্ত দোকানদার সব বুঝতে পারলে, এ খুব বড় মানুষ, এর টাকা নেই, সবই জহরৎ! সে খুব মিষ্টি মুখে যত্ন জানিয়ে কথা কহিল। রাজপুত্রের পেটের কথা সব জেনে নিলে। খানিক দূরে বনের ধারে যে রাজকন্যেও বসে আছেন তা পর্য্যন্ত জেনে নিলে। অনেক যত্ন কোরে তাঁকে খেতে দিলে, রাজপুত্র বল্লেন, না থাক বাড়ী গিয়েই খাব।

দোকানী তা শুনলে না। বল্লে সে হবে না মুখখানি যে, একেবারে শুকিয়ে গেছে, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে খাবার নিয়ে বাড়ী যাও।

রাজপুত্র সব ভুলে গেলেন। খেতে বস্‌লেন, দোকানী আস্তে আস্তে বাইরে এসে বাইরে থেকে শেকল টেনে দিয়ে চাবি বন্ধ কোরে একদৌড়ে বনের ধারে রাজকন্যার কাছে উপস্থিত।

রাজকন্যার ত চক্ষুস্থির। তাকে দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেন যে রাজপুত্র কথা রাখেন নি, ধূর্ত্ত লোকের ফাঁদে পড়েছেন। রাজকন্যা অনেক কাকুতি মিনতি কল্লেন, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। দোকানী তা কানেই তুল্‌লে না। ধন রত্ন ও রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। পাছে লোকে জান্‌তে পারে বলে

অনেক দূরে গিয়ে বাস কল্লে। রাজকন্যাকে বিয়ে কর্ব্বার জন্যে কুঁজোর সাধ হোল, রোজ এসে ভয় দেখিয়ে আসতে লাগল। বিয়ে না কর্‌লে তোর স্বামীকে কাটব আর তোকেও কাটব। রাজকন্যা ভেবে চিন্তে বল্লেন, আচ্ছা বিয়ে কর্ব্ব তার আর কি, এক বৎসর আমার মৌনব্রত শেষ হোক, তার পর বিয়ে হবে। এক বৎসর যেন আমার সঙ্গে কেউ কথাটী কয় না।

ধূর্ত্ত রাজকন্যার কথায় স্বীকার হোল, একটা ঘরে রাজকন্যাকে বন্ধ কোরে রেখে দিলে, খাবার দুবেলা দুবার দিত, আর দেখে যেত। এমনি কোরে বছর কেটে এলো।

বৎসর শেষ হয়ে গেল, কুঁজো বল্লে, রাণী আজ আর কোন কথা শুনচি না, আজ বিয়ে কর্ত্তেই হবে।"

রাজকন্যা কাঁদ্‌তে লাগলেন। তাতে কি নিষ্ঠুরের মনে দয়া হয়? বলে ত গেল ঠিক হয়ে থাক, রাত্রে বিয়ে, আমি ফুলের আর পুরুতের যোগাড় করে আনি।

রাজকন্যা ব্রতচর্চ্চার জন্য যে ফুল পেয়েছিলেন, সেই ফুল নিয়ে চোখের জলে মাটিতে ঠাকুর এঁকে পূজা করে বল্লেন, হে ঠাকুর আমি যদি সতী হই, আমায় কুঁজোর হাত থেকে রক্ষা কর।"

বলতে বল্‌তেই ঝন্‌ঝন কোরে ঘরের শেকল খুলে গেল, যদূতের মত সাতটা ডাকাত ঘরে ঢুকে রাজকন্যাকে দেখে, স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইল। রাজকন্যা সাহস করে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন, তোমরা কে? কি চাও?"

তারা প্রণাম কোরে যোড় হাতে বল্লে, মা তুমি বুঝি লক্ষ্মী, এ দুষ্ট কুঁজোর ঘরে কেন?"

রাজকন্যা বল্লেন, আমি লক্ষ্মী নই, তোমরা বুঝি ডাকাত? তা এস, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে দেই।" তারা বল্লে, আমরা ধন রত্ন সব লুটেচি, এখন সেই কুঁজো বেটাকে একবারটী দেখ্‌তে চাই; যদি পোঁতা টাকা কোথাও থাকে। আদায় কর্ব্বো, কুঁজোর ঘর দেখিয়ে দাও।"

রাজকন্যা আঙ্গুল বাড়িয়ে একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন, তারা হুড়োহুড়ি কোরে যেমন ঢুকলো; বাইরে থেকে শেকল বন্ধ কোরে দিয়ে রাজকন্যা অমনি সরাসর বাইরে চলে এলেন। সেখানে সাতটা চোরের সাতটা ঘোড়া, সাতছালা টাকা বোঝাই দাড়িয়েছিল। একটা ঘোড়াখুলে নিয়ে পবন বেগে হাঁকিয়ে চল্লেন।

আসবার সময় পথের ধারের নিশানা ঠিক করে গেছলেন, যেই বনের ধারে এসে উপস্থিত হয়ে দেখেন, বনের ধারে তখনও সেই পক্ষরাজ ঘুরে বেড়াচ্চে। রাজকন্যাকে দেখে আহ্লাদে হিঁ হিঁ করে এগিয়ে এলো। রাজকন্যা চোরের ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বস্‌লেন। আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন, "পক্ষীরাজ তোমার প্রভু যেখানে আছেন, আমায় সেখানে নিয়ে চল।"

নিদেশ মাত্রে পক্ষীরাজ সেই দোকানের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, দরজায় চাবি বন্ধ হলে কি হয় বুদ্ধিমতী রাজকন্যা সবই বুঝলেন, এরই মধ্যে রাজপুত্র বন্দী আছেন, অমনি তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুক্‌লেন। রাজপুত্র প্রথমে মনে করে ছিলেন, কুঁজো এসেছে, তাই চুপ করে পড়ে ছিলেন। রাজকন্যার সাড়া পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠে বস্‌লেন।

"স্বপন? না সত্যি! সাগরপারের হারান নিধি কি ফিরিয়ে পেলুম?"

"পেলে না পেলে চোক খুলেই দেখ তো!"

দুজনে অনেক সুখ দুঃখের কান্না হাসি সাঙ্গ করে পক্ষীরাজে চড়ে এবার আর না বিশ্রাম নিয়ে সোজা নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

রাজ্যশুদ্ধ নর ও নারী রাজপুত্রের বউ দেখে একবাক্যেই স্বীকার হলো যে এমন রূপ তারা আর কোথাও এর আগে চোখেও দেখেনি, শুধু রূপ কথায় যা শোনা ছিল!

রাজকন্যা পক্ষীরাজের পাখা দুখানি আগাগোড়া সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। ভাগ্যে সে একটী বচ্ছর ধরেই সেই বনের ধারটীতে বসেছিল, তাই তো, নৈলে সেই সাতযুগের পথ কাটিয়ে তাঁরা কি আর বাড়ী ফির্‌তেই পারতেন?

অক্ষমতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ মিত্র।

ঘনীভূত মন্দ মেঘ ঈশানের কোণে
অন্তরে গর্জিত ধাতু গিরির ক্ষমতা
স্বামীপুত্রহারা নারীর কান্নার বেগ
ধরাতে রোধিতে নাহি শক্তির সমতা।

স্বাস্থ্য ও সাহিত্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস।

স্বাস্থ্যের সহিত সাহিত্যের তিন প্রকারের সম্বন্ধ।

প্রথম সম্বন্ধ দেহ লইয়া :—সাহিত্য সেবীরা অধিকাংশই বহুমূত্র, অম্ল ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত। এখানে শুধু সাহিত্য সেবাকেই দোষ দেওয়া যায় না; দারিদ্র্যতাই প্রধাণতঃ সেই গুলির জন্য দায়ী। সাহিত্যজীবি দিগের জন্য স্বাস্থ্য বীমা বা সাহায্য ভাণ্ডারের সুব্যবস্থা থাকা উচিত।

দ্বিতীয় সম্বন্ধ।—দেশের লোকের স্বাস্থ্য চর্চ্চা লইয়া।—কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয়, যে দেশে "আয়ুর্ব্বেদ" বেদের শ্রেণীতে উন্নমিত হইয়াছিল এবং যে দেশের ধর্ম্মাচরণের প্রত্যেক সুত্রের সহিত স্বাস্থ্যবিধি ওতঃ প্রোত ভাবে বিজড়িত ছিল ও আছে—যে দেশের সৎসাহিত্যে স্বাস্থ্য কথার চর্চ্চা পাংক্তেয় নয়। যাঁহারা চিকিৎসক—তাঁহারাও যেন স্বতন্ত্র ভাবে সমাজে ধৃত হইত ও হইয়া থাকেন; এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বও যেন স্বতন্ত্র কিম্ভুতকিমাকার একটা বস্তু—অস্পৃশ্য চণ্ডালের ন্যায়। তাহার ফলে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ মৃত্যুর অতি বাহুল্যে জগতের শীর্ষস্থানীয়।

তৃতীয় সম্বন্ধ—স্বয়ং সাহিত্যিক ও তাহাদের লেখা লইয়া।—নষ্ট ও ভ্রষ্ট চরিত্র, সুবিখ্যাত জুয়াচোর জালিয়াৎও লেখক বলিয়া সাহিত্য সভায় স্থান পায়। আবার অশ্লীল ছবি ছাপাইয়া, নক্কার জনক ও প্রত্যক্ষে কামোদ্দীপক লেখা লিখিয়াও সেই ছবি ও লেখার রচয়িতারা সাহিত্য সভায় পাংক্তেয় হয়—ইহার অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি আছে!

তাই আজ আমি প্রত্যেক সাহিত্য সেবীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যে তাঁহারা আমার প্রস্তাবিত বিষয় গুলির আলোচনা করিবার সৎ সাহস দেখান। এবং এতদ্‌সম্বন্ধে অগ্রণী হইয়া ভবিষ্যত সাহিত্য সম্মেলন গুলিতে যাহাতে উত্তরোত্তর এই চর্চ্চা চলিতে থাকে, তাহার পথ এই পবিত্র বঙ্কিম ভবনে করিয়া রাখুন।

শ্রীচৈতন্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপেতে
লভিলে জনম শ্রীচৈতন্য,
তব আবির্ভাবে নবদ্বীপ ধাম
চির আদবের, চির বরেণ্য।
জন্মভূমির সুকোমল ক্রোড়ে
লভিলে সকল শিক্ষা দীক্ষা,
পাপী তরাইতে হরিনাম গাহি
দুয়ারে দুয়ারে করিলে ভিক্ষা।
পাপের স্রোতেতে হিন্দু ধর্ম্ম
ডুবিতে ছিল যে জলধি-জলে,
তুমিই তখন উড়াইলে দেশে
ধর্ম্মের ধ্বজা ভকতি বলে।
দীন হীন জনে, ধনী নির্ধনে
দানিলে সবারে ভকতি মন্ত্র,
তব কণ্ঠের মধু সঙ্গীতে
কাঁপিল বাণীর সে বীণাযন্ত্র।
সুপ্ত নগরী জাগিয়া উঠিল
তোমার শ্বরণকমল স্পর্শে,
নব প্রেমস্রোতে ভাসিল নদীয়া,
ভাসিল বঙ্গ বিপুল হর্ষে।
ভক্ত জনের হরি কীর্ত্তনে
মুখরিত হল নীরব পল্লী,
প্রভাতে সন্ধ্যায় হরিনাম গানে
কাঁপিয়া উঠিল বিটপ বল্লী।

এস গো দয়াল নদীয়ার চাঁদ
এস বাঙ্গলার পূণ্যভূমে,
জাগাও এ ধাম অমৃত মন্ত্রে
মগ্ন আছে যে মোহের ঘুমে।

সমালোচনা।

কায়স্থ পত্র-পঞ্জিকা। এই পত্র পঞ্জিকাখানি "কায়স্থ" মাসিক পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয় দ্বারা ৬৬ নং রসা রোড নর্থ ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত, মূল্য দেড় আনা মাত্র।

এই পত্র পঞ্জিকা খানি প্রত্যেক কায়স্থ জাতির গৃহে শোভা পাইবার উপযুক্ত। কায়স্থ জাতিতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সমাজ-সংস্করণ। মূল্য দুই আনা মাত্র। ব্রাহ্মণ-রক্ষণ সভার বিশেষ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী এবং উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রদত্ত হিন্দি বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ। ৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ-রক্ষণ সভা হইতে প্রকাশিত।

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। আধুনিক সমাজ সংস্কারকগণের হস্ত হইতে পবিত্র হিন্দু সমাজকে রক্ষা করাই এই বক্তৃতার মূল অভিষ্ট থাকায়, এই পুস্তক খানির নাম সমাজ-সংস্করণ দেওয়া সার্থক হইয়াছে।

চিকিৎসক-বান্ধব। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পাইন সম্পাদকদ্বয় সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই মাসিক পত্রিকা খানিতে আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইতেছে। ব্যাধির কারণ, কিরূপে ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, রোগের ইতিহাস, রোগীর বিবরণ সকল প্রকাশিত হইতেছে। আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের আলোচনা পূর্ণ "চিকিৎসা বান্ধব" মাসিক পত্র খানির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ডসটনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রতিমাখান
সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা ক'রতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন। এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ।৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রী শক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, [২য়, সংখ্যা

১।	শ্যামের বাঁশী	শ্রীযুক্ত রমাবিলাস কাব্যবিনোদ	৩৩
২।	আমার নিবেদন	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
৩।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৭
৪।	শ্রীকুঞ্জ-ভঙ্গ	শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত	৪২
৫।	মাষ্টার মহাশয়	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৪৩
৬।	সাধক সঙ্গীত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৪৬
৭।	মরকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৪৭
৮।	দীপশলাকাগ্র	,, ,,	৫৮
৯।	মন্ত্রমুগ্ধ	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	৬২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 5-9-24

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷০, গ্রোস ৭৪৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
ঝাপসা হয়ে যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

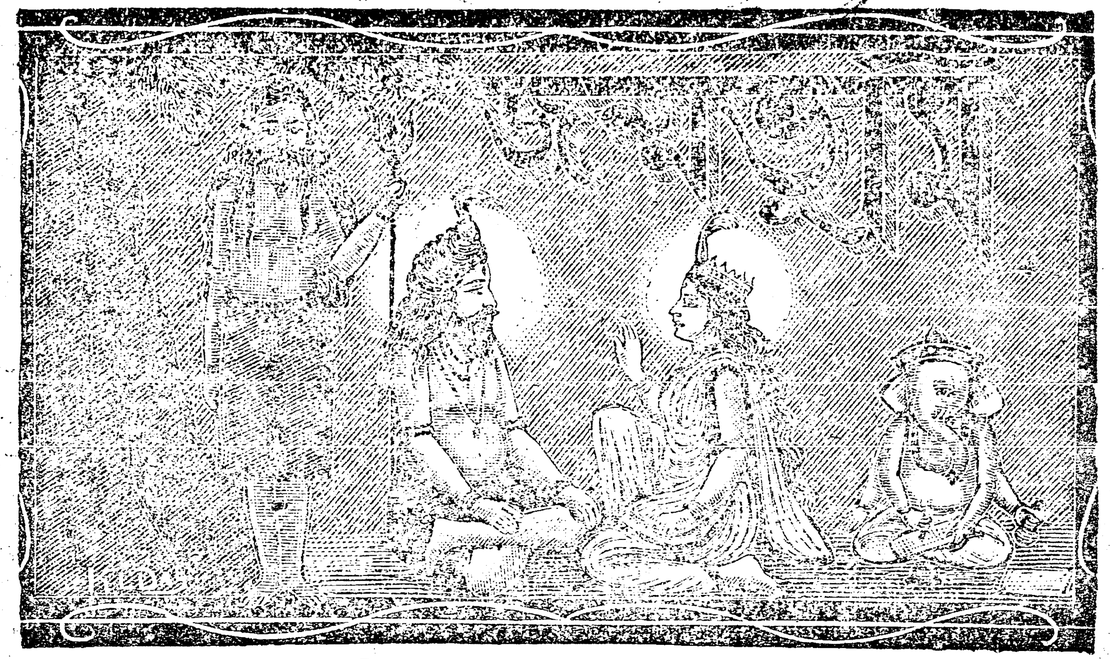

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। | ১৩৩১ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য়, সংখ্যা।

শ্যামের বাঁশী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রমাবিলাস কাব্যবিনোদ।

(১)

শ্যামের বাঁশী শুনবি যদি
আয় গো সবে আয়।
বাজছে বাঁশী কদম তলে,
শুনবো মোরা হেলে দুলে,
পোড়বো শ্যামের পদমূলে,
(তোরা) পড়বি যদি আয়।

(২)

শ্যামের বাঁশী শুন্‌বি যদি
আয় গো সবে আয়।
শ্যাম যখন বাজায় বাঁশী,
মনঃ প্রাণ হয় উদাসী,
ছুটে ছুটে তাইতে আসি,
(মোরা) ভুলে সব জ্বালায়।

(৩)

শ্যামের বাঁশী শুন্‌বি যদি
আয় গো সবে আয়।
শ্যামে বাঁশী বোল্‌ছে রাধা,
রাধা নামে বাঁশী সাধা,
ভাষায় ভাবে সুরে বাঁধা,
(তোরা) শুন্‌বি যদি আয়।

(৪)

শ্যামের বাঁশী শুন্‌বি যদি
আয় গো সবে আয়।
বাজ্‌ছে বাঁশী যমুনায়,
আয় গো সবে ধেয়ে আয়,
প্রেমাশ্রু সলিলে হায়,
(তোরা) ভাস্‌বি যদি আয়।

(৫)

শ্যামের বাঁশী শুন্‌বি যদি
আয় গো সবে আয়!
বাজিয়ে বাঁশী সদাই ডাকো,
বনের মাঝে কোথায় থাকো,
প্রাণ মোদের দেখ নাকো,
(তুমি) হয়ে নিঠুর প্রায়।

(৬)

শ্যামের বাঁশী শুন্‌বি যদি
আয় গো সবে আয়।
শুন্‌লে মোহন বাঁশীর ধ্বনি,
প্রাণের মাঝে প্রমাদ গণি,
আস্‌ছে মোদের গুণমণি,
(মোরা) ধোর্‌বো গিয়ে পায়।

(৭)

শ্যামের বাঁশী শুন্‌বি যদি
আয় গো সবে আয়।
কদমতলে শ্যামের বাঁশী,
শুন্‌তে বড় ভালবাসি,
ঢালে প্রাণে সুধার রাশি,
(প্রাণ) লুটায় শ্যামের পায়॥

আমার নিবেদন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, একদিন এই পুণ্যভূমি হইতে মনীষি বঙ্কিমচন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" অন্যত্র তিনি বাঙ্গালী লেখককে আশ্বাসিত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গলার ইতিহাস চাই।"

কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, "সকলেই লিখিবে, যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে"—তাই আবার বলিয়াছেন যে, যাহা লিখিবে তাহাই মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি!" বঙ্কিমচন্দ্র নবভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনার নিমিত্ত সকল বাঙ্গালীকে তাঁহার এই

আমন্ত্রণ এবং উৎসাহ দান বিফল হয় নাই। এখন তুমি আমি অনেকেই মাতৃ পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, ইতিহাস আলোচনা ও সঙ্কলন করিতে হইবে, এ কথায় আর কাহারও কোন মতভেদ নাই। বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব, রাজনীতিক এবং সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে; অনেক জেলার ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে; অবশ্য এখনও অনেক বাকী; দেশের সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন ইতিহাস অল্পকালে গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। এখনও উদ্যোগপর্ব্ব মাত্র চলিতেছে। আমরা মাল মসলা সংগ্রহ করিতে পারি; ইতিহাস দেবায়তন কালে গঠিত হইবে।

শতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ইংরেজীতে লিখিত ইতিহাসের উপর আমাদের অচলা ভক্তি দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজীতেই ইতিহাস চর্চ্চা করিতে হইবে, এই মোহ আমাদের এখনও কাটে নাই। পাশ্চাত্য জগতে খ্যাতি লাভের আশায় আমরা আজও উদ্‌গ্রীব। শক্তিশালী লোকে ইংরেজীতেও লিখুন, ক্ষতি নাই; কিন্তু দেশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় রচিত না হইলে সাধারণে নিজের দেশকে কিরূপে চিনিবে? এখনও বাঙ্গলায় লিখিত ইতিহাসের যথেষ্ট আদর হয় নাই। চিরদিন এ ভাব থাকিবে না; দেশাত্মবোধের সম্যক্ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সকল দিকের পরিপুষ্টি হইবে। লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইবে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে অনেক আশা করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার এবং বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস এখন নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে আলোচিত হইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়।

ইতিহাস চর্চ্চায় সর্ব্বদা সত্য নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতে হইবে। সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণ করিতে হইবে। "ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এ পরামর্শ ইতিহাস লেখকের জন্য নহে। কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া নিজ মত সমর্থনের নিমিত্ত ইতিহাসকে বিপথে চালিত করিবার প্রয়াস নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। জাতীয় পক্ষপাত দুষ্ট বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য ইতিহাস গুলির প্রতি মনস্বী লোকের যে অশ্রদ্ধা জাগিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক। কেবল অতীত গৌরবের সন্ধানে থাকিলে চলিবে না; গৌরব ও কলঙ্ক উভয়ের আলোচনায় লোক শিক্ষা হইবে। যে দিকে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট তাহা দেখাইয়া জন সমাজকে সুপথে আনয়নের চেষ্টা করিতে পার।

সমগ্র ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় বাঙ্গালীকে আরও অধিক

পরিমাণে নিযুক্ত হইতে হইবে। ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী বিদেশে গিয়া ধর্ম্ম এবং সভ্যতা বিষয়ে যাহা কিছু করিয়াছেন,—তাহার অনুসন্ধানে যত হয় ততই লাভ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার বিষয়ে বাঙ্গালীর যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। প্রশ্নতত্ত্বের উদ্ধার যত অধিক হইবে, এই ভাবের ইতিহাস সঙ্কলনের ততই সুগম হইবে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস চর্চ্চায় আমাদিগকে আত্ম নিয়োগ করিতে হইবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ভুল ভ্রান্তি করিলেও পথ দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। নিরপেক্ষ ভাবে এ বিষয়ের সকল দিক পর্য্যালোচনা করিতে হইলে গভীর জ্ঞান এবং গবেষণার প্রয়োজন। প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস রচিত হইলে জগতের যে উপকার সাধিত হইবে, এক কথায় তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। জ্ঞান এবং ধর্ম্মের দিকেই ভারতবাসীর বিশিষ্টতা সমগ্র জগতে না হউক এসিয়া খণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শাস্তির মধ্য দিয়া মানব সমাজের যে উপকার সাধিত হইয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে তাহার সন্ধান করা পণ্ডশ্রম। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বগ্রাসী প্রয়াসের ব্যর্থতা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় বিপুল সাধনার সাফল্য সপ্রমাণ করিবার উদ্যোগে আমাদিগকে জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। সভ্যতার ইতিহাসের ভিতর দিয়া উত্তরজনে আমাদেরই কেহ ইহা দেখাইবেন এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আসুন আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হই। সত্য আমাদের অবলম্বন হউক; ভগবান আমাদের সহায় হউন।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্তের গীতাবলি পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা সাকার কি নিরাকারবাদী এ বিষয় সন্দিহান হইতে হয়। সাধক রামপ্রসাদ সেন গাহিতেছেন,—

"কে জানে মন কালী কেমন!
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥"

তিনি আবার ব্রহ্ম ধারণায় একটু উচ্চ সীমায় উঠিয়া গাহিলেন,—

"মন তোমার এ ভ্রম গেল না।
মাটী ধাতু পাষাণ মূর্ত্তি গড়িয়ে কর উপাসনা॥"

সাধক কমলাকান্ত বলিতেছেন,—

"জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা ত শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥"

তিনি ব্রহ্ম ধারণায় উচ্চ সীমায় উঠিয়া গাহিলেন,—

"প্রকৃতি পুরুষ, অথবা শূন্য, সেই সকলি, সকলে ভিন্ন।"

আবার এই সকল মহাত্মারা সেই ব্রহ্ম শক্তিকে সাকার রূপে উপাসনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিরূপণেও ব্রহ্মের রূপ চিন্তায় আমাদের আর্য্য ঋষিগণেরও এই মত। তাহারা ব্রহ্ম শক্তিকে সাকার ও নিরাকার ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে সথাভাবে তোমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছ, তুমি আমার বিশ্বরূপ দেখ।" ইহা বলিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। পার্থ সেই অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় বিশ্বরূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভগবান ধনঞ্জয়কে নিতান্ত ভীত দেখিয়া বিশ্বরূপ পরিহার করিলেন। নিরাকার রূপ অচিন্ত্য অব্যক্ত সেই, সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপের স্থূল ধারণাই সাকার উপাসনা। আর্য্য ঋষিগণ সেই সাকার উপাসনাকে দোষাবহ বিবেচনা করেন নাই। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনায় তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি ও নিরূপম রূপের উল্লেখ আছে। আমাদের দার্শনিকগণ ব্রহ্ম নিরূপণে সেই শক্তিকে কেহ সর্ব্বরূপময় আত্মা, কেহ পুরুষ প্রকৃতি, কেহবা পরমাণু রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও দার্শনিক সেই সাকার উপাসনাকে দোষাবহ কি পাপজনক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষে নির্ব্বিবাদে সাকার ও নিরাকার উপাসনা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান, ধ্যান ও ধারণার শক্তি অনুসারে ব্রহ্মশক্তিকে কেহ বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ নিরাকার ভাবে, কেহ বা সাকার ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। মধ্যদেশ ও সমুদয় ইউরোপ খণ্ডে সেই সাকার উপাসনা উচ্ছেদের জন্য বহুদিন ব্যাপী ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লব ও জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছিল। সাধক কমলাকান্ত আর্য্য ঋষিগণের পথাবলম্বী। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ভিন্ন ভগবানের বিরাট ভাব ধ্যান ও ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সামান্য হইতে বিশেষের সৃষ্টি হয়। সামান্য বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহগণের উৎপত্তি

হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সেই জন্য ব্রহ্ম শক্তিকে স্থূলভাবে উপাসনায় সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তিনি সেই শক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন ও কোটাল হাটে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। তিনি নবজলধর বরণীর রূপে সবিতার জ্যোতি, অপার বারিধির অপূর্ব্ব শোভা, বিশ্বব্যাপী আকাশের নিবিড় নীলবর্ণ, মহীরুহগণের সুন্দর শ্যামল কান্তি, শশাঙ্কের সুন্দর সুষমা, ত্রিদিবের কল্পনা প্রসূত ঐশ্বর্য্যরাশি সন্দর্শন করিতেন। এক্ষণে তিনি কোটাল হাটে আগমন পূর্ব্বক সেই বিশ্ব শক্তিকে নয়নজলে প্রণিপাত পূর্ব্বক অমরার গড়ে গুরুদর্শনের কথা মনে করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "মা! যাঁহার কৃপায় শৈশব হইতে তোমার ধ্যান করিতে শিক্ষা করিয়াছি। যাঁহার ঐশী শক্তিবলে তোমাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিয়া তোমার রূপ দর্শনে বঞ্চিত হই নাই, বহুভাগ্য বলে সেই গুরুদেবের কৃপায় আমি পুনর্ব্বার দর্শন পাইলাম। ইচ্ছাময়ী! আর কত কাল এ দাসকে রক্তমাংসময় দেহ বহন করাইবে।" ইহা কহিয়া সাধক কেণারামের সহিত স্নান পূজা ও আহারাদি সম্পন্ন করিলেন।

শীতকাল, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি জাল সুখস্পর্শ সাধক কমণ্ডলু করে কালীবাটীর প্রাঙ্গণস্থ তরুমূলে সলিল সেচন করিতেছেন। সাধক পার্শ্ববর্ত্তী কেণারামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই বিল্ববৃক্ষ আমার রোপিত। আমি প্রতিদিন ইহার মূলে সলিল সেচন করিয়া থাকি। দেখুন ইহার রূপ মায়ের নীল কাদম্বিনী রূপের অনুরূপ। ইহার পত্র সকল একটীও ছিন্ন নহে। মায়ের চরণপদ্মে অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া দিবার উপযুক্ত। ঐ দেখুন লম্বমান বিল্বফল সকল শ্যাম শরীরে সজল জলদবর্ণে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। এই সকল ফল এখনও পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, ইহারা বৃদ্ধ পক্কাবস্থায় স্বর্ণ কলসের শোভাধারণ করিবে, ফলগুলি দর্শনীয় হইলেও অন্তঃসার শূন্য নহে, অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু। ঐ দেখুন আমার স্থলপদ্ম। ইহারা বড় যত্ন প্রিয়। লজ্জা মুখে, নত বদনে, ধরণীর দিকে নয়ন বিক্ষেপ করিয়া আছে। আমি ইহাদের মুখে মায়ের চরণের জ্যোতি অবলোকন করি। ঐ দেখুন মল্লিকাদল, ইহারা এই উদ্যান আকাশে তারাবলি। সুন্দর কুমারীগণের বিমল হাস্যের ন্যায় ইহাদের হাস্য পরিদর্শন করিয়া আমার বিমলার চারুহাস্যের সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিয়া সুখী হই। এই আমার আদরের জবাদল। প্রভাত উত্থিত অরুণের ন্যায় ইহার প্রসূন সকল এই আশ্রম গগনে অপূর্ব্ব শোভার

সমাবেশ করিয়া থাকে। রক্ত চন্দনে মিশাইয়া এই সকল জবা আমি মায়ের চরণে দিয়া পরমা শান্তি পাই। মহারাজা বাহাদুর এই আশ্রমের চারি ধারে পাকা প্রাচীর দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অনুরোধে বাঁশের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। বিশু বেড়ার চারি দিকে লতাজাল রোপন করিয়াছে। দেখুন লতাজাল কি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে, সমুদয় আবরণকে গ্রাস করিয়াছে। শ্যামল ঘন পত্রাবলির মধ্যে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুম সকল নীল পীত লোহিত বর্ণের ছবি খুলিয়া প্রিয় দর্শনীয় হইয়াছে। বিশু সাধকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, সাধকের বাক্য অবসান হইবামাত্র কেণারামকে কহিলেন, "ঠাকুর! আমি এই লতাগুলিকে কেবলমাত্র বেড়া দিবার জন্য এখানে আনি নাই। আমি বাইরে ঐ বনের ভিতর লতাগুলিকে দেখে ভাবলাম হায়! হায়, তোমাদিকে কেউ আদর করে না, তোমরা অন্ধকারে বনের ভিতর পড়ে আছ। ঠাকুর আমাদের পতিত পাবন, তাঁর পাপী তাপী তরাণই কাজ। তিনি আমাকে স্থান দিয়েছেন, তোমরাও তাঁর চোকে পড়্লে তোমাদের দশা ফিরে যাবে, এই ভেবে কতকগুলি লতাকে উপ্ড়ে এনে এই বেড়ার ধারে পুতে ছিলাম। ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টিতে আজ এদের চেহারা দেখুন। ফলে ফুলে সমস্ত বেড়া ঘেরে কালী বাটীর শোভা বাড়িয়েছে। ঐ দেখুন সম্মুখে আমার সদানন্দময়ী জলদবরণী হাস্ছেন। বেড়ার চারিধারে সেই হাসি। কাল বরণী শতাগুলি—তাদের উপর লাল নীল সাদা হলুদ বর্ণের কত ফুলই ফুটেছে।" বিশুর এই কথা শুনিয়া কেণারাম কহিলেন, "বিশুর এখন সকলের উপর সমান সহানুভূতি জন্মিয়াছে। আমি দেখিতেছি, ইহার পর বিশু জগতের কোন পদার্থকেই ভিন্ন ভাবে দর্শন করিবে না। সকল বস্তুতে ঈশ্বরের আত্মা অবলোকন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন।" সাধক একটু হাসিয়া কহিলেন, "বিশুর ইচ্ছা মহারাজের এই কুসুম কাননটীকে লতা কণ্টকাকীর্ণ বন ভুমিতে পরিণত করে। বিশু সর্ব্বদাই অভিযোগ করিয়া বলে কেন বাহিরের ঐ সকল লতা ও কণ্টক এই উদ্যানে স্থান পাইবে না।" ইহা কহিয়া সাধক শ্যামাগৃহের অন্তরালে বিশুর রোপিত শাক বেগুনাদি ক্ষেত্র কেণারামকে দেখাইয়া কহিলেন, "দেখুন ক্ষেত্রটি কণ্টকজাল ও তৃণাদিতে পরিপূর্ণ। কণ্টক ও তৃণাদিকে উপাড়িয়া ফেলিতে বলায় বিশু মনে বড় কষ্ট পায়, সে জন্য এ বিষয়ে আমি বিশুকে আর অনুরোধ করি নাই।" ইহা শুনিয়া কেণারাম কহিলেন, "কেন? বিশু। কণ্টকজাল ও তৃণাদি পরিষ্কার না করিলে শস্য বর্দ্ধিত

হইবে না, তাহা কি তুমি জান না?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমি দেখ্ছি সব যায়গাতেই গরীবের লাঞ্ছনা। আমি কি দোষে এই সকল গরীব কাঁটা গুলিকে টেনে, উপাড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেব বুঝতে পারি না।" কেণারাম কহিলেন, "বিশু, উপায়কে রক্ষা করিতে হইলে অপায়ের বিনাশ কর্ত্তব্য। বিশ্ব পালনী পরমেশ্বরী যজ্ঞ ও দেবগণের রক্ষার জন্য অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! এরা অপায় নয়, অত্যাচারীও নয় এবং পরম উপকারী, একটু মাথা তুলে উঁচু হয়ে উঠেছে এই মাত্র অপরাধ। আমি দেখ্ছি এদের মহৎ গুণ আছে। মা আমার কোন বস্তুকে বৃথা সৃষ্টি করেন নাই। আপনি বলছেন, এরা শাক বেগুন হতে দেয় না। শাক বেগুন সুখের সময় মানুষের মুখ রোচক কিন্তু কাঁটা তৃণাদি মানুষের অসময়ে উপকার করে, কণ্টকারী ও মুথা ঔষধে প্রয়োজন। যারা অসময়ে উপকার করে, তারাই যথার্থ বন্ধু। ঠাকুর এই সকল ভেবে আমি ওদিকে তুলে ফেলে দি নাই।" কেণারাম কহিলেন, "বিশু! তুমি মুথা ও কণ্টকারী বাহিরে অনেক পাইবে, কিন্তু শাক বেগুনের গাছ অযান্ত যেখানে সেখানে জন্মে না. ইহাতেই বুঝিতে হইবে শাক বেগুনকে যত্ন পূর্ব্বক আবাদ করা কর্ত্তব্য।" বিশু কহিলেন, "ঠাকুর, উপকারী ব্যক্তি সম্মুখে থাকিলেও তোমার মত উপকারী অনেক পাওয়া যায় বলে উপকারীকে লাঞ্ছনা করে তাড়িয়ে দেওয়া কি উচিত? আমি ত মুর্খ মানুষ, আপনি কি বলেন?" কেণারাম বিশুর কথা শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া ঠাকুরের মুখ পানে চাহিয়া ভাবিলেন, সাধু সহবাসের কি অপূর্ব্ব মহিমা! সেই ঘোরতর মহাপাষণ্ড, হিংস্র বিশেডোম সাধু সহবাসে পরম অহিংসা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। মানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিতে ভগবচ্ছক্তি বিদ্যমান দেখিতেছে। মানব যেমন প্রিয়তম হইতে প্রিয়তম নিজ শরীরের উপর হিংসা করিতে অতি বড় কুণ্ঠিত হয়। বিশুও সর্ব্ব বস্তুকে নিজ শরীরের ন্যায় বোধ করিতেছে। ঠাকুর একটু হাঁসিয়া কহিলেন, "এরূপ সহানুভূতি মন্দ নহে। কিন্তু এরূপ সহানুভূতির পরিণাম কি তাহাই আমি ভাবিতেছি। আমি দেখিতেছি, মহারাজের কালী বাটীটী বিশুর সর্ব্ববস্তুতে সমান ভাব বশত শীঘ্র জঙ্গলে পরিণত হইবে। কীঠ পতঙ্গ মশকাদির দংশনে এখানে অবস্থান করা কঠিন হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীকুঞ্জ-ভঙ্গ।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্তদুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত।

(১)

সাজান বাগান মোর শুকাইয়া যায় রে!
কি দোষে হানিল বিধি অশনি মাথায় রে!
আনন্দ সরসী নীরে,
কমলিনী ধীরে ধীরে,
চাহিয়া অরুণ পানে কেন ডুবে যায় রে!
মরম বেদনা হায় জানাইব কায় রে?
সাজান বাগান মোর শুকাইয়া যায় রে!

(২)

স্বকরে আকর হ'তে রতন মালায় রে!
তুলিয়া সোহাগ ভরে পরিনু ভালায় রে,—
বিধি হ'ল প্রতিকূল,
মরমে বুঝিনু ভুল,
আপনি ছিঁড়িয়া মালা গড়াগড়ি যায় রে;
আচ্ছাদিল ভস্মরাশি উজল প্রভায় রে,
সাজান বাগান মোর শুকাইয়া যায় রে!

(৩)

আনন্দ কানন হায় রচিয়া হিয়ায় রে,
মোহিনী-প্রতিমা গড়ি বসাইনু যায় রে,—
বিধি হ'ল প্রতিকুল,
মরমে বুঝিনু ভুল,
কে ভজিল সে মুরতি,—ফেলিল ধরায় রে!
আধারিল কুঞ্জ-বন, আঁখি অন্ধ হায় রে!
সাজান বাগান মোর শুকাইয়া যায় রে!

(৪)

কনক বল্লরি মোর! ওগো ফিরে চাও রে!
অতৃপ্ত বাসনা ল'য়ে কোথা তুমি যাও রে!
না,—না, বিধি প্রতিকূল,
মরমে বুঝিনু ভুল,—
পতিপদ ধূলি মেখে যাও সতি যাও রে!
অক্ষয় অমর ধামে চিরশান্তি পাও রে
পাগলিনী সোহাগিনী জগতে জানাও রে!
জ্বালার সংসার পানে ফিরে না তাকাও রে!
সাধের বাগান মোর শুকাইয়া যায় রে!

মাষ্টার মহাশয়।

লেখক,—হরিধন মিত্র।

(১)

"বাবা!" সেই কেলে কুৎসিৎ লোকটা আমার মাষ্টার হবে? সে মাষ্টারির কি জানে?

বাবা বল্‌লেন,—তাকি হয়েছে "অনি!" কেলে কুৎসিৎ লোক কি পড়াতে জানে না? আমি তাকে ভাল রকম জানি, তিনি উচ্চ শিক্ষিত। তার উপর চরিত্রবান। কাল' হলে কি হয়?

আমি—কাল হলে কি হয়? হবে আর কি? ছাই হয়! কিন্তু বাবা আমি বেশ বুঝছি সে আমার Second Book, আখ্যানমঞ্জরী ও শুভঙ্করী এর একটাও কিছু পড়াতে পার্‌বে না!

"আচ্ছা দেখে নিয়ো ঠিক্ পার্‌বে।"

"ছাই পার্‌বে! মুণ্ডু পার্‌বে! ঘোড়ার ডিম্ পার্‌বে!"

(২)

আমি বাবার একমাত্র মেয়ে। আমাদের সংসারে আর কেউ ছিল না।

আমি আর বাবা। বাবা রোজগার করে অনেক টাকা জমিয়েছিলেন। সে ই টাকার সুদেই তাঁর ও আমার বেশ চলে যেত। মাইনে করা রাতদিনের রাঁধনী ও ঝি ছিলো; তারাই বাড়ীর সব কাজকর্ম্ম কর্‌ত—আমাকে কিছুই কর্‌তে হত না। তার উপর বাবার আদরে আদরে আমি গর্ব্বে একেবারে ফুলে উঠেছিলুম। রাতদিন নানা রকমের পোষাক পরে, গায়ে আতর মেখে ও ফুল নিয়ে ব্যস্ত থাকতুম। আমার মনে হত আমার কিসের অভাব? রূপের—পয়সায়—আদরের? না কিছুর না। বাবাত বলেন, আমার মত রূপ আর কোন মেয়ের নেই। তাঁর অগাধ পয়সা ব্যাঙ্কে জমা আছে, তিনি ত বলেনই সে সব আমারই হবে। আর আদরের ত কথাই নেই—বাবাকে যা বলি তাই হয়, বাবার কাছ থেকে যা চাই তাই পাই। কিসের তবে অভাব? কিছুর না।

তবে অভাব একটা—রূপবান শিক্ষক। আমার মাষ্টার—সে কিনা কাল কুৎসিত। বাবা কি বুঝেছেন তাঁর ঐ কাল কুৎসিত মাষ্টারটাকেই ভাল লাগে। আমি বাবাকে কত বলি—ঐ কাল কুৎসিত মাষ্টারটাকে ছাড়িয়ে দাও। বাবা কখন হাঁ,—কখন না—ইত্যাদি নানান কথা বলেন। আসলে সেই কাল কুৎসিত লোকটাই আমার মাষ্টারী কচ্ছে।

(৩)

মানুষ যখন ধ্বংসের পথে এগোয় তখন তার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। সে একবারও পিছন ফিরে দেখে না, অনবরত এগিয়ে যায়। বাবারও তাই হল।

বাবা অসৎ সংসর্গে পড়ে সব পয়সা উড়িয়ে দিতে লাগলেন। ব্যাঙ্কে যা টাকা জমা ছিল সব তুলে নিয়ে খরচ করে ফেল্‌লেন। তার পর বাড়ী বাঁধা দিয়ে, দেনা করে কি রকম হয়ে গেলেন। আমার উপর তাঁর সে রকম আদর যত্ন রইল না। রাঁধনী ও ঝিকে জবাব দিয়ে আমায় বল্‌লেন—অনি, এখন থেকে তোমার সব কাজ কর্‌তে হবে মা। তুমি ত আর ছেলে মানুষ নও। পরের ঘরে যেতে হবে, ওসব না শিখ্‌লে চল্‌বে কেন?

(৪)

ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হলে নানা রকম বিপদ ঘটে। আমারও তাই হল। একে বাবার চরিত্র মন্দ, তার উপর কোথা থেকে তাঁর শরীরে জ্বর-ব্যাধি এসে আশ্রয় কর্‌লে। তিনি রাতদিন বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

তাঁর নূতন সংসর্গের বন্ধুগণ সব কোথায় সরে পরে পড়ল। হায় রে মানুষের কৃতজ্ঞতা!

কিন্তু আমার সেই কাল কুৎসিত মাষ্টার মশাইটি ডাক্তার ডেকে এনে ঔষধের নিয়মিত ব্যবস্থা কর্‌তে লাগ্‌লেন। বাবার উপর তাঁর যত্নের কোন ত্রুটী দেখলুম না। মনে মনে ভাবলুম—উঃ সেই কাল কুৎসিত লোকটাই শেষকালে বাবার জন্যে এত কচ্ছে। বাবারত ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই, তবে কি সেই কাল কুৎসিত লোকটাই নিজের পয়সা দিয়ে বাবার জন্য ডাক্তার আনাচ্ছে। "লোকটা তা হলে ভাল।" পরক্ষণেই মনে হল ছাই ভাল। বাবার এতকাল পয়সা খেয়ে এসেছে। এখন কোন আক্কেলে আর এই একটা সামান্য উপকার না করে। আবার মনে হল না না ভাল। আমাদের এই বিপদের সময় অমন করে সাহায্য কচ্ছে। আর ত কেউ কর্‌তে আসেনা।

(৫)

আজ বাবার জ্বর একটু বেড়েছে। পায়ের কাছে আমি শুষ্ক মুখে বসে আছি! মাথার পাশে সেই কাল কুৎসিত লোকটা পাখা নিয়ে বাবাকে বাতাস কচ্ছে। আর মাঝে মাঝে কপালের ন্যাকড়াটা ওডিকোলনে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

* * * *

হটাৎ আমার দিকে চেয়ে সেই কাল কুৎসিত মাষ্টারটা বল্লেন,—অনিলা! তোমার মুখখানা বড় শুকিয়ে গেছে কি খেয়েছ?

তার কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। মনে হল তার পা-দুখানা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলি,—"ওগো দেবতা, তুমি সুন্দরের চেয়েও সুন্দর, তোমায় বুঝতে পারিনি আমায় ক্ষমা কর।"

আমায় চুপ করে থাক্‌তে দেখে সেই কাল কু—না না সেই দেবতার চেয়েও সুন্দর লোকটী আবার বল্লেন—অনিলা! কি খেয়েছ ভাই?

শুনে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"ওগো আমি তোমার ভাই? না তা হবে না—আমি তোমার দা"—বলেই কি ভেবে আমার বড় লজ্জা পেতে লাগল। মাষ্টার মশাই এ সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্লেন খেয়েছ কি না বল না?

"না।"

"যাও খেয়ে এস।"

"ঘরে একটীও চা ল নেই।"

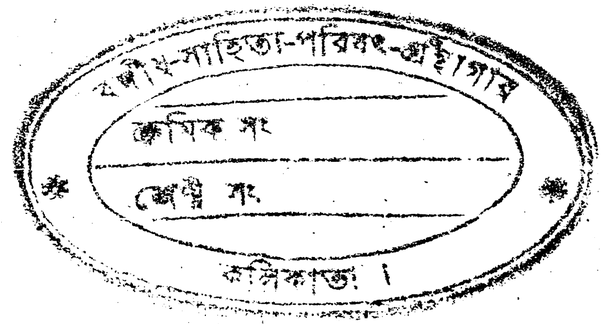

"চাল নেই ?"

"না।"

আচ্ছা তুমি বস আমি দশ মিনিটের মধ্যেই চাল আর কিছু আলু, পটোল নিয়ে আস্‌ছি।

আমি বল্‌লুম—মাষ্টার মশাই! বাবাকে ফেলে আজ আর রাঁধতে পারব না। চাল টালের দরকার নেই।

"আচ্ছা তুমি বস আমি এক্ষুণি আসছি।"

* * *

কিছুক্ষণ পরেই সেই দেবতার চেয়ে সুন্দর লোকটী এক ঠোঙা খাবার নিয়ে এসে বল্লে—আচ্ছা এগুলি খেয়ে নাও।

(৬)

আজ সকালবেলা ডাক্তার বাবাকে দেখে বড় ভয় পেলে। তার মুখ দেখে আমি বুঝ্‌লুম তিনি বাবার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান।

* * *

কিছুতেই কিছু হল না। বৈকাল বেলা বাবা আমার হাতখানি ধরে সেই সুন্দরের চেয়েও সুন্দর মাষ্টার মহাশয়ের হাতের উপর দিয়ে, "বাবা! একে দেখো, তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, একে তোমার জীবনের চির-সঙ্গিনী করে রেখো"—বলে তাঁর চক্ষু চিরতরে মুদ্রিত কল্লেন।

আমি—"বাবা! বাবা! মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই! কি হল বলে চীৎকার করে উঠ্‌লুম।

সাধক সঙ্গীত।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

(আমি) চাইলে ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী!
(আমায়) দোষের দণ্ড দাও শঙ্করি!
(আমি) ভয়ঙ্করী মায়ের ছেলে শঙ্করে হুঙ্কারে মারি॥
বারণ যেটা, করি সেটা, ভাল মন্দ না বিচারি॥
(অম্‌নি) সঙ্গে সঙ্গে কিল্ চাপর্ সব হাসিমুখে হজম করি॥

(আমায়) দুষ্ট বলে কত দণ্ড দেবে তুমি দিগম্বরি!
(এযে) গর্ভ দুষ্ট ছেলে তোমার "আশীলক্ষেও" নাহি ডরি॥
(তোমার) দণ্ডবিধি যা ছিল মা, বল ফেঁসেছে ও শঙ্করি।
(এযে) লাজের কথা, লোক সমাজে প্রকাশ করে বল্‌তে নারি॥
বাকি দণ্ড যা আছে গো দিয়ে ফেল কৃপাকরি।
(আমি) বেঁচে থেকে সে গুলোও মা, একে একে পরখ্ করি॥
(কেবল) বোঝবার আছে একটা কথা, (আমি) তোমার খাই মা
তোমার পরি।
(তুমি) যা করাও তাই করি আমি; যেমন ফেরাও তেমনি ফিরি॥
তাতে আবার তোমার মত মা, যার করে গো চৌকীদারী।
কোন্ ফাঁকে যে প'ড়ে দোষে (হয়) দণ্ডভোগের অধিকারী।
চালক যদি চালাক হয় মা, বালক দোষী হয় কি করি'।
"উদর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" পড়ে যে তায় দেখধরি॥
মার করে ছেলের দণ্ড দুঃখ তাহে নাহি করি।
বরং তাতে প্রাণের তৃপ্তি মায়ের তৃপ্তি অনুসারি॥
মুলে কিন্তু কায় ভুলে না ছেলের ঝরে চোখের বারি।
তা বুঝে গো কর দণ্ড, শ্রীপদ দণ্ড ভিখারী॥

মরকত মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নরোত্তম ঠাকুর।

চন্দ্রচুড় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে বৈজয়ন্ত গিরি। সেই দুই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে একটি তপসীর আশ্রম। একদা দিবা তৃতীয় প্রহরের পর সেই আশ্রমে একটী সন্ন্যাসী বসিয়া নয়নানীমিলন পূর্ব্বক ধ্যান করিতেছেন, পার্শ্বদেশে কতকগুলি পুষ্প অযত্নে বিকীর্ণ রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন এইমাত্র কেহ সেই ফুলগুলি তুলিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছে। কোন দিকে জনমানবের

সঞ্চার নাই। সন্ন্যাসীরা দাস দাসী রাখেন না, কেহ কেহ চেলা রাখেন. কেহ বা নিঃসঙ্গ হইয়া নির্জ্জনবাস ভাল বাসেন। এ সন্ন্যাসীর কোন ভাবের সন্ন্যাস, ভাল করিয়া না জানিলে পরিচয় দেওয়া দুর্ঘট। একটু মাত্র পরিচয় এই যে, সন্ন্যাসীর বয়স অধিক নহে, উর্দ্ধ সংখ্য ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর।

সন্ন্যাসী ধ্যানে আছেন, সহসা সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ দূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। যোগ প্রগাঢ় হইলে কোন প্রকার বাহ্য শব্দে যোগীগণের ধ্যান ভগ্ন হয় না, কিন্তু শব্দ শুনিবা মাত্র এই সন্ন্যাসীটী নয়ন উন্মীলন করিলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, একি! কোথায় অশ্বের পদধ্বনি! কোন কোন শিক্ষিত অশ্ব পর্ব্বতে উঠিতে পারে, ইহা কি তবে তাহাই অথবা আশ্রয়ের পশ্চাত হইতে শব্দ আসিয়াছিল? যদি তাহাই হয়, তবে থামিল কেন? অশ্বপৃষ্ঠে কি শোওয়ার আছে? সন্ন্যাসীর আশ্রমে অশ্বারোহিরা কেন আসিবে? বোধ হয় তবে ভ্রম।

সন্ন্যাসী পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পুনরায় অশ্বপদধ্বনি। সন্ন্যাসী আর সে বারে চাহিয়া দেখিলেন না, পূর্ব্ববৎ ধ্যানে রহিলেন। পাঁচ মিনিট পরে কে যেন সম্মুখে আসিয়া জয় ভৈরব নাথ বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী আর ভ্রমের কুহক না ভাবিয়া সাম্‌নে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? একটী সুন্দর যুবা পুরুষ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভুতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। মুখখানি দেখা যাইতেছে না, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের পরিচ্ছদ যেন রাজপুত্রের ন্যায়। স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কে তুমি বৎস! গাত্রোত্থান কর।"

যুবা পুরুষ উঠিয়া বসিলেন। করযোড়ে বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি বৎস! অপরাহ্ন সময়ে এই বিজন পর্ব্বত প্রদেশে কেন আসিয়াছ?

পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া যুবা উত্তর করিলেন, আমি আপনার দাস আশ্রয় প্রার্থী।

সবিস্ময়ে সন্ন্যাসী কহিলেন আশ্রয় প্রার্থী। আশ্চর্য্য! দেখিতেছি, রাজপুত্রের ন্যায় চেহারা। রাজপুত্রের ন্যায় বেশভুষা, সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় ভিক্ষা করা সত্য সত্যই আশ্চর্য্য।

যিনি আসিয়াছেন তিনি সত্য সত্যই রাজপুত্র কিনা, সে পরিচয় এখনও

আমরা পাই নাই। সন্ন্যাসী তাহাকে রাজপুত্র মনে করিতেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া না যায় ততক্ষণ আমরাও অগত্যা তাঁহাকে রাজপুত্র বলিতে বাধ্য। রাজপুত্র বলিলেন, "আপনি মহাপুরুষ! আপনার নিকট আমি অসত্য কহিব না। যথার্থই আমি বিপদ্‌গ্রস্ত। যথার্থই আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।"

মস্তকে করোত্তলন পূর্ব্বক নারায়ণ স্মরণ করিয়া, সন্ন্যাসী কহিলেন, "অতিথি।" রাজপুত্র বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ!" অতিথি আশ্রিত উভয়ই আমি। বিশেষতঃ বিপদ্‌গ্রস্ত।

সন্ন্যাসী। বিপদ্‌গ্রস্ত! কি বিপদ্? বৎস!

অতিথি। আমাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাতে লোক আসিতেছে। অশ্বারোহণে ছিলাম পশ্চাৎ ধাবকেরা পদব্রজে—সেই নিমিত্তই অগ্রে আসিতে পারিয়াছি। বোধ করি, তাহারা এখনই আসিয়া পড়িবে।

সন্ন্যাসী। ধরিতে আসিতেছে। কি অপরাধে?

অতিথি। আমি খুন করিয়াছি।

সন্ন্যাসী সসব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভ্রুকুঞ্চন করিয়া চমকিত স্বরে কহিলেন, "খুন।"

অতিথি। হাঁ প্রভু! খুন। আমি একটী নারীহত্যা করিয়াছি।

কি করা কর্ত্তব্য, বিবেচনা করিয়া অগ্রেই সন্ন্যাসী সেই অতিথির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমের পশ্চদ্ভাগে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে একটি বৃক্ষবাটিকা, অতিথিকে তথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বসাইয়া সন্ন্যাসী তাহার বক্ষ ও ললাট কর দ্বারা স্পর্শ করিলেন, দেখিলেন, কম্প নাই, স্বেদ নাই, চাঞ্চল্য নাই, দিব্য প্রশান্ত ভাব। সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সুন্দর যুবা পুরুষ স্ত্রীহত্যা করিয়া আসিয়াছেন, প্রথমত হইতেই অসম্ভব। তদ্ব্যতীত খুনী লোকের অঙ্গে কোন প্রকার কম্পন নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইহা যেন আরও অসম্ভব।

সংশয় ভঞ্জনের অবসর হইল না, আশ্রমের সম্মুখে কলরব শ্রবণগোচর হইল। প্রশান্ত গম্ভীর বদনে সন্ন্যাসী ঠাকুর দ্রুতবেগে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, পাঁচজন অস্ত্রধারী পুরুষ। বীর পুরুষের ন্যায় আকৃতি নহে—সামান্য পদাতিকের ন্যায় আকৃতি। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করিতে আসিয়াছ কে তোমরা?"

সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "আসামী অন্বেষণে আসিয়াছি। পলাতক খুনী আসামী।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "পলাতক খুনী আসামী তপস্বীর আশ্রমে ইহা তোমরা কি প্রকারে বুঝিলে?" একজন বলিল, "এই পথেই আসিয়াছে। এই উপত্যকা প্রদেশে প্রবেশ করিবার অন্য পথ নাই। অধিকন্তু আমাদের আসামী একটি শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার ছিল। সেই অশ্বটা শূন্য পৃষ্ঠে অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে। একটা বৃক্ষমূলে সেই অশ্বটী বন্ধন করিয়া আমরা এই দিকেই আসিতেছি।

মিথ্যা কথাও বলা হইবে না। অথচ আশ্রয়ার্থীকে রক্ষা করিতে হইবে, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রশান্ত স্বরে সন্ন্যাসী কহিলেন, "যাহাই তোমরা হও, যাহা করিতেই আসিয়া থাক, এখন আমার অতিথি, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এইখানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হও। তাহার পর তোমাদের বাক্য শ্রবণ করিব।"

পঞ্চ পদাতিক এক সঙ্গে পঞ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "বিশ্রামের অবকাশ নাই। ভোজনে আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনি বলুন, এ পথে কেহ পলাইয়া গিয়াছে কিনা?

একটু চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "পলায়ন করিতে কাহাকেও দেখি নাই। অস্ত্রধারী হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করাতে তোমাদের অপরাধ হইয়াছে, আতিথ্য গ্রহণ করিলে আমি সে অপরাধ ক্ষমা করিব।

লোকেরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর সহিত বাগবিতণ্ডা করা দোষাবহ ভাবিয়া কাজে কাজে তাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবেশন করিল। সন্ন্যাসী স্বহস্তে কয়েকটী ফল আনয়ন করিয়া তাহাদের ভক্ষনার্থ প্রদান করিলেন। অপরাধ করিলে পুরাকালের মুনি ঋষিরা অভিশম্পাত প্রদান করিতেন, সকোপনয়নে চাহিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিতেন, সেই পৌরাণিক কথা স্মরণ করিয়া তাহারা সন্ন্যাসীর উপহার রক্ষা করিল।

অর্দ্ধদণ্ড অতীত. ঐ পাঁচজনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান মৌন ভঙ্গ করিয়া সেই ব্যক্তি আপন সঙ্গিগণকে কহিল, "তপস্বীর আশ্রমে খুনীলোকের লুকাইবার স্থান নাই—বোধ করি, আসামী তবে এদিকে আইসে নাই। পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া হয় ত পর্ব্বত শিখর দেশে আরোহণ করিয়া থাকিবে, চল আমরা পর্ব্বত শিখর দেশে অনুসন্ধান করিতে যাই।"

সন্ন্যাসীর অনুমতি লইয়া পরিত্যক্ত অস্ত্রাদি পুনঃ গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচজনেই বৈজয়ন্ত পর্ব্বতের শিখরাভিমুখে উত্থিত হইতে লাগিল।

দুই দিকে দুই পর্ব্বত। বৈজয়ন্ত পর্ব্বতের আসামীকে যদি না পাওয়া যায়, নামিয়া আসিয়া উহারা পুনর্ব্বার এই দিকে আসিতে পারে, চন্দ্রচুড় পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করিতে পারে, এই ভাবিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর আশ্রমের পশ্চাতে গমন করিলেন। যেখানে সেই অপরিচিত রাজকুমার প্রচ্ছন্ন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া চুপি চুপি তাহাকে কহিলেন, "তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। সত্যই তোমার পশ্চাতে লোক আসিতেছিল। এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইচ্ছানুসারেই বৈজয়ন্ত শিখরে আরোহণ করিতে গেল, তথা হইতে নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসা বহুক্ষণ সাপেক্ষ। তোমার অশ্বটী তাহারা পথি মধ্যে এক বৃক্ষ মূলে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। হাঁ কজন লোকে তোমার পশ্চাদ্ ধাবিত হয় তাহা তোমার মনে হয়? অতিথি উত্তর করিলেন, "পাঁচজন।"

উর্দ্ধমুখ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে তোমার অশ্ব নিরাপদ, তুমিও এখন নিরাপদ, অশ্বের নিকট প্রহরী নাই, এই সময় তুমি পলায়ন কর। সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব অল্প, কিয়ৎদূর যাইতে যাইতেই অন্ধকার হইয়া আসিবে। দ্রুত অশ্ব ধাবনে তুমি সচ্ছন্দে নিরাপদ স্থানে পহুছিতে পারিবে। প্রস্থান কর বিলম্ব করিও না।"

অতিথি কহিলেন, "আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমি পলাইতে পারিব না। এই পার্ব্বতীয় পথের চতুর্দ্দিকই বিপদ ক্ষেত্র। নিরাপদ স্থান কোথায় পাইব।"

সন্ন্যাসী আবার চিন্তামগ্ন হইলেন, আবার সেই পূর্ব্ব সন্দেহ মনে আসিল। এমন সুন্দর চেহারা যাহার সে কখন নারীহন্তা হইতে পারে না। হইলেও বিপদক্ষেত্রে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া আপাততঃ আমার এ আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। এই নিশাকালে এই স্থলেই আমি আশ্রয় দিব, অতিথি যদি মিথ্যা কথা না বলে, তাহা হইলে বোধ হয় সত্য পরিচয়টীও আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া অতিথিকে তিনি বলিলেন, "তবে থাক।"

আশ্রমে আনয়ন করিলেন না। অগ্রে যেখানে রাখিয়া ছিলেন, অতিথিকে সেই খানেই রাখিয়া সন্ন্যাসী নীরবে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। উভয়েই নীরব। আরও অর্দ্ধদণ্ড অতিক্রান্ত হইয়া গেলে সন্ধ্যা হইল। আকাশ মণ্ডল দিব্য পরিষ্কার। আকাশ কন্যারা আকাশ-পটে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যা দেবীর উপাসনা করিল। চন্দ্রোদয় হইল না, নির্ম্মল গগনে নক্ষত্র মাঝে নক্ষত্রপতি নাই, এই লক্ষণেই বোধ হইবে কৃষ্ণপক্ষ রজনী।

যাহারা গিরি শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারা নামিল না। অন্য দিক দিয়া হয়ত অন্য পথে চলিয়া যাইবে, কিম্বা হয় ত অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া সমস্ত রজনী পর্ব্বতে পর্ব্বতেই ভ্রমণ করিবে, সন্ন্যাসীর মনে এইরূপ ধারণা হইল। অতিথি সৎকার আশ্রমের নিয়মানুসারে যতদূর সম্ভব আশ্রিতের সে অবস্থায় খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করা যতদূর সম্ভব ততদূর পরিমাণে অতিথি সেবা সম্পন্ন হইল। বৃক্ষ বাটিকার যে স্থানে তাহারা বসিয়াছেন সে স্থানটী তাদৃশ অনাবৃত ছিল না, সারি সারি তরুরাজি পরস্পর শাখায় শাখায় সংলগ্ন করিয়া কুঞ্জ বাটিকার ন্যায় যেন একখানি চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। লোকালয় ত্যাগী সংসার বিরাগী যোগী ঋষিরা তাদৃশ স্থলকেই অধিক ভাল বাসেন, শান্তি ক্ষেত্র মনে করেন। শিখরারোহিরা তখনও পর্য্যন্ত অদর্শন, অবসর বুঝিয়া সন্ন্যাসী মিষ্ট বচনে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরিচয় প্রকাশ করিবার কোন বাধা আছে কি ?"

অতিথি। বাধা কিছুই নাই। কিন্তু যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সহসা পরিচয় প্রদানে শঙ্কা হয়।

সন্ন্যাসী। এখানে শঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, আমি বনবাসী তপস্বী। আশ্রিতকে আশ্রয় দান করাই আমার ধর্ম্ম, ভয় করিও না, সংশয় আনিও না, নির্ভয়ে পরিচয় প্রদান কর।

অতিথি। মহাপুরুষের আশ্রমে কোন শংঙ্কা নাই, তাহা আমি জানি, কিন্তু চিত্ত আমার এখন অত্যন্ত শঙ্কার স্থল।

সন্ন্যাসী। চিত্তকে শান্ত কর। তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে অপরাধ তুমি করিয়াছ। ভাবিতেছ, সত্য সত্য তাহা যেন তুমি কর নাই। ভ্রম হইতেছে, ভয়ে তোমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইতেছে, ভয় পরিত্যাগ কর মঙ্গল হইবে, পরিচয় দাও।

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অতিথি অতি সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রবণমাত্র সন্ন্যাসী সচকিতে চমকিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসীর সেরূপ ভাব হইবার কারণ কি ? অতিথির পরিচয় পাইয়া তিনি চমকিলেন কি জন্য ? এই দুই প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন ঠিক দিতে পারিব না। কিন্তু অনুমানে যাহা আসিতেছিল পরিচয়ে, তাহাই সত্য প্রকাশ পাইল। সত্যই অতিথিটী রাজপুত্র।

পরিচয়ে রাজপুত্র এই কারণেই কি সন্ন্যাসী চমকিলেন তাহা নহে। রাজপুত্রের

পিতার নাম শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। কেবল বিস্ময় মাত্রও নহে। সন্ন্যাসীর নয়নে যেন সংসারী লোকের চঞ্চলতা বিকাশ পাইতে লাগিল। অতিথি পরিচয় দিয়াছেন, তাহার নাম সমরনাথ। পিতার নাম রাজা অমরনাথ। রাজ্যের নামটীও সমরনাথ অপ্রকাশ রাখেন নাই। এই তিনটি মাত্র কথা।

সেই তিন কথা ভিন্ন তখনও সন্ন্যাসীর কর্ণে অন্য কথা প্রবেশ করে নাই। কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনর্ব্বার তিনি রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা অমরনাথের পুত্র তুমি ?

রাজপুত্র। হা মহাশয়! তাঁহারই পুত্র।

সন্ন্যাসী। (সবিস্ময়ে) পুত্র!

রাজপুত্র। হাঁ মহাশয়! দত্তক পুত্র।

সন্ন্যাসীর বিস্ময় আরও যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। বিষয়ী লোকের যেমন আত্ম স্বার্থের কিছুমাত্র বিরোধী বাক্য শ্রবণ করিলে অন্যমনস্কে চিত্তকুল হন, তিনিও সেইরূপ অন্য মনস্ক হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "রাজা অমরনাথ দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমি শ্রবণ করি নাই। তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল, সেই পুত্রের অভাবে দত্তক গ্রহণ ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই সমরনাথের মুখখানিতে রাজা অমরনাথের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কোন কথা সত্য। ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, রাজা অমরনাথের ঔরসজাত একটী পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ ?

রাজপুত্র। দেখিয়াছি। আমার সেই ভগ্নীটি—

সন্ন্যাসী। ভগিনী ? তোমার ? আচ্ছা, তাহার নাম কি বল দেখি ?

রাজপুত্র। মরকত মোহিনী।

সন্ন্যাসী। (সকৌতুকে) মরকত মোহিনী কেমন আছে ?

রাজপুত্র। (সজল নয়নে) সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে।

সন্ন্যাসীর চক্ষে ত জল আসিল। সংসারের সমস্ত মায়া মমতা ছেদন করিয়া যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একটী রাজকন্যার অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণে তিনি কাঁদিলেন, ইহা অতি বিচিত্র।

নিতান্ত বিচিত্র নহে। এই সন্ন্যাসীটী কতদিনের সন্ন্যাসী তাহা আমাদের জানা নাই। সন্ন্যাসে ইহার চিত্ত নিবেশিত হইয়াছে কিনা, তাহাও নিশ্চয় বুঝা যায় না। নেত্রদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া তিনি একদৃষ্টে রাজপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ

করিলেন। বৃক্ষ বাটিকায় একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে উত্তমরূপে রাজপুত্রের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসী যেন একটু কাঁপিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন, সেই যদি হয়, তাহা হইলে পঞ্চ পদাতিকের হস্তে ইহাকে সমর্পণ করাই উচিত। আমার পক্ষে উচিত, কিন্তু আমার আশ্রমের পক্ষে উচিত নহে। এই যুবা বলিতেছে, মরকত মোহিনী সর্পাঘাতে মরিয়াছে, প্রথমে যুবা বলিয়াছে, স্বয়ং স্ত্রীহত্যা করিয়া এই পর্ব্বত প্রদেশে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। দুই দিকেই সংশয়ের কথা, মরকত মোহিনী মরিয়াছে—তবে আর কাহার জন্য——

ভাবনা একটু অন্তরে অন্তরে রাখিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম সমরনাথ ?

হাঁ, সরমনাথ।

আচ্ছা, দত্তক গৃহীত হইবার অগ্রে তোমার কি ঐ নাম ছিল ? অথবা দত্তক গৃহীত হইবার সময়ে ঐ নাম হইয়াছে ? পূর্ব্ব নাম যদি কিছু থাকে, সেইটী আমি শুনিতে চাই।

রাজপুত্র কহিলেন, "সে নাম আমি পাঁচ বৎসর পরিত্যাগ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার নাম ছিল বিজয় মাধব।"

সন্ন্যাসী বসিয়া ছিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। চঞ্চল চরণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অলোভ, অক্রোধ, নিষ্কাম, ক্ষমাশীল, যোগী ঋষির লক্ষণ। সেই সকল লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এই সন্ন্যাসী তখন যেন অগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধ কম্পিত কলেবরে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে রাজপুত্রকে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পাষণ্ড ! এতক্ষণ আমার কাছে মিথ্যা কথা, অগ্রে ঐ পাপ নাম শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ আমি তোকে স্বহস্তে শমনালয়ে প্রেরণ করিতাম। যাহারা ধরিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার অবসর রাখিতাম না। তুই আমার মরকত মোহিনীকে খুন করিয়াছিস্। রচনা করিয়া সর্পাঘাতের কথা বলিতেছিস্। এই মুহূর্ত্তে আমারই হস্তে এই ভণ্ডামীর উপযুক্ত ফললাভ হইবে।"

রাজপুত্রের বাকরোধ হইল। সন্ন্যাসী বলে কি ? সমরনাথ মনে মনে ভাবিলেন, সন্ন্যাসী বলে কি। আমার মরকত মোহিনী—একি সর্ব্বনাশের কথা, সন্ন্যাসীর মরকত মোহিনী। কি আশ্চর্য্য ! এ কে, তবে সত্য সন্ন্যাসী নহে। নিরীহ মৃগ ভাবিয়া আমি কি দুরন্ত ব্যাঘ্র গুহায় প্রবেশ করিয়াছি।

ভণ্ড সন্ন্যাসীর হস্তে নিশ্চয় আমার প্রাণ যাইতে পারে। সন্ন্যাসী সাজিয়াছে বলিয়া যদিও স্বহস্তে না মারে, অনুসন্ধানকারীরা এ পথে ফিরিয়া আসিলে অবশ্যই আমাকে তাহাদের হাতে ধরাইয়া দিবে। যে দিক দিয়াই হউক এইবারেই প্রাণ গেল।

রাজপুত্রের অনুমান যথার্থ। এই তপস্বীর নাম নরোত্তম ঠাকুর। সত্য সত্য ইহার নাম নরোত্তমও নহে, সত্য সত্য এ ব্যক্তি আশ্রমবাসী, তপস্বী নহে। এ ব্যক্তির এক মহৎ বংশে জন্ম। রাজা অমরনাথের কন্যা মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এই ব্যক্তি প্রার্থী হইয়াছিল, বংশ মর্য্যাদায় তুল্য না হওয়াতে রাজা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যে রকমে পারি মরকত মোহিনীকে চুরি করিব। বিবাহ হইলেও চুরি করিব, এই মতলবে সময় প্রতীক্ষা করিতেছিল। তদবধি লোকালয়ে বাস করিলে রাজকোপে পতিত হইতে হইবে। সেই কোপ এড়াইবার অভিপ্রায়ে জটাধারী তপস্বী সাজিয়া পর্ব্বতাশ্রমে লুকাইয়া আছে। ইহার প্রকৃত নাম রায়মঙ্গল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুশাঙ্কুরী।

বসন্তকালের শেষ ভাগ। ভারতক্ষেত্রে ঋতুরাজের আবির্ভাব। বসন্ত প্রিয় বিহঙ্গকুল মধুরস্বরে গান করিয়া ঋতুরাজের স্তব করিতেছে, বনে উপবনে কুঞ্জে কুঞ্জে নব নব কুসুম বিকসিত হইয়া বসন্তরাজকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেতেছে, সহকার কুঞ্জে স্তবকে স্তবকে মুকুল মুঞ্জরিত হইয়া বসন্তরাজকে আরতি করিতেছে, কুসুমের সুবাসে মুকুলের সুবাসে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে, মধুলোভা মধুকরকুল পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জন করিয়া মধু আহরণ করিতেছে, বেলা অনুমান তৃতীয় প্রহর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

রবিতেজ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, দক্ষিণ দিক হইতে মৃদু মৃদু বসন্ত সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে মৃগয়াবেশধারী একজন যুবা পুরুষ একাকী এক অরণ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কটীদেশে তরবারী দুলিতেছে, হস্তে কিছুই নাই। বিচরণ করিতে করিতে সেই রাজ পুরুষ মনে

মনে ভাবিতেছেন, রাজ্য রক্ষার কি উপায়? পূর্ব্বকালের রাজারা এক এক কন্যা দায়ে মহাবিপদগ্রস্ত হইতেন, রাজায় রাজায় ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত তদ্রূপ উপদ্রবে অনেক রাজা রাজ্যহারা হইয়াছেন। বেশি কথা কি, কেহ কেহ আত্মজার প্রাণ সংহার করিয়া মহাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, রাজা ভীম সিংহ প্রাণসমা প্রিয়তমা দুহিতা কৃষ্ণকুমারীকে আপন সহোদর ভ্রাতার দারা বধ করিয়া ছিলেন। আমাকেও কি তাহাই করিতে হইবে? হায়! হায়! আবার তুল্য হতভাগ্য পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেহ নাই।

রাজ পুরুষ এইরূপ ভাবিতেছেন,—আর চলিতেছেন। কিয়ৎদূর গিয়া দেখিলেন, বামদিকে বৃহৎ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ। একজন দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য সেই বৃক্ষ মূলে বসিয়া কুশতৃণে রাশি রাশি অঙ্গুরী নির্ম্মাণ করিতেছে, এককালে জোড়া জোড়া অঙ্গুরী প্রস্তুত করিয়া কতকগুলি বামে আর কতকগুলি দক্ষিণে নিক্ষেপ করিতেছে। বন মধ্যে ঐরূপ কুশঙ্গুরী রাশীকৃত হইয়াছে। লোকটীর অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা মস্তকটী অতি ক্ষুদ্র। মস্তকে একগাছিও চুল নাই। চক্ষু দুটি বড় বড় নাসিকা প্রশস্ত, অধরোষ্ঠ প্রফুল্ল, হস্ত পদ দীর্ঘ, বক্ষস্থল সুদীর্ঘ, গ্রীবা সুদীর্ঘ, উদর সংকীর্ণ।

রাজপুরুষ সেই লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ সকল কি করিতেছ? স্তূপাকার তৃণাঙ্গুরী ইতস্ততঃ কি নিমিত্তই বা নিক্ষেপ করিতেছ? সংসারে তোমার কি আর অন্য কার্য্য কিছুই নাই?

লোকটীর চক্ষু অঙ্গুরীর দিকে ছিল, সম্মুখে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া লোকটি একবার ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল। বেশভূষা দেখিয়া কোন রাজবংশীয় বীর পুরুষ বলিয়া মনে হইল, নম্র বচনে উত্তর করিল, সংসারে আমার ইহাই একমাত্র কার্য্য। রাজপুরুষ পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার্য্যে তোমার কি লাভ? ইহার নামই বা কি কার্য্য।

লোক উত্তর করিল, এ কার্য্যের নাম বিবাহ। যে পাত্রের সহিত যে কন্যার বিবাহ হইবে, তাহাই গণনা করিয়া আমি যুগল অঙ্গুরী নির্ম্মাণ করিতেছি যাহার সঙ্গে যাহার সংযোগ, সেই দুটী একত্র করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিতেছি।

যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি, পুরুষ পরম্পরায় এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। রাজপুরুষ ভাবিতে ছিলেন কন্যার

বিবাহ। একটী প্রাপ্ত বয়স্কা সুন্দরী কন্যার নিমিত্ত পাঁচটী বর প্রার্থনা করিতেছে। পাঁচজনই রূপবান, পাঁচজনই ধনবান, পাঁচজনই মর্য্যাদাপূর্ণ। তাঁহার মধ্যে তিনজন রাজা। যাঁহারা রাজা, আমার কন্যাটির পাণিগ্রহণার্থ তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, জয় পরাজয় কাহার পক্ষে কি হইবে, তরবারেরাই বলিতে পারে, আমি যদি একজনের অনুকুল পক্ষ হই, তাহা হইলে প্রবল প্রতিপক্ষ আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়া আমাকেও সংহার করিতে পারে; প্রাণে যদিও না মারে, রাজ্যচ্যুত করিয়া চির নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। উপায় কি?

নিরন্তর রাজপুরুষের মনে এই দুঃসহ ভাবনা জাগিতেছিল, অঙ্গুরী বন্ধনকারি লোকটীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলেও প্রবল কৌতুহলে লোকটীকে তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, কেমন তুমি গণক ঠাকুর, এইবার আমি বুঝিব। বল দেখি, আমার কন্যার সহিত কাহার বিবাহ হইবে?"

একবার বামে একবার দক্ষিণে নেত্র সঞ্চালন করিয়া লোকটী এক জোড়া অঙ্গুরী হস্তে তুলিয়া লইল, চুপি চুপি কি মন্ত্র পাঠ করিল, তাহার পর সহাস্য বদনে বলিল, 'তোমার ঠাকুর বাড়া আছে, ঠাকুর বাড়ীর মন্দিরে যে ব্রাহ্মণটী দেব-দেবীর পূজা করে, সেই ব্রাহ্মণের এক পুত্র আছে, সেই পুত্রের নাম মাধব। সেই মাধব তোমার জামাতা হইবে।

গণনা শুনিয়াই রাজপুরুষ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। ক্রোধের সঙ্গে বিজাতীয় ঘৃণার উদয়। ভ্রুকুটি ভঙ্গি করিয়া সক্রোধে তিনি লোকটিকে বলিলেন, "তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। যদবধি কন্যার বিবাহ না হয়, তদবধি তোমাকে আমি আমার নিজ বাড়ীতে আটক রাখিব, গণনা যদি সত্য হয়, যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে, যদি মিথ্যা হয়, সমুচিত শিক্ষা দিব।"

হাস্য করিয়া লোকটি বলিল, "কোথাও আমি যাই না, কোথাও আমি আটক থাকি না, চিরদিন এই খানেই থাকিব। তুমি গৃহে যাও। আমার গণনা যদি মিথ্যা হয়, এইখানে আসিয়া তুমি আমাকে সমুচিত শিক্ষা দান করিও।

এইস্থলে কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। মৃগয়া বিহারী রাজপুরুষের বেশে যিনি অরণ্য মধ্যে আগমন করিয়াছেন, সত্য তিনি সামান্য একজন রাজকর্ম্মচারী নহেন, স্বয়ং তিনি রাজা। তাহার স্বগতঃ চিন্তাতেই সে ভাব পরিব্যক্ত হইয়ছে, বাস্তবিক রাজা না হইলে একজন বনবাসী স্বাধিন মনুষ্যকে নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া আটক রাখিতে চাহিতে পারিতেন না। রাজা হইলেও সেই অরণ্য মধ্যে

তাহার রাজ ক্ষমতা খাটিল না। লোকটি যাইবে না। বল পূর্ব্বক লইয়া যাওয়া কিম্বা তরবারের ভয় দেখাইয়া লইয়া যাওয়া ভাল নহে, লোক যখন কোথাও যাইবে না বলিল, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা তাহার চেহারা যখন বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি হইল, পলায়ন করিলেও তথাপি তাহাকে ধরিয়া আনিবার বাধা হইবে না, স্থির করিয়া রাজা পুনর্ব্বার তাহাকে কহিলেন, "সাবধান! বিবাহান্তে তোমাকে যদি এখানে না পাই, যেখানেই যাও, যেখানেই থাক, নিশ্চয় আমি তোমাকে ধরিবই ধরিব। আমার কন্যার বিবাহের অধিক বিলম্ব নাই। সাবধান! মাথা বাঁচাইতে চাও, পলায়ন করিও না।"

লোকটি হাস্য করিল। রাজা চলিয়া গেলেন, যাইতে যাইতে আর একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেলেন, "পলায়ন করিও না, যেখানে আছ ঠিক ঐ খানে থাকিও। আমি আসিয়া দেখিব, কতগুণ ধরে তোমার জীবন শূন্য কুশাঙ্গুরী।

ক্রমশঃ

দীপশলাকাগ্র।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ইতিহাস।

আধুনিক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে যে সকল আবিক্রিয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে দীপশলাকা আবিষ্কার একটি বিশেষ উপকারক। আমার যে সকল নব যুবক বন্ধু অদ্য এই বিজ্ঞান সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, দুই পুরুষ পূর্ব্বে এই উপকারী দীপশলাকার অভাবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (নব্য যুবকগণকে) এখন তাদৃশ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে না। দীপশলাকা অথবা দিয়াশলাই প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য উপকারী বস্তু। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের পিতামহী, প্রপিতামহীগণ অপরাপর গৃহ কার্য্যের সহিত দীয়াশলাই প্রস্তুত করা একটি প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন; পাকাটি অর্থাৎ পাট কাটি গুলি ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া, সরু সরু করিয়া চিরিয়া, তাহার দুই দিক দ্রবগন্ধকে ডুবাইয়া, তাঁহারা দীপকাটি

* ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি, আই, ই, আই, এস ও এম, বি, এফ, সি, এস, মহাশয় দেশালাই সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহারই মর্ম্মানুবাদ।

(সাধারণ কথায় দেকাটি) প্রস্তুত করিতেন; এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই এক একটি চকমকির বাক্স থাকিত; সেই বাক্সের মধ্যে এক খণ্ড চকমকির পাথর আর এক খণ্ড ইস্পাতফলক রাখা হইত; পাথরখানি বামহস্তে ধরিয়া তাঁহার নিম্নভাগে একখণ্ড শুষ্ক শোলা ধরিয়া উক্ত ইস্পাত খণ্ডের দ্বারা ঠুকিলেই পাথর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত, স্ফুলিঙ্গগুলি সেই শোলার উপর পড়িবা মাত্র আগুণ জ্বলিয়া উঠিত। বার বার চকমকি ঠুকিয়া আগুণ বাহির করিবার অসুবিধা ছিল বলিয়া গৃহস্থেরা সকলেই এক একটা মৃণ্ময়পাত্রে তুষ ঘুঁটে সাজাইয়া অগ্নি প্রস্তুত রাখিতেন, বিশেষতঃ রাত্রিকালেই তাহা অধিক ব্যবহারে আসিত, সে অগ্নি তাদৃশ তেজস্কর হইত না বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত, শীঘ্র নির্ব্বাণ হইত না, গৃহিণীরা সেই আগুণে পূর্ব্ব কথিত গন্ধকযুক্ত দীপকাটি ধরাইয়া অতি সহজেই আলোক প্রজ্জ্বলিত করিতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ফেরিওয়ালা সচরাচর সেই সকল দেশালাই লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইত।

কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদনের প্রণালী কোন সময়ে কাহার দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায় না, পুরাকালে আর্য্য সভ্যতার পুরাতন বিবরণীতে অর্থাৎ বৈদিক সময়ে বেদের বর্ণনাতে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের আদিম আর্য্য উপনিবেশীগণ অগ্নিকে উপাসনার বস্তু বলিয়া পূজা করিতেন, মানবের শুভাশুভ সাধনে অগ্নির কতদূর শক্তি, তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন। বেদে আমরা আরও দেখিতে পাই, দৈনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত গৃহস্থের বসত বাটীর মধ্যে কোন এক নির্জ্জন স্থানে নিরন্তর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবার প্রথা ছিল, কুলাচার মতে পবিত্র জ্ঞানে সেই গার্হস্থ্য অগ্নি পিতার পর পুত্রেরা সমভাবে রক্ষা করিতেন। খৃষ্টানেরাও প্রথমাবস্থায় এই আচার মান্য করিয়া আসিতেন, ভারতবর্ষের পার্শিগণের জাতীয় সমাজ আজিও সেই কৌলিক প্রথা পালন করিয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পারসীরা যখন ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসেন, তৎকালে তাহাদিগের গৃহস্থিত সেই পবিত্র বহ্নির কিয়দংশ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত মন্দির সমূহে এখনও পর্য্যন্ত সেই পূত অগ্নি স্বতেজে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। গ্রীকদিগের পৌরাণিক ইতিহাসে বর্ণনা—পণ্ডিত প্রমিথিয়স বহ্নি ব্যবহার জ্ঞান প্রচারের আদি কর্ত্তা। প্রবাদ এইরূপ যে উক্ত প্রমিথিয়স প্রথমে দেবগণের নিকট হইতে অগ্নি চুরী করিয়াছিলেন।

পুরু পুরু কাচ এবং স্বচ্ছ দর্পণ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিবার পদ্ধতি গ্রীকেরা জানিতেন। সিরাকিউজের সম্মুখে রোমানদিগের পোতাবলি দগ্ধ করিবার সময় প্রজ্জ্বলিত দর্পণ ব্যবহার করা হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা আছে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে অপরিষ্কার ধাতুর আকর হইতে অগ্নি সংযোগে পরিষ্কার ধাতু বাহির করিবার প্রণালী মিশরীরা জানিতেন, অগ্নি সংযোগে মৃৎপাত্রাদি দগ্ধ করিবার রীতিও মিশর দেশের লোকদিগের পরিজ্ঞাত ছিল; পাঁচসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মিশরীরা যে সকল স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল মন্দিরে আজিও অগ্নি ব্যবহারের হাপর ও তদোপযোগী যন্ত্রাদি পরম যত্নে সুরক্ষিত আছে।

চকমকির বাক্স ব্যবহারের বহু পূর্ব্বে অন্য প্রকার অগ্নি উৎপাদনের ব্যবহার ছিল। দুইখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ একত্র ঘর্ষণ করিলে অগ্নি বাহির হইত, দুইখণ্ড প্রস্তর ঘর্ষণেও অগ্নি উৎপাদিত হইত; কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে আজিও সেই প্রথা বিদ্যমান আছে।

মধ্য সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ইউরোপ খণ্ডে চকমকির বাক্সের ব্যবহার ছিল, তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল প্রচলিত দীপশলাকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে রাসায়নিক প্রক্রিয়াযোগে অন্যান্য জলনশীল বস্তুর সৃষ্টি হওয়াতে ক্রমশঃ চকমকির ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ডবারেনার সাহেবের আবিষ্কৃত প্লাটিনামদীপ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, হাইড্রোজেন গ্যাস ও প্লাটিনম ধাতু সংযোগে সেই দীপ অগ্নি উৎপাদন করিত; অগ্নি উৎপাদনের পিচকারী বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিলে সেই বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে ও উত্তাপে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত।

(পরীক্ষা—ডবারেনার সাহেবের আবিষ্কৃত ল্যাম্প এবং অগ্নি-পিচকারীর পরীক্ষা এইখানে প্রদর্শিত হইল।)

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে হামবর্গের ব্রাণ্ড সাহেবের দ্বারা পীতবর্ণ ফস্‌ফরাস্ আবিষ্কৃত হয়, অতি শীঘ্র অগ্নি উৎপাদনে সুবিধার আকাঙ্ক্ষায় মধ্যে মধ্যে যখন তখন যন্ত্র কাঁপাইয়া আলোক ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইত. কিন্তু দেড় শত বৎসরের অধিক কাল সেই পদার্থটি সাধারণের ব্যবহারে আইসে নাই, উৎপাদনে বিপদের আশঙ্কা ছিল বলিয়াই সকলে সাহস করিয়া তাহার ব্যবহারে অগ্রসর হইত না।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের চান্‌সেল সাহেব "ক্লোরেট অব পটাসিয়ম" দীপ

শলাকা প্রথম প্রস্তুত করেন, স্বতন্ত্র একটি শিশিতে তীব্র সালফিরিক্ এসিড রাখা হইত, উক্ত দীপশলাকার অগ্রভাগ সেই এসিডে ডুবাইবামাত্র শলাকাটি জ্বলিয়া উঠিত। সেই সকল শলাকার ফরাসী নাম ছিল, অক্সিমরিয়েট অথবা কেমিক্যাল ম্যাচ, একফ্লোরিণ অর্থাৎ ইংরাজী দুই শিলিং মুল্যে সেই প্রকারের একশত দেশালাই বিক্রীত হইত। যে যে বস্তু সংযোগে আলো জ্বলিত তাহা এই :—

ফ্লোরেট অব পটাসিয়ম, চিনি এবং গঁদ, এই তিন বস্তু একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করা হইত, সেই মিশ্রিত পদার্থ তীব্র সালফিরিক এসিডে সংলগ্ন হইবামাত্র এত তেজে আলো জ্বলিয়া উঠিত যে, তর্দ্দর্শনে অনেক লোকে ভয় পাইত। আমি সেই প্রকারের কয়েকটি দীপশলাকা প্রস্তুত করিয়াছি, এই স্থলে যখন আমি কাচের শিশিস্থিত তীব্র সালফিরিক এসিডে একটি শলাকা ডুবাইব, কিরূপ তেজে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে, এখনি তাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

পরীক্ষা—একটি ফ্লোরেট অব পটাস দীপশলাকা তীব্র সালফিউরিক এসিডে ডবাইয়া কার্য্য প্রদর্শন করা হইল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ঘর্ষণ শলাকা প্রথম প্রস্তুত হয়, তাহার নাম হইয়াছিল, লুসিফার ম্যাচ; ইংলণ্ডের জন ওয়ার্কার সাহেব তাহা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, সার উইলিয়ম কন্‌গ্রীব সাহেবের নামে সেই দীপশলাকার দ্বিতীয় নাম হইয়াছিল কনগ্রীব ম্যাচ। সেই সকল শলাকার অগ্রভাগে ফ্লোরেট অব পটাস এবং এন্টিমনি সালফাইড; তাহা জ্বালিবার জন্য কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক হইত না, সালফিউরিক এসিডেও ডুবাইতে হইত না, ম্যাচ বাক্সের গায়ে এক প্রকার বালু কাগজ সংলগ্ন থাকিত, এক একটি শলাকা সেই কাগজে ঘর্ষণ করিবামাত্র আলো জ্বলিয়া উঠিত। প্রত্যেক বাক্সে ৮৪ চৌরাশিটি করিয়া দীয়াশালাই থাকিত, প্রত্যেক বাক্সের মুল্য ছিল এক শিলিং।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া প্রদেশে প্রকৃত বাণিজ্য প্রণালীতে পীত ফস্‌ফরাস্ যুক্ত প্রকৃত লুসিফার ম্যাচ অর্থাৎ ঘর্ষণ দেশালাই প্রস্তুত হইয়াছিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত কেবল অষ্ট্রীয়াতে এবং দক্ষিণ জর্ম্মাণ রাজ্যে সেই কারবার চলিয়াছিল। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে, কেবল তাহাদিগের জ্বলনশীল পদার্থের নূতন নূতন আবিষ্কারে নহে, শ্রমলাঘবোপযোগী নূতন নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি সেই উন্নতির কারণ।

লুসিফার ম্যাচ প্রস্তুত করণে পীত ফসফরাস ব্যবহারে কিছু কিছু অসুবিধা আছে। পীত ফসফরাস যখন তখন শীঘ্র শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, সেই সকল দিয়াশলাই হঠাৎ আপনা আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়, ফল দর্শনে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন, অধিকন্তু পীত সালফরস অতি তীব্র বিষাক্ত পদার্থ, লুসিফার ম্যাচ ফ্যাক্টরী অর্থাৎ সেই দীয়াশালাই প্রস্তুতের কারখানা সমূহে যাহারা কর্ম্ম করিত, তাহারা এক প্রকার অস্থিরোগে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিত, সেই দীয়াশলাই প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার ফসফরাস ধূমের গন্ধ আঘ্রাণে প্রধানতঃ তাহাদের মুখের নিম্ন চোয়াল ক্ষত হইয়া যাইত। তদ্দর্শনে তদবধি তৎ সংশোধনের সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্য বিধায়ক নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সেই রোগ এক্ষণে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। যাহাই হউক, ২৫ পঁচিশ বৎসরের অধিক দিন হইতে রাজকীয় আইন প্রচারের দ্বারা ডেন্‌মার্ক এবং সুইজারল্যাণ্ড রাজ্যে লুসিফার ম্যাচের ব্যবহার নিবারিত হইয়াছে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রটার সাহেব আশু প্রজ্জ্বলন নিবারক ভিন্ন প্রকার ফসফরাস আবিষ্কার করেন, সেই ফসফরাসের নাম নিরবয়ব অথবা লোহিত ফসফরস। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের লণ্ডষ্ট্রম সাহেব প্রকৃত সেফটি ম্যাচ অর্থাৎ নিরাপদ দীয়াশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই দীয়াশলাই জ্বালিবার নিমিত্ত ম্যাচ বাক্সের উভয় পার্শ্বে নূতন এক প্রকার পাতলা আবরণ সংযুক্ত থাকে, দীপশলাকার অগ্রভাগ সেই আবরণে ঘর্ষণ মাত্র প্রজ্জ্বলিত হয়। দীপশলাকার অগ্রভাগে যে পদার্থ আছে, তাহাতে ফসফরাস নাই, কিন্তু বাক্সের গায়ে যে পাতলা আবরণ থাকে, তাহাতে অত্যল্প পরিমাণে লোহিত ফসফরাস ও শিরীশ আছে। এক্ষণে সর্ব্বদেশে দুই প্রকার দীয়াশালাই ব্যবহার হয়, লুসিফার ম্যাচ ও সেফটি ম্যাচ। আজকাল লুসিফার ম্যাচ অপেক্ষা সেফটি ম্যাচের অত্যধিক প্রচলন ও অত্যধিক ব্যবহার।

মন্ত্রযুদ্ধ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

পূর্ণিমার রাত্রি সে দিন। জ্যোৎস্নায় আকাশ ছাপিয়ে উঠেছে। সুন্দর চাঁদের আলো যেন স্বর্গ পারাবতের পাখা ঝরা কোমল পালকের মত চারিদিকে

ছড়িয়ে যাচ্ছে, কাপাস-ফাটা শুভ্র তুলার মত রাশি রাশি এলিয়ে পড়ছে। সুধু কেবল চাঁদের আলোয় নয়, তারায় তারায় কাঁপন সেদিন, বাতাসে বাতাসে আকুল গন্ধ ভরা কথার স্পর্শ, নীহারে নীহারে অশ্রু উৎসার ঝঙ্কৃত।

সারা দিনে তার একবারও দেখা পাইনি আজ। মনটা কেমন কেমন করতে লাগল। সে হয় ত আমার প্রতীক্ষায় পথপানে চেয়ে বসে আছে, কখন আমি যাব। আর আজ যখন ঐ আলোয় আলোয়, তারায় তারায় বাতাসে বাতাসে নীহারে নীহারে, চারিভিতে ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছি, তখন তার আভায় আজ আমার যে কত ভাল লাগবে তা ভেবে আমার হৃদয়খানা ব্যাকুল হর্ষে ভরে উঠ্‌ল। এমন সময়ে অদূরে আকাশ দিয়ে দুটি মুখরা পাপিয়া ভেসে যাচ্ছিল। আমার মনে হ'ল—আমার হৃদয়গগন এখনও নীরব, তার সঙ্গে একবার দেখা পেলে ঐ মুখর পাপিয়ার মতই আমরা মিলন-সুর গেয়ে ভেসে যাব।

সন্ধ্যার সময় বাগান থেকে দুটি সদ্যোজাত গোলাপ ফুল ভাল দেখে তুলে এনেছিলাম। সে দুটি যদি শুকিয়ে যায়, তবে আমার মনে বড় ব্যথা বাজ্‌বে; তাকে ত দেওয়া হবেই না তা ছাড়া আমার তোলাও বৃথা হবে।

ফুল দুটির দিকে চোখ পড়াতে আর তাকে সেগুলি না দিয়ে থাকতে পার্‌লাম না। একবার আকাশ ও ধরার পরে চেয়ে আমি কত কি ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু সে জালে বাঁধা থাকতে বেশীক্ষণ ইচ্ছে হ'ল না, তাড়াতাড়ি তা ছিঁড়ে উঠে পড়লাম।

তখন নিশীথ রাত্রি। চাঁদ মাঝ গগনের কোলে হাস্‌চে। বাগানের রাশি রাশি ফুলের গন্ধ ইতস্ততঃ ভেসে আস্‌চে। আমি সেই ফুল দুটি হাতে ক'রে জ্যোৎস্না ছাওয়া পথ দিয়ে তার বাড়ীর দিকে চল্‌তে লাগ্‌লাম। নিঃশব্দে বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিলাম। দু'একটি পাখী কাছের কোন ঝোপের মাঝে কিচির মিচির করে উঠল। বাড়ীর সাম্‌নেটা যেন গোপন হাসিতে কেঁপে গেল।

নীরবে ভেজান দরজার কপাট-দুটি ঠেলে গৃহের ভিতরে ঢুক্‌লাম। চাঁদের করে প্রাঙ্গণ ধুয়ে যাচ্ছে। বাড়ীর চারিদিক নিস্তব্ধ—কোথাও কেউ নেই। আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে ঢুক্‌লাম। ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না—সুধু মেঝের ওপর, টেবিলের ওপর, চেয়ারের ওপর, কতকগুলা বই ছড়িয়ে পড়ে আছে—কোনটার মলাট ছেঁড়া, কোনটার বা পাতা ছেঁড়া বা খোলা পড়ে রয়েচে—একটা গোছগাছ ঘরের মধ্যে কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না—সবই যেন এলোথেলো।

তখন মনে হ'ল—এ কার ঘর। এ কার ঘরে আমি ভুলে ঢুকেছি! চাঁদের

আলোয় ঘর ভরে উঠেছে, আমি সেই উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগলাম—সে কি তবে একলা চলে গেছে! না সে আবার আসবে, সে তা হ'লে কোথায় গেছে!

নানান্ চিন্তার ছুতা মনের মধ্যে জোট বাঁধছিল, তার আর শেষ নেই—বেড়েই চলেছিল। ঘরের বইগুলা যেন গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে হ'ল। সিন্দুকের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছিল—সেইটাকে একটু উস্কে দিয়ে বইগুলো সাজিয়ে ফেলতে লাগলাম। অধিকাংশ বইই কবিতার বই—রবীন্দ্রনাথের লেখা "কেতকী" "শেফালী" প্রভৃতি। এই ঘর যার কাছে আমি এসেছি, এ একজন কবির ঘর। ঘরখানি কি রহস্য-মণ্ডিত, কি অপরূপ স্বপ্ন বিজড়িত হ'য়ে চোখে দেখা দিল। এই ঘরে বসে সে কত অনাগত যুগের স্বপ্ন দেখে, কত জিনিষ ভাবে লেখে! এই চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথায় হাত রেখে সে ভাবে, এই বইগুলি তার প্রাণের ব্যথার সাথী—জিনিষপত্র যেন কত স্বপ্নজড়ান—কবির কত হাসি খুসি দিয়ে ভরা! তরুণ কবির দু'একটি কবিতা পড়তে বড় ইচ্ছে হল। একখানি খাতা তুলে নিয়ে বেতের চেয়ারে বসে পড়তে সুরু করলাম—দু'চার লাইন পড়ে মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল আর পারলাম না।

এমন নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকা ঠিক নয় ভেবে উঠে পড়লাম। এমন সময়ে কার গান শুনতে পেলাম—সে গানের "সুধা" আমি ছাড়া তখন অনুভব করবার কেউ বুঝি ছিল না। এ যে সেই তরুণ কবির ললিতকণ্ঠে প্রাণ মাতান মোহন উচ্ছ্বাস সুর! চুপে চুপে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠলাম। আকাশভরা তারা, চাঁদের আলো, বসন্ত বাতাস, ফুলের গন্ধ সবই আকুল! এদের নীরব বাণী আমি বেশ শুন্‌তে পেলাম, কিন্তু বুঝতে পার্‌লাম কিনা জানি না।

ছাদে যেখানে অন্ধকারের কোলে চাঁদের আলো এসে পড়েচে, সেই আলো আঁধারের মিলন রেখায় এসে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম।

হা এ যে সেই তরুণ কবির আপন গলা! নিশীথ রাত্রিতে সে ছাদে বসে তার প্রাণভরা কত ব্যথাহর্ষের গান গেয়ে যাচ্ছে—কে তা শুন্‌বে? আহা—কে তা শুন্‌বে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সে বাঁশী আমি পিছন থেকে শুনছিলাম। কিন্তু যেই যাওয়া অমনি সে বাঁশী থেমে গেল—আর বাজ্‌ল না—যেন তার একটা তার ছিঁড়ে গেল।

পিছন ফিরে তরুণ কবি আমায় দেখে ফেল্‌লে—কত তন্ময় হয়ে—কত আকুল দৃষ্টিতে! নড়িল না—উঠিল না—একটী কথা কহিল না—হাত থেকে বীণা খসে ছাদে পড়ে গেল! ভ্রূক্ষেপ নেই! কবি কি ভাবে বিভোর। মন্ত্র-মুগ্ধের মত সে শোভা দেখ্‌তে লাগল! বাঁশী বাজ্‌ল না।

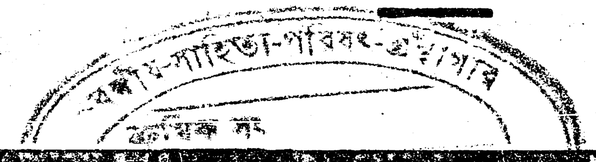

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ড্‌স্‌টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরবোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান সুন্দর সুখখানি

কিসে হয়, ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৶০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৶০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Galcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩১, [৩য়, সংখ্যা

১।	মধু-বাসর	শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	৬৫
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৭
৩।	মরকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৭৩
৪।	আর্য্য মহিলা	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,	৮২
৫।	সাধক সঙ্গীত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৯২
৬।	বলিদান	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এচ,জি,টী	৯৩
৭।	ত্যাগী বিশ্বপতি	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	৯৫
৮।	সমালোচনা	... ...	৯৬

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 14 9-24

জারমলীন

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৪৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible] যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

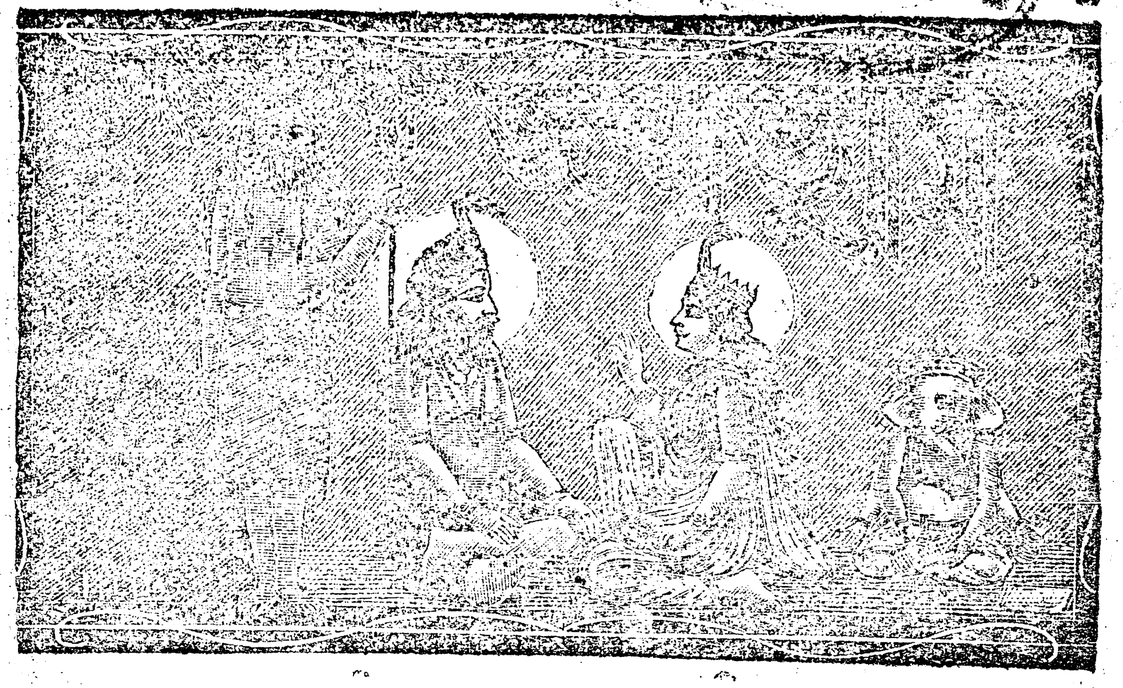

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। | ১৩৩১ সাল, আষাঢ়। | ৩য়, সংখ্যা।

মধু-বাসর।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

প্রভাতী পবন এখন বহেনি
হে সুন্দর, মনোচোর।
কেন যেতে চাও চলিয়া এখনি
হয়নি ত নিশি ভোর॥
ফুল-রাশি-হাসি সুষমা ছড়ায়
গলি পড়ে চাঁদ রজত ধারায়
পিয়া পিউ বোলে পাপিয়া পিয়ায়
রয়েছে রজনী ঘোর।

এখনি কি যাবে ছাড়িয়া আমায়
হয়নি ত নিশি ভোর ॥
কেন যেতে চাও ছাড়িয়া আমায়
পরাণ দেবতা মোর।
মরম দুয়ার এখন খুলিনি
এখন রজনী ঘোর ॥
জ্বলিতেছে দীপ উজল বিভায়
হৃদি-খানি ভরা শত বাসনায়
মরমের কথা সরমে লুকায়
অন্তর মন ভোর।
নিদয় হইয়া যেওনা চলিয়া
ওগো প্রিয় ওগো চোর ॥
এই ত রজনী এখনি আসিল
এখনি কি হল ভোর ?
ফুলের বাসরে এইত শুইনু
এরি মাঝে নিশি ভোর ?
চন্দন চুয়া এখন ঝরেনি
প্রথম সরস পরশ লাগেনি
জড়িমায় আঁখি ভরিয়া আসেনি
ক্ষুধিত পরাণ মোর।
মুকুলিত সাধ—মুকুলিত আশা
যেও নাক মনোচোর।
রূপে রসে ভরা সারাটী মেদিনী
ভরেনি হিয়াটী মোর।
পরাণ পিয়াসা এখন মেটেনি
দেখিয়া আনন তোর ॥
যামিনী এখন হয়নি ত ভোর
ভেঙ্গনাক ওগো সুখের বাসর
দুরু দুরু কাঁপে হিয়াখানি মোর
নয়নে বহিছে লোর।

দিবনাক ছেড়ে রয়েছে যামিনী
হয়নি ত নিশি ভোর ॥

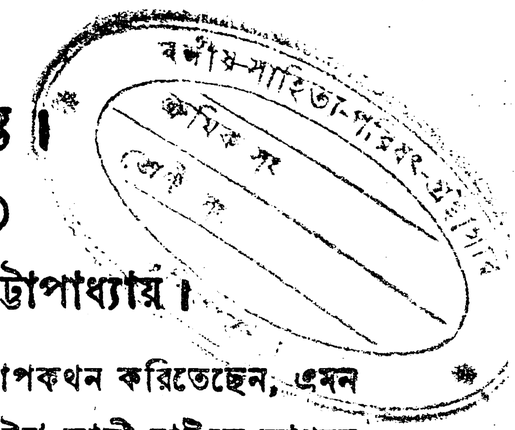

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এইরূপে ঠাকুর, কেণারাম, বিশু নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ দুইজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া কালী বাটীতে আগমন করিলেন। সাধক কেণারাম ও বিশুর সহিত শ্যামা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যুবরাজকে আসন প্রদান করাইয়া কেণারামের সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। প্রতাপ চাঁদ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "আপনার এখানে আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আপনাকে দর্শন করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছিল। এক্ষণে বহুদিনের পর প্রিয়বস্তু দর্শনের ন্যায় আপনার দর্শনে আমার মনে বড় আনন্দের উদয় হইতেছে। আপনার এখান হইতে গমনাবধি আপনার মধুময় বাক্য স্মরণ করিয়া সুখী হইতাম। যত দিন যাইতেছিল, ততই দর্শন আশা প্রবল হইতেছিল। অদ্য কয়েক দিন আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আপনি যানাদি গ্রহণ করেন নাই, আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন। কিন্তু আমার দর্শন পিপাসা এতই প্রবল যে আপনাকে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলাম না।" সাধক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ। আমি এখানে আসিয়া তোমাদের কুশল বার্ত্তা লইয়াছি। মনের আকর্ষণী শক্তি মহীয়সী। তোমরা আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়া আমিও তোমাদিগকে অনেক সময় মন হইতে অপসারিত করিতে পারিতাম না। প্রতাপ। ভগবানে সেইরূপ চিত্ত সন্নিবেশের নাম ধ্যান।" অতঃপর যুবরাজ কহিলেন, "আপনার অনুগত কেণারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুশলে আছেন ?" সাধক কেণারামকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ইনিই কেণারাম চট্টোপাধ্যায়।" ইহা শুনিয়া যুবরাজ প্রণাম ও কেণারামের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরের মুখে

আপনার প্রশংসাবাদ মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি। আজ আপনার দর্শনে পরম সুখী হইলাম।" কেণারাম কহিলেন, "আমার জন্মান্তরের সুকৃতি বলে ঠাকুর আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমি অতি দোষ দুষ্ট হইলেও অতি শরণাগত বলিয়া, ঠাকুর আমাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। আপনি আমাদের ভাবী ভূপতি। অদ্য আমি আপনাকে দর্শন করিয়া, আমাকে পুণ্যবান বিবেচনা করিতেছি। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, আপনি ধার্ম্মিক, ভক্তিমান, কর্ম্মী ও জ্ঞানী। আমি শুনিয়াছি, ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও ভোগ বিলাসকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করেন। আত্মার উৎকর্ষ লাভে আপনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন। আপনি পরমার্থ চিন্তা অমৃত পানে আপনাকে অমর করিবার অভিলাষী। ভবাদৃশ ধনবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ ও ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা মানবগণের স্বততই হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া তাহার সম্ভোগে বীত রাগ হওয়া, এই প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসারে অতি কঠিন কর্ম্ম। সংসার সরোবরে ঐশ্বর্য্য প্রস্ফুটিত পদ্ম, মানব ভ্রমর, মধুপানে প্রমত্ত হওয়া তাহার প্রবৃত্তি। মনের বল অসীম না থাকিলে সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে উদাসীন পুরুষের মোক্ষ সহজেই হইয়া থাকে।" ইহা কহিয়া কেণারাম তুষ্টিস্তাব অবলম্বন করিলে, সাধক যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রতাপ! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ করিয়া যথা সময়ে ধর্ম্ম চিন্তা করিতেছ ত? তোমার স্বধর্ম্ম প্রজা পালন ও সৎকর্ম্মের সহায়তা করা, তাহার অন্যথাচরণে তোমার প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে।" যুবরাজ কহিলেন, "গুরুদেব! আমি যথাসাধ্য আপনার উপদেশ সকল কর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু মনের সম্পূর্ণ সন্নিবেশের বিঘ্নতা বশত আমার বিশ্বাস হইতেছে, আমি প্রাণায়াম করণের এখনও সম্পূর্ণ অধিকারী হই নাই। আমি ঘেরণ্ড প্রভৃতি সংহিতাশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিতেছি, দেহ শোধন, ধৌত, অন্তধৌত, আসন মুদ্রাদি দ্বারা প্রাণায়ামের অধিকারী না হইলে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কম। ঋষি ঘেরণ্ড বলেন, দেহ শোধন ছয় প্রকার। ধৌত অন্তধৌতাদি চারি প্রকার। অন্তধৌত বাতসার আদি চারি প্রকার। সিংহাসনাদ আসন বত্রিশ প্রকার। মহামুদ্রাদি মুদ্রা সকল পঞ্চ বিংশতি। হটযোগ এই সকল অভ্যাস না করিলে কোন ব্যক্তিই রাজযোগের অধিকারী হন না। শিব সংহিতা, যোগাম্বুধি প্রভৃতি অন্য সংহিতাও সেইরূপ উপদেশ দিতেছেন। আমার বিশ্বাস চঞ্চলচেতা ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে হটযোগই

কর্ত্তব্য। সাধক যুবরাজের মনোভাব অবগত হইয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ! সংহিতাকারদিগের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁহারা যে সকল কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, তাহা তোমার মত লোকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য। হটযোগ সাধনা কারীর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। লঘুচেতা রাজযোগে অনধিকারী মানব হটযোগে সংসারীর চক্ষে অদ্ভুত কর্ম্মা হইয়া অহঙ্কারে প্রকৃত যোগ সাধন ও তৎফল লাভে বঞ্চিত হয়। মন কর্ম্ম সকলের উপদেষ্টা, সেই মনকে অভ্যাস যোগ দ্বারা সংযত করিয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানের উদয় হইলে ঐ সকল হট কর্ম্মের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। সংহিতাকারই বলিয়াছেন,—

"নাস্তি মায়াসমঃ পাশো, নাস্তি যোগাৎ পরংবলং।
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ॥"

এই জ্ঞান উপার্জ্জনের উপায় অনেক আছে। এ সংসারে জ্ঞান বিকীর্ণ আছে, সেই জ্ঞানের উপার্জ্জনে শাস্ত্র সকল উপায়, মন কর্ত্তা, বুদ্ধি উপদেষ্টা। প্রাণায়ামের পূর্ব্বে মনকে পবিত্র বিবেচনা করিলেই সকল চাঞ্চল্য হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমাদের সকল শাস্ত্রই বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া রচিত হইয়াছে। দেখ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা অর্চ্চনায় প্রাণায়ামের পূর্ব্বে মার্জ্জন মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ও পরে বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। এই মার্জ্জন মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য দেহ ও অন্তশুদ্ধি। বিনিয়োগ মন্ত্রে মনের সংযম হয়। এক এক মন্ত্রের প্রণেতা এক এক ঋষি। তাঁহারা বহু তপস্যা দ্বারা লোক হিতার্থে সেই সকল মন্ত্রকে পবিত্র করিয়াছেন। বেদোক্ত প্রাণায়ামের পূর্ব্বে সেই সকল ঋষি ও ছন্দ উচ্চারণে মন দেহ পবিত্র হয় ও মন প্রাণায়ামে অধিকারী হয়। সংহিতাকার যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"ঋষিশ্ছন্দোহধি দৈবঞ্চ ধ্যায়ন মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদা।
যত্তু মন্ত্রং যপেৎ গার্গি ত দেব হি ফলপ্রদং॥"

যে ব্যক্তি ঋষি ছন্দ ও অধি দেবতাকে স্মরণ করিয়া মন্ত্র যপ করেন, তাঁহারও যপের ফল লাভ হয়। প্রতাপ চাঁদ! তুমি সন্ধ্যাবিধি অনুসারে প্রথমে মার্জ্জন মন্ত্র পাঠ করিয়া দেহ শুদ্ধি পূর্ব্বক বিনোয়োগ মন্ত্রে মনকে সংযত করতঃ প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি যপের ফল নিশ্চয় লাভ করিবে। আমি বুঝিতেছি, তুমি হঠযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে হঠযোগ বিপদ জনক। অষ্টাবক্র সংহিতা হঠযোগের উপদেষ্টা নহেন। যদি সংহিতা-

কারগণের মতাবলম্বী হইতে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তুমি মহর্ষি অষ্টাবক্রের উপদেশ গ্রহণ কর, আত্মাকেই কেবল নিত্য বস্তু বলিয়া জান, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" ইহা কহিয়া সাধক মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর বিশু কহিলেন, "যুবরাজ! সে দিন একজন হটযোগী এখানে এসেছিলেন, তিনি ঘট শুদ্ধি, নাড়ী শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, অনেক শুদ্ধি বুদ্ধির কথা বল্‌লেন। শরীরটাকে শোন ও পাটের মত কেচে, ধুয়ে সাদা কর্ব্বার অনেক রকম কথা বল্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, ঠাকুর দেহটাকে কেচে ধুয়ে ঠিক কল্লেম, কিন্তু মনটাকে সাদা কর্ব্বার কি উপায় কল্লেন বলুন দেখি? তিনি বল্‌লেন, শরীরের ময়লা গেলেই মনের ময়লা যাবে, কিন্তু আমার কথাটা বেশ ভাল লাগ্‌লো না, কত বাবু ভায়াকে দেখি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তা বলেই কি কর্ত্তে ধর্ত্তে হবে তাদের মনও পরিষ্কার। শ্মশানে মশানে চাই ভস্ম মেখে কত সন্ন্যাসী পড়ে থাকেন, তাঁদের চুলগুলো রুক্ষ, গায়ে ময়লা তা বলেই কি ধর্ব্বো তাদের মনও ময়লা। শরীর কাচ্‌লে কি হবে মন কি সব সময়ে শরীরে থাকে। মন কত দিকে নেচে বেড়ায়। মনটাকে আগে বশ কর্ত্তে হবে। কুস্তি বাজী কল্লে কি করে মন সাদা হবে আমি বুঝতে পারি না।" বিশুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "বিশু তুমি জান না, শরীরের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দেহ মন মন্দির। যদি কাহারও গৃহ দূষিত হয়, পূতি গন্ধ বিশিষ্ট হয়, দুর্জ্জন লোক দ্বারা পরিবৃত হয়, গৃহ স্বামীও দূষিত হইয়া থাকেন। দেহ সরোবরে মনঃ সরোজ। সরোবর অপরিষ্কার থাকিলে কমল দলের পূর্ণ বিকাশ হয় না। দেহ অপবিত্র থাকিলে মনের পবিত্রতা ও বিকাশ সম্ভব নয়। সৎগুণ সকল সে মনকে আশ্রয় করিতে পারে না ও সে মনের আকর্ষণী শক্তি থাকে না।" কেণারাম কহিলেন, "শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ বিস্তর একথা সত্য। কিন্তু শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার কর্ত্তা মন। আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম আরম্ভেই জল শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, ঘট শুদ্ধি, অঙ্গন্যাস ইত্যাদির আবশ্যক। এই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনকে শুদ্ধ ভাবাপন্ন করিবার জন্য। মন্ত্র দ্বারা অঙ্গাদি শুদ্ধ হইয়া থাকে, মন্ত্র সকলের শক্তি অসীম। আপনি ঠাকুরের এই উপদেশ অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া, অঙ্গাদি সংস্কার পূর্ব্বক মনকে সংযত করতঃ প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হউন। প্রাণায়ামের সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যপারম্ভ করিলে, অভ্যাস যোগ দ্বারা ক্রমে আপনার মন সংযত হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

কেণারামের বাক্য শেষ হইবামাত্র সাধক কহিলেন, "প্রতাপ! তুমি কি হটযোগ অভ্যাস করিতেছ?" যুবরাজ কহিলেন, "দেব! আমি ইতি মধ্যে কুম্ভযোগ অভ্যাস করিয়াছি। আমি হটযোগের কাঠিন্য কিছুই অনুভব করিতেছি না। আমার বিশ্বাস হইতেছে, হটযোগ দ্বারা আমার দেহ শুদ্ধি হইবে, পরে আপনার উপদেশ মত প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিব। আমি আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সময়ানুসারে বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি। আমি হটযোগ অভ্যাসের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি।" যুবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধক কহিলেন, "সকল সাধনাই উত্তম। কেবল অবস্থা বিশেষে সাধনার ব্যবস্থা। প্রতাপচাঁদ! তুমি কৃতদার, রাজপুত্র, বিষয়ী-ভোগী, তোমার পক্ষে হটযোগ সাধনা কষ্টকর। যদি এখন তোমার প্রাণায়ামে মনঃ সংযোগ না হয়, যদি তুমি চিন্ময়ীকে চিন্তামণি পুরে ধ্যান করিতে অক্ষম হও, কেবলমাত্র মুখে তাঁহার নাম গ্রহণ কর। নামের এমনি আকর্ষণী শক্তি দেখিবে নাম উচ্চারণে ক্রমে তোমার হৃদয় আকর্ষণ করিবে ও মনেরও ভাবান্তর ঘটিবে ও পরে তুমি যোগ কর্ম্মের অধিকারী হইবে। যুবরাজ, মোক্ষ লাভ অতি কষ্ট সাধ্য। কামনা, ভোগ, বাসনা, থাকিতে মোক্ষ লাভ হয় না। মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান। এই সংসারে মায়া প্রসূত, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর কোন বস্তুই নাই, এই বোধ ও ধারণার নাম জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ বহু সাধনা সাধ্য। তুমি অগ্রে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকারী হও, মনকে সংযত কর, তাহার পর সাধনা মার্গে যাইবে। নচেৎ তুমি কর্ম্ম ফললাভে বঞ্চিত হইবে।" ইহা কহিয়া সাধক মৃদু স্বরে গাহিলেন,—

তুমি মিছে ভ্রমণ করোনা, আমার মন তুরঙ্গ পথে চল।
তুমি সুকৃতি সুমুন্ত্রী বট, কুমন্ত্রণায় কেন ভোল॥
তুমি যে শুনেছ ভাই, ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই,
যার গাছ হলনা ফল হবে কি, সে সব কথা শিকেয় তোল।
দেখিয়ে না দেখ দিঠে, বিপক্ষ চড়েছে পিঠে,
তোমার রথী সে সারথি হারা, কি শঙ্কট ঘটাবে বল॥

সঙ্গীত শেষে প্রতাপ চাঁদ কহিলেন, "গুরুদেব! আপনার কৃপায় আমি হটযোগ সাধনায় কৃতকার্য্য হইব বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। আমি অদ্য হইতে নাম গ্রহণের পৃথক সময় নির্দ্ধারিত করিব।" ইহা কহিয়া যুবরাজ কেণারামের

নিকট মানকর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে সুখী হইয়া, তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলে, কেণারাম কহিলেন, "যুবরাজের মনের চাঞ্চল্য গুরুতর বলিয়া বোধ হইল। আমার বোধ হয়, তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কার্য্য বিষয়ে চিত্তের সন্নিবেশ করিতে পারিতেছেন না। ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশ্বাসই অমূল্য বস্তু। হৃদয় উদার না হইলে বিশ্বাস আইসে না। উদার হৃদয়ে সমুদয় সৎগুণ আশ্রয় করিয়া থাকে। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন নিষ্ফল হয় না, তেমনি উদার হৃদয়ে উপদেশ সকল কখনও নিষ্ফল হয় না। হৃদয় অপবিত্র থাকিলে, তাহার সমুদয় কর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়। কথিত আছে,—

"যদি ধরতি ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মপুণ্ড্রং পটস্থা।
যদি বসতি গুহায়াং বৃক্ষমূলে বনে বা॥
যদি পঠতি পুরাণং বেদ বেদাঙ্গোহপি শাস্ত্রং।
যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্ব্বমেতৎ বিরোধং॥"

রাজপুত্র হৃদয়ের গুরুতর চাঞ্চল্য বশত আপনার উপদেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মানুষ অনেক সময়ে গ্রহ বৈগুণ্য বশত ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে।" সাধক কহিলেন, "প্রতাপ চাঁদ ধার্ম্মিক। তিনি শ্রদ্ধাহীন নহেন। মনের চাঞ্চল্য বশত তাঁহার ইতি কর্ত্তব্যতার অভাব হইতেছে। আমি তাঁহার জন্য দুঃখিত! এইরূপ প্রেমালাপে কিয়ৎক্ষণ অতি বাহিত হইলে, দিবস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আবার দিবস পতি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অদৃশ্য হইতেছেন। ভুবন শ্রমভারাক্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। জীবগণ সন্ধ্যা দেবীর সম্বর্দ্ধনায় তৎপর। গৃহ, দেবালয়, দীপদানে আলোকিত ও শঙ্খশব্দে মুখরিত। বিহঙ্গমগণ তরুরাজিকে আশ্রয় করিয়া কলধ্বনি পূর্ব্বক লোকালয়ের সেই সকল কোলাহলের সহিত যোগদান করিতেছে। জলচর পক্ষীগণ নদী ও তড়াগতীর পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে আকাশের কোনে উড্ডীন হইতেছে। তাহারা লোকালয়ের সেই সকল আনন্দধ্বনিকে অধিকতর মনোরম করিবার জন্যই কলরব পূর্ব্বক গমন করিতেছে। ক্রমে নক্ষত্র মালা পরিশোভিত নীলকান্ত মণিময় মুকুট মস্তকে নিশাদেবীর আবির্ভাব দৃষ্ট হইল। বিশু ও কেণারামের সহিত সাধক বিশ্বশক্তির উপাসনার জন্য গমন করিলেন। ক্রমশঃ

মরকত মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নরবলির আদেশ।

রাজাটীর নাম পাওয়া গেল না। বনস্থলী হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়া রাজা সর্ব্বাগ্রে সহর কোতোয়ালকে আহ্বান করিলেন। কোতোয়াল আসিয়া করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা আদেশ করিলেন, দেবালয়ের পূজক ব্রাহ্মণ জটাধর, তাহার পুত্র মাধব। অদ্যই তুমি সেই মাধবের শিরচ্ছেদন করিয়া আমাকে রক্ত দেখাও!

কোতোয়াল কাঁপিয়া উঠিল। সাক্ষাতে কিছু বলিতে না পারিয়া, অবনত মস্তকে কেবল এইমাত্র বলিল; "যো হুকুম মহারাজ!"

মন্থর গমনে, কম্পিত পদে কোতোয়াল রাজসমীপ হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিবর্গ, সভাসদ্ বর্গ, পুরবাসীবর্গ, সকলেই ঐ নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, সকলেই হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। মাধবের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। সকলেই তাহাকে ভাল বাসেন। মাধবের বিনয়, নম্রতা ও মধুরালাপে ইতর জনেরা পর্য্যন্ত তাহার উপর সন্তুষ্ট। পিতার নিকটে থাকিয়া মাধব সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চ্চা করে, কাহার সহিত বিরোধ করে না, বিলাস বাসনার স্বপ্নও দেখে না, কদাচ কাহাকেও রূঢ় কথা বলে না, লেখা পড়ার পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না, তদ্ভিন্ন পিতৃসেবায় মাধবের একান্ত যত্ন। বিনা দোষে, বিনা বিচারে, বিনা কারণে রাজা সেই নিরিহ মাধবের প্রাণ বধ করিবার আদেশ দিলেন, সকলের প্রাণেই বেদনা লাগিল! রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী একাকী কোতোয়ালীতে গমন করিয়া নির্জ্জনে কোতোয়ালকে বলিলেন, "মাধবকে কাটিও না। বিনাদোষে ব্রহ্মহত্যা করিলে, রাজ্যের অমঙ্গল হইবে। রাজার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। এ রাজ্যে কখনও নরবলী হয় নাই, কুলদেবতারা নরবলী দর্শনে, ব্রহ্মরক্ত-পাতে রাজ্যের উপর—রাজবংশের উপর বিমুখ হইবেন, রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে। খবরদার! খবরদার! কদাচ মাধবকে কাটিও না।"

কোতোয়াল বলিল, "আমি ত কথনই পারিব না। মাধব আমার সন্তান তুল্য স্নেহপাত্র, মাধবের শিষ্টাচারে সকলেই আমরা বিমুগ্ধ, কোন প্রাণে সেই মাধবকে আমি বলিদান করিব।"

কোতোয়াল কাঁদিয়া ফেলিল। সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "তুমি এক কর্ম্ম কর। মাধবকে ডাকিয়া দূরবনে লইয়া যাও। সেইখানে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, একটা বনজন্তু কাটিয়া রাজাকে রক্ত আনিয়া দেখাইও। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের মাধবকে রক্ষা করিবেন।"

স্ব স্ব রাজা মধ্যে রাজাদের হুকুম অব্যর্থ। রাজারা যাহা যাহা হুকুম করেন, তাহা যেমন শুভপ্রদ, তেমনি অশুভ উৎপাদক, রাজার প্রকৃতি অনুসারে হুকুমের প্রকৃতি বিবেচনা করিতে হয়। রাজা যদি ধর্ম্মানুরাগী, প্রজারঞ্জন এবং সুবিচার পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার আদেশে সর্ব্বদা মঙ্গল ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে; রাজা স্বেচ্ছাচার হইলে তাঁহার আদেশ অবিশ্রান্ত অমঙ্গলের নিমিত্ত হয়। যে রাজার রাজ্যের কথা আমরা বলিতেছি, তিনি এক প্রকার খাম-খেয়ালী। এক এক সময়ে তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়, এক এক সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় বিষময় ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে। এ রাজা অধার্ম্মিক, এমন কথা আমরা বলি না; এ রাজা ধার্ম্মিক, এ কথাও ঠিক নয়, ইহার বুদ্ধি প্রকৃতি যখন যে প্রকার থাকে, কার্য্যও সেই প্রকার দাঁড়ায়, কার্য্য করিবার আদেশও এক এক সময়ে পরস্পর বিরুধি হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ পুত্র মাধবকে রাত্রিকালে বলিদান করিবার আদেশ হইয়াছে, সহর কোতোয়াল রাত্রিকালেই মাধবকে আনয়ন করিবার জন্য দেবালয়ে দূত পাঠাইয়াছিল, মন্ত্রী মহাশয় কোতোয়ালীতে উপস্থিত থাকিতে থাকিতে মাধব সেই স্থলে আনীত হইল।

মাধবের পিতা জটাধর ভট্টাচার্য্য কি ভাবিয়া নিশাকালে অপূর্ণ বয়স্ক প্রিয় পুত্রকে কোটালের লোকের সঙ্গে ছাড়িয়া দিলেন, তাহাও একবার ভাবিতে হয়। তিনি বাস্তবিক কোন প্রকার অমঙ্গল আশঙ্কা করেন নাই, রাজধানী মধ্যে মাধবের অপ্রিয় কেহই ছিল না, মাধব কাহারও অপ্রিয় নহে; কোটালের লোক ডাকিতেছে, কোন প্রকার অসৎ অভিপ্রায় নাই, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ সরল অন্তরে তাহাই ভাবিয়া ছিলেন, সুতরাং কিছু মাত্র সন্দেহ অথবা আপত্তি করেন নাই।

মাধব আসিয়া কোতোয়ালীতে উপস্থিত। মাধবের মুখ দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয়

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আপন উত্তরীয় বসনে দুইবার নেত্র মার্জ্জন করিলেন, মাধব তাহা দেখিল না, মন্ত্রীর চক্ষে জল পড়িতেছে, তাহাও মাধব বুঝিল না। বুঝিবার হেতু না থাকিলে, কিম্বা হেতুটা জানা না থাকিলে কাহার মনে কোন প্রকার অনুকূল অথবা প্রতিকুল ভাব আসিতেই পারে না, ইহা মানুষের স্বভাব সিদ্ধ। মাধবের বদন দিব্য প্রশান্ত, দিব্য স্বপ্রতিভ, সে বদনে কিছুমাত্র চঞ্চলতা ছিল না। দেখিতেও মাধবটী দিব্য সুশ্রী, বালক সুলভ সরলতা ও হাস্য তাহার মুখে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ পায়। মন্ত্রী মহাশয় নিরঞ্জল নয়নে সে মুখ অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন তা, তৃতীয়বার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া কোটালের সঙ্গে তিনি একটী অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। কোটালের হস্তে সহস্র মুদ্রার মোহর অর্পণ পূর্ব্বক তিনি কহিলেন, "বনে ছাড়িয়া দিবার সময় অভয়দান করিয়া এই মোহর গুলি মাধবকে তুমি দিও, আমি আর এখন দেখা দিব না, চলিলাম। যাহা বলিয়া দিয়াছি, তাহাই করিও। কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে। সাবধান!

মন্ত্রী মহাশয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, মোহরগুলি বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া লইয়া খড়্গপাণি সহর কোতোয়াল শীঘ্র শীঘ্র মাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুই জনে এক সঙ্গে গেলেন, মন্ত্রী মহাশয় কেন ফিরিলেন না, মাধবের মনে সে সংশয় আসিল না। মন্ত্রী হয় ত অন্য কার্য্যে আসিয়া ছিলেন, কার্য্য সারিয়া চলিয়া গেলেন, ইহাই মাধব ভাবিল।

দুই দণ্ড অতীত। বাহিরে গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া শান্ত বদনে মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কোতোয়াল বলিল, "মাধব! আজ আমার একটী কার্য্য আছে, এই রাত্রিকালে তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

কি কার্য্য, মাধব তাহা জানিত না, সুতরাং কোন আপত্তি করিল না, নির্ভয়ে অসংদিগ্ধ চিত্তে কোতোয়ালের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাত্রি অনুমান ছয় দণ্ড।

লোকজন কেহই সঙ্গে গেল না, কেবল মাধবকে সঙ্গে লইয়া রাজ কোতো-য়াল আপন আবাস হইতে বাহির হইল। অশ্বারোহণে কোতোয়াল, তাহার সম্মুখে সেই অশ্ব পৃষ্ঠে মাধব। অশ্ব চলিতেছে, শোয়ারেরা নিস্তব্ধ; অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ। অশ্ব ছুটিতেছে না, ধীরে ধীরে কদমে কদমে চলিতেছে। রাজ-ধানী ছাড়াইয়া প্রান্তরে পড়িয়া খানিকক্ষণ পরে কোতোয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "মাধব! তুমি ঘোড়া চড়িতে জান?" হাস্য করিয়া মাধব উত্তর করিল,

"শিখিতে ছিলাম, পটু হই নাই। পাঠের সময় দুই বেলা সখের কার্য্য শিখিবার সময় পাওয়া যায় না।"

কোতোয়াল বলিল, "অশ্বারোহণটা কেবল সখের কার্য্য নহে, উহার দ্বারা অনেক সময় অনেক বিপদ হইতে রক্ষে পাওয়া যায়। তুমি শিক্ষা করিও, অনেক উপকার পাইবে।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে একটা বন প্রান্তে উপস্থিত হইল, সুশিক্ষিত অশ্ব অঙ্গ সংকোচ করিয়া সংকীর্ণ পথে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। রাত্রি অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। বনমধ্যে কতদূর আসিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কোতোয়াল কিছু ব্যস্ত হইল। তাহার সঙ্গে আলো জ্বালিবার উপকরণ ছিল, একটা বাতি প্রজ্জ্বালন করিয়া সম্মুখে দেখিল, একটু দূরে এক ভগ্ন অট্টালিকা। রাশিকৃত প্রস্তর ঠাঁই ঠাঁই ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর মৃত্তিকার স্তর পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা জন্মিয়াছে, একধারে ছোট একটা চাঁদনী ছিল, তাহার কতক অংশ পড়িয়া গিয়াছে, দুইটা স্তম্ভের উপর কতকাংশ দাঁড়াইয়া আছে, ক্ষণকালের জন্য তথায় আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানটা সহর কোতোয়ালের জানা ছিল, অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মাধবকে লইয়া কোতোয়াল সেই ভগ্ন চাঁদনীর মধ্যে প্রবেশ করিল, হস্তে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা।

কি করিতে আসিয়াছে, কি কথা বলিবে, রাজ কিঙ্কর প্রথমে যেন তাহা ভুলিয়া গেল; বলি বলি মনে করিয়া বলিতে পারিল না, অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে মন্ত্রীদত্ত মোহর গুলি বাহির করিল। সেই গুলি মাধবের হস্তে দিয়া সাশ্রু গদ্‌গদ স্বরে বলিল, "মাধব! লও, এস্থান হইতে চলিয়া যাও, শীঘ্র আর এ রাজ্যে ফিরিয়া আসিও না, এ রাজ্যের কেহ যেন তোমারে এ অঞ্চলে দেখিতে না পায়। এই মোহর গুলি তোমার অসময়ের সম্বল রহিল, ইচ্ছা মত নিয়মিত রূপে প্রয়োজন অনুসারে খরচ করিও, অপব্যয় করিও না, আমি তোমাকে এই বনে পরিত্যাগ করিলাম! কেন, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। আমার অশ্বটী তুমি লইয়া যাও, বনপথ আমার জানা আছে, আমি পদব্রজে ফিরিয়া যাইতে পারিব।"

মাধবের অলক্ষিতে কোটালের চক্ষে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িল, কণ্ঠস্বর প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া আসিল; আর কিছু বলিতে পারিল না। মস্তক ছেদনের আজ্ঞা, আমি তোমাকে কাটিবার জন্য এই বনে আনিয়াছি; নিষ্ঠুর হইয়া

রাজ কোতোয়াল সেই সাংঘাতিক কথাটা প্রকাশ করিতে পারিল না, নীরবে কেবল অশ্রুপাত করিল মাত্র।

ব্যাপার কি, কোটালের চক্ষে ঘন ঘন অশ্রু কেন, মাধব তাহার কিছুই বুঝিল না! জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিতেছে, অবসর না দিয়াই কোটাল তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দিল, স্তম্ভিত বচনে কহিল, "যাও মাধব, যাও, এই পথে চলিয়া যাও, এ রাজ্যে আর ফিরিয়া আসিও না!"

কারণ বুঝিল না, বারণ বুঝিল, পিতা কোথায় রহিলেন, পুঁথিগুলি কোথায় রহিল, মাধব একবার মনে মনে সেই দুটী কথা ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এ রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে নিষেধ, অবশ্যই কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে, অনুমানে অনুমানে এরূপ অবধারণ করিয়া মাধব আর দ্বিরুক্তি করিল না, মোহরগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া উত্তর মুখে অশ্ব ফিরাইল। শিক্ষিত অশ্ব মৃদু কদমে বন পথ অতিক্রম করিয়া শান্ত ভাবেই চলিল। যতক্ষণ দেখা গেল বর্ত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া কোটাল ততক্ষণ মাধবের গতি ক্রিয়া দর্শন করিল। অশ্বসহ মাধব অদৃশ্য হইয়া গেল। কোটাল আবার কাঁদিল। অনন্তর হস্তস্থিত তরবারির দ্বারা বনের একটা মৃগ শিশু বধ করিয়া পত্রপুটে তাহার রক্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কোটাল বিষণ্ণ বদনে রাজধানীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ রাখিবেন, পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে রাজকুমার সমরনাথ যেদিন নরোত্তম ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, প্রথমে আশ্রয় দিয়া তাহার পর নরোত্তম তাহাকে যে রাত্রে প্রাণে মারিবার ভয় দেখান, সেই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা। অবিচারে অকস্মাৎ বিপ্র বালক মাধবের নির্ব্বাসন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুরু দর্শন।

তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া নির্ব্বাসিত মাধব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইলে এক একবার অশ্ব হইতে নামিয়া দুই একটী বনফল ভক্ষণ করিয়াছে, নিকটস্থ নদীর জল পান

করিয়াছে, অশ্বটীও সেই অবকাশে তৃণ ভক্ষণ ও জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত বিশ্রাম।

বন আর ফুরায় না। মাধবের অশ্ব যতদূর যায়, ততদূর বন। নিবিড় অরণ্য। চতুর্থ দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ে মাধব একটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। বনভূমিতে সূর্য্যাস্ত। সময়টী সুন্দর। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষশাখে, বৃক্ষপত্রে রক্তবর্ণ রবি কিরণ বিকীর্ণ হওয়াতে পত্রগুলি স্বর্ণবর্ণ দেখাইতেছে। বিবিধ বিহঙ্গ কুজনে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে! সময় রমণীয়, স্থানটীও অতি রমণীয়। বন মধ্যে যেন শান্তি নিকেতন বৈকুণ্ঠ ধাম! নব নব পল্লবে তরুগণ সুসজ্জিত! নব নব পুষ্প বিকাশে চারিদিক সুগন্ধময়। একটু দূরে দক্ষিণ বাহিনী স্রোতস্বতী। যাহাদের অন্য কার্য্য নাই, যাহাদের মনে অন্য চিন্তা নাই, যাহারা নিরবচ্ছিন্ন পরমার্থ চিন্তায় অভ্যস্ত, তাহাদের এই শান্তিধাম। প্রকৃতই শান্তিপ্রদ। মাধবের পক্ষে শান্তিপ্রদ নহে। মাধবের মনে প্রবল চিন্তার লহরীলীলা। কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় গৃহ, কোথায় পরিজন, কোথায় মাধব, মাধব তাহা কিছুই জানিতেছে না। বসন্তের সুখময় সময়, বসন্তের সুখময় স্থান, মাধবের চিন্তাকুল চিত্তকে শান্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না! সন্ধ্যা সমাগমে বরং আরও অধিকতর উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। বিজন বনভূমি ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত। মাধব এখন যায় কোথা?

অশ্বটী অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত। পৃষ্ঠ হইতে শোয়ার অবরোহণ করিলে অশ্ব একবার ভূলুণ্ঠিত হইয়া ক্লান্তি নিবারণের চেষ্টা পাইল। তদনন্তর অন্ধকার অরণ্যে নব নব তৃণপত্র ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই তরুতলে শয়ন করিয়া মাধব একটু বিশ্রাম করিতে পারিবে, যদি সম্ভব হয়, নিদ্রাদেবী যদি দয়া করেন, তাহা হইলে হয়ত কিঞ্চিৎ নিদ্রাসুখও উপভোগ করিতে পারিবে, সেই আশায় মাধব সেই তরুতলে উপবেশন করিল। ভাল লাগিল না। আবার উঠিল। কিয়ৎদূর পরিভ্রমণ করিল। ভাল লাগিল না, সর্ব্বক্ষণ অন্য মনস্ক। কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আরও বা বিপদ উপস্থিত হইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, কোথায় যেন কি ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটিয়াছে, মাধবের চিন্তা তরঙ্গিত ক্ষুদ্র হৃদয় সমুদ্রে নিরন্তর সেই তরঙ্গের ক্রীড়া।

পরিক্রমণ করিতে করিতে মাধব আবার সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিল। অশ্বত্থ বৃক্ষকে আর্য্য সন্তানেরা দেবতা বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকে। অশ্বত্থ

বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলে পুণ্যলাভ হয়, অশান্ত চিত্তে শান্তির উদয় হয়, ক্ষণেকের জন্য মনের উদ্বেগ দূর হইয়া যায়, বালক হইলেও মাধবের মনে সেই সংস্কার জন্মিয়াছিল। অন্ধকারে অশ্বত্থবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিবে, মাধব এইরূপ সংকল্প করিল। ব্রাহ্মণের সন্তান, সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা বন্দনা করিতে হয়, মনের অস্থিরতায় মাধব তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। অশ্বত্থবৃক্ষ নারায়ণ, অশ্বত্থবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে, সেই আশ্বাসে মাধব সেই সংকল্পিত ব্রতে চিত্ত স্থির করিল। প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত পদে পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৃক্ষের তিন দিক বেষ্টন করিয়া চতুর্থ দিকে আসিবামাত্র অকস্মাৎ মাধবের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। এতক্ষণ যাহার ভয় আইসে নাই, বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাহার মনে ভয় আসিল কেন? সম্মুখে কি যেন দেখিল। প্রথমে নির্ণয় করিতে না পারিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিবে ভাবিতেছিল, সামলাইয়া গেল। অন্ধকারেই দেখিল, যেন এক মনুষ্যমূর্ত্তি উপবিষ্ট, দীর্ঘাকার মনুষ্য। অন্ধকারে প্রথমে বোধ হইল, মনুষ্যের ছায়া। আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, ছায়া নহে, সজীব মনুষ্য মূর্ত্তি। তথনও পর্য্যন্ত ভয় ঘুচিল না। এই নিবিড় বিজন অরণ্য মধ্যে সন্ধ্যাকালে মনুষ্য বসিয়া কেন? দস্যু তস্কর হইবে কি? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? এই বিজন বনে দস্যু কি নিমিত্ত আসিবে? এ বনে মনুষ্যের সমাগম নাই। দিবাভাগেও পথিকেরা এ পথে চলে না; তবে এখানে চোর বসিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে? বনের সম্পত্তি চুরি করিবে? করিলেই ত হয়? তাহার জন্য ওৎ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

মাধব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। মূর্ত্তি একবার চাহিয়াও দেখিল না। একটী কথাও কহিল না, মাধবের পূর্ব্ব সংস্কারে বাধা পড়িল। জীবিত মনুষ্য নহে, আবার মাধবের মনে সেই সংশয় দাঁড়াইল।

মাধব ভূত মানিত—ভূতের ভয় করিত। এ মূর্ত্তি যখন কথা কহিল না, তখন নিশ্চয়ই ভূত। মাধবের মনে একটু ভূতের আতঙ্ক আসিল। মাধবটী যে সময়ের লোক সে সময়ে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী ইতিহাস এবং ইংরাজী বিজ্ঞান, সে সময়ে এতদ্দেশের লোকের স্বপ্নেও উদয় হইত না। এখন যে সকল বালক ইংরাজী বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ভূতের অস্তিত্বে অথবা ভূতের দৌরাত্মে আদৌ বিশ্বাস রাখেন না, সে সময়ে সে সকল বালকের পিতামহেরও জন্ম হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। মাধব অপেক্ষা

অল্প বয়স্ক বালকেরা এখন ভূতের গল্প শুনিলে হাস্য করিয়া উড়ায়। মাধব সে সময়ে সে শিক্ষা পায় নাই। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক অতএব তাহার ভূতের ভয় হওয়া নিতান্ত বিচিত্র বোধ হয় না।

ভয় হইল। ভয় কিন্তু আবার শীঘ্রই ঘুচিয়া গেল। উপবিষ্ট লোকটী সহসা জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?"

পরিষ্কার নরকণ্ঠস্বর শ্রবণে মাধবের ভূতের ভয়টা ঘুচিল বটে, কিন্তু ভয়ের প্রধান অনুচর যে কম্প মাধবের সে কম্পটুকু তখনও ঘুচে নাই। লোকটীকে মাধব মনে করিল যেন সাধুলোক। উত্তর দানে বিলম্ব না করিয়া কম্পিত মাধব কম্পিত স্বরে কহিল, "আমি মাধব।"

নাম শ্রবণে সে দীর্ঘ লোকটীর কেমন এক প্রকার নূতন কৌতূহল জন্মিল। সকৌতূহলে আগন্তুক বালকটীকে সস্নেহে বলিল, "মাধব আসিয়াছ ? উত্তম করিয়াছ। নিকটে উপবেশন কর।"

মাধবের মনে তখন দুইভাব একত্র। আশ্চর্য্য ভাব, আর আনন্দ ভাব। বনবাসী অপরিচিত লোকে লোকালয় বাসী আত্মীয় লোকের ন্যায় নাম ধরিয়া ডাকিল, স্নেহ প্রকাশ করিল, ইহাই আশ্চর্য্য ভাব। আদর করিয়া নিকটে বসিতে বলিল, তাদৃশ সঙ্কটে তখন সেইটীই আনন্দ ভাব।

মাধব বসিল,—লোকটীর অতি নিকটেই বসিল।

অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে এখনকার কোন বাবু লোকের বৈঠকখানা ছিল না। ঝাড় লণ্ঠন ছিল না, গ্যাসের অথবা বিদ্যুতের আলো ছিল না, নিশাকাল, তরুতল অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই দুটি লোক (একটি বৃদ্ধ একটি বালক) এক সঙ্গে বসিয়া রহিয়াছে। প্রথম কয়েকটী কথার পর আর কেহ কোন কথা কহে নাই। ক্ষণকাল পরে লোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "মাধব রাজা অমরনাথের দেবালয়ে তুমি কি তোমার পিতার নিকট বাস করিতে ?"

মাধব চমকিল। এত বৃত্তান্ত এই বনবাসী কিরূপে জানিল ? লোকটি কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে জানে ? লোকটি পুরাতন মুনি ঋষির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ? বিস্মিত মানসে মাধব দুই তিন বার ইহাই ভাবিল।

লোকটিকে আমরা আর লোকটী লোকটী বলিয়া নিকৃষ্ট সম্ভাষণে অবমানিত করিব না। ইনি একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রধান গণিত শাস্ত্রবিদ্ মহাপুরুষ। ধর্ম্মে কর্ম্মেই ইহার গাঢ় অনুরক্তি। ইহার নাম ভবানন্দ স্বামী।

মাধব যাহা ভাবিতে ছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। ভবানন্দ স্বামী সস্নেহে

তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, "মাধব! তুমি উত্তর কর আর নাই কর, আমি তোমাকে চিনিয়াছি। এই রাত্রে তুমি আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর। আমি তোমার দীক্ষা গুরু হইব। আমি তোমাকে সন্ন্যাসী সাজাইব। আমি তোমার জপ তপের আশ্রম করিয়া দিব। সন্ন্যাসে তোমার মঙ্গল হইবে। যতদিন আমার অনুমতি না হয়, ততদিন তুমি অছিলায় কোন লোকালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চল, নিকটেই নদী আছে, আমি তোমাকে স্নান করাইয়া আনি। আমিও স্নান করিয়া আসি। স্নানান্তে তোমার কর্ণে অভীষ্ট মন্ত্র প্রদান করিব।"

স্নান হইল। মন্ত্র গ্রহণ হইল। স্বামী দত্ত যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করা হইল। গুরুদেবের অনুমতি ক্রমে মাধব সেই তরুতলে শয়ন করিল। যে রকম মন লইয়া, নিরাশ্রয় হইয়া, মাধব বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহাতে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিবে, এমন আশা ছিল না। মাধব কিন্তু স্বচ্ছন্দে সেই অনাবৃত তৃণাসনে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে মাধব গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের চরণ বন্দন করিল। গতরাত্রে আর একটী কার্য্য তাহার বাকী ছিল, গুরুদেবের অনুমতি লইয়া সেই কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাই তাহার বাসনা। গুরুদেবকে বলিল, "রাত্রে অশ্বত্থ মূলে আসিবার অগ্রে একটী অশ্ব আমি বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। সেটী একজন সদাশয় কোটালের অশ্ব। সে অশ্ব আমি কি প্রকারে সেখানে পৌঁছাইয়া দিব আজ্ঞা করুন।"

স্বামীজি কহিলেন, "গৃহ পালিত পশুরা আপনাদের প্রভু গৃহ উত্তম চিনিতে পারে, বন্ধন মোচন করিয়া দাও, কোটালের অশ্ব কোটালের গৃহে স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাইবে। কোন চিন্তা নাই।"

তদ্দণ্ডেই গুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। তাহার পর আশ্রম নির্ম্মাণ। মাধবটী বালক, গৃহ নির্ম্মাণে অপটু, সুতরাং গুরুজী স্বয়ং অরণ্যের তৃণ লতা পত্রে একখানি পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। দুটি লোক সেই কুটীরে স্থান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভবানন্দ স্বামী সে কুটীরে আশ্রয় লইলেন না, তিনি পূর্ব্ববৎ বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক অঙ্গুরী নির্ম্মাণে রত রহিলেন। কুটিরে কেবল মাধব একাকী রহিল। নিত্য উষা কালে নদীতে স্নান করে, কুটিরে বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করে, ভক্তিমান হইয়া গুরুদেবের সেবা করে, কেবল নিশাকালে অল্পক্ষণ একাকী নিদ্রা যায়। মাধবের নূতন বেশটি অতি সুন্দর হইয়াছে।

পরিধান মৃগচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি গলে রুদ্রাক্ষমাল্য মস্তকটি সুমুণ্ডিত। লোকে নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে, এখন আমাদের পাঠক মহাশয়েরা দেখুন, বালক সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসী শেষ কালে কি করিবে এইবার আমরা তাহা দেখিব।

ক্রমশঃ

আর্য্য মহিলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ।

বিবাহ।

কন্যার পিতা বা সম্প্রদানে অধিকারী অন্য ব্যক্তির দ্বারা কন্যা সম্প্রদত্তা হইলে অথবা তাহাদের কাহারও অভাবে কন্যা যখন স্বয়ং দত্তা হইয়া বিবাহ করেন, তখন হইতেই কন্যার এক নূতন জীবনের সূত্রপাত। কন্যা স্বয়ং দত্তা হইয়া বিবাহ করিবেন, ইহাতে পাশ্চাত্য ভাব কিছুই নাই, সুতরাং কেহ সংস্কার বশতঃ এই রীতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না, এরূপ আশা করা যায়। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥

* * *

গম্যস্তভাবে দাতৃণ্যা কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্॥

অর্থাৎ পিতাই কন্যাদানে মুখ্য অধিকারী। তদভাবে পিতামহ, সকুল্য কিংবা মাতা বিবাহে কন্যাদানের অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। দানাধিকারীর অভাব হইলে, কন্যা স্বয়ংবর করিবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী। এই বিবাহই গার্হস্থ্য জীবনের দ্বার।

হিন্দুশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের

পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে আজ কাল যে প্রকার বিবাহ বিধি প্রচলিত আছে, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ। শুল্ক বা পণ গ্রহণ করিয়া যে কন্যার বিবাহ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহার নাম আসুর বিবাহ। পরস্পর অনুরাগ প্রযুক্ত শপথ পূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। অষ্টবিধ বিবাহ বিধির মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই সুধী সমাজে প্রশংসনীয় ও পৈশাচ বিবাহই নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ছলক্রমে বা কন্যা নিদ্রিতা থাকিলে বা অন্যবিধ অবস্থায় কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকেই পৈশাচ বিবাহ কহে। ভগবৎ কৃপায় আজকাল পৈশাচ বিবাহ কোনও রূপে প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ বিবাহ বিধি বর্ত্তমানে দণ্ডবিধি আইনের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া দণ্ডনীয় হইয়াছে।

আমাদের সমাজে ইদানীং একটা উৎকট রূপ বিবাহ বিধির প্রচলন হইয়াছে। ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহ বিধির সংমিশ্রণ দ্বারা আমাদের সমাজ আজ কতকটা কলুষিত। আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি না যে, পূর্ব্বে পণ গ্রহণাদি ব্যাপার সামাজিকগণের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। পণ গ্রহণ প্রথার ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার উৎপত্তি নির্ণয় করা বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। যাহা হউক, পণ গ্রহণ প্রথার প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হইবে।

পাশ্চাত্যগণ আমাদের বিবাহ পদ্ধতির অনেক দোষ দেখিয়া থাকেন। যাহারা আমাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ধর্ম্মান্তর ও অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদের বিবাহ বিধির দোষ কীর্ত্তন করতঃ আপন মনের স্বস্তি বিধানে প্রয়াসী। তাঁহাদের চোখে আমাদের বিবাহ বিধির শত সহস্র দোষ থাকিলেও এবং তাহারা অন্য কোনও যুক্তিতর্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও আমাদের বিবাহ যে পাশ্চাত্য সিভিল কণ্ট্রাক্ট (Civil Contract) নহে, একথা মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুর বিবাহ সম্বন্ধ কোনও মতেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। পতি ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করতঃ পত্নীর প্রতি কোনও প্রকার দুর্ব্যবহার করিতে পারেন না; অপ্রকৃতিস্থ হইয়া কোনও প্রকার দুর্ব্যবহার করিলেও পতিকে ত্যাগ করা হিন্দু পত্নীর ধর্ম্ম নহে। হিন্দু পত্নী প্রাণান্তেও তাহা করিতে পারেন না। আপন কর্ত্তব্যানুরোধে পতি যদি পত্নীর প্রতি কোনও অন্যায়াচরণ করিতে বাধ্য হন, হিন্দুপত্নী তাহা নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন,—এইরূপ নীরবে সহ্য করিয়াই তাঁহারা আপন জাতির মহত্ত্ব জগৎকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ নীরবে সহ্য করাই

ভারতে পত্নীত্বের তথা নারীত্বের অন্যতম গৌরব। আবার স্বামী যখন বিপথে চালিত হয়েন, সতীলক্ষ্মীর উদ্বোধন বাক্যই তাঁহাকে সুপথে আনয়ন করিতে সক্ষম হয়। স্বামীর কর্ত্তব্যপালনে ঔদাস্য পরিলক্ষিত হইলে স্ত্রীর বাক্যই স্বামীকে কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে। স্বামীর কর্ত্তব্য পালনে নিজের মহদনিষ্ট সংঘটিত হইলেও হিন্দু পত্নী অনায়াসে হাস্যমুখে সমস্ত প্রত্যবায়ের আলিঙ্গন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাতেই স্বকীয়া উদারতা নিজের নারীত্বের গৌরব। ভাগ্যদোষে স্বামী যদি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, হিন্দু পত্নী প্রাণান্তেও স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি স্বামীর দুঃখে সমদুঃখ ভাগিনী। আবার স্বামী যখন রাজ্যেশ্বর তখন জায়া সৌভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী—মহিষী। স্বামী পথের ভিখারী হইলেও স্বামী হিন্দু স্ত্রীর একমাত্র সম্বল। পাশ্চাত্য রমণীর ন্যায় স্বামীকে তখন অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক বরং হিন্দু পত্নী স্বামীকে তখন আরও জড়াইয়া ধরেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি নারীরত্ন নারী জীবনের যে উচ্চতম আদর্শাবলী জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগতের কোনও নারীর সহিত আদর্শ বহুল ভারতবর্ষের আদর্শ জীবনা কোনও নারীর তুলনা হইতে পারে বলিয়া আমরা জানিনা।

হিন্দু সমাজে নারীগণ সতত অবমানিত হন, তাঁহাদের নিজের কোনও ক্ষমতা নাই, তাঁহারা শত উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বলিয়া পাশ্চাত্যগণ গগনমার্গ বিদারণ করিতে পারেন, ভারত নারীর অবস্থার তথা কথিত উন্নতি করিবার জন্য তাঁহারা সভা সমিতি সংগঠন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ ভারতে টিকিবে না। তাঁহারা বলিতে পারেন, ভারতে নারী ক্ষমতা হীনা, অথবা অবলাজন আত্মোন্নতির সাধন প্রয়াসে অনধিকারিণী। কিন্তু তাঁহারা আবার জানিয়া রাখুন, স্বামী যখন বিপথে গমন করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ না করিয়া কিরূপে সৎপথে আনিতে পারা যায়, ইহা ভারত রমণী হইতেই শিক্ষনীয়। নারীর মানসিক বলের নিকট পুরুষ হীনতর রূপে সতত প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। স্বামী বা পুত্র বা অন্য কোনও পরিজন নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, অকর্ত্তব্য আচরণে যখন সচেষ্ট থাকেন, তখন কিরূপে তাঁহাকে সে পথ হইতে বিরত রাখিতে হয়, সে কর্ত্তব্যজ্ঞান অনন্যকল্প ভারত নারীতে শোভা পায়। কর্ত্তব্যে স্মরণ করিয়া এবং কর্ত্তব্য অবশ্য সম্পাদ্য বিবেচনা করিয়াও পতিপুত্র যখন নানা কারণে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষমতা বিবেচনা করিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন, যেন নারী জাতির উৎসাহ কতদূর কার্য্যকর

হইতে পারে—ইহা ভারতের ইতিহাস হইতে যে কেহ শিক্ষা করিতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কিরূপে সহর্ষে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া তাহার অনুগমন করিতে হয়, ইহাই পতিপ্রাণা ভারত রমণীর দেবীত্বের পরিচয়। তাই বলিতে ছিলাম, হিন্দুর বিবাহ পাশ্চাত্য সিভিল কণ্ট্রাক্ট নহে। ইহা জন্ম জন্মান্তরের, যুগ যুগান্তের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। হিন্দুর বিবাহ মন্ত্রাদি এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে;

স্বামী স্ত্রীর যে সম্বন্ধ তাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান হইলে পতির প্রতি ঐকান্তিকতা, পরিজনের প্রতি স্নেহের গাঢ়তা, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তা প্রভৃতি আপন মনোমধ্যে স্বতঃই উদিত হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সহিত যখন আত্ম প্রত্যব জ্ঞানের বিচার হয়, তখন সে সম্বন্ধ আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠে। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ বিষয়ে অনুশাসকগণের মতের সকৌতুহল আলোচনা বিশেষ সুফল প্রসূ হইতে পারে।

বিবাহের অব্যবহিত পরে বধু পিতৃগৃহ হইতে স্বামী গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। দেশ ভেদে ইহার বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। যে সমস্ত দেশে বাল্য বিবাহের পূর্ণ প্রচলন আছে, তথায় কন্যা রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে স্বামীগৃহে স্থায়ীভাবে আইসেন না। কোথায়ও বা বিবাহের এক বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার স্বামিগৃহে থাকিবার নিয়ম নাই। নিয়ম যাহাই থাকুক না কেন, অবিকাংশ ক্ষেত্রে আজ হউক, কাল হউক হিন্দু স্ত্রী স্বামিগৃহেই আসিয়া থাকেন। স্বামি তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই অপরিচিত পরিবারে 'একজন' হইয়া থাকিতে কন্যার অর্থাৎ স্ত্রীর মনে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। মাতা পিতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি পিতৃগৃহের আত্মীয়গণ হইতে দূরে যাইতে প্রাণ স্বতঃই কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু যাহাকে নিজের "সর্ব্বস্বধন" "হৃদয় দেবতা" রূপে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাঁহা হইতে দূরে থাকিলে আপন কর্ত্তব্য সাধিত হইবে কেন? কন্যা পিতৃগৃহে আপন পিতাকে যে চক্ষে দেখিতেন, হৃদয়ের যে ভাব লইয়া আপন পিতাকে সতত সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, আজ শ্বশুর গৃহে শ্বশুরের প্রতিও তাঁহার সেই সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আপন মাতাকে কন্যা যাদৃশ উদার প্রকৃতি ও হিতসাধিকা বলিয়া পূজা করিতেন, বধু আপন শ্বশ্রূকেও সতত কল্যাণানুধ্যান নিরতা মাতৃদেবীর আসনে বসাইবেন, সতত শ্বশ্রূর বশানুবর্ত্তিনী হইয়া আপন কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করাই বধুর কর্ত্তব্য।

যৌবনাবস্থায় বা বিবাহিত জীবনে স্বামীই নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন। মনু ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।

ভর্ত্তা নিজের স্ত্রীকে যথাসাধ্য ভরণাদি দ্বারা রক্ষা ও পোষণ করিবেন। ইহাতেই ভর্ত্তার ভর্তৃত্ব। বধু ও স্বামীর বাধ্য হইয়া চলিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য! শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর বশানুবর্ত্তিতাই স্বামীর বাধ্যতার নামান্তর বলা যাইতে পারে।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বধূ ঘটনাচক্রে পড়িয়া হয়ত নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুদ্ধির অভাবে কোনও কার্য্য করিয়া বসেন ও শ্বশ্রূর অপ্রিয় হইয়া পড়েন। হয়ত অজ্ঞানভাব প্রযুক্ত সে কর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু শ্বাশুড়ী হয়ত বধূর মনের সে নির্দ্দোষ ভাব গ্রহণ না করিয়া কোনও মন্দভাব গ্রহণ করতঃ মনে মনে যথেষ্ট কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। হয়ত ক্বচিৎ স্পষ্ট বলিয়া বধূকে শিক্ষাচ্ছলে ও ভবিষ্যতে বুঝিয়া চলিবার উপদেশ প্রদান করতঃ দুই চারি কথা শুনাইয়া দেন। বধূ যদি উপদেশ গ্রহণ না করিয়া শ্বশ্রূর কথায় বাদপ্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংসারে একটা ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী সমাজে এরূপ অশান্তিময় সংসারের যথেষ্ট সদ্ভাব আছে। বাঙ্গলার সামাজিক উপন্যাসকারগণও নাট্যকারগণ অনেকেই এরূপ অশান্তিময় বাঙ্গালী পরিবারের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাই হউক, বধূগণ একটু সংযত হইলেই আমাদের অশান্তিময় পরিবারের সংখ্যা আশাতিরিক্ত হ্রাস পাইতে পারে।

প্রথমতঃ যাহাদের 'বুক ফাটিলেও মুখ ফোটে না,' পরে তাহারাই যে গৃহকে অশান্তিময় করিয়া তুলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা, পরন্তু নিতান্ত ক্ষোভের কথা। ক্ষেত্র বুঝিয়া তাঁহাদের বাক্‌সংযমের পূর্ণ অভ্যাস থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীর স্বামিজন ইহজগতে ভগবৎ প্রেরিত বন্ধু। স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের সহিত অপরিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। উভয়ে হয়ত পরস্পরের কোন অজ্ঞাত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কোন শুভ মুহূর্ত্তে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হন, যুগ যুগান্তের সে পবিত্র বন্ধন কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না। শ্রীভগবানের এমনই খেলা যে ইহাদের পরস্পর শুভদৃষ্টি মাত্রেই এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। এই মায়ায় পড়িয়া কতহিন্দু স্ত্রী আপন অবস্থাকে শোকার্হা করিয়া রাখিয়াছেন, কত দেব সদৃশা নারী আপন দেবীত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা এ সমস্তই ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহাদের দেবীত্বের কথা স্মরণ করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে ও গৌরবে ভরিয়া উঠে। মহাকবির হাতে পড়িয়া ইহারা জগৎকে শিখাইয়াছেন।

"পতি র্হি দেবতা নার্য্যঃ পতির্বন্ধু র্জগদ্‌গুরুঃ।"

পতিই নারীর দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই জগদ্‌গুরু। ইহাদের চরিত্র চিত্রিত করিয়া নারী জাতিকে মহাকবি আরও শিখাইয়াছেন,—

"প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥"

(রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড, অ, ৫৮)

প্রাণপণ করিয়াও আপন ভর্ত্তার প্রিয়কার্য্য সাধন করা সতত বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য।

হিন্দুশাস্ত্রে পতির প্রিয় অনুষ্ঠানই স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পতির প্রতি কায়মনোবাক্যে অনুরক্তিই তাঁহাদের 'সতী'ত্বের একমাত্র নিদর্শন। ইহাতেই তাহাদের কীর্ত্তির চিরপ্রতিষ্ঠা—ইহাই তাঁহাদের পরম সুখের নিদান। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"পতি প্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥"

যে স্ত্রী আচারবতী ও সংযতেন্দ্রিয়া পতির প্রিয়, হিতকর কার্য্যে সতত আপনাকে নিযুক্তা রাখেন তিনি ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তিশালিনী ও পরলোকে অনুপম সুখভাগিনী হন।

আপন কর্ত্তব্য পরায়ণতার আরও শত নিদর্শন থাকিলেও এই একটি পরম কর্ত্তব্যের উপেক্ষার জন্য নিজকে নিরয়গামিনী হইতে হয়। শত পুণ্য সঞ্চয় করিলেও এই একটি মাত্র পরম কর্ত্তব্যের অপালন হেতু অন্য সমুদয় পুণ্যরাশি ডুবিয়া যায়। অকীর্ত্তি আপন মস্তকের উপর স্বকীয় প্রভুত্ব স্থাপন করে। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য,—

"অকীর্ত্তি নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তি র্লোকেষু পূজ্যতে।"

রামায়ণ।

অনেকে নানা তীর্থযাত্রাদি করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে প্রয়াস পান। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তীর্থ গমন দ্বারা পাপের প্রক্ষালন হয় না। অনাচারযতীর তীর্থ স্নানাদি নিষ্ফল। স্বাচারা 'সাধ্বীর' তীর্থে স্নানাদি করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। তীর্থযাত্রা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে পতির

পাদোদকপান দ্বারা তীর্থ স্নানাভিলাষিনী নারীর কামনা সিদ্ধ হয়। পতিই নারীর পরম দেবতা।

মহর্ষি অত্রি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ব্বা প্রয়াতি পায়ংপদম্॥"

যে নারী তীর্থস্নানে অভিলাষিনী হন, তিনি পতির পাদোদক পান করিবেন। ইহাতেই শিবলোক বা বিষ্ণুলোকে যাইবার অধিকারিণী হইয়া থাকেন। ইহাতে তাহার সতীত্বের পূর্ণ মাহাত্ম্য।

সতীত্ব মাহাত্ম্য সর্ব্বদেশেই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কি ভারতবর্ষে কি আমেরিকায়, কি এশিয়াখণ্ডে কি ইউরোপে প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই সকলে সতীত্বের পূজা করিয়া থাকেন। জগতের অত্যুন্নত সুসভ্য সমাজে কি অসভ্য পার্ব্বতীয় প্রদেশের নিভৃত পল্লীতেও সকল স্থানেই শতমুখে সকলে সতীত্ব মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন। পতি প্রাণতা ও স্বামীর অনুবর্ত্তিতার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ মালার যে দেশে চিরকালই বাহুল্য সে পুণ্যস্থান ভারতবর্ষ ইহার আদর্শ হারাইলে ভারতের অবনতিরই সূচনা। অসতী নারী হিন্দুর—হিন্দুর কেন? সমগ্র জগতের মহিলা কুলের কলঙ্ক।

পাতিব্রত্যধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন,—

"অনুকুলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী।

যে স্ত্রী স্বামীর অনুকুলতাচরণ করেন, যিনি স্ত্রীর কার্য্যাদি করিতে সুদক্ষা, যিনি সাধ্বী, যিনি দুষ্টবাক্য ব্যবহার করিতে জানেন না, যিনি সতত প্রিয়বাদিনী সুমিষ্ট বাক্যই যাহার জিহ্বার ভূষণ, যিনি আত্মগুপ্তা ও পতি পরায়ণা, তিনি সামান্যা মানবী নহেন—তিনি স্বর্গের দেবতা।

মহর্ষি আবার বলিয়াছেন,—

"অনুকুলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈ যুক্তা শ্রীবের স্ত্রী ন সংশয়ঃ॥"

যে স্ত্রী এই গুণরাজির দ্বারা বিভূষিত তাঁহাতে আর লক্ষ্মীদেবীতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহাঁরা অভিন্ন। কেহ এরূপ স্ত্রী পাইলে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বগৃহে বিরাজমানা এরূপ মনে করিতে পারেন। বাস্তবিক—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥"

মনু।

এরূপ আদর্শকে কে পায়ে ঠেলিয়া অবমাননা করিতে চাহে?

স্ত্রী স্বামির মনোভিলাষ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী আপনার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাতেই পত্নীর ধর্ম্ম পালন হয়। ইহাতেই পত্নীর পত্নীত্ব।* মহর্ষি দক্ষ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোহনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রম সমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥" ৪।১

বাস্তবিক বলিতে গেলে,—

"অকুকূল কলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।
প্রতিকূল কলত্রস্য নরকোনাত্র সংশয়॥" ৪।৫

পত্নী দিয়াই পুরুষের গৃহ। পত্নী যদি স্বামির ছন্দোহনুবর্ত্তিনী হন, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের সহিত অন্য কোনও আশ্রমের তুলনা হয় না।

যাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা স্বাভিমতানুকূল, তাঁহার নিকট এই পৃথিবী ও স্বর্গের কোনও প্রভেদ নাই। যাঁহার স্ত্রী আপন মতের প্রতিকূলতাচরণ করেন, তাঁহার নিকট এ পৃথিবী নরক স্বরূপ।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে,—

গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।

সুখের জন্যই লোকে গৃহস্থাশ্রমাবলম্বন করে, সংসারে যাহা কিছু সুখ শত্নীই তাহার বিধাত্রী। তাই কবি বলিয়াছেন,—

When pain and anguish wring the brhn, A ministering angel than?

'সাধ্বী' স্ত্রী পতির কেবল 'সহধর্ম্মিণী' নহেন, সর্ব্ব বিষয়ে পতির সহচারিণী হওয়াতে তাঁহার কর্ত্তব্য এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি। পতির সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে স্ত্রীর সাহায্য মাত্রই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য নহে—পরন্তু পতির ভ্রম-সংশোধনও তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। পতি অনেক সময়ে মোহ বশতঃই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিয়া বসেন। সর্ব্বদাই

* সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী।

প্রকৃত পথে থাকিয়া জীবনের চালনা করিতে পারিবেন, এমত কেহও আশা করেন না। একজন বন্ধু যদি সতত ভ্রম সংশোধনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। বিবাহিত জীবনে স্ত্রী অনেক সময়ে এইরূপ বন্ধুর কাজ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। স্বার্থের খাতিরেই হউক, অথবা স্ত্রী জাতির পরোপকারেচ্ছার স্বাভাবিক গতি নিবন্ধনই হউক তাঁহারা পতির—পতির কেন জগতের যে কোনও আত্মীয়ের—কোনও রূপ অনিষ্ট সাধন হইতেছে, দেখিতে পাইলে তাহাতে যত্নবতী না হইয়া পারেন না। ইহা তাহাদের আজন্ম ধর্ম্ম। ইহা মাতৃজাতির আভিজাত্যের মূল কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। চারিদিকের দুঃখরাজি যখন আপন ভীষণ মুখব্যাদন করিয়া মানুষকে উদরস্থ করিবার চেষ্টা করে, দারিদ্র বা নৈতিক অবনতি যখন মানবকে সামান্য ক্রীড়নকের ন্যায় আচরণ করিতে থাকে, তখন পতি স্ত্রীর সান্ত্বনা বাক্য পাইলে আপনাকে ধন্য মনে করেন। স্ত্রীর নিকট সান্ত্বনা পাইলে দারিদ্রও অকুণ্ঠিত চিত্তে আলিঙ্গণ করিবার যোগ্য হয়, স্ত্রীর উপদেশে জীবনের গতি অবনতির দিক্ হইতে উন্নতির দিকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এক কথায় স্ত্রীই পতির ভাগ্যের নিয়ন্ত্রী। যাহাতে নিজের প্রিয়তমের প্রিয় সাধন হয়, তদ্দিকে স্ত্রী সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। বেশী কি,—

"প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্য ভর্ত্তৃং কার্য্যং বিশেষতঃ॥"

ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,—

"ছায়েরানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিত কর্ম্মসু। ২৬।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।২৭।"

সাধ্বী স্ত্রী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিবেন। সতত পতির মঙ্গলচিন্তা ও তাঁহার আরব্ধ হিত কার্য্য নিচয়ে আন্তরিত সহায়তাচরণ করিয়া প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দেওয়া প্রত্যেক সাধ্বী হিন্দু রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আদিষ্ট কার্য্যের পরিসমাপণের সময় স্ত্রী দাসীর ন্যায় পতির আজ্ঞানুপালন করিবেন।

প্রকৃত আদর্শ পত্নী হইতে হইলে তাঁহাকে সতত পতির অনুবর্ত্তিনী হইতে হইবে। হিন্দু স্ত্রী কল্যাণ সাধনে মাতা, স্নেহ ভাগিনী, আদেশানুবর্ত্তিতায় দাসী হিত চিন্তায় ও তৎপরতায় বন্ধু। ইহাই হিন্দু পত্নীর আদর্শ।

সমাজে একমাত্র পতির প্রতি স্ত্রীর আপন কর্ত্তব্য সমাচরিত হইলেই যথেষ্ট হইল না। পতির প্রতি স্ত্রীর যাদৃশ কর্ত্তব্য আছে, পরিবারের সেইরূপ অন্য

সকলের প্রতিই স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহের সময় কন্যা কেবল মাত্র বরকেই দান করা হয় না। পরিবারস্থ প্রত্যেককে কন্যা দান করা হয়, একথা বলিলে দোষ বা অত্যুক্তি হয় না। এ কথার অর্থ—এই যে, পতির ন্যায় পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতিও যোষিৎকুলের কর্ত্তব্য আছে। শ্বশ্রূ শ্বশুর ননন্দ দেবর, দাস দাসী প্রভৃতি সকলেই গৃহিণীর নিকট অনেক আশা করেন। এক্ষণে তাহাদের প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য উক্ত হইবে।

বর্ত্তমানে দেবরগণের প্রতি ভ্রাতৃ বধূর কর্ত্তব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক।

পতির অগ্রজ ও অনুজ উভয়েই দেবর নামে পরিচিত। ইহাদের প্রতি বধূর গুরু কর্ত্তব্য আছে। পাশ্চাত্য সমাজে একান্নবর্ত্তি প্রথার তাদৃশ প্রচলন নাই। সুতরাং তথায় দেবরগণের প্রতি ভ্রাতৃবধূর কর্ত্তব্যের গণ্ডী অতি সঙ্কীর্ণ, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে একান্নবর্ত্তি প্রথার প্রচলন আছে, সুতরাং এখানে ভ্রাতৃবধূর কর্ত্তব্য সীমা বদ্ধ নহে। একান্নবর্ত্তিপ্রথার সমালোচনা এখানে করিবার আবশ্যক নাই। অর্থনীতি বিজ্ঞানের হিসাবেও অন্যান্য দিক দিয়া দেখিলে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। সমাজতত্ত্বজ্ঞগণ কেহ কেহ এই প্রথাকে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এই প্রথা বিদ্যমান না থাকিলে, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত অথবা রামের ন্যায় অনুজ বৎসলের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য সমাজের ইতিহাসে কখনও এরূপ দুইটি চিত্রের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাউক, তাহার আলোচনার বিশেষ কোনও প্রাসঙ্গিকতা নাই।

একান্নবর্ত্তিতার বিদ্যমানতা হেতু দেবর ননন্দী প্রভৃতির স্ত্রীর দায়িত্ব গুরুতা লাভ করিয়াছে। পতির যিনি অগ্রজ, যিনি পতির নিকট গুরু ও পিতার ন্যায় সতত সম্পূজ্য, তাঁহার অবমাননা হইলে বা তাঁহার সেবায়, তাঁহার প্রতি কোনও রূপ ত্রুটি হইলে তাহাতে পাপ সমাচরিত হইয়া থাকে। আপন ভর্ত্তার যাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, ভর্ত্তার সহচারিণীর তাঁহার প্রতি কোনও রূপ, বিশেষ কোনও রূপ কর্ত্তব্যের কল্পনা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

কেহ কেহ দেবরকে একটু ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন, অন্ততঃ পারিবারিক উপন্যাসকারগণ এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে নিতান্ত অনভ্যস্ত নহেন। উপন্যাস যদি সমাজের চিত্র হয়, তবে ইহাও অনেকাংশে সত্য। পতির সহিত স্ত্রীর

চির সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। যখন হিন্দু সমাজে স্ত্রী একজন অপরিচিত যুবককে পতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতে পারেন, তখন তাঁহারই—পতির ভ্রাতাকে কেন তিনি ঈর্ষার চক্ষে দেখিবেন, তাহা কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষকে পতি বলিয়া আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা যদি স্ত্রীর থাকে, তবে তাঁহারই সোদরকে ভ্রাতৃবধূ কেন ঈর্ষার চক্ষে দেখিবার কোনও যুক্তি নাই। দেবরকে নিজের স্নেহ বা ভক্তির বশ করিতে ভ্রাতৃবধু অনায়াসেই পারেন। ইহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত নহে।

সাধক সঙ্গীত।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

কে চায় তোমার দয়া শিবে (!)।
(কা'রে) লোভ দেখা'য়ে ভুলাইবে (?) ॥
পরের দুঃখ দূর করাকেই দয়া বলে সবাই ভবে।*
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ," তা'রেও কি মা পর ভাবিবে (?) ॥
দুঃখে প'ড়ে মায়ের দ্বারে পুত্র গিয়ে ধর্ণা দিবে।
আহা যেন জ্ঞাতির কাছে মাতৃদায়ের গাঁতি জানা'বে (!) ॥
(আমি) চাইনে দয়া কর্‌বে দয়া (?)
(একি) ভিখারীরে ভিক্ষা দিবে (?)
(আমার) যোটে না কি কলসী দড়ি, গলায় দিয়ে মর্‌তে ডুবে (?)
সুখে দুঃখে 'মা' 'মা' বলি (এটা) মায়ের ইচ্ছাই মন বুঝিবে।
(আমার) তা'তেই শান্তি, তা'তেই তৃপ্তি, অশান্তি যে ভিক্ষা ভেবে ॥
"ভিক্ষায়ং নৈব নৈবচ" সার বুঝেছি ভবের ভাবে।
রাজরাজেশ্বরীর পুত্র শ্রীপদ তায় না মজিবে ॥

---

* যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে।
ইচ্ছা ভূমিসুরঃ শ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥

বলিদান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এচ, জি, টী।

বলিদান কি? আমরা সাধারণতঃ বলিদান বলিলে কি বুঝিয়া থাকি? বলিদান বলিতে আমরা বুঝি যে,—কোনও জীবকে দেবোদ্দেশ্যে হনন বা বধ। যেমন—কালী বা শীতলা দেবীর তৃপ্তির জন্য পাঁঠা বা পুরুষ ছাগল কাটিয়া নিবেদন বা উৎসর্গ করা।

আচ্ছা এত প্রাণী, এত দ্রব্য থাকিতে মা কালীর বা শীতলা দেবীর এই বাক্‌শক্তিহীন ছাগ-শিশু ভোজনে এত প্রীতি কেন? আবার দেখিতে পাই, সকলেই এই সমস্ত দেবীকেই আমরা জগন্মাতা বা মহামায়া বলিয়া, দয়াময়ী বলিয়া, উক্ত দেবীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। কিন্তু মাতৃগণ যদি জগন্মাতা; তবে ক্ষুদ্র ছাগ শিশু কি জগৎ ছাড়া কিম্বা ঐ ক্ষুদ্র জীবেরও কি সেই জগন্মাতাই—উহার মা নন? জগন্মাতার প্রীতি অপ্রীতি ত কিছুই নাই। তাঁহাদের বা তাঁহার প্রীতি কেবল মাত্র জীবগণের ভক্তিতে বা নমোর্চ্চারণে, তিনি ত ঘুস প্রার্থী নয়। তিনি সকল জীবকেই, তাহাদের অভাব পূরণার্থে যাহার যাহা প্রয়োজন সমস্তই দিতেছেন; তদ্বিনিময়ে চান কেবল মাত্র জীবগণের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠা ভক্তি।

তবে আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিদান করি কেন? আত্মতৃপ্তির জন্য, তাঁহার প্রীতির জন্য নয়। আর এক কথা, তিনি ছাগ শিশুর প্রার্থী নন, আমরাই স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ছাগ শিশুকে বলি দিয়া থাকি। কিন্তু তিনি যে, ছাগ শিশুর প্রার্থী, আমরা ত সে ছাগ শিশু দিই না। আমরা বিপরীতার্থ গ্রহণ করি। তিনি ছাগ অর্থে যাহার লঘু গুরু জ্ঞান নাই, সেই মনের অসদিচ্ছারূপ কাম ছাগের বলি অর্থাৎ ত্যাগ বা দমন প্রার্থী। আমরা ঠিক তদ্বিপরীত, কামনারূপ ছাগের পরিবর্ত্তে জীব ছাগ শিশুই বলি দিই। শিশু অর্থে অঙ্কুর অর্থাৎ অসদিচ্ছা মনে আসিবা মাত্র সেই সময় মা ব্রহ্মময়ী বা জগজ্জননীকে মনে মনে স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করা উচিৎ যে, "হে মাত! আমার এই পাপপূর্ণ কলুষিত কাম ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর, তৎপরিবর্ত্তে সদিচ্ছারূপ রোগ মুক্তি প্রদান কর। "কিন্তু হায়! আমরা কি এ ভাবে কোন দিন মাতৃগণের শ্রীচরণে

প্রার্থনা করি? তাই না আমাদের এই দারুণ দুর্ব্বিসহ শোক-তাপ রোগ যাতনার তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হয়।

আমরা ত স্পষ্টই দেখিতে পাই, কলির জীব নানা প্রকারে নানা ভাবে পাপসাগরে মজ্জমান। মায়ের অপরাধ কি? আমরা যে যেমন কর্ম্ম করিতেছি, সেই রূপই ত ফলভোগ করিতেছি। যে যেমন ভাবে সাধনা ক'রে যে, যে বস্তু চায় তাইত পাইতেছে। যে খারাপ ইচ্ছা পূরণ করিতে মায়ের নাম নিচ্ছে, সে ভাগও ত' চাইতে পারে, কিন্তু চায় কয় জন?

আমাদের ভাবা উচিৎ নয় কি? "আমার একমাত্র শিশু সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় পীড়িত; আমি তখন সেই শিশুকে বাঁচাইবার জন্য—কেন জগন্মাতার ছাগ সন্তান জগন্মাতার প্রীত্যর্থে বলি দিব মানস করি?" মা যে জগন্মাতা, তিনি কি তাঁহার এক সন্তানকে বাঁচাইয়া আর এক সন্তানকে খাইতে চান? এই জন্যই ত' বেশীর ভাগ আমার সেই একমাত্র সন্তান অকালে কাল কবলিত হয়। যদিই বা কখন কখন দেখি, কোথাও কাহার সন্তান রোগমুক্ত হয় বটে, কিন্তু সে কি মায়ের দয়ায়? সে তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই রোগমুক্ত হয়। তখন আমরা মনে করি যে, মায়ের দয়ায় বাঁচিয়াছে; দাও একটা দুর্ব্বল পশু বলি। কিন্তু এ বলি কি বলি? এ প্রকারান্তরে আত্মতৃপ্তি, ভ্রাতৃ-হত্যা ভিন্ন আর কি? প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে ত বটেই।

আমরা বেশ জানি যে, মা কালী বা মা শীতলা ত' পাঁঠা খাবেনই না; খাব আমরা নিজে আর যারা উহা খাইয়া রসনার তৃপ্তি করে।

তাই বলি যে, ছাগ শিশু আমাদের ভাষায় বঞ্চিত, সেই নীরিহ ছাগ বলি মা দিয়ে প্রকৃত যে, কুবাসনারূপ কাম ইচ্ছা, সেই কামনাকে নিয়ে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে সত্য সনাতনী মহামায়ার নিকট প্রকৃত কামছাগ বলি দিই এস। দেখিবে তাহাতে মা জগন্মাতা আমাদের উপর সদয়া হন কি না? তা যদি না হয়, তবে তিনি কখনই দীন দয়াময়ী "মা" নন। তিনি রাক্ষসী। মা কখন রাক্ষসী হ'তে পারেন না, মা চিরদিনই মা। যে কেউ হ'ক বে, মন প্রাণ এক করে বল্‌বে,—"মা তুমি বলি প্রিয়া যদি তবে লও মা আমার প্রাণের অসৎ কামনা, প্রেমহীন কামনারূপী ছাগশিশু লও। মা! এ ভিন্ন আমি তোমার ছাগ সন্তান তোমায় কি বলে নিবেদন ক'রে দেব। তাই বলি মা যদি তুমি এই দীন হীনের কামনার ফাঁস, বাসনার ছাঁদরূপ আমার অভক্তি ছাগল শিশু বলি নাও। তা ছাড়া এ জগতে তোমাকে দেবার মত অন্য বলি

কোথায় পাব? মা গো! তুমি জগৎ জননী,—আমার পুত্র—আমার স্ত্রী—আমার বিষয় বৈভব বলে ত' কিছুই নাই; এ সকলই ত' তোমার। তোমার জিনিস তোমায় আর কি দিব মা? তাই বলি মাগো! এই কু-মনের কাম ইচ্ছারূপ দুর্জ্জয় অজা গ্রহণ কর জননী।" এই ত' প্রকৃত বলিদান। এ ছাড়া কি আর অন্য বলি হ'তে পারে? তাই বলি মা আজ এই দীনের এই কামনা রূপ বলিদান গ্রহণ কর মা।

"নমস্তে সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
স্বরেন্নিত্যং ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী দেবী নমহস্তুতে॥"

ত্যাগী বিশ্বপতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

একি হেরি বিশ্বরাজ, কেন হেন ভিক্ষু সাজ,
কেন আজি ছিন্ন ঝুলি করে;
রাজবেশ পরিহরি, কেন ওহে ত্রিপুরারী,
করিতেছ ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে?
থাকিতে সুবর্ণ-দুল, কর্ণেতে ধুতুরা ফুল,
মাখিয়াছ ভস্মরাশি গায়!
বিশ্বজন তব প্রজা, তুমি সকলের রাজা,
তবে কেন ভূত পাছে ধায়!!
আছে তব স্বর্ণহার, তবে কেন ফণীহার,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে তব দোলে,
অমৃত করিয়া দান, গরল করিছ পান,
এই কিগো ছিল তব ভালে।
থাকিতে সুরম্য স্থান, শ্মশানেতে বাসস্থান,
নির্ম্মাণ করিছ পশুপতি,—

অদ্ভুত তোমার লীলা, জানি নাক' একি খেলা,
খেলিতেছ বিশ্বে বিশ্বপতি!

সমালোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মন্তব্য সহ। মূল্য চারি আনা মাত্র।

গত ১৯২৩ সালের ১৯এ আগষ্ট কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে, প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার বিশেষত্বগুলি বাঙ্গালী পাঠকের জানিয়া রাখা দরকার। চন্দ মহাশয় দত্ত মহশয়ের মন্তব্যসহ প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

জ্যোতিষ প্রসঙ্গ বা আকাশ রহস্য। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তকে সূর্য্য, সূর্য্যের উৎপত্তি বা নিহারিকাপদ, সূর্য্য একটি দ্বিতীয় প্রভাব তারামাত্র, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব, সৌর কলঙ্ক ও সৌরশিখা, সৌর জগৎ, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, দিবা ও রাত্রি, চন্দ্র, চন্দ্রের উপরিভাগ প্রভৃতি জ্যোতিষ প্রসঙ্গ সকল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক জটিল তত্ত্বের সুমীমাংসা করা হইয়াছে। আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

স্বপ্নাদ্য ঔষধ। মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, পুষ্পবন্ধ্যা, ঋতুবন্ধ্যা ও বাধকাদি যন্ত্রণাদায়ক স্ত্রীরোগ সমুহের শান্তির জন্য কালীঘাটের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রী৺কালী মাতার স্বপ্নাদ্য যে ঔষধ "জন্মভুমি পত্রে" বিনামূল্যে বিতরণের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে তাহার দ্বারা অনেকেই শুফফল প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা অবশ্য আনন্দের কারণ সন্দেহ নাই এবং এই নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য দাতা মহাশয়ও ধন্যবাদের পাত্র। যাহারা হাতে হাতে ঔষধ লইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কিছুই খরচ লাগে না কিন্তু দুরদেশের প্রার্থিদিগের জন্য ব্রাহ্মণকে ঔষধ পাঠান সূত্রে নিজ হইতে ডাক খরচা করিতে হয়, তাহা সদব্যয় হইলেও দাতার সাধ্যানুসারে তাহাতে একটু কষ্ট হইয়া পড়ে, সে জন্য আমরা সাধারণকে জানাইতেছি যে অতপর দুরদেশের প্রার্থিগণ পত্রের সহিত ⁄১০ ছয় পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে অবাধে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ল্ডস্‌টানিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রাতিমাখান সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৶০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ৷৶০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩১, [৪র্থ, সংখ্যা

১।	প্রণাম	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	৯৭
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৮
৩।	মরকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১০৪
৪।	ভাব প্রকাশ	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১১৫
৫।	প্রাচীন ভারতে তাড়িতবার্ত্তা	,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১১৫
৬।	আবাহন	শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিদ্যারত্ন	১১৭
৭।	শান্তি	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	১১৮
৮।	সাধক সঙ্গীত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	১২২
৯।	বক্রেশ্বর পথে	শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩
১০।	প্রাপ্তি স্বীকার	... ...	১২৮
১১।	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলোনোৎসব	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত	১২৮

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 19-10-24

জারমলীন

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
এলোমেলো হয়ে যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন
এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা: "জিজীবিষান"
টেলিফোন নং: ২৭১০ কলি:
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। } ১৩৩১ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ, সংখ্যা।

প্রণাম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

কাঁপাইয়া দিগন্তেরে বেজে উঠে শঙ্খ ঘণ্টা রোল,
সমস্বরে শতকণ্ঠে বলে ভক্ত হরি হরি বোল ;
বিশ্বপতি, হইতেছে সন্ধ্যারতি তোমার মন্দিরে,
নিঃস্ব আমি আসিয়াছি করিতে গো প্রণাম তোমারে।
আনি নাই পূজারতি মহা আয়োজন পুষ্প ফল,
একমাত্র এনেছি গো সাথে ল'য়ে নয়নের জল।
লও দেব লও অর্ঘ্য—অধীনের প্রাণের প্রণতি,
সার্থক করিয়া লও এই তুচ্ছ দান, বিশ্বপতি।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বেদান্ত বলেন, পরম ব্রহ্মের যোগ-নিদ্রার অবসানে তাঁহা হইতে মায়া প্রাদুর্ভাব হইয়া এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্ব মায়াময় ও স্বপ্নবৎ হইলেও ব্রহ্ম শক্তিই ইহার ভিত্তি। অজ্ঞান অন্ধকারে মানব মায়ার পরিকল্পিত পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। মানবের মনাকাশে জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইয়া সেই অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা তুরীভূত হইয়া যায়। মানব বিশ্বের প্রকৃত অস্তিত্ব অবগত হইতে পারেন, তখন তিনি দেখিতে পান জগৎ মায়াময় নহে, ব্রহ্মময়, জগতের সমুদয় পদার্থই ব্রহ্ম। বেদান্তবাদী ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "সচ্চিদানন্দ শিবোহং শিবোহং।" জ্ঞান দৃষ্টি প্রভাবেই তন্ময়ভাব আইসে, তাই প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান সাধক কমলাকান্ত বলিতেছেন, "ব্রহ্মই আমার অন্তরে বিদ্যমান, কিন্তু বাজীকর যেমন অপ্রকৃতের আবির্ভাবকে প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, প্রকৃতের অস্তিত্বকে গোপন করে, আমরাও সেইরূপ ব্রহ্ম বাজীকরের খেলা বুঝিতে না পারিয়া আপনার ও জগতের স্বরূপত্ব অনুধাবন করিতে পারি না। সাধক গাহিয়াছেন,—

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা যুন কারো ঘরে।
যা চাবে, সেই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুখে ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়োনা যে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হওনা মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজী এ সংসারে।
ওরে বাজীকরে চিন্‌লে না মন, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

প্রেম ও ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হয়। তৎসঙ্গে তন্ময় ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। হৃদয়ে তন্ময় ভাবের অঙ্কুর হইলে ভেদ জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম ভেদ, জাতি ভেদ থাকে না। মানব যেমন নিজ কথা

শুনিলে কর্ণপাৎ না করিয়া থাকিতে পারে না, পরমুখ নিঃসৃত তৎসম্বন্ধীয় বাক্য তাহার হৃদয়কে গুরুতর ভাবে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ঈশ্বরের নাম যে অবস্থাতে যে রূপে হউক, কর্ণগোচর হইবামাত্র, সাধকের চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হয়, উৎকণ্ঠা আইসে, তিনি ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়া সমাধিস্থ হন। প্রবাদ আছে, সাধক কমলাকান্তের অনেক স্থলে সেই তন্ময় ভাবের আবির্ভাব হইত। একদা তিনি কয়েক জন ভক্তের সহিত কোটালহাট হইতে তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে ছিলেন। দিবসপতি প্রায় অস্তগত অবস্থায় ধরাতলে পতিত। তাঁহার রক্তিম কিরণ মালা দিঙ্মণ্ডল, আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধক ও ভক্তবৃন্দ বড় রাজপথে চলিতেছেন। ভক্তদিগের মধ্যে কেশারাম ও বিশু সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, একজন মুসলমান সামান্য উত্তরীয় খণ্ড আসন স্বরূপ ভূমিতলে সন্নিবেশ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে নামাজ মন্ত্রে, উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের স্তুতিবাদ করিতেছেন। সাধক ভক্তবৃন্দের সহিত নামাজকারীর অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় প্রেমবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি তন্ময় ভাবাপন্ন হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। নামাজ শেষ হইল, কিন্তু সাধক তদবস্থায় রহিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেশারাম তাঁহার অধিক প্রিয় ছিলেন। কেশারাম তাঁহার সমাধিভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বভাব উপস্থিত হইল। সাধক মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

তারা না! যদি কেশে ধরি তোল তবে বাঁচি এ সঙ্কটে।
আমায় একূল ওকূল দুকূল পাথার, মধ্যে সাঁতার বিষম হল॥
সঙ্গী গুলো হলো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই,
(তোমায়) ধরতে গেলে, (তারা) আমায়
ধরে ডোবে, ডোবায় গেল প্রাণটা।
কমকলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ওমা! চরণ তরি শরণ দিয়ে, সঙ্গে লয়ে দেশে চল॥

সঙ্গীত শেষে মুসলমান কহিল, "আমি অনেক যায়গায় গান শুনেছি, কিন্তু এমন মিঠা গান কখনও শুনি নাই। তোমরা এখানে অনেক ক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিলে?" কেশারাম কহিলেন, "তুমি উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকিতেছিলে, আমাদের এই ঠাকুর তোমার নামাজ পাঠ শুনিয়া ভগবানের ভাবে

বিভোর হইয়াছিলেন। ইহার বাহিরের জ্ঞান লোপ হইয়াছিল।" নামাজকারী বলিল, "ভগবান এক, রাম, রহিম দোসরা নাই। যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে তোমাকে আমি ভালবাসিব, এ সোজা কথা। এই ঠাকুর ভগবানকে ভালবাসে, তাই ভগবান একে ভালবাসে। বাবা মানুষেই সব আছে, মানুষেই পীর পয়গম্বর হতে পারে। এ ঠাকুর বড় বড়িয়া লোক।" কথিত আছে, "সেই মুসলমান তদবধি প্রায়ই কোটালহাটে সাধকের নিকট আসিত ও সাধককে বড় ভক্তি করিত।" কেণারামের কোটালহাটে অবস্থান কালে তিনি তথায় যাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অমরার গড়ে নিজ বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রকাশ করেন। সেই সকল ঘটনা এখনও কিম্বদন্তীরূপে জীবিত আছে। তাহার মধ্যে দুই একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

সাধক গাহিয়াছেন,—"তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেমনে।" দ্বৈতভাবে বিমলা ভক্তি ও বিশুদ্ধ আনন্দের বিঘ্ন হয়। সাধক বাহিরে শাক্ত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া অনুমিত হইলেও ধর্ম্মরাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী যে কোন স্থানে অহোরাত্র কি ত্রিরাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইত, কিম্বা যে কোন স্থানে মহোৎসব ও রক্ষা কালীর পূজাদি হইত, সর্ব্বত্রই সাধকের অধিষ্ঠান হইত। তিনি সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের শিরোমণি রূপে গৃহীত হইতেন। হরিনাম-মধুরস-মুগ্ধ-ভক্ত-অলি বৃন্দের গুঞ্জনে কোলাহল মুখরিত হইলে, প্রেম পরিপূর্ণ কৃষ্ণ সঙ্গীত সাধকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সকলকে প্রেমোন্মত্ত করিত। সাধকের রচিত অনেক গুলি সুললিত ভক্তিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গীত আছে। গৌর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গ্রাম পল্লী টলমল করিলে, সাধকের টলমল ভাব আসিত। অনেক সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শ্যামার চরণে সমাধি হইতেন। কথিত আছে, কোটালহাটে একজন স্বর্ণকার ছিল। তাহার বাটী সাধকের কালী বাটীর অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। স্বর্ণকারের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল। সে স্বকর্ম্মে নিরত থাকিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদির সংস্কার সময়ে, হাতুড়ীর প্রতি আঘাতে তাল দিয়া শ্যামা সঙ্গীতে সুখী হইত। সাধকের শয়ন গৃহ হইতে তাহার সঙ্গীত সুস্পষ্ট ভাবে শোনা যাইত। অনেক সময় তাহার সঙ্গীত শ্রবণে সাধকের নয়ন বারি বিগলিত হইত, কখন কখন তাঁহার সমাধি ভাব আসিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর স্বর্ণকার সাধকের নিকট আসিয়া তাহার চরণ দর্শন করিয়া যাইত। যে দিন যুবরাজ প্রতাপচাঁদ সাধকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে, স্বর্ণকার

সাধকের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। সাধক তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "এ ব্যক্তি সর্ব্বদা জগদম্বার গুণানুকীর্ত্তনে সুখী হইয়া থাকে।" কেণারাম কহিলেন, "স্বর্ণকার! তুমি সুখী, তুমি প্রতিদিন ঠাকুরের চরণ দর্শন করিয়া সুখী হও। আমি দেখিতেছি, ঠাকুর তোমার প্রতি প্রসন্ন। সাধু সহবাসই সংসার সাগর উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমাদের অনুনয়ে তুমি আজ আমাদিগকে সঙ্গীত দ্বারা সুখী কর।" বিশু কহিল, "ইনি বেশ গান কর্ত্তে পারেন। কিন্তু নিজের দোকানে বসে, হাতুড়ীর তাল না দিলে, গানের বেশ সুবিধা হয় না। আমাদের ঠাকুর এর গান শুনে ঘুমিয়ে পড়েন।" কেণারাম কহিলেন, "ভগবান ভাবগ্রাহী, তিনি মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়া দেখেন না, অন্তরের ভাব দেখেন। আমাদের ঠাকুর ইহার বাহ্যিক ক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া অন্তরে প্রেমের ভাবে বিভোর হন।" স্বর্ণকার কহিল, "ঠাকুর, হাতুড়ীর আঘাতে আঘাতে তাল দিয়ে গান কল্লে আমার বড় মনঃসংযোগ হয়, তা না হলে বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়, গান কর্ত্তে ভয় করে। হাতুড়ী হাতে, সোণা রূপার পাত ধরে, তাল দিয়ে, গান কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে, আর আমার কোন দিকে মন যায় না। বুকের মাঝে ঐ কালীমার দুটী চরণের দিকে মন রেখে, আমি প্রাণ খুলে গান করি। দেবতারা বলতে পারেন, কেন! আমার অন্য সময়ে সে ভাব আসে না।" কেণারাম কহিলেন, "তুমি হাতুড়ীর মত হাতে তাল দিয়া, গান করিতে অভ্যাস কর, ক্রমে তোমার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এখন তুমি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া সঙ্গীত দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।" বিশু কহিল, "হাতুড়ীর তাল না দিলে, এর মুখে গান আদতেই বার হবে না, আপনার মিছে অনুরোধ। ঠাকুর কহিলেন, "হাতুড়ীর তাল দেওয়া বেশী কষ্টকর নয় বাড়ী নিকটে, হাতুড়ী ও একটা রূপার পাত আনিয়া আঘাত করিতে করিতে স্বর্ণকার গান করিতে পারে।" স্বর্ণকার ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজের দোকানে একটী রূপার পাত ও লৌহ খণ্ড আনিয়া, হাতুড়ীর তাল দিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিল,—

মন গরীবের কি দোষ আছে, তারে নিন্দা কর মিছে।
বাজিকরের মেয়ে (শ্যামা), তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে॥
শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনা ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে॥

আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটা থাকে, ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্ন, নৈলে কেন সার করেছে॥

স্বর্ণকারের সুমধুর সুস্বরে কালী বাড়ী আমোদিত হইতেছে, এমন সময় মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর কয়েকজন অমাত্য সহ কালী বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সুস্বরে আকৃষ্ট হইলেন, তাহার গমনে সঙ্গীতের বিঘ্ন হইবে বিবেচনা করিয়া সঙ্গীত শেষ পর্য্যন্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিলেন। সঙ্গীত শেষে জগদম্বার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিলেন। মহারাজা বাহাদুর বিশু প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমরা আপনাদের আনন্দের বিঘ্ন ঘটাইলাম। কে গান করিতে ছিলেন? তাঁহার কণ্ঠস্বর আমার সুমধুর বলিয়া বোধ হইল। লৌহখণ্ডে আঘাতের তাল দিয়া গান হইতেছিল, এখানে কি যন্ত্র নাই? কিম্বা যন্ত্র নিপুণ কেহ নাই?" মহারাজা বাহাদুর আসিবামাত্র স্বর্ণকার হাতুড়ী হস্তে একধারে দাঁড়াইয়াছিল। সাধক তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই ব্যক্তি গান করিতেছিল। ইহার বাস কোটাল হাট, আপনার প্রজা, জাতিতে স্বর্ণকার। সংস্কার বশত হাতুড়ীর তাল না দিয়া এ ব্যক্তি গান করিতে অক্ষম, আমার ইচ্ছায় ঐ লৌহখণ্ডের উপর হাতুড়ীর আঘাত করিয়া গান করিতেছিল। ইহার উদারতা আছে, ভক্তি শূন্য নহে।" মহারাজা বাহাদুর স্বর্ণকারকে বসিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণকার, আমি তোমার সঙ্গীতে প্রীত হইয়াছি। তুমি যন্ত্রের সহিত সঙ্গীত অভ্যাস কর, সুগায়ক হইবে।" ইহা কহিয়া রাজা বাহাদুর সাধককে কহিলেন, "আপনার অবর্ত্তমানে আমি এখানে সন্ধ্যার পর একদিন আসিয়া ছিলাম, কিন্তু এরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারি নাই, আজ আমি বিমলার অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শন করিতেছি। মায়ের প্রসন্ন বদন ও নয়ন যুগলের জ্যোতি নীল নভস্তলে শুক্র-তারার জ্যোতির ন্যায় দর্শন করিতেছি। আশ্রমের তরুরাজিরও ভাবান্তর অবলোকন করিতেছি। পূর্ণ শশীর উদয়ে আকাশ মণ্ডলের শোভা অতি বড় মনোরম হয়, কিন্তু অমানিশিতে সেই আকাশ মলিন ভাব ধারণ করে। আজ আপনার আগমনে এই আশ্রম গগন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন অনুভব করিতেছি। এখানে সকলই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এক বস্তুর অভাবে কাহারও রমণীয়ত্ব প্রতীয়মান হয় নাই। যাহা হউক আপনাকে সুস্থ শরীরে প্রত্যাগত দেখিয়া, আজ বড়

আনন্দ অনুভব করিতেছি।" সাধক কহিলেন, "মহারাজ! নিশ্চয়ই আপনার হৃদয় আমার সাক্ষাৎ জন্য অধিকতর প্রয়াসী ছিল, জগদম্বার দর্শন লাভ জন্য তাদৃশ ব্যাকুল ছিল না, তাই আপনি সদানন্দময়ীর প্রসন্ন বদন ও প্রকৃতি মণ্ডলীর চারুদেহ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভক্তি ও ভালবাসার অনুরূপ মানুষকে অবলম্বন করিয়া, হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই ভক্তি ও ভালবাসা যখন মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বশক্তিতে পতিত হয়, তখনই মানুষ সাকল্য লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা জগতের বন্ধন। জগদম্বা এখনও আমার সংসার বন্ধন ছিন্ন করেন নাই। আমি দেখিতেছি, আপনারাই আমার বন্ধন। এই কেণারাম চট্টোপাধ্যায় ও আপনাদিগকে ভুলিতে পারি না কেন? এ কথা আমি অন্তর্বাসিনী মহামায়াকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি।" সাধকের বাক্য অবসান হইবামাত্র, রাজা বাহাদুর মস্তিত বদনে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার নাম কেণারাম চট্টোপাধ্যায়?" কেণারাম আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার অনুগত প্রজা। আমরা আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক, গুণগ্রাহী নরপতির অধিকারে বাস করিয়া থাকি বলিয়া অহঙ্কার করি। আজ আমি আপনার দর্শনে আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি।" মহারাজা বাহাদুর মৃদুহাস্যে কহিলেন, "আমি আপনার দর্শনে আমাকে আপনাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি। যে হেতু আপনি এই দেবতুল্য মহাপুরুষের অধিক প্রিয়। নিশ্চয়ই আপনি আমা অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক, অধিক ভক্তিমান, অধিক উদার। মহাত্মারা মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া মানুষকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মানুষের বাহ্যিক বিভবের উপর ভ্রুক্ষেপও করেন না। গুরুদেব আপনার ভক্তি, প্রেম ও সঙ্গীত বিদ্যার পারদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন, এ জন্য আপনার দর্শন আশা আমার অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। জগদম্বার ইচ্ছায় তাহা পূর্ণ হইল, এক্ষণে আমার অনুরোধ কল্য আপনি গুরুদেবের সহিত, রাজবাটীতে গমন পূর্ব্বক আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।" কেণারাম মহারাজা বাহাদুরের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার পারদর্শিতা কিছুমাত্র নাই। ঠাকুর আমার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ আমার অশেষ দোষকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।" অনন্তর মহারাজা বাহাদুর কেণারামের বিবিধ পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক অমরারগড় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতি বাহিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ

মরকত-মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বয়ংবর যুদ্ধ।

মাধব সন্ন্যাসী হইবার পর পূর্ণ এক বৎসর গত হইয়াছে। রাজা অমর নাথের কন্যার স্বয়ম্বর। পূর্ব্বে এক স্থলে বলা হইয়াছে, মরকত মোহিনীর পাণি লাভের নিমিত্ত পাঁচটী পাত্র উমেদার। সেই পাঁচজনের মধ্যে তিন জন রাজ-পুত্র। যে দুই জনের রাজবংশে জন্ম নহে, তাহারা এই রত্নলাভে মনে মনে হতাশ না হইয়াও আপাততঃ বাহ্যতঃ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তিন জনের রাজ্যের নাম অথবা নিবাসের নাম এখানে গোপন থাকুক, কেবল তিন জনের তিনটী নাম পাঠক মহাশয়েরা অবগত হউন। বীর বরেন্দ্র, রাজ মহীন্দ্র, রাধানন্দ বাহু নরেন্দ্র।

মরকত মোহিনীর জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ইহাদের পরস্পর বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল; মরকত মোহিনী যখন বালিকা, তখনও ইহাদের বন্ধুত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই; মরকত মোহিনীর যখন যৌবনাঙ্ক সেই সময় তাহার রূপের প্রশংসা দেশে দেশে প্রচারিত হয়, রাজ কন্যাদের রূপ বর্ণনার সমাচার কেবল রাজপুত্রেরাই রাখিয়া থাকেন; প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় রাজপুত্রেরা প্রশংসিত রূপবতী রাজ কন্যাগণকে স্বচক্ষে দর্শন করিবার অভিলাষী হন, ঐ তিনটি রাজকুমার সেই শ্রেণীর নব প্রেমিক। তাহারা প্রত্যেকেই স্বচক্ষে মরকত মোহিনীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়াছেন, তিন জনেই মরকত মোহিনীর প্রেমে—পরিচিত-প্রেমে নহে,—প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ, বিমোহিত, উন্মত্ত প্রায়। প্রেমের প্রসঙ্গ অপ্রকাশ্য না হইলে, আপনাদের মধ্যে প্রকাশ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না; তিন জনেই তিন জনের মনোবাসনা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন; এইখানেই তাহাদের আশৈশব বন্ধুত্ব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, স্থূল কথায় মিত্রতা ঘুচিয়া শত্রুতা জন্মিয়াছে। মরকত-মোহিনীর পাণি গ্রহণের বিরোধে পরস্পর তিন জনের যদি যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা।

তিন বরের মধ্যে বীর বরেন্দ্রটি কিছু অধিক রসিক। রাজকন্যার নাম মরকত মোহিনী হইল কেন, বীর বরেন্দ্র এক দিন রাজ ঘটককে আহ্বান করিয়া সেই নিগূঢ় তত্ত্বটী জানিয়া লন। তত্ত্বটি কি, তিনি স্বয়ং তাহা বলিবেন না। আখ্যায়িকার অনুরোধে আমরাই তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া সেই নিগূঢ় তত্ত্বটী ভাঙ্গিয়া দিব। রাজা অমরনাথ আপন পট্ট মহিষীর সহিত একদা তীর্থ যাত্রা করিয়া ছিলেন; বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া রাজা রাণী শেষে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, রাজধানী হইতে যাত্রা কালে মহিষী গর্ভবতী ছিলেন, দুই এক মাস গর্ভ, কেহ জানিতে পারেন নাই, মথুরা, বৃন্দাবন ভ্রমণ কালে সেই গর্ভের উপচয় আরম্ভ হয়; হিমালয়ে মহিষী পূর্ণগর্ভা। রাজা যখন ধবলগিরি দর্শনে যান, সেই সময়ে সেই পূর্ণ স্থলে রাণী একটী সুকুমারী প্রসব করেন। ধবলাচলে এবং কাঞ্চনজঙ্ঘাতে পুরাকালের কোন কোন ঋষি নূতন নামে সম্ভাষণ করিতেন। সেই নাম মরকত শৈল। রাণী মরকত শৈলে সুকুমারী প্রসব করিয়াছেন, স্মরণার্থ রাণী নিজেই কন্যাটির নাম রাখেন, মরকত মোহিনী। যে কন্যার স্বয়ম্বর, সেই কন্যাই সুকুমারী মরকত-মোহিনী।

এইটি হইল পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বের কথা। মরকত কুমারী এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া। লোকে বলে, পৃথিবীতে তাঁহার রূপের তুলনা হয় না। এখন কার বঙ্গীয় কবিরা বলেন, বঙ্গীয় কাব্যের নূতন নূতন তুলনার সৃষ্টি করিতে হইবে: তিল ফুল, কমল ফুল, গৃহিণীর, মৃগ, দাড়িম্ব, বিল্ব, বিম্ব কোকিল, ভ্রমর, শশাঙ্ক, এ সকল উপমা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর নূতন নূতন রস রক্ষা করিতে পারা যায় না।

এত বড় নজীর হইতেছে, সুন্দরী কামিনীর রূপ বর্ণনা। তবে আর আমরা কি করিব? দুধে আল্‌তা, গেঁসারির ডাল, লালঠোঁট, এই প্রকার দুটী পাঁচটি নূতন সৃষ্টির সাহায্য লইলে প্রকৃত পক্ষে মরকত মোহিনীর রূপের পরিচয় দেওয়া যায় না! সেই পুরাতন গুলির মধ্য হইতে কতকগুলি বাছিয়া না লইলে মরকত মোহিনীর রূপ খানিকে প্রকৃত চিত্রে চিত্র করা দুষ্কর। তাহা যদি করা যায়, নূতন নূতন কবিবরেরা মহাকবিরা মহা ঘৃণায় মুখ বাঁকাইবেন, কেহ কেহ হয় ত ক্রোধে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবেন, সুতরাং আমরা মরকতের রূপ বর্ণনায় বিরত রহিলাম।

মরকত মোহিনী পঞ্চদশ বর্ষীয়া। এই মরকত মোহিনীর পাণি লালসায় তিনটি রাজকুমার পরস্পর যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা, কাজে কাজে সত্য

সত্যই যুদ্ধ বাধিল। এক কন্যার তিন বর, ইহা কখনই সম্ভব নহে, অতএব একাধিক প্রতিদ্বন্দিতে বিরোধ উপস্থিত হয়; ইহা বিচিত্র নহে, হিংসার বশবর্ত্তী হইয়াই পরিণয়াক্ষী বন্ধুতে বন্ধুতে ঐ নিদারুণ গৃহ যুদ্ধ।

স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে এক কন্যার জন্য পঞ্চ উমেদার দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দুইজন খারিজ হইয়াছেন, তিন জন বাহাল আছেন। পাঁচটি একসঙ্গে উপস্থিত থাকিলে এক প্রকার নলদময়ন্তীর অভিনয় হইত, শ্রীহর্ষ দেবের কল্পনার সহস্রাংশের একাংশ শক্তি আমাদের থাকিলেও নল দময়ন্তীর ছায়ার ছায়াও আমরা চিত্র করিয়া দেখাইতে পারিব না, অতএব পাঁচজন মানব উমেদারের মধ্যে অরাজ বংশীয় দুইজন আমাদের প্রতি সদয় হইয়াই আপনা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এখন কেবল তিন জনকে লইয়া কথা।

তিন জনেই সংগ্রাম, প্রায়বর্ষাবধি কাটা কাটি রক্তারক্তি। ভগবানের কৃপায় মূল তিনটির জীবন রক্ষা হইয়াছে। দুইজন পরাজিত, একজন বিজয়ী। যাঁহারা পরাজিত হইলেন, তাঁহারা মরকত মোহিনীর আশা পরিত্যাগ করিলেন না, স্বয়ম্বর সভা আহ্বানের নিমিত্ত রাজা অমরনাথের নামে দুই নাম স্বাক্ষরিত একখানি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিলেন।

পরিণয়াক্ষী রাজকুমারত্রয়ের গৃহ যুদ্ধ সময়ে রাজা অমরনাথের ভয় হইয়াছিল। পাছে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কেহ তাহার কন্যাটিকে হরণ করে, তাহাই তাঁহার ভয় ছিল। যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়াছে, অনেক পরিমাণে তাঁহার আশঙ্কার হ্রাস হইয়াছে, সেই সময়ে তিনি ঐ অনুরোধ পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন। প্রবোধের উপর প্রবোধ। রাজা বিবেচনা করিলেন, এখনও তিন জন। যুদ্ধে কাটাকাটি করিয়াও কেহ এ বাসনা পরিত্যাগ করিল না। দুই জন চাহিতেছে স্বয়ম্বর সভা, একজন চাহে হিন্দুর অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে এক প্রকারে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব্য, অসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, হিন্দু শাস্ত্র সম্মত এই অষ্টবিধ বিবাহের বিধি আছে; তাহার মধ্যে প্রথমের পাঁচটী নির্দ্দোষ,—অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে অসুর বিবাহ ক্রীত বিবাহের মধ্যে গণ্য। কন্যার পিতাকে ধন দিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহার নাম অসুর বিবাহ। যুদ্ধে জয়ী হইয়া বল পূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ। পৈশাচ বিবাহ কেবল জঘন্য বলাৎকার মাত্র। রাজা ভাবিলেন, আমার এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? তিন জনের মধ্যে বিজয়ী রাজকুমার যদি বলপূর্ব্বক আমার কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ

করে, তবে ত রাক্ষস বিবাহ হইবে। আমার বংশে রাক্ষস বিবাহ কখনও হয় নাই। সে কলঙ্ক আমার পক্ষে অসহ্য হইবে। দুই জন প্রার্থী স্বয়ম্বর সভা চাহিতেছে, তাহাই ভাল, তাহাই সৎ পরামর্শ!

রাজা অমরনাথ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করাই অবধারণ করিলেন। দেশে দেশে রাজগণ সমীপে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল। কোন দিন সভা হইবে, কোন দিন বিবাহ হইবে, সমস্ত পত্রে তাহা লেখা থাকিল। বিবাহের দিনও ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রম্ভাবতী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে, তিনটি রাজকুমারের মধ্যে কুমার বীরবরেন্দ্রটি কিছু অধিক রসিক। তাঁহার একটি উপনায়িকা আছে। দেখিতে বেশ সুন্দরী, বয়সও অল্প; নাম রম্ভাবতী! রাজপুত্র যেখানে যান, রম্ভাবতীকে সঙ্গ ছাড়া করেন না। এ রাজ্যে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, কিম্বা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তথাপি সঙ্গে আছেন রম্ভাবতী। নগরে একখানি উত্তম বাড়ী ভাড়া করিয়া রম্ভাবতীকে রাখা হইয়াছে। অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। প্রায় এক বৎসর যুদ্ধ হইয়া গেল, ইহার মধ্যে একবারও রম্ভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বীর বরেন্দ্রের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বয়ম্বরের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, বীর বরেন্দ্রের মনে নূতন আনন্দ জন্মিয়াছে; এই আনন্দের সময় মোহিনী রম্ভাবতীকে একবার দর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সন্ধ্যার পর উত্তম বেশ ভূষা করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিয়া কুমার বীর বরেন্দ্র বাহাদুর প্রাণ প্রণয়িনী রম্ভা দর্শনে চলিলেন।

রম্ভাবতীর গৃহ মনোহর সজ্জায় সুসজ্জিত, একখানি সাটিনের গদির উপর সাটিনের ঝালর দিয়া ঘেরা সুগন্ধ শয্যায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে রম্ভাবতী বিরাজ করিতেছে, গদী হইতে দশহস্ত অন্তরে হীরা কাটা সোণার আলবোলা বসিয়া আছে, মণি মণ্ডিত নলটি ভুজগাকারে বক্র হইয়া কামিনীর কমনীয় বিম্বো চুম্বন করি-

তেছে; অপরাপর সুগন্ধের সহিত আলবোলার ধুমের সুগন্ধ মিশ্রিত হইয়া গৃহটিকে আমোদিত করিতেছে, একটি সুন্দরী পরিচারিকা গদীর পার্শ্বে বসিয়া সুচিত্রিত মখমল মণ্ডিত তালবৃন্ত দ্বারায় সুন্দরীকে বীজন করিতেছে, আসনের দুই পার্শ্বে দুইটী সুন্দর সুন্দর মণিময় দীপে সুগন্ধ ঘৃতে রজতবর্ণ আলো জ্বলিতেছে, দেওয়ালের ছবিরা সেই আলোতে কতই যেন সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে, গৃহের শোভা চিত্ত চমৎকারিণী।

পরিচারিকার নাম সোহাগিনী। মুখস্পর্শী নলটি একবার নামাইয়া রাখিয়া ম্লান বদনে রম্ভাবতী কহিলেন, "সোহাগ! কতদিন আর এ দেশে থাকিব? মন আর এ রকমে বাঁধা থাকিতে চাহে না। যাহার আশ্বাসে থাকা তাহার আর সে দিন নাই।"

সোহাগিনী বলিল, "সত্য সে কথা। সত্য সত্য মন যেন হু হু করে। বৎসর ফিরিতে গেল, কুমারের ত দেখা নাই।"

রম্ভা। এখনও কি তুমি দেখা পাইবার আশা রাখ! সে আশা নাই। বিবাহ করিয়া সুখী হইবে, এখন কি আর রম্ভাবতীকে তাহার মনে আছে?

সোহা। অমন কথা আমি শুনিব না। তোমারে তিনি কখনই ভুলিবেন না। বিবাহই করুন, আর যাহাই করুন, রম্ভাবতী তাহার মাথার মণি চির দিন থাকিবেন, যতদিন বাচিবেন, রম্ভাবতীকে তিনি ভুলিবেন না। রম্ভাবতী যদি মান করেন, পায় ধরিয়া——

অশ্বের চাবুক হস্তে কুমার বীর বরেন্দ্র গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান। লজ্জায় রসনা কর্ত্তন করিয়া, সহচরী সোহাগিনী সুন্দরী অধোমুখে মৃদু হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

রম্ভাবতী আসন হইতে উঠিল না, যেভাবে ছিল, সেই ভাবেই থাকিয়া চঞ্চল-কটাক্ষে একবার যুবরাজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শ্লেষপূর্ণ বচনে কহিল, "এসো রসিকরাজ! কতদিন? আজিকার চন্দ্রের কোন্ দিকে উদয়?"

বচনের ভঙ্গি বুঝিতে সুরসিক রাজপুত্রের বিলম্ব হইল না। ধীরে ধীরে সুকোমল গালিচার উপর দিয়া গিয়া রম্ভাবতীর আসনের পার্শ্বে তিনি হাটু গাড়িয়া বসিলেন; এক হাটু গালিচায়, এক হাটু ঊর্দ্ধে, চাবুক গাছটি তখন তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

উভয়ে নিস্তব্ধ; মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া সোহাগিনীও নিস্তব্ধ। এমন সুখময় বিলাস-গৃহের এমন বিরস অবস্থা কতক্ষণ থাকিবে? প্রথমে মৌন ভঙ্গ

করিয়া বরেন্দ্র বাহাদুর কহিলেন, "রম্ভাবতী! তুমি কেমন আছ?" রম্ভাবতী কথা কহিল না। সোহাগিনীর অর্দ্ধ সমাপ্ত বাক্য সত্য হইল। রম্ভাবতী মান করিয়া বসিল। এ দেশের মানভঞ্জন যাত্রার দূতিরা কেহ সে সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকিলে এই মানভঞ্জনের পালাটা অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইতে পারিত, কিন্তু সে সুবিধা সে ক্ষেত্রে ঘটিল না, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ সুখে থাকুন, শ্রীমতী রাসেশ্বরী রাধাসুন্দরী সুখে থাকুন, তাঁহাদের সেই বৃন্দাবনের নিধুবনের দুর্জ্জয় মানভঞ্জন লীলাটি জগতের সর্ব্বদেশের প্রেমিক-পুরুষগণকে কামিনী মানব্যাধিবিনাশনের উত্তম অব্যর্থ মহৌষধ শিক্ষা দান করিয়াছে। কুমার বীরবরেন্দ্র বাহাদুর রম্ভাবতীর পায়ে ধরিলেন, অবগুণ্ঠন মধ্যে মুখ লুকাইয়া সোহাগিনী হাস্য করিল, রম্ভাবতীর কথা ফুটিল, কিন্তু মানের তেজটুকু সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইল না। নেত্রে কিঞ্চিৎ অশ্রু আনয়ন করিয়া, বিমুগ্ধকণ্ঠে রম্ভাবতী বলিল, "কেন তুমি আর এখানে আসিয়াছ? নূতন বিবাহ করিয়া নূতন রাণী পাইবে, নূতন যৌবনের অধীশ্বর হইবে! রম্ভাবতী তোমার কে? আমি এইমাত্র সোহাগিনীর সহিত পরামর্শ করিতেছিলাম, শীঘ্র এ দেশটা পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

বরেন্দ্র যেন প্রাণে ব্যথা পাইলেন, আপনার দুইখানি হস্তে রম্ভার দুইখানি হস্ত ধারণ করিয়া সজললোচনে কহিলেন, "রম্ভা! রম্ভা! তোমার বাক্যে আজ বিষ বর্ষণ হইল। তুমি আমার বক্ষে বিষবাণ নিক্ষেপ করিলে! তোমায় পরিত্যাগ করিয়া প্রেম-সংসারে কি লইয়া আমি সুখী হইব? প্রিয়তমে! তুমি আমার! চিরদিন তুমি আমার! ইহাই আমি জানি। তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা আমি জানিতাম না, এখনও জানি না। আমারে পরিত্যাগ করিয়া তুমি হয় ত সুখী হইতে পার, কিন্তু আমি পারিব না।"

রম্ভা। কেন পারিবে না? মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিয়া দুই রাজ্যে ইন্দ্রত্ব করিবে! তোমার সুখের অভাব কি?

বরেন্দ্র। দেখ রম্ভা! আর লজ্জা দিও না। এ বিবাহটা হইতেছে একটা পণের কথা। যে জিতিবে, সেই এ রাজকন্যা লাভ করিবে, এইরূপ একটা পণ ছিল! এখন আমি জয়ী হইয়াছি, কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া সকলকে দেখাইব, আমার পরাক্রম কত। বিবাহ কেবল সেই জন্য, প্রেমের জন্য নয়, আমার হৃদয়ে আর অন্য প্রেম ধারণের স্থান নাই, তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

রম্ভা। আচ্ছা রসিকরাজ! বল দেখি, তোমার সেই মরকত মোহিনী কি আমা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী?

বীর। সুন্দরী কি অসুন্দরী, তাহা কেবল চক্ষুই বলিতে পারে, রূপের কথা লইয়া প্রেমের বিচার হয় না। যে চক্ষে তোমারে আমি দর্শন করিয়াছি, সে চক্ষু অপর সুন্দরীকে সুন্দরী বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে লজ্জা পায়।

যুবরাজের বক্রোক্তির অর্থ বুঝিয়া রম্ভাবতী স্থির করিল, মরকত মোহিনীকেই অধিক সুন্দরী বলা হইতেছে। আবার তাহার মান উপজিল। আসন হইতে উঠিল না, রাজপুত্রের মুখের দিকেও আর চাহিল না। কথা কহিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইল। অভিমানে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মানময়ী রম্ভাবতী অধোমুখী, মৌনীবতী।

রাজপুত্র আদর করিয়া রম্ভার হস্তে তাম্বুল দিলেন, রম্ভা তাহা ঘৃণা করিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। রাজপুত্র রম্ভার ওষ্ঠে আলবোলার নলটী ধরিলেন। ক্রোধে বামহস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক রম্ভা তাহাও ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাজপুত্র তখন চতুর্দ্দিকে ধোঁয়া দেখিলেন। মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিব না, এ কথা যদি বলেন, শেষে মিথ্যা হইয়া যাইবে! মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিব, অথচ ভালবাসিব না, এ কথা যদি বলেন, রম্ভাবতী বিশ্বাস করিবে না, রম্ভাবতী পলায়ন করিবে। রম্ভাকে লইয়া এই হতভাগ্য বীর বরেন্দ্র আপনাকে যত সুখী মনে করেন, তাঁহাকে লইয়া রম্ভাবতী আপনাকে তত সুখী মনে করে না, বীর বরেন্দ্র তাহা জানিতেন না। যে সুখ তিনি ভাবেন, তাহা প্রকৃত সুখ নহে, সুখের স্বপ্ন মাত্র। সেই সুখস্বপ্ন এতদিন ভঙ্গ হয় নাই, এই রাত্রে রম্ভাবতী স্বয়ং সেই স্বপ্নঘোর ভঙ্গ করিয়া দিতে, এইরূপ লক্ষণ দাঁড়াইল।

রম্ভাবতী কথা কহিল। পূর্ব্বে যাহা কিছু শুনিয়াছিল, তাহা যেন কিছুই মনে নাই, এই ভাবে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমার! সত্যই কি তুমি মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিবে?"

রাজপুত্র কহিলেন, "পণে জিতিয়াছি, আর কেহ যদি প্রতিযোগী না দাঁড়ায়, মরকত মোহিনীর পতিত্ব স্বীকার করিব। হাঁ, ভাল কথা! নিশ্চয় ওটা নাই! রাজা অমরনাথ কন্যার স্বয়ম্বর-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন, স্বয়ম্বর-স্থলে কত শত রূপবান রাজপুত্র আসিবে, রাজকন্যা তন্মধ্যে কাহাকে গ্রহণ করিবেন, সেটা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে আছে!

রম্ভা। তুমি কি ইতিপূর্ব্বে মরকত মোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে?

বীর। করিয়াছিলাম!

রম্ভা। মনের ভাব কিরূপ বুঝিয়াছিলে? তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ?

বীর। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। আমাদের দেশে অনূঢ়া কুমারীর অনুরাগ বিরাগ বিবাহার্থী পুরুষের জানিবার উপায় নাই। কুমারীদের কথাই বা কেন, সাধারণ স্ত্রীজাতির অনুরাগ বিরাগ নিঃসন্দেহ অবধারণ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য।

রম্ভা। নিতান্তই যদি দুঃসাধ্য, তবে তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছ কেন?

বীর। পাগল হই নাই; পরীক্ষা করিতেছি।

রম্ভা। পরীক্ষা! কিসের পরীক্ষা? প্রেমের। তাহাই পাগলামী! স্ত্রীজাতির প্রেমের পরীক্ষা পুরুষে করিতে পারে না। স্ত্রীজাতির প্রেম স্ত্রীজাতিই পরীক্ষা করিতে পটু,—এটাও তুমি বুঝিতে পার না? নিশ্চয় তুমি পাগল হইয়াছ। কি বল, পাগল হও নাই! যদি হও নাই, তবে একটা বালিকার জন্য রণক্ষেত্রে তত রক্তপাত কে করাইল? কিছুই তুমি বুঝিতে পার না।

বীর। না পারিবার কথা। আমার মনঃপ্রাণ তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি, কেবল রম্ভাবতীই বুঝিতে পারি, আর কিছুই বুঝি না। সংসারের চতুর্দ্দিকেই দিবা রাত্রি আমি কেবল রম্ভাবতী দেখি।

রম্ভা। হাঁ, ঠিক! সেই জন্যই এই এক বৎসর বিচ্ছেদ! দেখ বরেন্দ্র, তোমার ঐ রকম ভণ্ডামীর জন্য আমি তোমারে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করি। মনে ছিল, একদিন তোমারে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। সেই দিন আজ।

বীর। (সচকিতে) তুমি আমারে কি করিতে বল?

রম্ভা। আমি বলি, তুমি মরকত মোহিনীকে বিবাহ কর, রম্ভাবতীর আশা পরিত্যাগ কর, রম্ভাবতীর প্রণয় যতটুকু তুমি লইয়াছ, সেটুকু ফিরাইয়া দাও। আমি অনুমতি করিতেছি, মরকত মোহিনীকে তুমি বিবাহ কর। অনুমতি করিতে পারি না, সুখ কদাচ উপরোধ অনুরোধের বশ নয়, আমি কেবল এইটুকু বলিতে পারি, বিবাহ করিয়া যদি পার সুখী হও।

বীর। (সবিস্ময়ে) একি রম্ভাবতী! তুমি কেবল বারবার টুকু টুকু টুকু টুকু বলিতেছ, সত্য কি আমি তোমারে একটুখানি প্রণয়ের অধিকারী হইয়াছি? সম্পূর্ণ প্রণয় সত্য কি তুমি আমাকে প্রদান কর নাই?

রম্ভা। (হাস্য করিয়া) তাই বলিতেছ, তুমি পাগল নও! তোমারে যদি সম্পূর্ণ প্রণয় প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের সেই লচমন সিংয়ের রাসভটীর জন্য কি রাখিব? তোমাতে আর গর্দ্দভে প্রভেদ কি?

বীর কুমারের প্রাণে এই পরিহাস সহ্য হইল না, তিনি সক্রোধে পার্শ্বস্থিত অশ্বকষায় হস্তে তুলিয়া লইলেন। নেত্র পালটিতে রম্ভাবতী সেই চাবুকগাছটা কাড়িয়া লইল; নাচাইয়া নাচাইয়া বলিল, "এ চাবুক যদি তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করে, তাহা হইলে অশ্বের অপমান হয়। এ চাবুক অশ্বের প্রবোধের জন্য, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে স্পৃষ্ট হইবার জন্য নয়।"

বীর বরেন্দ্র রম্ভাবতীর মুখে গর্দ্দভ হইলেন! যদিও কিছু কিছু ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, তিনি তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতে পারিলেন না! রম্ভাবতী একজন বারবিলাসিনী, সে কেবল একটী নায়ক লইয়া সুখী হইতে পারে না, মনে মনে সুখী ছিলও না, নূতন অছিলা পাইয়া রম্ভাবতী মনে মনে হাসিল, কুমারের চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, কিছুমাত্র ভয় পাইল না। তিরস্কার যতদূর করিবার, রম্ভাবতী বরেন্দ্রকে তাহা করিল, পরিশেষে চাবুক হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আসন হইতে নামিল, প্রস্থানের উপক্রমে আর একবার রাজপুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাবুক নাচাইয়া বক্রগ্রীবায় বলিল, "রাজপুত্র, বিদায়! বিদায়! রজনী প্রভাতে আর তুমি আমারে দেখিতে পাইবে না, হয় ত জন্মেও আর না।"

রম্ভাবতী পার্শ্বগৃহে প্রবেশের অভিপ্রায়ে অচঞ্চলে পার্শ্বদ্বারাভিমুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল, ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "দাঁড়াও! যে ভালবাসা এতদিন ছিল, তাহা তুমি স্বইচ্ছায় ছিন্ন করিলে, আমার অপরাধ নাই। আমি তোমারে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিতাম, এখনও বাসি, তুমি কিন্তু এইমাত্র নিজমুখেই বলিয়াছ, প্রণয়ের একটু অংশ আমারে তুমি দিয়াছিলে। হাঁ, স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। এখনও কেন তোমারে প্রাণ চায়, সেটি আমারে তুমি বলিয়া দিতে পার?"

এই সময়ে সোহাগিনী উঠিয়া রম্ভাবতীর হস্ত ধারণ করিল। রম্ভাবতী কিন্তু রাজপুত্রের শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, কিম্বা হয়ত ইচ্ছা করিয়াই দিল না। সোহিগিনীর লজ্জা কমিল, অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক কুমারের দিকে চাহিয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া সোহাগিনী দুই তিনবার হস্ত সঙ্কেত করিল, বাম হস্তে রম্ভাবতী হস্ত, দক্ষিণ হস্তে কুমারের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত।

পলায়নের জন্য রম্ভাবতী দুই তিনবার টানাটানি করিল। সোহাগিনী হস্ত ছাড়িল না। রঙ্গ দেখিয়া রাজপুত্রও দাঁড়াইলেন। নাটকের রঙ্গ ভূমির ন্যায় সেই দৃশ্যটী অতি শোভাময় হইল। কুমারকে সম্বোধন করিয়া রঞ্জিত বদনে সোহাগিনী বলিল, "রাজ কুমার! এইবার শিক্ষা কর; নায়িকা প্রেমের কত মহিমা, এই পরীক্ষায় তাহা তুমি শিখিয়া লও। তোমার বিবাহ হয় নাই, সংসার জ্ঞানে পরিপক্কতা জন্মে নাই, নায়িকা প্রেমে তুমি মোহিত হইয়াছিলে, যাহারা সংসারী, তাহারাও অন্তঃপুরের বাহিরে প্রণয় অন্বেষণ করে! তুমি যেমন রাখিতে পারিলে না, তাহারও সেই প্রকার প্রথম প্রণয় রক্ষা করিতে পারে না। নাম হয় নিশাচর, উপাধি হয় মাতাল আর লম্পট, তুমিও সেইরূপ নাম লইয়াছ, উপাধি লাভের অধিকারী হইয়াছ কিনা, তুমিই তাহা মনে মনে বিবেচনা কর।"

আমাদের পাঠক মহাশয়েরা কেহ যদি কখন এইরূপ নায়িকা প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সোহাগিনীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিবেন। হায়! হায়! প্রণয়ের কি দুরাবস্থা! যেখানে প্রণয়, সেই খানেই এইরূপ নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘটে, ইহা সকলে স্বীকার করেন না। সোহাগিনী বালিকা কাল হইতে রম্ভাবতীর সহচরী হইয়া আছে, অনেক দেখিয়াছে, অনেক শুনিয়াছে, অল্প বয়সেই এই সোহাগ যেন আমাদের পাকা ঠাকুর মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসারে যাঁহারা ঐরূপ নায়িকা প্রেমে পাগল, তাহারা সংসার ভুলিয়া যায়; বিবাহিতা ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা রমণীকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়া, হয় ত এককালে বিস্মৃত হইয়া, পরকীয়া প্রেমে বদ্ধ হইতে আকিঞ্চন পায়। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলিবেনা গণিকাপ্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইন্দ্রজাল জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

রাজ কুমার বীর বরেন্দ্র বাহাদুর তরুণ যৌবনে রম্ভাবতীকে পাইয়াছিলেন, রম্ভাবতী ভিন্ন জীবনে আর তাঁহার অপর প্রেমপাত্রী মিলিবে না, ইহাই তিনি জানিতেন, হৃদয়ের সমস্ত প্রণয় রম্ভাবতীকে তিনি দান করিয়া ছিলেন, সে প্রণয়ের বিনময়ে রম্ভাবতীর প্রণয়ের এক বিন্দুও তিনি পাইয়া ছিলেন কিনা, সন্দেহ। তাহা যদি পাইতেন, এত শীঘ্র এমন বিচ্ছেদ ঘটিত না। ঐ প্রকার ক্ষেত্রে কেহই তাহা পায় না, অথচ মাকড়সার ন্যায় অনেকেই আপনাদের জালে আপনারা জড়াইয়া মারা যায়। চক্ষের উপর শত শত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াও কুপ্রেমিকগণের চৈতন্য উদয় হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য!

রম্ভাবতীর সহিত বীর বরেন্দ্রের কলহ হইল। প্রেমের কলহ নহে, সে প্রকার কলহ প্রভাতের মেঘের ন্যায় অল্পক্ষণ স্থায়ী। আড়ম্বর অধিক, কার্য্য অল্প; এ সকল ক্ষেত্রে তাহা নয়, যেমন কলহ, তেমনি বিচ্ছেদ। রম্ভাবতীর সহিত এই রাজপুত্রের বিচ্ছেদ ঘটিল। সোহাগিনীর হাত ছাড়াইয়া রম্ভাবতী চঞ্চলপদে গৃহান্তরে প্রবেশ করিল, পূর্ব্ব প্রেমিকের মুখেরদিকে আর একটিবারও ফিরিয়া চাহিল না।

বরেন্দ্রের হৃদয় অত্যন্ত ভারী। তাহার বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার বক্ষে দুইখানা প্রকাণ্ড পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতের পাথর নয়, প্রণয়ের পাথর। পাথর দুখানা যেন বুকের ভিতর দুলিতে লাগিল। একদিকে রম্ভাবতী, অন্যদিকে মরকত মোহিনী। কোন দিকটা গুরু, কোন দিকটি লঘু, অবোধ রাজকুমার তাহা বুঝিতে পারিলেন না। থাক যদি কল্য আসিয়া দেখিব, সোহাগিনীকে এই কথা বলিয়া প্রেমিক নাগর সে রাত্রের মত বিদায় হইলেন। অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর বরেন্দ্র বাহাদুর পুনর্ব্বার রম্ভাবতী দর্শনে আসিলেন। সমস্তই ধোঁয়াময়! কোথায় রম্ভাবতী, কোথায় সোহাগিনী, কোথায় পরিচারক পরিচারিকাবর্গ, কোথায় গৃহ সজ্জা, কেহই নাই, কিছুই নাই, অন্ধকার! কেবল শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রাজপুত্র সেই অন্ধকার গৃহ দেখিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল, নেত্রকেন্দ্রে দুইবিন্দু অশ্রু দেখাও দিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল। রম্ভাবতী নাই! রাজপুত্র ভাবিলেন, রম্ভাবতীর প্রেম বিশুষ্ক, সে প্রেমে কিছুমাত্র রস ছিল না। সমস্ত রম্ভাবতীর প্রেমে রস থাকে না, এই বিরস তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, সংসারে বিলাসিনী বল্লভেরা যদি সতর্ক হইতে শিক্ষা করেন, বীর বরেন্দ্র যাহা করিলেন, তাঁহারাও যদি তাহাই করেন, গৃহস্থ সংসারের অনেকটা উপকার হইতে পারে। বীর বরেন্দ্র কি করিলেন? গণিকা-প্রেম অনিত্য জানিয়া মন্থর চরণে অন্ধকার বিলাস গৃহ হইতে বীর বরেন্দ্র পলায়ন করিলেন। গত রাত্রে চাবুক গাছটি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি আর পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন না। শূন্য হস্তে পলায়ন করিলেন। মনে জাগিল, এই শ্রেণীর কপট প্রেমিকারা ক্ষণে ক্ষণে অশ্বিনী, ক্ষণে ক্ষণে চাবুক।

ক্রমশঃ

ভাব প্রকাশ।

লেখক,— ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

কত যে উঠিয়া ভাব হৃদয় মাঝারে—
গুমরি মিলায়ে যেত ভাষার অভাবে।
শিশুর স্বপন প্রায়, কব তা কাহারে?
বৃথা চেষ্টা করে কবি ফুটাতে সে ভাবে।
ভাষার জনমদাত্রী ভাষা সোহাগিনী।
কে তুমি সৌন্দর্য্যময়ী কবি বিলাসিনী॥
উন্মুক্ত করিয়া দিলে সুমুখে আমার,
বিশ্ব-চিন্তা প্রকাশক ভাষার ভাণ্ডার?
চির মুক হৃদি মম উঠিল ফুকারি,
বিপুল হরষে পূর্ণ আবেগের তানে—
সুপ্ত হৃদি তন্ত্রী মম, উঠিল ঝঙ্কারি
তান লয় সমন্বিত ভাষা উৎস সনে,
মুক কবি তাই আজ নিতান্ত বাচাল।
রচে শুধু ভাব নাথ কল্পনার জাল॥

প্রাচীন ভারতে তাড়িত বার্ত্তা।

লেখক,— শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

তাড়িতের এক নাম বিদ্যুৎ। ইহার ইংরাজি নাম ইলেক্‌টিসিটি। বর্ত্তমান জগতে তাড়িত বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতি দেখা যাইতেছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তিতে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবের অশন, বসন, শয়ন, বিহার প্রভৃতি হেন কার্য্য নাই যাহাতে নিয়োজিত না করা হইতেছে। এখন ইহাকে এমন ভাবে কাজে লাগান হইতেছে যে, ইহার একান্ত আবশ্যকতা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই

অনুভব করিতেছি। এই তাড়িতপ্রবাহ এরূপ ভাবে ছোট বড় সকল কাজেই লাগিতেছে যে, ইহাকে আর বাদ দেওয়া চলে না। শুধু ইহাই নহে, ইহার অভাব ঘটিলে বহুকার্য্য করাই যায় না—বহু অসাধ্য সাধন এই তাড়িত করিয়াছে, এখনও করিতেছে এবং কে জানে ভবিষ্যতে আরও কি করিবে।

এক সময়ে মেঘাগমে গগনে তাড়িতের ক্ষণিক উজ্জ্বল বিকাশ ব্যতীত, এই তাড়িৎ আর দেখা যাইত না, এবং কোন বস্তুতে বজ্রপাত হইলে সেই বস্তুর দগ্ধাবস্থা দেখিয়া তাড়িতের ঐ একমাত্র দাহক্রিয়া ব্যতীত আর কোন ক্রিয়াই জানা ছিল না। তখন ঐ গগন বিহারী বিদ্যুতের যে অন্য অবস্থা আছে, ঐ অনুশীয় বিদ্যুৎকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় এবং তাহাকে যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা কেহই স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। মানুষ কায়মনবাক্যে কোন কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করিলে, হেন কার্য্য নাই, যাহা সে না করিতে পারে—কার্য্যে নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উহা ধরিয়া থাকিলে এক দিন না একদিন ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইবেই হইবে—ইহাই ঐশ্বরিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম।

যে তাড়িতপ্রবাহ এখন আমরা অবাধে ধরিয়া রাখিয়াছি এবং শান্ত শিষ্ট অনুগত আজ্ঞাবাহি ভৃত্যের ন্যায় যে প্রবাহকে আমরা ব্যবহার করিতেছি, সেই তাড়িতশক্তি সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দির পূর্ব্বে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পূর্ব্বে তাড়িতের যে কোন কার্য্যোপযোগিত্ব আছে, তাহা কেহ অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। পরে অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে তাড়িতশক্তিতে দূর হইতে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবিত হয়—টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হয়। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিদ্যুৎকে কার্য্যকরি করিয়া তুলিল। তখন ভারতের অবস্থা, ভারতের বিজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান লোপ পাইয়াছে; তাহার সত্যতাও মরণোন্মুখি। অবশ্য বর্ত্তমানেও ভারতের ঐ সকল অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই—এখন হইয়াছে এইটুকু যে, তাহারা তাহাদের প্রাচীনকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র—এখনও প্রাচীনকে চিনিবার মতও হয় নাই।

বলিয়াছি যে, ভারতের বিজ্ঞান লোপ হইয়া গিয়াছে। এই লোপ যে কত কাল হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ যুগেই অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বেই ইহার বিলোপ

হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানাদি লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনকার জ্ঞান ভাণ্ডারের কণিকামাত্র যে কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহাতেই আমরা সেকালের অনেক সংবাদ পাইতেছি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শুক্রনীতি বলিয়া একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। সে গ্রন্থের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে জানা যায় যে, সে খানি একটি বৃহৎ গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের একখানি চুম্বক পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম "শুক্রনীতি সার।" এখানিও ছোট গ্রন্থ নয়। ইহার শ্লোক সংখ্যা ২৫৬৭। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৩৬৭ শ্লোকে পাওয়া যায়,—

"অযুতক্রোশজাং বার্ত্তাং হরেদেকদিনেন বৈ।"

(একদিনে দশহাজার ক্রোশ দূরের সংবাদ গ্রহণ করিবে।) রাজা একদিনের মধ্যে দশহাজার ক্রোশ দূরের সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখিবার কথা। এতদূরের সংবাদ লোকের ডাক বসাইয়াও পাওয়া যায় না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সংবাদ গ্রহণ ও প্রচারের ব্যবস্থার কথার ইঙ্গিত হইল। ইহা যে টেলিগ্রাফের কথা তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। কেবল ইহা সাধারণ টেলিগ্রাফ কি অয়ারলেস টেলিগ্রাফ তাহা স্থির হইল না। ঐ সংস্কৃত শ্লোক যে তাড়িতবার্ত্তা জ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা একদিনে দশহাজার ক্রোশ দূরের সংবাদ কোন উপায়েই পাওয়া যায় না। নীতি গ্রন্থ কার্য্যের উল্লেখ করে, সঙ্কেতে বিষয় জানাইয়া দেয়, এই জন্য তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

আবাহন।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিদ্যারত্ন।

স্বাগত! বঙ্গ ভাষার সেবক আজি এ কুটীরে এস হে ভাই।
বঙ্কিম-স্মৃতি তাড়িত পূত তুলনা যে এর কোথায়ও নাই॥
এস হে সকলে ভরিয়া অঞ্জলি ভকতি অর্ঘ্য কর গো দান।
দুঃখ দৈন্য ভুলিয়ে সবে ছড়াও গগনে গভীর তান॥

বেদনা মথিত আনন্দ গানে, জাগাও চেতনা প্রতি প্রাণে প্রাণে—
সে স্বর লহরে আনন্দ সাগরে ধীরে ধীরে সবে ভাসিয়ে যাই।
উঠিল সেথানে গভীর নিঃস্বনে দেশাত্ম বোধের মধুর রোল।
নব্য যুগের পরম তীর্থ প্রতীচ্য প্রাচ্যে দিয়েছে কোল
স্বাগত! মনীষি এসহে ধীরে, পিছুপানে আর নাহি চেও ফিরে
এ নব তীর্থে আমরা সকলে হরষে মিলিব বাসনা তাই।
একদা হেথায় সে মহাপুরুষ মুক্তি মন্ত্র করিলা গান।
দীর্ঘ বর্ষ হইল অন্ত আজি সে মন্ত্রে ভরেছে প্রাণ—
বন্দে মাতরম্ মধুর ধ্বনি, স্বরগ হইতে সেই ধ্বনি শুনি
কল্যাণ আশীষে দানিছেন অভয় সে প্রাণের সাড়া সতত পাই।
পবিত্র এ রজ বঙ্কিম চরণ পরশি ধন্য ; আমরা আজ—
মাখিয়ে অঙ্গে হইব ধন্য, পরিব অঙ্গে মধুর সাজ—
কে আছ কোথায় এসহে ত্বরা এসহে ছুটিয়ে পাগলের পারা—
এ শুভ বাসরে থেকনা নীরব তাঁহারই বন্দনা যতনে গাই।*

শাস্তি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

(১)

"কি রকম জামা হয়েছে ?"

"কেন রহমন ?"

"এ জামা আমি নোবনা"—বলিয়া, রোষ কষায়িত নয়নে রহমান একবার শয্যাশায়িত বৃদ্ধ দর্জ্জি মহারব খাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং পরক্ষণেই জামাটাকে তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া পথে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল—তাহার আজ কি করিয়া পথ্য সংগ্রহ হইবে, তাহার কন্যাই বা কি আহার করিবে।

* বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে।

রহমন মজুরীর টাকা দিবে বলিয়াছিল—কিন্তু কই ত কিছুই দিল না। ঘরে যে একটীও পয়সা নাই।

রহমনের চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট ইত্যাদির কারবার। সে ইহাতে প্রভূত অর্থ অপার্জ্জন করে, জলের মত ব্যয়ও করিয়া থাকে। তাহাকে সকল সময়েই দেশী ধুতি ফুলদার চুড়ীদার পাঞ্জাবি, রিষ্ট ওয়াচ ও ষ্টিক হস্তে দেখা যায়। ইহার কখনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না। সকলেই তাহাকে পুরা দস্তুর বাবু ও ধনশালী বলিয়া জানে।

রহমনের কারবার গুদাম হইতে দক্ষিণ দিকে খানিকটা দূরে তাহার নিজ বসত বাটী, আর বামদিকে খানিকটা দূরে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ দর্জ্জি মহরব খাঁর জীর্ণ পর্ণশালা। এ কুটীরখানি তাহার নিজের নহে। সে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়া আজ প্রায় এখানে আট নয় বৎসর বাস করিতেছে।

যখন "জামা আমি নোব না"—বলিয়া রহমন মহারব খাঁর গাত্রে জামাটীকে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন মহারব খাঁর পার্শ্বে বসিয়া তাহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক কন্যা মতিয়া কি একটা সুচিকর্ম্ম করিতে ছিল।

মতিয়া রহমনের তীব্র বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। কিশোরী মনে মনে ভাবিল—যাহাকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসে তাহার এই পশুর মত কাজ! সে এত গর্ব্বিত! কেন? সে কি তাহাকে ভালবাসে না, কিশোরী আবার ভাবিল—না না; রহমন তাহাকে ভালবাসে—তবে? তবে? সে কেন তাহার মৃত্যু শয্যা শায়িত পিতাকে এরূপ ভৎর্সনা করিয়া গেল! সে ত বলিয়াছিল—আজ জামা তৈয়ারীর মজুরী দিবে—কইত কিছু দিল না। মতিয়ার অলক্ষ্যে তাহার বুক ভরিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। হায়! কি করিয়া আজ রাত্রে সে তাহার পিতার পথ্যাদি সংগ্রহ করিবে।

কিন্তু মতিয়াকে পথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইল না। জীবদ্দশায় তিন চারিটী পুত্র কন্যা ও প্রাণতুল্য সহধর্ম্মিণী হারাইয়া, তিন মাস কাল যাবৎ কাসরোগে ভুগিয়া ভুগিয়া বৃদ্ধের তিলে তিলে জীবন প্রদীপ নিবিয়া আসিতেছিল—তাহার উপর আজ আবার এই ভৎর্সনায়—সন্ধ্যাকালে যখন ঘরে ঘরে দীপ জলিয়া উঠিল, তখন উহার ক্ষীণ জীবন প্রদীপটী একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

শোকে, অভিমানে, মতিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল—রহমন! রহমন! তুমিই আমার পিতাকে হত্যা করলে! তোমাকে এর উপযুক্ত শাস্তি দেব। এ জীবনে আমার ভালবাসার আশা আর কোরনা। কোরলেও পাবে না।

রহমনের কাছে মহারব খাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। কয়েক জন প্রতিবেশীর সহিত সে উহাকে কবর দিয়া আসিল।

(২)

মহারব খাঁর মৃত্যুর পর দিবসের কথা বলিতেছি।

রহমন দুইটী টাকা লইয়া মতিয়ার কাছে গিয়া বলিল,—"এই নাও জামার মজুরীর টাকা।"

মতিয়া সজোরে টাকা দুইটী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে রক্তাক্ত নয়নে বলিল,—"চাই না টাকা।"

রহমন বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হতভম্বের মত বলিল,—"কেন মতিয়া?"

মতিয়া। কেন? জিজ্ঞেস কচ্ছ? লর্জ্জা করে না। বাবা অসুখের জন্যে তোমার জামার ছাঁটকাট না হয় ভাল করে কর্‌তে পারিনি; তাই বলে তুমি তাকে অসুখের ওপর ... ... (দারুণ উত্তেনায় মতিয়া আর বল্‌তে পার্‌লে না)।

রহমন ধীর ভাবে বলিল,—"রাগ কোরনা মতিয়া—আমায় ক্ষমা কর।"

মতিয়া। ক্ষমা—ক্ষমা ক্ষমা আবার কিসের?

রহমন। তোমার বাবাকে বকেছিলুম বলে।

মতিয়া। বকেছিলে, বেশ করেছিলে—তাতে আর হয়েছে কি?

রহমন। তবে মজুরীর টাকা দুটো নাও।

মতিয়া। নিয়ে যাও, তোমার টাকা চাইনা আমি।

রহমন একটু ভাবিয়া বলিল,—"আচ্ছা এ টাকা আমি মজুরী বলে দিচ্ছি না—কাল থেকে তোমার খাওয়া হয়নি—তাই দিচ্ছি। কিছু কিনে খাবে বলে।"

মতিয়া। আমার খাওয়া হয়নি তা তোমার কি? আমার ওপর এত যত্নই বা কেন জেখাতে এসেছ।

রহমন জড়িত স্বরে বলিল,—"সেকি মতিয়া! তুমি কি জাননা আমি তোমাকে কত ভাল ... ...।"

রহমনের কথা শেষ হইতে না হইতে মতিয়া শ্লেষ পূর্ণ হাঁসি হাঁসিয়া বলিল,—"থাক্ বুঝেছি! ধিক্ রহমন! দুটো টাকা দিয়ে ভালবাসা কিন্‌তে এসেছ ধিক্ তোমায়!"

রহমন বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তুমি আমার ভালবাসা চাওনা মতিয়া?"

মতিয়া। চাইনা, রহমন—তোমার ভালবাসা চাইতুম বটে—কিন্তু এখন আর চাইনা। তুমি এখান থেকে শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও।

রহমন। তুমি আমায় তা হলে ভালবাস না কেমন?

মতিয়া। না। শোন রহমন! আর একটী কথা—এই কথাই তোমায় শেষ বলা—পশুর মত অধম মানবের, আমার মত নারী হৃদয়ের ভালবাসা চাওয়া দুরাশা মাত্র। চুপ্, সুরকির গুদামে অনেক ভালবাসা পড়ে আছে—কুড়িয়ে নাওগে—এখান থেকে চলে যাও রহমন।

রহমন বুঝিয়া দেখিল—পিতাকে ভর্ৎসনা করায় ও তাহার উপর পিতা মারা যাওয়ায় মতিয়া এরূপ করিতেছে—এখন তাহার কাছ হইতে সরিয়া যাওয়াই উচিত। আজ বৈকালে আসিয়া সান্ত্বনা করিবে। আবার কি ভাবিয়া রহমন ঠিক করিল, না সে আজ আর আসিবে না—কাল আসিবে। তখন নিশ্চয় উহার অনেকটা রাগ পড়িয়া যাইবে।

(৩)

পরদিবস বৈকালে রহমন সেই পর্ণকুটীর খানির ভিতর আসিয়া ধীর স্বরে ডাকিল,—"মতিয়া।"

কেহ সাড়া দিল না।

রহমন আবার ডাকিল,—"মতিয়া।"

তবুও সাড়া আসিল না।

রহমন মনে মনে ভাবিল—কাল তাহাকে ওরূপ করিয়া অপমান করিয়াছে, বলিয়া নিশ্চয় মতিয়া লুকাইয়া আছে। লজ্জায় বাহির হইতে পারিতেছে না।

* * * *

হৃষ্ট চিত্তে রহমন তন্ন তন্ন করিয়া সেই কুটীর খানির প্রত্যেক ঘর খুঁজিল। কিন্তু হায়! সে কোন ঘরেও মতিয়াকে খুঁজিয়া পাইল না।

রহমন ভাবিল—বোধ হয় মতিয়া বাহিরে কোথাও গিয়াছে। এখনই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল। ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকার করিয়া রাত্রি হইল। তবুও মতিয়া ফিরিয়া আসিল না।

* * * *

"মতিয়া! মতিয়া! কোথায় তুমি? খুব শাস্তি দিলে বটে,"—বলিয়া রহমন সেই ভগ্ন কুটীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব্যাকুলচিত্তে বসিয়া পড়িল।

উপরে অনন্ত আকাশে তারার দল উপযুক্ত শাস্তি দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলিও ঝিল্লী রবে—"কেমন হয়েছে, তাকে ত আর খুঁজে পাবে না—সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে" বলে বিদ্রূপের গান আরম্ভ করিয়া দিল।

সাধক সঙ্গীত।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

চিরকালটাই নেচে কুঁদে কাটা'লে মা! পুতুল খেলে,
ভেঙে' গ'ড়ে নেড়ে' চেড়ে' জুড়ে' তেড়ে'ই সারা হ'লে,
স্বল্প বসতের ধারলে না ধার, পুতুল-পুতুল বাতিক তোমার,
(অমন) সোণার অঙ্গ কালি হ'ল মা (কেবল) খেলা খেলা* খেলার তালে॥
খেলায় এমন আছ' মেতে', (তোমার) নাইক' বিরাম খে'তে শু'তে,
কটিতে বসন পরিতে একেবারে(ই) গেছ' ভুলে॥
আপনি নাচ' তাথেই তাথেই, নাচাও পুতুল ধেই ধেইয়া ধেই,
(কারুর) দোষ ধ'রে দাও আছড়ে ফেলে,
গুণ ভেবে নাও কোলে তুলে॥
দোষ গুণী তুমিই একা, পুতুল তো সব জড়া ফ্যাকা,(১)
(তাদের) চলন ফেরন, সোজা বাঁকা, সবই তোমার ইচ্ছা বলে॥
পুতুল মুখে "আমি" বুলি, কি কৌশলে দেছ' কালি (!)
বলিহারি চতুরালী, জগৎ ভরা (সই) "আমি" রোলে॥
(সেই) "আমি" শুনে' দিবানিশি, হাসছ' তুমি অট্টহাসি,
শ্রীপদ তাই ডেকে খুসী, (তোমায়) "সদানন্দময়ী" বলে॥

---

* প্রথম খেলার অর্থ,—পুতুলের প্রতি খেলিবার অনুজ্ঞা।
দ্বিতীয় খেলার অর্থ—"ইহাই আমার খেলা।"

(১) অনীশ্বরং হীশ্বর দেশিতং জগৎ—রামায়ণম্॥ তথাচ শঙ্করা চার্য্য শ্রুতং "ত্বং কর্ত্রী কারয়ত্রী ইত্যাদি। (জঃ সঃ)

বক্রেশ্বর পথে।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা ইংরাজি ১৯২০ সালের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে বেলা ৩ ঘটিকার সময় বীরভূম জেলাস্থ শিউড়ী গ্রাম হইতে বক্রেশ্বর নামক তীর্থ দর্শনার্থ মোটরযানে যাত্রা করি।

সিউড়ী বীরভূম জেলার প্রধান কার্য্য স্থান। এখানে মেণীমাধব বিদ্যালয়, গীর্জা ও বিচারালয় প্রভৃতি অনেক গুলি অট্টালিকা আছে। এতদ্ভিন্ন টাউন-হল, লাইব্রেরী, কৃষি প্রদর্শনী হল প্রভৃতি সুবৃহৎ গৃহ সকল বর্ত্তমান আছে।

এই তীর্থক্ষেত্র (বক্রেশ্বর) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অণ্ডাল সাঁইথিয়া কর্ড লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং সিউড়ী ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তের মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। যাত্রিগণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বহু সুন্দর পথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমাদের গাড়ী বক্রেশ্বর যাইবার রাস্তা দিয়া ট্রেণের মত বেগে যাইতে লাগিল। এখানকার ভূভাগ সুকোমল মৃত্তিকা নহে। অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড মিশ্রিত শক্ত শুষ্ক মৃত্তিকা। এখানে স্থানে স্থানে একপ্রকার অতি সুন্দর শুভ্র স্বচ্ছ প্রস্তর পাওয়া যায়। এখানকার মৃত্তিকার সহিত প্রচুর পরিমাণ অভ্র মিশ্রিত আছে। মৃত্তিকার কঠিনতা বশতঃ এস্থানে জলাশয়াদি সহজে খনন করা যায় না। মধ্যে মধ্যে কূপ আছে এবং কূপের জলেই স্নান আহার প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুষ্করিণী অল্পই আছে এবং তাহার জলও সুপেয় নহে। এখানকার রাস্তা সমূহ সুদৃঢ় প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত হওয়ায় অতীব ভারসহ। এবং বর্ষাকালেও কর্দ্দমাক্ত হয় না এবং অন্য সময়েতেও ধূলিপূর্ণ থাকে না। পথ অতি পরিষ্কার, যাইবার কোনও অসুবিধা নাই; পথ জনাকীর্ণও নহে, কেবল মধ্যে মধ্যে দু'একখানি গো শকট, দু'একটি মনুষ্য ও দু'একটা গৃহপালিত জন্তু। এখানকার জীবজন্তু কলিকাতা প্রভৃতি জনাকীর্ণ সহরের জীবজন্তুর ন্যায় মোটরযানের সহিত সুপরিচিত নহে। বহুদূর হইতে গাড়ীর শব্দ পাইবামাত্র রাস্তা ছাড়িয়া ভয়ে পার্শ্বস্থিত প্রান্তরে পলায়ন করে, এমন কি শকটাদির গো মহিষগুলি গাড়ীর উপরস্থ লোকজন জিনিষ পত্র সমেত রাস্তা হইতে অবতরণ করত বেগে প্রান্তরের উপর দিয়া স্বেচ্ছামত

পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। এতদ্দেশীয় গো মহিষাদির লাগাম নাকের ভিতর দিয়া সংযুক্ত নহে—গলায় হাসুলির ন্যায় রজ্জুর সহিত সংযুক্ত। তাই গাড়োয়ানগণ সহজে ইহাদিগের গতির অবস্থান্তর করিতে পারে না।

পথিমধ্যে অনেক নদী আছে। চৈত্রমাস রৌদ্র বড় প্রখর। নদী সমুদয়ের অধিকাংশই শুষ্ক; অতি ক্ষীণধারে একটি মাত্র ধারা একপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কেবলমাত্র স্তূপাকার বালুকারাশিতে পূর্ণ। এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আবার বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ হইয়া খরপ্রবাহ ধারণ করত গমন পথবর্ত্তী সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ বস্তু সকলকেও সমূলে উৎপাটিত করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করে না।

অধিকাংশ নদীতেই সাঁকো আছে, আবার কতক গুলিতে সাঁকো নাই, সে সকল নদীর উপর দিয়াই গাড়ীকে পার হইতে হয়। বর্ষায় জলবাড়িলে আর পারাপারের সুবিধা থাকে না। তবে বৎসরের মধ্যে আটমাস কাল (নভেম্বর হইতে জুন) এই প্রকারেই পার হওয়া যায়। রাস্তা হইতে নদীবক্ষ বহু নিম্ন। তবে অবতরণ ও অবরোহণের রাস্তাগুলি সুদৃঢ় হওয়ায় এরূপে পারাপার হইবার বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। নদীতে যে সামান্য জল আছে তাহা অতি বিশুদ্ধ ও সুপেয়। নদীস্থ যে কোনও স্থানের বালুকারাশি কিঞ্চিৎ মাত্র খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। পার্শ্বস্থিত গ্রামের লোকে হাতা দ্বারা বালি খনন করিয়া কোন পাত্রের মুখে ছাঁকিবার জন্য একখানি নেকড়া পাতিয়া ঐ বালুকাপূর্ণ জল ছাঁকিয়া ব্যবহারের জন্য লইয়া যায়! নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ, সুপেয় ও পরিষ্কার।

পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মধ্যে মধ্যে দু'একটি গাছ, দু'একখানি কুঁড়ে ঘর, দু'একটা গৃহপালিত পশু! পথপার্শ্বে স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দশবারখানি করিয়া পর্ণ কুঠির আছে।

মধ্যে মধ্যে ইটের পাঁজাগুলি হতভাগ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভবিষ্যতে আশা ও সৌন্দর্য্যের সূচনা স্বরূপ বিরাজমানা। এখন এরূপ কদর্য্য ভাবে নির্জ্জনতা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, পরে কত সুরম্য হর্ম্ম্য, সুদৃঢ় পথ, সুন্দর প্রাচীর প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া মানবের অহঙ্কার বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। কত শত ভাবুক (ইঞ্জিনিয়ার) ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সু-আকারে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য বংশ পরম্পরায় চিন্তা করিবে। কত ভোগ বিলাসিনী ইহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর আবাস নির্ম্মাণ করত ভোগ বাসনা চরিতার্থ

করিবে। কত দেবদেবী মূর্ত্তি ইহার দ্বারা নির্ম্মিত কক্ষে অনন্তকালাবধি জন সমাজের পূজ্য রূপে শোভা পাইবে। কিন্তু হায়, অস্থায়ী জগতে স্থায়িত্ব কোথায়? ইহাও চিরস্থায়ী নহে। সংস্কারাভাবে কালে আবার মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। মাটী হইতে উৎপাদিত হইয়া আবার মাটিতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে; ইহা যে কত কালাবধি এরূপ আসা যাওয়া করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রান্তর গুলি বিস্তীর্ণতার আদর্শ স্বরূপ। এরূপ সুবিস্তীর্ণ কোন বস্তু দর্শন করিলে মানব মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়।

দূরে, বহুদূরে, দূরতার পরপারে মেঘমালা সদৃশ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান। এটি সিউড়ী হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাগলপুরের পাহাড়।

প্রান্তরের উন্নতাবনত ভাব দেখিলে বোধ হয় এখানে বৃষ্টির জল জমিতে পারে না। বর্দ্ধমান জেলা অতিক্রম করিলেই ভূভাগের এই উন্নতাবনত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ক্ষেত্র সমুদয় অতিশয় সমতল। এই উন্নতাবনত ভাব বড়ই মনোরম।

এইরূপে নদ নদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আমরা বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথের কোনও অসুবিধা না থাকায় গাড়ী অত্যন্ত বেগে গমন করিতে পারিয়াছিল।

এই তীর্থ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে বক্রেশ্বর নদ ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণাংশে পাপহরা নদী তথায় নিত্য শব সৎকার হইয়া থাকে। আট দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতেও মৃতদেহ এই স্থানে সৎকারার্থ আনীত হয়।

নদীর পশ্চিম তীরে অর্থাৎ বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বাংশে একটি বিরল পাদপ বনভূমি। বনের পশ্চিমাংশে বহু সংখ্যক মন্দির বিহীন ও মন্দির-যুক্ত শিবমন্দির পরিবেষ্টিত বক্রেশ্বর দেবের উন্নত মন্দির। এখানে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সে গুলিকে ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা আটটি। ১। ক্ষার কুণ্ড। ২। ভৈরব কুণ্ড। ৩। অগ্নি কুণ্ড। ৪। সৌভাগ্য কুণ্ড। ৫। জীব কুণ্ড। ৬। ব্রহ্ম কুণ্ড। ৭। শ্বেত গঙ্গা। ৮। বৈতরণী।

সূর্য্য কুণ্ড নামে আরও একটি কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি অপেক্ষাকৃত আধুনিকা। এই কুণ্ড সমূহ হইতে উষ্ণজল বুদবুদাকারে অবিরত প্রবাহিত হইয়া পাপহরা নদীর সহিত মিলিত হইতেছে। কুণ্ডগুলি রাস্তা হইতে দশ ফুট

নিম্নে অবস্থিত। অবতরণ ও অবরোহণার্থ সোপানাবলী আছে। কুণ্ডগুলির উত্তাপ বিভিন্ন। অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর। তাপমান যন্ত্রে ২০০০ ডিগ্রী (ফারণহিট) প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্বেতগঙ্গা কুণ্ডের নিকট একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। তাহার চতুপার্শ্বে ভগ্ন প্রস্তরময় মূর্ত্তি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কালে বৃক্ষ সাতিশয় স্থূল হওয়ায় অধিকাংশই মূলে নিহিত হইয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

এই স্থানে একটি পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু কোনসময়ে বিশ্রামার্থ এইস্থানে আগমন করেন, ইহা তাঁহারই পদচিহ্ন।

দাঁইহাটি নিবাসী স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এই স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের শিবলিঙ্গ ও কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য দেব ও অতিথি সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কুণ্ড সমুদয়ের অনতিদূরে সাতঘেটে, চন্দ্রসায়ার ও দামুসায়ার নামক তিনটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

এখন যেস্থানে মন্দিরাদি বর্ত্তমান বোধ হয় বহু, পূর্ব্বে তাহা নদী তল ছিল। পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির কি বিচিত্র গতি। আজ তুমি সমৃদ্ধিশালী নগর মধ্যে বাস করিতেছ, ৫০০ শত বৎসর পরে পুনরায় সেখানে যাইলে হয় ত দেখিতে পাইবে হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য শোভা পাইতেছে। আবার ৫০০ শত বৎসর পরে যদি কোন কারণ বশতঃ সেখানে যাও, হয় ত দেখিবে যে অনন্ত সমুদ্র বিরাজমান। আবার কিছুদিন পরে যে কি হইবে কে বলিতে পারে। উল্লিখিত বস্তু সমুদয়ের বিষয় আরও অনেক বলিবার ছিল ও এতদ্ভিন্ন কতিপয় উল্লেখ যোগ্য বিষয় ছিল, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় ও তৎ সমুদয়ের ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকায় বর্ণিত হইল না।

তথা হইতে আমরা হেতমপুরে যাত্রা করি। হেতমপুর সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম। মুসলমান রাজত্বের সময় হেমত খাঁ নামক কোনও তাৎকালিক স্বাধীন নরপতির নামানুসারে এই স্থানের হেতমপুর নাম হইয়াছে। হেতমপুরের পার্শ্বস্থিত দুবরাজপুরে একটী ক্ষুদ্র শৈল আছে, সেটি অতীব বিস্ময় জনক। সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উপর্য্যুপরি স্থাপিত। দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্তরখন্দ সমূহ এইরূপে যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে বালুকা রাশি প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রস্তর সমূহ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত নহে।

হেতমপুরে রাজা সত্যনিরঞ্জন বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিচালিত উচ্চ ইংরাজি স্কুল, কলেজ, বহু ছাত্র থাকিবার উপযোগী বোর্ডিং, গৌরাঙ্গভবন (সেখানে নিত্য অতিথি ভোজন হয়) দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে আছে, ভূতপূর্ব্ব মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের ও মহারাণীর প্রস্তরময় মূর্ত্তি ও কতিপয় সুন্দর দর্শনযোগ্য অট্টালিকা আছে। পরে আমরা সিউড়ী যাত্রা করিলাম।

তখন পর্ব্বত অন্তরালে অর্দ্ধ লুক্কায়িত সূর্য্য তাঁহার স্নেহমাখা কিরণজাল বিস্তার করিয়া গাছের মাথায় খেলা করিতেছে। আর আশে পাশে ছিন্ন মেঘরাশি বিচরণ করিতেছে। সে যে কি অপরূপ অব্যক্ত সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার পার্থিব ভাষার শক্তি নাই, সে সৌন্দর্য্য অঙ্কন করিবার শক্তি অতি সুনিপুণ চিত্রকরেরও নাই। সামান্য মনুষ্যের সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া উঠিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের অস্ফুট ও অপূর্ণ সৌন্দর্য্য সহসা চন্দ্রোদয়ে পরিস্ফুট ও সম্পূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সূর্য্য সে দিনের মত অস্ত গেল, কত লোকের কত আশা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। ছলনাময়ী আশা সে দিনের মত তাহাদিগকে বঞ্চিত করিল। জগতে আশার ছলনাই ধন্য। একদিকে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য, অপরদিকে উদিতমান চন্দ্র ক্রোড়ে লইয়া প্রান্তর একখানি মধুর সুন্দর ছবির মত প্রতিভাত হইতে লাগিল।

মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ পক্ষী সকল সুমধুর সঙ্গীত তানে প্রান্তরের নির্জ্জনতা ও রজনীর ভীষণতা দূর করিতে লাগিল। একে বসন্ত তায় সন্ধ্যা, আশে পাশে মৌয়াফুল ফুটিয়াছে। মধুর বায়ু বাসন্তী অন্ধকার সমাগমে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। যেখানে যেটি সুমিষ্ট পাইতেছে, বহন করিয়া প্রথমে মানবের কাছে লইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা কি অপরূপ বিশেষ, আবার এই নিস্তব্ধ জনমানবহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে। অন্ধকার একবার অনন্ত বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি অব্যক্ত অসংযুক্ত ভাব লহরী মানব মনে উদিত হয়। এই স্থানেই বোধ হয় প্রকৃত সুখের কণিকাভাস পাওয়া যায়। বোধ হয় সকল জ্বালা জুড়ায়। ক্রমে অন্ধকার নিবিড়তর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তারকারাজি চন্দ্রমণ্ডলে উদিত হইতে লাগিল। পরে আমরা গৃহে আসিয়া পৌছিলাম, শান্তিময়ী সন্ধ্যার আগমনে সকলেই শান্তিলাভ করিল।

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব।*

লেখক, — শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

মাধুরী হের নয়নে।
শোভিছে মধুর শ্রীপতি, মধুর হাসিনী শ্রী-সনে,
মধুরা রাধা মধুর শ্যামে,
সোহাগ মধু ঢালিছে প্রেমে,
মধুর গগন মধুর পবন,
(কিবা) ভাতিছে শ্রীগোকুল মধুর প্রাণে।
বহি'ছে মধুর মৃদু কলনাদে মধু যমুনা মধুর উজানে॥
মধুর বন মধুরা ধেনু,
মধু বরষে কুসুম রেণু,
মধুর চাঁদিমা, মধুর নীলিমা,
(কিবা) বাজি'ছে সুমধুর মোহন বেণু,
শ্রীপদ মানস! মধুর হ'য়ে নম' শ্রীপতি শ্রীমতী চরণে॥

প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা বহুবাজারের ৩৯ নং মদন বড়ালের লেনের মৃণাল এণ্ড কোংএর নিকট হইতে আমরা "অমান" নামে অম্লরোগের একশিশি ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা দেশীয় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। এক প্রকার চুর্ণ বিশেষ. আহারের পর দুই আনা মাত্রায় ঔষধ মুখে দিয়া একটু দুধ বা জল খাইলে অম্লজনিত কোনরূপ যন্ত্রণার ভয় থাকিবে না। অথচ পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে। ব্যবহারে আমরা ইহার সদ্‌গুণের উপলব্ধি করিয়াছি, বড় শিশি ৸৹, ছোট শিশি ।৵৹। উক্ত কোম্পানীর নিকট এবং বড়বাজার খোংরাপটী বি, কে, পালের ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

আমরা "বেহালার পাচন" প্রস্তুত কারক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণ মহাশয়ের দুইবর্ণে মুদ্রিত, এ্যালমেনাক্ বা দেওয়ালে টাঙ্গাইবার সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। ইংরাজী বাঙ্গালা তারিখ এবং প্রধান প্রধান তিথিগুলি পর্ব্ব সকল সন্নিবেশিত হওয়ায়, এই পঞ্জিকাখানি সাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

---

* ঋগ্বেদোক্ত "মধুবাতা" ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থ অবলম্বনে লিখিত।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্‌টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরবোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। শূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয়, ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন। এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
33, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩১, [৫ম, সংখ্যা

১।	প্রার্থনা	শ্রীমতী মোক্ষদাবালা বিশ্বাস	১২৯
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩০
৩।	মরকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৯
৪।	অনিলের বৈরাগ্য	শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী	৪৯

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 22-11-24

জ্বরের যম জারমলীন

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৮০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
ওলট পালট হয়ে যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।
মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "জিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

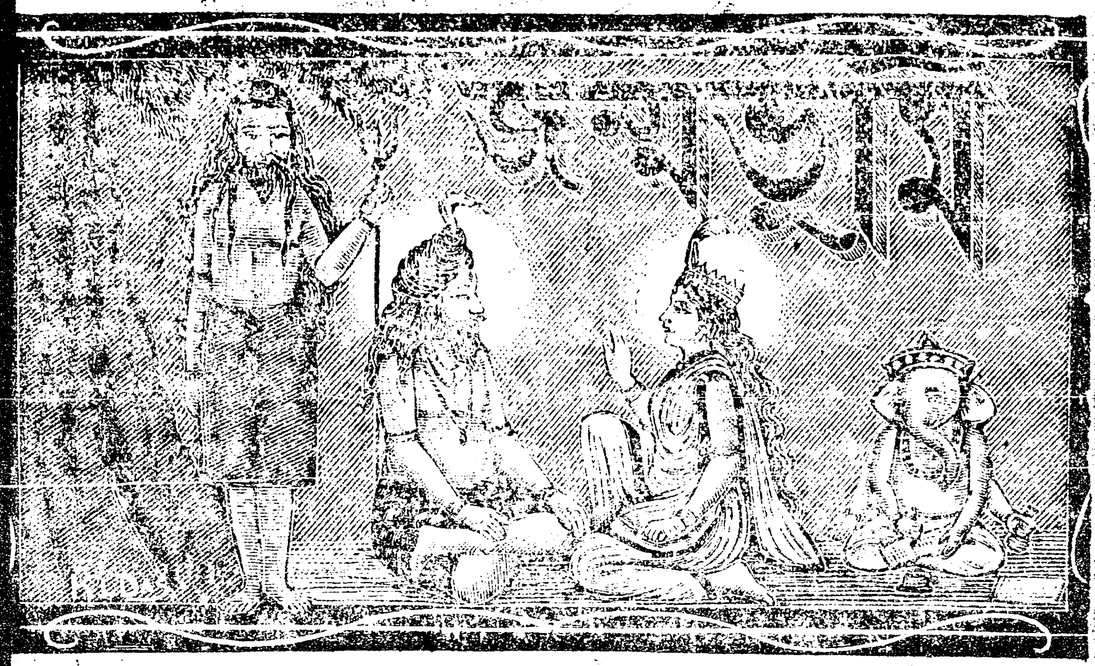

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। } ১৩৩১ সাল, ভাদ্র। { ৫ম, সংখ্যা।

প্রার্থনা।

লেখিকা,—শ্রীমতী মোক্ষদাবালা বিশ্বাস।

তোমারি চরণে, এ আশ্রিত জনে,
দিওগো অন্তিমে স্থান।
তোমারি নামেতে, তোমারি ধ্যানেতে,
মুগ্ধ কর মম প্রাণ ॥
তোমারি তরেতে, তোমারি আশেতে,
দিবা নিশি মগ্ন আঁখি।
খেলিতেছে ধারা, রবি শশী তারা,
তবুও চাও না দেখি ॥

আঁধার পথেতে, নীরব নিশিতে,
(আমি) পথহারা পথি প্রায়।
দাও গো আলোক, হৃদয়ে পুলোক,
ছুটে যেন মোহ যায়॥
নিখিল জগতে, আপন বলিতে,
নাহি আছে কেহ গো।
অখিলের পতি, অগতির গতি,
(তাই) অর্পিনু প্রাণ গো॥
তোমারি তরেতে, পথের ধারেতে,
কাঁদিতেছি বসি একা।
ভুলোনা ভুলোনা, আমার বেদনা,
ওহে! দীনতারণ সখা॥

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরদিন সন্ধ্যার পর কেণারাম চট্টোপাধ্যায় সাধক ও প্রতাপচাঁদের সহিত অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন, মহারাজ বাহাদুর কেণারামের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাদ্যযন্ত্র বিশারদ, ভক্তিমান ও উদার, সেই জন্য ইনি আমাদের গুরুদেবের প্রিয়। অদ্য ইনি যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও আমার অনুনয়ে এখানে আসিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাকী গুরুদেবের সুললিত কণ্ঠের সহিত বাদ্যযন্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিবেন।" অনন্তর সাধকের ইচ্ছানুসারে পাখয়াজ, ঢোল ও তানপুরা মাত্র আনীত হইল। সাধক হৃদয় বাসিনী ভুবনমোহিনীর ধ্যান করিয়া তানপুরা হস্তে করিলেন। কেণারাম শ্যামার চরণে মনপ্রাণ সন্নিবেশ

পূর্ব্বক বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত আরম্ভ হইল, সাধক গাহিলেন,—

তনুরতি ভাসিল ভব সাগরে।
মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে,
দেখ যেন ডুবাও না পাথারে॥
দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি তায়, কুপথে তরণী বায়,
যতনে দমনে রাখ সবারে।
কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল,
বেয়ে দে ভাই সুধাময় সমীরে॥
কামাদি জগাতি ছয়, মহামন্ত্রে কর জয়,
পথে যেন বিড়ম্বনা না করে।
কমলা কান্তেরে লয়ে, কালী নামের সারী গেয়ে,
সুখে চল সদানন্দ নগরে॥

সঙ্গীতের সুস্বরে, বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুরের সামঞ্জস্যে সমাগত সকলের হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোত উঠিতে লাগিল। সেই সুস্বর ধারা সাধক ও বাদ্যকারের হৃদয়ভরা ভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া সকলকেই প্রফুল্ল করিল। সঙ্গীত শেষে মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আজ আমরা সকলেই গুরুদেবের পরমানন্দের কিঞ্চিৎ ভাগ লইয়াছি। সকলেরই হৃদয়ে প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সঙ্গীতটী পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিবার প্রার্থনা। সংসার অতি ভীষণ স্থান, পদে পদে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। জননী ভিন্ন আর কে অজ্ঞান অন্ধ সন্তানের ভার লইবেন।" পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ হইল, সাধক গাহিলেন,—

যখন যেরূপে রাখিতে আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
জনম করম দুঃখ, সুখ করি মাখি,
জলদবরণী যদি নিরখি অন্তরে শ্যামা।
বিভূতি ভূষণ, কি রতন মণি কাঞ্চন,
তরুতল বাস, কি রাজ সিংহাসন,
কমলাকান্তের উভয় সম সাধন,
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে গো মা॥

সঙ্গীত শেষ হইল, সকলেরই প্রসন্ন বদন, বিশুদ্ধ আনন্দ পরিপূর্ণ হৃদয়ে

উচ্ছ্বাস তাঁহাদের তরল নয়নে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রেম পরিপূর্ণ গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "ভগবানের উপর ভাল কথা এমনি জিনিষ, ভগবানকে হৃদয়ে পাইলে মানুষ সব ভুলিয়া যায়। হৃদয়ে পরম বস্তুর আবির্ভাবে পরমাশান্তির উদয় হয়। তরুতল বাস, সিংহাসন উভয়ই সমান সুখ দায়ক হয়।" মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর কহিলেন, "প্রেম ও ভালবাসা হইতে এই শান্তি সুখ উৎপন্ন হয়। ভালবাসার অঙ্কুর এই সংসারকে অবলম্বন করিয়া জন্মে। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী সেই ভালবাসা বৃক্ষের রস স্বরূপ। সুহৃদ ভাবকে প্রেম বলে। সুহৃদভাব দাম্পত্য প্রেমেই বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। মানুষের ভাগ্য প্রসন্ন হইলে, সেই প্রেম পরিপক্ক অবস্থায় অতি বাঞ্ছনীয় পরমবস্তু ভগবানের উপর পতিত হয়। নায়ক নায়িকার উক্তিতে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের টপ্পাগানে প্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।" কেণারাম কহিলেন, "মহারাজ! ব্যক্তি বিশেষে গানের ভাবার্থ বোধের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশের টপ্পাগানের প্রেমে হৃদয় আপ্লুত হয়।" সাধক ও সভাস্থ সকলকে অতি বড় প্রসন্ন দেখিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমার গুরুদেবের মুখে আমি কখন টপ্পগান শুনি নাই। তাঁহার রচিত প্রেম পরিপূর্ণ টপ্পাগান, তাঁহার মুখে শুনিতে আমাদের সকলের বাসনা হইতেছে। কল্পতরুর নিকট কোন প্রার্থনাই ব্যর্থ হয় না। আমি জানি আমার গুরুদেব সকলেরই অনুনয় রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে, মহারাজা বাহাদুর সাধকের মুখে টপ্পাগান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সাধক নিম্ন লিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন,—

শিবের নয়ন ভুলেছে।
অতি নিরূপম চিকণ কাল শ্যামারূপ।
তা না হলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
হৃদয় মাঝারে রেখেছে॥
শশী ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভ্রমে ভ্রমরিণী এসেছে॥
হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়ে রয়েছে॥
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।

ও রূপ আনন্দ বিধি, কমলা কান্তের হৃদি,
কমলে প্রকাশ করেছে।

সঙ্গীত শেষে রাজা বাহাদুর কহিলেন, "সুন্দর টপ্পা! অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব প্রকৃতি রূপিণী মহামায়ার রূপে মুগ্ধ। ভুবনমোহিনীর রূপে ভুবনেশ্বর মুগ্ধ, বিচিত্র নহে। শিব শক্তিই জগতের নায়ক নায়িকা। যে ব্যক্তি আশৈশব সন্ন্যাসী, যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে মহাশক্তির আবির্ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, তাঁহার ভাব ও ভাষা সেই মহাশক্তির স্তুতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।" কেণারাম কহিলেন, "মহারাজ! আমি জানি আমাদের ঠাকুর দুই একজন প্রেমিক গোস্বামীর অনুরোধে কয়েকখানি কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। রাধা কৃষ্ণ, শিব শক্তি অভেদ না হইলেও আপনি বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত শুনিতে বাসনা করেন, নায়ক নায়িকা ভাবের সুন্দর দৃষ্টান্ত ভগবানের ব্রজলীলা।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "ব্রজলীলায় অভিসার উৎকণ্ঠা, বিরহ, মান প্রভৃতি নায়িকার বিবিধ ভাবের চূড়ান্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। তাহাদিগকে সংসারের নায়ক নায়িকার ভাব কিম্বা ভগবানের সখ্যতা ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমার গুরুদেবের মুখে অমি ত কই কখন সেরূপ সঙ্গীত শুনি নাই।" মহারাজা বাহাদুরের বাক্য অবসান হইবামাত্র সাধক প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি কখনও আমাকে সেইরূপ সঙ্গীত করিবার অনুরোধ করেন নাই। আজ আপনি আমাকে একটী টপ্পাগান করিবার অনুরোধ করিয়া ভাবিতে ছিলেন, গুরুদেব কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, আদিরস আস্বাদনে চির বৈমুখ, ভক্তিরস পানে সর্ব্বদাই বিভোর, ইহার মুখে আদিরস সূচক সঙ্গীত শ্রবণের আশা বৃথা। সেই জন্য আপনার ইচ্ছানুসারে সঙ্গীত আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল।" সাধকের এই কথা শুনিবামাত্র মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "গুরুদেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনি যাহা কহিলেন, আমি তাহাই ভাবিয়াছিলাম, আপনাকে চিনিতে পারিলাম না, আপনি অন্তর্যামী।" ইহা কহিয়া রাজা বাহাদুর ভক্তিভাবাপন্ন হইলে সাধক তানপূরা ধরিয়া পুনর্ব্বার গাহিলেন,—

ও শ্যাম বন্ধু! তোমায় না দেখিলে ঝরে
দুটি আঁখি, দেখিলে নয়ন জুড়ায়।
না জানি কি মন্ত্র দিয়ে, বাঁধিলে হিয়ে,
বিধু বদনখানি স্বপনে নিরখি॥

ঘরে গুরুজনার ভয়, কত ছলে কত কয়,
শুনিয়া না শুনিহে মরমে মরে থাকি।
তথাপি তোমার তরে, পরাণ কেমন করে,
সুধাইও কমলাকান্ত তারে রাখি সাথী॥

সঙ্গীত শেষে যুবরাজ প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "ভগবানের দর্শন জন্য সাধকের যেরূপ উৎকণ্ঠা আইসে, তাহা আমাদের মধ্যে কমলাকান্তই অনুভব করিতে সক্ষম, তিনিই তদ্বিষয়ে সাক্ষী দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি।" রাজা বাহাদুর কহিলেন, "এ গানটীকে নায়ক নায়িকা কিম্বা সাধক সাধিকার ভাবে লওয়া যাইতে পারে।" কেণারাম কহিলেন, "মহারাজ! ভক্তের মন বুঝিয়া ভগবান আপন বেশ পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য বহুরূপী হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বরূপত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। আমাদের ঠাকুর অনুগত ভক্তের অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন সাধনা বিষয়ক পদও রচনা করিয়াছেন। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে মহামায়ার আগমন সম্বন্ধে গীতাবলি সময় গুণে বড়ই মনমুগ্ধকর হয়। সেই সকল গীতাবলিকে আগমনী বলে। আমাদের ঠাকুরের অনেকগুলি আগমনী গীত আছে। সেই সকল গীত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে রচিত হইয়াছিল।" মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "আমি মূঢ়তা বশত গুরুদেবের মুখে সেই সকল সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত। আমি ইহাকে যেভাবে ধরিয়াছি, ইনিও আমার নিকট সেই ভাবে প্রকাশ হইয়াছেন। আপনারা উভয়ে আজ ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনাদিগকে পুনর্ব্বার শ্রম পীড়িত করিয়া আগমনী সঙ্গীত শুনিবার বাসনা করা আমার উচিত নহে।" কেণারাম কহিলেন, "মহারাজ! সঙ্গীত সাধনার অঙ্গ আমি আজ পর্য্যন্ত গান করিয়া ঠাকুরকে ক্লান্ত কি অবসন্ন হইতে দেখি নাই। আপনাদের সন্তোষে আমিও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।" ইহা কহিয়া কেণারাম সাধকের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে, সভাস্থ ব্যক্তিগণের কোন কথাই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। বৈঠকে কিম্বা ভক্তবৃন্দের মধ্যে, তাঁহার স্তুতিবাদ কি তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার স্তুতিবাদ আরম্ভ হইলেই তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইত। তিনি মনপ্রাণ শ্যামার চরণে সন্নিবিষ্ট করিয়া বাহেন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিতেন। কেণারাম একথা জানিতেন। তিনি ঘটনাক্রমে ঠাকুরের অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছেন, এখন তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের চরণ স্পর্শ

করিবামাত্র তাঁহার সমাধিভাব ভঙ্গ হইল। কেণারাম কহিলেন, "আমি আপনার রচিত একখানি আগমনী গীতের সঙ্গত করিতে ইচ্ছা করি।" ইহা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "সময়ে সকল বস্তুই সুস্বাদু হয়। প্রত্যেক বস্তুর সুস্বাদের সময় আছে, এখন আগমনী সঙ্গীত প্রীতিকর হইবে কি?" ইহা কহিয়া সাধক গাহিলেন,—

বারে বারে কহ রাণী! গৌরী আনিবারে।
জান ত জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী,
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা যারে।
তিলেক না ছাড়ে তারে, সদা রাখে হৃদি পরে,
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শঙ্কর শীতল কায়া,
সেই অবধি হর জায়া বিচ্ছেদ না করে॥
অবলা অল্প মতি, না বোঝ কার্য্যের গতি,
যাব কিন্তু না বলিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ,
তার মা বটে বুঝায়ে যদি আনিবারে পারে॥

সঙ্গীত শেষে সকলেই অতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, তাঁহারা কখনও এরূপ সুন্দর আগমনী সঙ্গীত শ্রবণ করেন নাই। এরূপে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভোগের পর মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেণারাম যতদিন কোটালহাটে অবস্থান করিয়া ছিলেন, প্রায়ই কোন দিন রাজপ্রাসাদে, কোন দিন কোটালহাটে বৈঠক হইত। কথিত আছে, মহারাজা বাহাদুর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া ছিলেন।

সাংখ্য বাদিরা বলেন, আত্মা অসংখ্য। আত্মার বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা হেতু মানবের মধ্যে এত পার্থক্য অনুভূত হয়। দর্পণ অপরিষ্কৃত থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না, পরিষ্কৃত ও পারদ সংযুক্ত থাকিলে দর্পণে সকল মূর্ত্তিই প্রতিফলিত হয়। পুণ্য পারদের সংযোগে আত্মার শক্তি

পরিবর্দ্ধিত হয় মানুষ ক্রমে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রাদি দেবগণও বিশুদ্ধ আত্মা মাত্র। জ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মার শক্তি। দেবতাদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মা মানবই অসাধারণ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হন। দেবতা সদৃশ সাধক কমলাকান্তের অনেক অমানুষিক কর্ম্ম সম্পাদনের প্রবাদ আছে। বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ভদ্রলোকের বৈঠকে সাধু সন্ন্যাসীর কথা উত্থাপিত হইলে, সাধক কমলাকান্ত উচ্চাসন পাইয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তি, প্রেম, তৎকৃত অসাধারণ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সকলে সুখী হন। কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের কোটাল হাটে অবস্থান কালে সংঘটিত একটী অপূর্ব্ব কর্ম্মের জনশ্রুতি আছে, তাহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী সাঁকো মোহন পুর নামক গ্রাম নিবসী জনৈক ব্রাহ্মণকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সাঁকো বর্দ্ধমানের ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্মে সাধকের শুভাগমন হইত। একদা কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ কোটাল হাটে আসিয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদের সকলের নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধক বিশু ও কেণারাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ভেটে পালসিটের একজন কায়স্থ সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার ভক্ত ও প্রিয় ছিলেন। ভৈটে পালসিট গ্রাম বর্দ্ধমানের ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। কায়স্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় সাত্ত্বিক ও ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু তাহার তাদৃশ বিষয় সম্পত্তি ছিল না। কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পোষ্য ও প্রতিপাল্য অনেকগুলি ছিল। তিনি স্বহস্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি সংসার চিন্তার মধ্যে, যখনই সময় পাইতেন, কোটালহাটে ঠাকুরের নিকট আসিয়া, তাঁহার চরণ দর্শনে সকল জ্বালা ভুলিয়া যাইতেন। তিনি ঠাকুরের মুখ চাহিয়া প্রাণ খুলিয়া, মনের কথা বলিতেন। হাস্যমুখে সংসারের গুরুভার বহন করিয়া ঠাকুরের চিন্তায় পরমানন্দ ভোগ করিতেন। ভক্তি ও ভালবাসার বশ জগৎ। ঠাকুরও তাঁহাকে সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার নয়নে দেখিতেন। কায়স্থ মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিতেন, "আমি এমনি দুঃখী, আপনার একদিনও মনোমত সেবা লইতে পারিলাম না।" সাধক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "আমি অনেকবার তোমার বাটীতে অতিথি হইয়াছি। মানুষ নিমন্ত্রণ কারীর যথেষ্ট ভোজ্য পানীয় প্রদান অপেক্ষা,

তাঁহার যথেষ্ট বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের পক্ষপাতী হয়। আমি বুঝিতেছি, তোমার গৃহে আমার গমনে, তুমি দোল দুর্গোৎসবের ন্যায় নিমন্ত্রণ ও ভোজনের আড়ম্বর করিতে পারনা বলিয়া দুঃখিত, নিজের অবস্থায় কখনও দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে, নচেৎ শান্তি লাভ করিতে পারিবে না।" কায়স্থ ঠাকুরের বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। একদা তিনি ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আজ মাসাবধি কাল আমার পরিবারবর্গ আপনার চরণ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। পরশ্ব ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে আপনি ভক্তবৃন্দের সহিত আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আপনার গমন উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবগণেকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে।" কায়স্থের হৃদয়ের আকিঞ্চন ও ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া সাধক অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, জগদম্বাকে ধ্যান করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণের কথা ভুলিয়া গেলেন। সাধক কহিলেন, "অমরার গড়ের কেণারাম চট্টোপাধ্যায় এখানে আছেন, তিনি তাঁহার সহিত পরশ্ব প্রত্যুষে ভৈটায় তাঁহার বাটীতে গমন করিবেন।" তৎকালে বিশু ও কেণারাম তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কায়স্থ কহিলেন, "চট্টোপাধ্যায়ের সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আমার বাটীতে গমন জন্য অনুরোধ করা আমি উচিত বিবেচনা করি।" সাধক কহিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিমান শূন্য, তাঁহার গমনের ভার আমি লইলাম, তোমাকে ৪।৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র গৃহে যাও।" কায়স্থ ঠাকুরের পদ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় সাধক কেণারাম ও বিশুকে লইয়া যাইবার জন্য সাঁকো মোহন পুরের ব্রাহ্মণের জনৈক দাস কোটালহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধক আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তিনি কেণারাম ও বিশুকে কহিলেন, "আমি ভ্রম বশত আমাদের পরিচিত ভৈটে পালসিটের সেই বিনীত কায়স্থের বাটীতে কল্য প্রত্যুষে উপস্থিত হইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি। কল্য প্রত্যুষে আমাদের সাঁকো মোহন পুরে যাইবার কথা স্থিরীকৃত আছে। আমরা উভয় স্থলে যথা সময়ে উপস্থিত না হইতে পারিলে তাঁহারা উভয়েই দুঃখিত হইবেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনাদির বিলম্ব ও বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। ভৈটে ও সাঁকো প্রায় ৭ ক্রোশ

দূরবর্ত্তী, এক সময়ে এক দিনে উভয় স্থানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আপনি যখন ভৈটে যাবার কথা দিয়েছেন, আমরা ত কিছুই জানি না। এখন উপায় কি? ঠাকুর আমাদের ভোলা মহেশ্বর। নিশ্চয়ই কায়স্থটী প্রাণ খুলে নিজের দুঃখ আকিঞ্চন জানিয়েছেন, ঠাকুর তার মনের ভাব দেখে, দুঃখ ভেবে, সাকো মোহন পুরের কথা ভুলে গেছেন।" সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি আমার স্থানীয় হইয়া মোহনপুরে যাও, আমি কাল ভৈটে যাইব।" বিশু কহিল, "আমার একা মোহন পুর যাওয়া হবে না, শুনুন ঠাকুর! আমার একটা কথা মনে পড়লো, আমি একদিন কালিয়াদমন যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। প্রথমে ব্যাসদেব তারপর তার চেলা কাশদেব এল। সকলেই বলতে লাগলো এর পর মূল গায়েন আসবে। কাশদেব মুখ ভঙ্গি করে, লোক গুলোকে হাসাতে লাগলো। অনেক ক্ষণ ধরে, কাশদেব আসর রাখলে। ভদ্রলোক সব ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলো। একজন ভদ্রলোক আর না থাকতে পেরে দাঁড়িয়ে কাশদেবকে বল্লেন, "ও কি হচ্ছে? কেন সময় নষ্ট কচ্ছ? যাও মূল গায়েনকে পাঠিয়ে দাও।" কাশদেব সংসেজে এসেছিল, তাড়া খেয়ে আসর ছেড়ে পালাল। ঠাকুর আমারও প্রায় সেই দশা হবে। আমাকে একলা দেখে সাকো মোহন পুরের ভক্তবৃন্দ কেউ সন্তুষ্ট হবেন না।" সাধক একটু হাসিয়া কহিলেন, "বিশু! আমি কাহাকেও কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। এখন উপায় কি?" ইহা কহিয়া সাধক সম্মুখস্থ প্রসন্নময়ী বিমলার প্রতি কাতর নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মা! তুমি ত আমার অন্তরে ছিলে, যাহা বলিয়াছ তুমিই বলিয়াছ, আমি কিছুই জানি না।" ইহা কহিয়া সাধক ধ্যানস্থ হইলেন। বিশু ও কেণারাম সাধকের ভাব দেখিয়া ভীত ভাবে তাঁহার নিকট উপবিষ্ঠ রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধক কহিলেন, "বিশু! ভৈটে পালসিটের কায়স্থের ভক্তিগুণে মায়ের তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠান হইবার ইচ্ছা। নিশ্চয়ই আমাদের বেশে কায়স্থের গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইবে। ইচ্ছাময়ীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। আমরা কল্য প্রভাতে সাকো মোহন পুরে গমন করিব। ইহা কহিয়া সাধক কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ

মরকত-মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ।

মরকত মোহিনীর স্বয়ম্বরের দিন সমাগত। দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে দিগ্‌দেশীয় নৃপ কুমারেরা একে একে আগমন করিতে ছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যা কালে সভাভূমিতে সকলে একত্র। স্বয়ম্বর সভা পরিপাটিরূপে সজ্জিত, পরিপাটিরূপে আলোকিত। মণিরত্ন ভূষিত রাজপুত্রেরা স্বগৌরবে সারি সারি উপবিষ্ট। বীর বরেন্দ্র বাহাদুর মানসের পূর্ণ আশায় রমণীরঞ্জন বেশভূষা করিয়া স্বগৌরবে সভাস্থ হইয়াছেন; যুদ্ধে যাহারা পরাস্ত হইয়াছিলেন, সেই দুটী রাজপুত্রও অনুপস্থিত নাই। সকলেই মনে মনে ভাবিতেছেন, সর্ব্বাপেক্ষা আমিই রূপবান, সর্ব্বাপেক্ষা আমার বেশভূষা মহামূল্য, সর্ব্বাপেক্ষা আমার বংশমর্য্যাদা অধিক, রাজকুমারী মরকত মোহিনী আমাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন।

সকলের ভাবনা সকলের মনে মনেই সমভাবে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। রাত্রি এক প্রহর। পঞ্জিকা বিহিত নগ্নানুসারে বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ। এইবার রাজকন্যা সভায় আসিবেন, এইবার রাজকন্যা আপন মনোমত পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন, সেই আনন্দে নরেন্দ্রকুমারেরা প্রফুল্ল হইতে লাগিলেন; কোন দিক দিয়া রাজকন্যা আসিবেন, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

লগ্নকাল নিকটবর্ত্তী, অন্তঃপুরে সংবাদ দিবার নিমিত্ত লোক প্রেরিত হইল। সহচরী সঙ্গিনী রাজনন্দিনী মরকত মোহিনী স্বয়ম্বর সভায় আসিতেছেন, একটী সহচরীর হস্তে কাঞ্চন পাত্রে পুষ্প মাল্য চন্দন, উভয় পার্শ্বে দুটি সহচরীর হস্তে দুটি শ্বেত চামর।

বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজকন্যা কেন এখনও আসিতেছেন না, সেই উদ্বেগে সকলেই নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছেন, হঠাৎ অন্তঃপুরের দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। রাজকন্যা সভায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে

সর্পে দংশন করিয়াছে, রাজকন্যা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ফেনপুঞ্জ বিনির্গত হইতেছে, মুখখানি নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে এই নির্ঘাত সংবাদ রাজসভায় পৌছিল। রাজা অকস্মাৎ কন্যাশোকে উন্মত্ত প্রায় হইলেন; সমাগত কুমারগণের প্রফুল্ল বদন ম্লান হইয়া গেল, কুমার বীর বরেন্দ্র যেন জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিলেন। যেখানে সর্পাঘাত, কতিপয় বিষ বৈদ্যকে আহ্বান করিয়া রাজা অমরনাথ তৎক্ষণাৎ সেইস্থলে গমন করিলেন। ধূলি ধূসরিতা প্রিয়তমা কন্যার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে রাজা আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া অনবরত বিলাপ করিতে লাগিলেন, রুদ্যমানা রাজমহিষিও যেন পাগলিনী। নানাপ্রকার চিকিৎসা হইল, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। সকলেই মনে করিল, প্রাণবায়ু বহির্গত!

সুখের স্বয়ম্বরসভা মহা অসুখের ভঙ্গ হইয়া গেল, নিমন্ত্রিত রাজপুত্রেরা ভগ্নান্তঃকরণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বাকি এখন রাজকন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। রাত্রিকালে সকলেই শোকাকুল, সুতরাং রাত্রিকালে আর শ্মশানের কার্য্য হইয়া উঠিল না, স্বয়ম্বর ক্ষেত্র যেন সে রাত্রে শ্মশান হইয়া রহিল। পর দিবস প্রত্যুষে রাজা অমরনাথ বলিলেন, "এ স্বর্ণপ্রতিমা আমি শ্মশানে দগ্ধ করিতে দিব না, অন্য কোন উপায়ে ইহার সৎক্রিয়া সমাধা করিবার ব্যবস্থা কর।"

অমাত্যগণ, পুরোহিতগণ, বৈদ্যগণ একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী উপায় স্থির করিলেন, যে কাষ্ঠ জলে ডুবিয়া যায় না, সেই কাষ্ঠের দ্বারা সুন্দর একটী সিন্দুক নির্ম্মাণ করা হইল, বায়ু প্রবেশের জন্য সেই সিন্দুকের চারিচারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখা হইল; একটী বৃক্ষপত্রের রস মাখাইয়া কন্যার দেহখানি কবিরাজ মহাশয়েরা সেই সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিলেন, সমস্ত অলঙ্কার বস্ত্র সেই অচেতন অঙ্গে অক্ষত রহিল, রাজার আদেশে সাশ্রুনেত্র বাহকেরা সেই সিন্দুকটী চাবিবন্ধ করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীর জলে ভাসাইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।

মরকত মোহিনীর বিয়োগ শোকটা রাজসংসারে কিছু বেশী লাগিয়াছে। রাজা অমরনাথের প্রথমাকন্যা সেই মরকত মোহিনী। পুত্র সন্তান জন্মে নাই,

মরকত মোহিনী যখন অষ্টম কি নবম বর্ষীয়া, সেই সময়ে মহিষী একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্রটি দুই বৎসরের হইলে অকস্মাৎ একদিন অদৃশ্য হইয়া যায়। কতদিকে কতলোক অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল, জলমগ্নের সন্দেহে সরোবরে সরোবরে জাল ফেলা হইয়াছিল, কেহই কিছু সন্ধান পায় নাই, কিছুতেই পুত্রটিকে পাওয়া যায় নাই। একজন দ্বারিপালের এক বালিকা কন্যা বলিয়াছিল, একজন পথিক একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত্রটিকে কোলে করিয়া নদীর পথে লইয়া গিয়াছে! বালিকার কথায় কেহ কেহ বিশ্বাস করে নাই, কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল। অলঙ্কার লোভে অথবা অন্য কোন মতলবে পুত্র কন্যা হরণের সমাচার প্রায়ই মধ্যে মধ্যে শ্রবণ করা যায়। তাহা মনে করিয়াই কাহারও কাহারও বিশ্বাস। বাস্তবিক রাজপুত্রটি কোথায় গেল, কি হইল, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার বিশেষ তত্ত্ব কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুত্র শোকাতুর রাজা বিয়োগবিধুরা রাজ্ঞী, ঐ মরকত মোহিনীর মুখ চাহিয়াই কতক পরিমাণে সে শোকটা ভুলিয়াছিলেন। সেই মরকত মোহিনী গেল। অকালে অপঘাতে সর্পাঘাতে মরকত মোহিনী রাজপুরীর সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। রাজ সংসারে এ শোক অবশ্যই গুরুতর—এ কথা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অরাজবংশীয় আর দুই ব্যক্তি মরকত মোহিনীর পাণি প্রার্থী হইয়াছিল। একজনের নাম রায়মঙ্গল, দ্বিতীয়ের নাম বিজয়মাধব। রায়মঙ্গল প্রত্যাখাত হইলে, বিজয়মাধব কিছুদিন রাজ সংসারেই বাস করিয়াছিলেন। বিজয়মাধবের জন্মস্থান কোথায়, তাহার মাতা পিতাকে সকলে তাহা জানিত না। রাজা অমরনাথ স্বয়ং কিছু কিছু জানিতেন, বিজয়ের শিষ্টাচারে রাজা তাহাকে ভালও বাসিতেন। বংশ পরিচয়ে নিকৃষ্ট ছিল না, অতএব রাজার সেই ভালবাসা আরও কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছিল, অপুত্রক রাজা সেই বয়ঃপ্রাপ্ত বিজয়মাধবকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে ছিলেন। বিজয়মাধব রাজাকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, রাজাও তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এ সম্বন্ধ যখন হয় নাই তখন বিজয়মাধব মরকত মোহিনীর রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণি গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে তাহার সে অভিলাষ দূর হইয়া যায়, তদবধি মরকত মোহিনীকে বিজয়মাধব ভগ্নী ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন।

চন্দ্রচূড় পর্ব্বতের উপত্যকায়, নরোত্তম ঠাকুরের আশ্রমে সেই বিজয়মাধব আপনাকে রাজা অমরনাথের দত্তকপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। নাম

বলিয়াছিল সমরনাথ। নামটি সত্য হইলেও সমরনাথ বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে রাজা অমরনাথের দত্তকপুত্র বলিয়া গৃহীত অথবা স্বীকৃত হয় নাই। পরিচিত লোকেরা তাহাকে রাজার পালিত পুত্র বলিয়া জানিত। সমরনাথের যথার্থ পরিচয় কি, সময়ান্তরে উপযুক্ত অবসরে তাহা প্রকাশ পাইবে। এখন কেবল এইটুকু প্রকাশ থাকুক, রায়মঙ্গল ওরফে নরোত্তম ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বিজয়মাধবকে দেখেন নাই—কেবল নামটি মাত্র শুনিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসীর আশ্রমে আদালতের উকিলের জেরার ন্যায় জেরার মুখে সমরনাথের প্রথম নাম প্রকাশ পাইল, নরোত্তম ঠাকুর তাহাকে প্রতিযোগী বৈরী জ্ঞান করিয়া, মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে! রাজার পালিত পুত্র হইয়া সমরনাথ সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় লইতে গিয়াছিলেন কেন, সংক্ষেপে আমরা এই স্থানে সেই কথাটি ব্যক্ত করিব।

সমস্ত জনপদেই সৎলোক অপেক্ষা দুষ্টলোক অধিক থাকে। রাজা অমরনাথের রাজ্যের জনকতক দুষ্টলোক সমরনাথকে বিষ নয়নে দেখিত। সমরনাথেরও কিছু দোষ ছিল। রাজপুত্র হইয়াছি, মনে করিয়া সমরনাথ সকলকে সমভাবে গ্রাহ্য করিতেন না। মরকত মোহিনীর বিসর্জ্জনের পর ষড়যন্ত্র করিয়া সেই সকল লোক রাজ্য মধ্যে রটাইয়া ছিল, সর্পাঘাতে রাজকন্যার মৃত্যু হয় নাই; বিজয়মাধব নামে সমরনাথ তৎপূর্ব্বে রাজকন্যার পাণি প্রার্থী হইয়াছিল, বর্ত্তমান সম্বন্ধে সে সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না! স্বয়ংবরে অন্য বরে মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিবে, সেই হেতু সমরনাথের ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। সেই ঈর্ষাবশে সমরনাথ গোপনে বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর মরকত মোহিনীকে বিষ খাওয়াইয়া ছিল। তাহাতেই মরকত মোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে।

শোকোন্মত্ত রাজা সেই সকল দুষ্টলোকের রচিত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সমরনাথের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন! সমরনাথ প্রাণভয়ে রাজ্য হইতে পলাইয়া যান। মিথ্যা কথাটা সত্য বলিয়া নিজেই তিনি নরোত্তমের নিকটে স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি স্ত্রীহত্যা করিয়াছি বলিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীও মিথ্যা সন্ন্যাসী। সমরনাথও মিথ্যা হত্যাকারী পলায়ন সময়ে রাজ অনুচরেরা সমরনাথের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, প্রথম পরিচ্ছেদে তাহা প্রকাশ আছে। সমরনাথ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক। নরোত্তম নামধারী রায়মঙ্গলও উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক। রায়মঙ্গল মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়া ছিলেন, সুতরাং সমরনাথ তাহার প্রতিদ্বন্দী। পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া

সেই ধারণাই তাহার মনে আইসে, পরমেশ্বর রক্ষা না করিলে সেই রাত্রেই হয়ত পর্ব্বতারণ্যে রায়মঙ্গলের হস্তে সমরনাথের প্রাণ যাইত। কি প্রকারে রক্ষা হইল তাহাও আর অপ্রকাশ রাখা সঙ্গত বোধ করা গেল না। পাঁচজন অস্ত্রধারী রাজপুরুষ সমরনাথের অন্বেষণে পর্ব্বতশিখরে উঠিয়াছিল। বিলম্বে তাহারা নামিয়া আইসে। সন্ন্যাসী সেই হত্যাকারীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে এইরূপ সন্দেহ করিয়া তাহারা অধিক রাত্রে নরোত্তমের আশ্রমের সম্মুখে মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়। কি ব্যাপার জানিবার জন্য আশ্রমের পশ্চাৎ হইতে নরোত্তম ঠাকুর সম্মুখে ছুটিয়া আইসেন। কথায় কথায় রাজানুচরগণের সহিত তাহার ঘোরতর কলহ আরম্ভ হয়, সেই অবসরে সমরনাথ অরণ্য পথ দিয়া পলায়ন করেন। তাহার অশ্ব যেখানে ছিল, সেখানেও অরণ্য। সেই রাত্রিকালে স্থানটাও নিরাপদ। সমরনাথ সৌভাগ্যবশে পরিত্যক্ত অশ্বটিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তদারোহণে অন্য দিকে প্রস্থান করেন। অনুচরগণের অস্ত্রে আহত হইয়া নরোত্তম ঠাকুর রাজধানীতে আনিত হন। সমরনাথকে পাওয়া যায় না। মরকত মোহিনীর শোকে সমরনাথ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, বিবাহ হইল না, সেই জন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাবনার্থ পূর্ব্ব প্রেমাকাঙ্ক্ষা স্মরণ করিয়া, মিথ্যা অপবাদ শিরে ধরিয়া সমরনাথ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কোথায় আছেন, কোথায় কি করিতেছেন, কেহই কিছু সন্ধান জানে না।

রায়মঙ্গল আহত অবস্থায় রাজধানীতে নীত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। সমরনাথের পলায়নে তাহার কোন দোষ নাই, রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া মিথ্যা অভিযোগ হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। সে মুক্তি রায়মঙ্গলের চিত্তের শান্তিদায়িনী হয় নাই। মরকতমোহিনী যৌবনাঙ্কুরে সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, পরিণয়াকাঙ্ক্ষা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জলশায়িনী হইয়াছে, ক্ষোভে দুঃখে বিরহে, রুগ্নাবস্থাতেও রায়মঙ্গল ক্ষিপ্তপ্রায়। ক্ষণে ক্ষণে প্রেমের কথা মনে পড়ে, ক্ষণে ক্ষণে মরকতের রূপ লাবণ্য মনে পড়ে, ক্ষণে ক্ষণে সকলের অলক্ষিতে দুটি চক্ষে জল পড়ে। ইহার নাম উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। এই লোকটির পরিণাম কি হইবে, সমরনাথের পরিণাম কি হইবে, তাহা আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে দর্শন করিব।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী সংসারী।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিপ্রকুমার মাধব মহারণ্যে সন্ন্যাসী হইয়াছে। দিন গণনায় মাধব এখন দুই বৎসরের সন্ন্যাসী। মাধবের বয়ঃক্রম এখন ষোড়শ বর্ষ। প্রাতঃস্নান, মন্ত্র জপ, গুরুসেবা, এই তিনটি মাধবের নিত্যকর্ম্ম। ইহা ভিন্ন মাধবের আর অন্য কর্ম্ম করে না, অন্য প্রকার চিন্তাও মনে আনে না। যে রাত্রে মরকত মোহিনীর সর্পাঘাতে মৃত্যু প্রচার, তাহার সপ্তাহ পরে মাধব অভ্যাসমত নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রাতঃস্নানে গিয়াছেন। স্নান করিয়া তীরে বসিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছে, এমন সময়ে দেখিল, নদীর স্রোতোবেগে একটী অপরূপ সিন্দুক ভাসিয়া আসিতেছে। মাধব যেখানে বসিয়া জপ করিতেছিল, ভাসিতে ভাসিতে সিন্দুকটি আসিয়া তাহার নিকটে লাগিল। ধীবরেরা মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত নদীর ধারে ধারে বেড়া দিয়া রাখিত, সেই সিন্দুকটি সেই সকল বংশখণ্ডে আটকাইয়া গেল। মাধব দেখিল, সিন্দুক আর ভাসে না। কোথাকার সিন্দুক, কাহার সিন্দুক, কিসের সিন্দুক, মাধবের মনে উপর্য্যুপরি তিন প্রকার তর্ক আসিল। তর্কের মীমাংসা হইল না।

সিন্দুকটি দেখিতে অতি সুন্দর। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইলেও জপমগ্ন সন্ন্যাসী বেশধারী হইলেও মাধব তখনও বালক। সুন্দর বস্তু দেখিলেই বালকেরা তাহা লাভ করিবার আশা করে, মাধব ভাবিল, এই সিন্দুকটি যদি লওয়া যায়, তাহা হইলে বল্কল মাল্যাদি রাখিবার সুবিধা হইতে পারে। এই মনে করিয়া পুনর্ব্বার জলে নামিয়া যথাশক্তি দুই হাতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া মাধব সেই সিন্দুকটি তীরে তুলিল। চাবিবন্ধ।

হঠাৎ মাধবের মনে হইল, কাহারও যত্নের বস্তু, যখন চাবিবন্ধ রহিয়াছে, তখন অস্বাভাবিক নহে, গুরুদেবের আজ্ঞা ব্যতীরেকে পরের দ্রব্য গ্রহণ করা হইবে না, এইরূপ ধর্ম্ম বুদ্ধিতে মাধব তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া গেল। সিন্দুকের কথা বলিল। গুরুদেব হাস্য করিলেন।

আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভবানন্দ স্বামী গাত্রোত্থান করিলেন, মাধবকে বলিলেন, "চল, দেখিব, তোমার সিন্দুকটি কেমন।"

মাধবের সাহস হইল, আনন্দ হইল, বস্তুটি লাভ করিবার আশাও বাড়িল।

শিষ্য সমভিব্যাহারে ভবানন্দ স্বামী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত অতি অপরূপরূপ সিন্দুক। মাধবকে বলিলেন, "ধর, উভয়ে ধরিয়া আইস আমরা সিন্দুকটি আশ্রমে লইয়া যাই।"

তাহাই হইল। সিন্দুকটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পঁহুছিল। মাধবের মুখখানি কিছু বিবর্ণ। আনয়ন সময়ে মাধব বুঝিয়াছে, বাহ্য আয়তন অপেক্ষা সিন্দুকটি কিছু ভারি। কি বস্তু ইহার মধ্যে আছে, তাহাই যেন কিছু ভাবিতে ভাবিতে মাধবের মুখখানি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল। স্বামিজী তাহা দেখিলেন, দেখিয়াও যেন দেখিলেন না। মুখেও কিছু বলিলেন না। চাবি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অতি সহজেই কুলুপের শৃঙ্খলটি ভগ্ন হইয়া গেল। ডালা খুলিয়াই রোমাঞ্চিত কলেবরে গম্ভীরবদনে, স্বামিজী দুই তিনপদ পশ্চাতে হটিলেন। চাবি ভাঙ্গিবার অবসরে মাধবকে নিতান্ত নিকটে থাকিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। মাধব একটু দূরে ছিল, সিন্দুকে কি আছে, মাধব তখন দেখিতে পাইল না।

প্রথমে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, পরক্ষণেই স্বামিজী অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার সিন্দুকের বস্তুটী দেখিলেন। একবার হেট হইয়া হস্তদ্বারা সেই বস্তুটির দুই তিন স্থান স্পর্শ করিলেন। বদন প্রফুল্ল হইল।

প্রফুল্ল কেন হইল, স্বামিজীর অনুভূত হেতুটি আমরা এস্থলে বুঝাইব। সিন্দুকে যাহা আছে, সারজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা তাহা বুঝিয়াছেন। সিন্দুকে একটি কন্যা। স্পর্শ দ্বারা স্বামিজী বুঝিয়াছেন, নাসারন্ধ্রে মৃদু মৃদু নিশ্বাস আছে অধরোষ্ঠে এবং উরসে অল্প অল্প কম্পন আছে। সেই লক্ষণ বুঝিয়াই তিনি প্রফুল্ল। সিন্দুকের নিকট হইতে অল্প দূরে গিয়া স্বামিজী সেই প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের কয়েকটি শিকড় উত্তোলন করিলেন, হস্ত পেষণে সেই সকল শিকড়ের রস গ্রহণ পূর্ব্বক একটি মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন করিয়া সেই পাত্র হস্তে পুনর্ব্বার সিন্দুকের নিকটবর্ত্তী হইলেন, অশ্বত্থমূলের রসটুকু সেই সিন্দুকস্থ কন্যার দুই তিন অঙ্গে উত্তম রূপে লেপন করিলেন; দুই তিন লহমার মধ্যে কন্যাটি আপনার প্রকৃত বর্ণ পুনঃ প্রাপ্ত হইল। সুন্দর মুখখানি নীলবর্ণ হইয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ মলিন হইয়াছিল, অল্পে অল্পে আরক্ত গৌরবর্ণ ধারণ করিল; গুরুদেবের নেত্র আনন্দে বিস্ফারিত।

প্রথম দর্শনে, প্রথম বিস্ময়ে, তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল, বদন গম্ভীর

হইয়াছিল, নিকট হইতে একটু দূরে তিনি সরিয়া গিয়াছিলেন, সে ক্রিয়াগুলি নিষ্কারণ ছিল না। কন্যার যদি নিশ্বাস আছে, তবে ইহার পিতা মাতা ইহাকে ভাসাইয়া ছিল কেন? গম্ভীর বদনে ইহাই গুরুজী ভাবিয়া ছিলেন। ভাবনায় এই মীমাংসা হয় যে, ভাসাইবার সময় নিশ্বাস ছিল না, নদীস্রোতে ক্রমাগত ভাসিয়া ভাসিয়া শীতল বাতাসে শীতল সলিলকণা স্পর্শে, অল্পে অল্পে বিষক্ষয় হইয়া নদীবক্ষেই নিশ্বাস ফিরিয়াছে। বর্ণ অঙ্গটি নীলবর্ণ হইয়াই রহিয়াছে। গুরুদেবের মানসিক মীমাংসায় ইহাই স্থির হইয়াছিল। যে ঔষধ তিনি প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ বিষক্ষয় হইয়া দেহকান্তি ফিরিয়া আসিল। নিন্দুকের কন্যা সিন্দুকেই রহিল!

মাধব দূরে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নয়নে গুরুদেবের কার্য্যের প্রক্রিয়াগুলি দর্শন করিতেছিল। গুরুজি তাহাকে ডাকিলেন, মাধব সমীপবর্ত্তী হইলে, সিন্দুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গুরুজি বলিলেন, "দেখ, মাধব! সিন্দুকের মধ্যে কি আছে দেখ।"

মাধব দেখিল, নাটক লিখিত মনঃকল্পিত অপ্সরা। মাধবের হৃদয় সমুদ্রে তখন কোন কোন ভাবের লহরী ক্রীড়া হইল, মাধব ভিন্ন আর কেহ তাহা বলিতে পারিবেনা।

সিন্দুকের কন্যাটি রাজা অমরনাথের প্রাণসমা দুহিতা। সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মরকত মোহিনী, এ পরিচয় পাঠক মহাশয় আর জানিতে চাহিবেন না। মাধব সেই মরকত মোহিনীকে চিনিতে পারিল। মাধব ক্রমশঃ পাঁচ বৎসর রাজার দেবালয়ে পিতার নিকট ছিল। মরকত মোহিনী সেই রাজার কন্যা। নবম বর্ষ বয়সে মাধব সে দেবালয়ে আশ্রয় পাইয়াছিল, রাজকন্যা মরকত মোহিনীও তখন নবমবর্ষীয়া। স্বভাবের নির্ব্বন্ধে উভয়ের বয়স ঠিক এক সমান। নবম বর্ষীয় বালকের সহিত নবমবর্ষীয়া বালিকার, ধূলাখেলা করা অস্বাভাবিক নহে। সর্ব্বদা না হউক, মাধবের সহিত মরকত মোহিনীর এক একদিন নিশ্চয়ই ধূলা খেলা হইয়াছিল। মরকত মোহিনীকে চিনেতে মাধবের কত বিলম্ব হওয়া সম্ভব? কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। শৈশবে, বালক বালিকাতে সদ্ভাব সঞ্চারিত হইলে সে বালিকা যৌবনকালেও সেই বালককে দেখিয়া লজ্জা করিতে পারে না, করে না। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে মাধবের শিরোচ্ছেদনের আদেশ, মরকত মোহিনী তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া। মরকত মোহিনীর দেহলতায় তখন যৌবনের মূল ফুটিতেছে; সেই নবযৌবনস্ফুরিতা সুন্দরী রাজকুমারী মরকত

মোহিনী সে সময়েও অবাধে মাধবের সহিত হাস্য কৌতুক করিয়াছিলেন; সেই মরকত মোহিনীকে চিনিতে মাধবের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, পাছে ভ্রম থাকে বলিয়া ভাবিয়া সেই কথাটী আমরা এইস্থলে আবার বলিলাম।

মাধবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে যথাসম্ভব চিন্তাতরঙ্গ অনেক। গুরুজি তাহাকে আর অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই অকস্মাৎ বলিলেন, "রাজ কন্যাকে তুমি চিনিয়াছ? নিশ্চয় চিনিয়াছ। তাই রাজ কন্যার নাম মরকত মোহিনী। মাধব! প্রিয় বৎস্য! আমি তোমার"—

গুরুদেব একবার দক্ষিণ হস্তের প্রান্তভাগ দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়নাশ্রু পরিমার্জ্জন করিলেন। গম্ভীর স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, "মাধব! আমি তোমারে সন্ন্যাসী করিয়াছিলাম, আবার আমি তোমারে সংসারী করিলাম। এই মরকত মোহিনীকে লইয়া তুমি আশ্রমে যাও—গান্ধর্ব্ব বিধানে ইহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে। সন্ন্যাস ধর্ম্মের অন্য কোন অঙ্গে আর তোমার অধিকার থাকিবে না, কেবল এক ইষ্টমন্ত্র জপে তোমার অধিকার থাকিবে। সন্ন্যাসীর বেশ পর্য্যন্ত আমি তোমারে পরিত্যাগ করাইব। চল, রাজ কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক সিন্দুক হইতে উত্তোলন করিয়া সঙ্গে লইয়া চল, আশ্রমে উপস্থিত হইলে, সংসারের উপযোগী করিয়া সে আশ্রম সাজাইয়া দিব চল।

মরকত মোহিনী অনেক কষ্টে সিন্দুকের মধ্যে উঠিয়া বসিয়া ছিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা কাতরা মলিনা, শীর্ণা, বিশুষ্ক বদনা, রুক্ষকেশা, মরকত মোহিনী মহাপুরুষের হস্তস্পর্শে সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়াছেন, কেবল দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। গুরুদেবের আদেশে মাধব তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সিন্দুক হইতে বাহির করিল। গুরুদেব অগ্রে অগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে মাধব আর মরকত মোহিনী। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, বিসর্জ্জনের সময় মরকত মোহিনীর কোমলাঙ্গের বস্ত্রাভরণ, কিছুমাত্র স্থানভ্রষ্ট করা হয় নাই। পরিশেষ শোভন বস্ত্রালঙ্কারে ততশীর্ণ পরীরেও মরকত মোহিনীর রূপের শোভা যেন কতই উজ্জ্বল দেখাইতেছে, রূপের প্রভায় বনস্থলী দিবাভাগেও নূতন প্রকারে আলোকিত হইতেছে, বন আলো করিয়া মরকত মোহিনী চলিয়াছেন।

অশ্বত্থমূল হইতে মাধবের আশ্রম কিছুদূরে, কতকগুলি নিবীড় পল্লব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুর অন্তরালে সেই আশ্রম বিনির্ম্মিত। অশ্বত্থমূল হইতে সে আশ্রম দেখা যায় না। অনেকগুলি বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া তাহারা তিনজনে আশ্রম সম্মুখে

আসিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মাধব আপনার উত্তরীয় বস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষ মালা যথাস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক, পুনরায় বাহিরে আসিল। গুরুদেব কহিলেন, মাধব, রাজকন্যা ক্ষুধার্ত্তা আছেন, কতকগুলি সুস্বাদু ফল আহরণ কর।" মাধব তাহাই করিল। তিনজনে কিছু কিছু ফলভক্ষণ করিয়া আশ্রমের সুশীতল জল পান করিয়া অনেক পরিমাণে সুশীতল হইলেন। রাজকন্যার বসন ভূষণ আছে, মাধব মৃগচর্ম্মধারী, মাধবের পার্শ্বে মরকত মোহিনী যেন হর পার্শ্ববর্ত্তিনী হৈমবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। গুরুদেবের চক্ষে তাহা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক। সেই মুহূর্ত্তেই যেন, কোন অদৃশ্য অনুচর অন্তরীক্ষ হইতে ভবানন্দ স্বামীর আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীগুলি আশ্রম সন্নিকটে নিক্ষেপ করিল।

মাধবকে সুন্দর বসনে সজ্জিত করিয়া সহাস্য বদনে গুরুদেব কহিলেন, "মাধব! মৃগচর্ম্মের প্রতি তাচ্ছিল্য করিও না—আর একদিন তোমারে ঐ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে হইবে।"

মাধব নিরুত্তর হইয়া রহিল। রাজকন্যা যতদিন আশ্রমে থাকিবেন, তত দিনের জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। শূন্য দূতে যাহা আনয়ন করিয়াছে তাহার মধ্যে বস্ত্র অলঙ্কার শয্যা তৈজসপত্র বর্ত্তিকা বর্ত্তিকাধার ইত্যাদি যাহা কিছু নির্জ্জনবাসী সংসারী লোকের প্রয়োজন, তৎসমস্তই আছে! রাজকন্যাকে তৃণাসনে শয়ন করিতে হইবে না, মৃন্ময়ভাণ্ডে অথবা পত্র পুটকে জলপান করিতে হইবে না, স্বামিজীর প্রসাদে তাহাদের কোন বস্তুর অভাব রহিল না।

স্বামিজী বৃক্ষমূলে গেলেন। মাধবের সহিত মরকত মোহিনী আশ্রমে রহিলেন। তৃতীয় দিবসে গুরুদেব সমক্ষে গান্ধর্ব্ব বিধানে তাহাদের বিবাহ হইল। একপক্ষকাল সেই নবীন দম্পতী দিবাভাগে বিশ্রম্ভ আলাপে সুখে অতিবাহিত করিলেন, নিশাকালে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিলেন। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে একপক্ষ কাল কাটিয়া গেল। মাধব সংসারী হইলেন, সন্ন্যাস সুখের ছিল, কিম্বা সংসার সুখের হইল তুলনা করিয়া মাধব তাহা স্থির করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

অনিলের বৈরাগ্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

(১)

মেসের একটী আধ অন্ধকার কক্ষে অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অনিল হাতের বইগুলি টেবিলের উপর ছুড়িয়া দিল। অনিলের অতর্কিত আগমনে গৃহমধ্যস্থ পাঠনিরত রমেন হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "কি অনিল দা! এত সকাল সকাল কলেজ থেকে ফিরলে যে? বলি ব্যাপার কি? বউদির খপর ভাল তো?" তথাপি অনিলকে নিরুত্তর দেখিয়া রমেন পুনরায় কহিল, "কি আমার কথার উত্তর দেবে না? না দাও তোমারই ক্ষতি, দিলে বরং দু চারটে উপদেশ দিতে পারতুম। যখন দেবেই না, তখন আর কি করি বল?"

"যা যা, বকামি করতে হবেনা। জানিস্ সব সময়ে মানুষের ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না। একটা সময় অসময় আছে।" বলিয়াই ক্রুদ্ধ অনিল নিজের বিছানার উপর সশব্দে একপাশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। রমেনও বেগতিক দেখিয়া পুনরায় পাঠে মনঃসংযোগ করিল।

রমেন ও অনিলের বাড়ী একই গ্রামে—পুষ্পপুরে। গ্রামখানিতে ভাল ছেলে বলিয়া তাহাদের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। বৎসর দুই বড় বলিয়াই হউক অথবা গ্রাম সম্পর্কেই হউক, অনিলকে রমেন দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত।

অতি শৈশবকাল হইতেই তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিত। একসঙ্গে খেলাধূলা হইতে স্কুলে যাওয়া ও সকাল সন্ধ্যায় ভ্রমণ করা পর্য্যন্ত যেন তাহাদের দৈনন্দিন কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে এক বিষয়ে তাহারা সমান হইতে পারে নাই—অনিল রমেন অপেক্ষা এক ক্লাস উঁচুতেই পড়িত। এবং ইহাই ছিল তাহাদের আক্ষেপের বিষয়। ভগবান তাহাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে সমান করিয়া ইহাতেই বা বাদ সাধিলেন কেন? যাহা হউক, একটা বিষয়ে পৃথক হইয়া পড়িলেন তাহারা পরস্পরকে মনোমত সঙ্গীরূপে পাইয়া সানন্দে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অনিল এখন ইউনিভার্সিটিতে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, রমেন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে প্রোমোশন পাইয়া বি, এ, পরীক্ষার

জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কলেজের ছুটী হইয়াছে, বলিয়া সে দেশে না যাইয়া কলিকাতার মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে। তাহার ধারণা বাড়ীতে গেলে তাহার বিন্দুমাত্র লেখা পড়া হয় না, কলিকাতার মেসই তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত ভাল।

সংসারে অনিলের মাতা ও অবিবাহিতা একটী ছোট ভগ্নী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পিতা বহুদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্থাবর অস্থাবর প্রভূত অর্থ এই বিধবা ও তাঁহার সন্তান দুইটীর জন্য রাখিয়া যান। সুতরাং অর্থকষ্ট অনিলের আদৌ ছিল না, তাই পিতৃহীন হইলেও সে নির্ব্বিবাদে লেখাপড়া শিখিতে পাইয়াছিল।

অনিল বরাবরই ভালমানুষ, নিরীহ প্রকৃতির; যখন যেটা করিত খেয়ালের বশে আপন মনেই করিয়া যাইত। কোন জিনিষ তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার একদম ছিল না; কিন্তু তাহার এই একমাত্র গুপ্ত দৌর্ব্বল্যটুকু জানাছিল শুধু রমেনেরই, তাই সময়ে অসময়ে এই দুর্ব্বলতাটুকুর সহায়তায় মজা দেখিবার জন্য সে অনিলকে রাগাইতে ত্রুটী করিত না। আর একটী দোষ অনিলের ছিল যে, সে তাহার নব পরিণীতা পত্নীকে একটু অধিক পরিমাণে ভালবাসিয়াছিল। এই জন্য রমেন বেচারা অনিলকে "ষ্টেন" আখ্যা প্রদান করিয়া মেসের প্রত্যেকের কাছে একদিন বলিয়াছিল যে তাহার অনিল দা বৌদিকে একটু অধিক পরিমাণেই ভালবাসে, তবে সে পরিমাণ যে কতটা তাহা বলিলে অনিলদা নাকি তাহার গায়ের হাড় একখানিও আস্ত রাখিবে না। তাহার কথা শুনিয়া এবং ক্রুদ্ধ অনিলকে লক্ষ্য করিয়া মেসের সকলেই সেদিন অত্যন্ত হাসিয়াছিল।

রমেন বেশ একটু চালাক চতুর। দেশে তাহার বাপ মা ভাই বোন সকলই আছে। অনিলের অবস্থাপন্ন না হইলেও তাহারা একেবারে দরিদ্রছিল না। ভরণ পোষণের জন্য তাহাদের কখনও বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে হয় নাই। অনিলের মাকে সে কাকীমা বলিয়া ডাকিত এবং তাঁহাদের বাড়ীতে তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল। অনিলের মাতাও রমেনকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, রমেনকে এবং অনিলকে তিনি ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন না।

* * * *

অনেকক্ষণ একপার্শ্বে চুপ করিয়া থাকিবার পর অনিল সহসা বলিল, "আচ্ছা রমেন, এটা ভারি অন্যায় নয়?"

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই রমেন বলিল, "কোনটা অনিলদা?"

"আঃ তুই কি কিছু বুঝিলি? বাস্তবিক তোর বুদ্ধিটা চিরকালই কিছু কম দেখছি।"

"না বল্‌লে আর কি করে বুঝি অনিলদা, আমি তো অন্তর্যামী নই যে, তোমার সব কথাই না বলতে বুঝে নেব।"

"আঃ তুই বড় বকে গেছিস! আমার কথাটা শুনবি কিনা তাই আগে আমি শুনতে চাই।"

নিরুপায় ভাবে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া রমেন বলিল, "আচ্ছা বল।" অনিল যে কি বলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই আন্দাজ করিয়া লইয়াছিল। এবার দেশ হইতে ফিরিবার পর অনিলের আষাঢ়ের মেঘের মত মুখখানা দেখিয়া রমেন বুঝিয়াছিল যে আর কিছু না হউক অন্ততঃ বৌদির সহিত তাহার অনিলদার একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছে এবং সে মনোমালিন্য যে কতটা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিলনা। সুতরাং অনিলদার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া সে নিশ্চিন্ত মনে পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ এইরূপ কঠিন আহ্বানে সে বেগতিক দেখিয়া বইখানি বন্ধ করিয়া অনিলদার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

অনিল বলিল, "হাসছিস যে?"

"ও কিছু নয়, তুমি বল। আচ্ছা অনিলদা কদিন ধরে লক্ষ্য কচ্ছি যে তোমার মুখখানা যেন কাল পেঁচার মত হয়েছে। সত্যি করে বলতো ব্যাপার খানা কি, আমার বাস্তবিক ভাবনা ধরে গিয়েছে।"

গম্ভীর স্বরে অনিল উত্তর দিল, "দেখ তুইতো জানিস যে এবারকার ছুটীতে আমি বাড়ী গেছলুম। কিন্তু তোর বৌদির কি অন্যায় দেখদিকি, আমাদের কারও অনুমতি না নিয়ে সে কি বলে তার বাপের সঙ্গে মধুপুরে চলে গেল। ভারি অন্যায়। আমার তো বাড়ীতে একদণ্ডও মন টিকছিল না। কি কষ্টেই যে দিনগুলো কাটিয়েছি।"

"অবাক্ কল্লে অনিলদা! তোমাদের অনুমতি না নিয়ে কি বৌদি কোথায়ও যেতে পারে? কাকীমার অনুমতি নেওয়া হয় নি?"

"মাইতো জোর করে মধুপুরে পাঠিয়েছেন, নইলে তো যাবার ইচ্ছে তার ছিল না। মা বল্লেন, তার শরীর খারাপ, না আমার আপামুণ্ডু কি একটা হয়েছিল। ছোট বোন ইন্দু একদিন বল্‌লে যাবার দিন নাকি আমার ঘরে

টাঙ্গান আমার ফটোখানার দিকে বারবার তাকিয়ে আঁচলে মুখ মুছে ছিল। তা যাই হউক রমেন আমাকে না বলে যাওয়াটা তার মোটেই ভাল হয় নি। এবার তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা কোরবোনা।"

"ওঃ তাই বল যে কাকীমা পাঠিয়েছেন। এই যে বল্‌ছিলে, তোমাদের অনুমতি নেওয়া হয় নি। আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলেম আর কি। তাহলে এখানে 'তোমাদের' অর্থে 'তুমি' শুধু নিজে। তা বেশ হয়েছে। তার মধুপুর যাওটাও হল, শরীরের উন্নতিটাও হবে। আর তোমার রাগ আর ঐ নভেলী ধরণের 'ক্ষমা' কথা তো—ওঃ সে আমার জানা আছে। এ এক রকম ভালই হয়েছে—তাঁর শরীরের পক্ষেও বটে তোমার পড়ার পক্ষেও বটে।"

"দেখ রমেন! তুই আর জ্বালাসনি। তুই মনে করিসনে যে তোর অনিলদা একটা যা তা লোক। এই তোর সাম্‌নে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে যদি তাকে আমি ক্ষমা করি তো আমি... ... ...।"

বাধা দিয়া রমেন বলিল, "ছিঃ ছিঃ, কর কি অনিলদা! অত বড় দিব্যিটা গেলনা আর অত করে চেঁচিয়োনা। তা হলে মেসের সমস্ত লোক বরফ জল হাতে করে এই সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে এসে ভিড় কোরবে। সে কিন্তু বড় বিশ্রী দেখাবে। পায়ে পড়ি অনিলদা! মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর।"

"দেখ রমেন তুই আমাকে পাগল ছাগল যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লি। আর তোর সঙ্গে যদি আমি জীবনে কখন কথা কই। আজকেই পাশের ঘরে সিট চেঞ্জ ক'রে আমি পরেশের কাছে উঠে যাব। যাক্ তুই তোর খেয়াল নিয়ে" কথা কয়টী কোন প্রকারে বলিয়া ফেলিয়া অনিল দ্রুত পদক্ষেপে ম্যানেজারের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

অনিল চলিয়া যাইবার পর রমেন আপন মনে একটু হাসিয়া নিজের বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িল, কারণ অনিলদার রাগকে সে চিরকালই চিনিত, তাহার উপর ম্যানেজার বাবু সে দিন মেসে ছিলেন না।

(২)

বেলা দশটা মেস বাড়ী কোলাহলে পরিপূর্ণ। মেসের বাবুদের মুখে বেশ একটু উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। সকলেই ব্যস্ত—কেহ বা পাইখানার দোর গোড়ায় তীর্থযাত্রী হইয়া বসিয়া আছে, কেহ বা কলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাতক পাখী হইয়া বসিয়া আছে। সদর দোরে এক জোড়া ছেঁড়া

জুতা কোন প্রকারে সেলাই করিয়া মুচি হাঁকাহাঁকি করিতেছে; রান্নাঘরে ঠাকুর ঝিয়ের সহিত বেশ একটু ঝগড়া বাঁধাইয়া তুলিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার ভাত বাড়িবার জন্য উপর হইতে হাঁকের পর হাঁক আসিতেছে, কিন্তু কেইবা কার কথা শোনে।

এই হট্টগোলের মধ্যে কোনরূপে আপনার পড়াটা প্রস্তুত করিয়া রমেন ভালমানুষটীর মত ডাকিল, "অনিল দা!"

গায়ের চাদরখানি বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া অনিল একপাশে শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, সে উত্তর দিল, "কি বল্‌ছিস রে?"

"তুমি আমার উপর রাগ করেছ অনিল দা?"

"কই না।"

"তবে কালকে অমন ক'রে চলে গেলে কেন? তাতে কি আমার একটুও কষ্ট হয়নি বল্‌তে চাও?" বলিয়া রমেন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল, কারণ সে জানিত যে, তাহার অনিলদা ইহাতেই একেবারে জল হইয়া যাইবে।

"কালকের কথা ছেড়েদে রমেন, তুইও যেমন পাগল, আমিও তেমনি একটা আস্ত পাগল। তা যাক, কিছু মনে করিস্‌নে। নাইতে যাচ্ছিস্ বুঝি। তুই যা, আমি একটু পরেই যাব।"

"তোমার ওঘরে সিট কবে থেকে নেবে বলেছে? পরেশ রাজী আছে তো? ম্যানেজার বাবু কি বল্লেন?"

"ফের ঐ কথা। এই না তোকে বল্‌লুম যা হয়ে গেছে তা গেছে; তা নিয়ে আবার মারামারি কর্‌বার কি দরকার?"।

"তাইতো বড় ভুল হয়ে গেছে অনিলদা! তা যাক কিন্তু তুমি কি বিছানা ছেড়ে উঠবেনা মনে করেছ? এমন হাঁ করে আকাশ পাতাল ভাবলে কি আর বৌদি মধুপুর থেকে ডানা মেলে উড়ে আসবে; না সেকালের রূপকথার মত পরীরা রাতারাতি এসে খাট শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে তোমায় একেবারে মধুপুরে বৌদির ঘরের মধ্যে পৌছে দেবে? কিন্তু এ রকম হলে মন্দ হত না; না অনিল দা?"

"আচ্ছা রমেন তুই কি আমায় কল্‌কাতা ছাড়া কর্‌বি? আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে, কেবল রাতদিন তোর বৌদির কথাই ভাবচো। হাঁ তার জন্যে আবার ভাবনা।" বলিয়া অনিল অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, পরে একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "বোলেছি তো তোকে যে তাকে ক্ষমা করা অসম্ভব।"

"তা না হয় অসন্তা হল, কিন্তু তুমি এ করছ কি? বলি নাইতে খেতে হবে না? এতো আর নিজের বাড়ী নয় যে ভাত নিয়ে বসে থাকবে।"

"তুই যা তো রমেন, আমার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। আমি একটু নিরিবিলি থাকতে চাই।"

"ও এতক্ষণ তা বল্‌তে হয়। তা হলে তো আমি কোন্‌কালে তোমায় নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা করে দিতুম। আজকে বোধ হয়, কলেজটাও কামাই হোয়্‌বে। কর যা তোমার খুসি। আমি চল্‌লুম নাইতে, একেবারে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরে আসবো।"

রমেন চলিয়া গেলে অনিল কাত্‌ হইয়া শুইয়া পড়িল। কাল হইতে তাহার আহারে রুচি নাই, কার্য্যে মনোযোগ নাই! কোন রকমে রাত্রে দুটী আহার করিয়া সেই যে বিছানা আশ্রয় করিয়াছে—তাহা একবারের জন্যও ত্যাগ করে নাই। স্ত্রী চলিয়া যাওয়াতে বেচারার বড়ই লাগিয়াছে, তাহার উপর রমেনের বিদ্রূপ বাঘের পিছনে ফেউএর মত অনবরত লাগিয়াই আছে।

অনিল চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, তাহার সুদূর শৈশবের দিন গুলি মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা, সঙ্গীদের খেলা, গ্রাম্য বিদ্যালয়, অনাথ পণ্ডিত পরাণে চৌকিদার এই রকম হিজিবিজি নানারূপ ভাবনা তাহার শূন্য মস্তিষ্কে বায়স্কোপের ছবির মতই যাতায়াত করিতেছিল। তাহার পর কেমন করিয়া মায়ের অঞ্চল ছাড়িয়া গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইল, সেখান হইতে ভাল ছেলে খ্যাতি পাইয়া কবে সে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ট্রান্‌স্‌ফার লইল, এবং কেমন করিয়া একটার পর একটা করিয়া এই মহা পরীক্ষা সাগর উত্তীর্ণ হইল। বি, এ, পরীক্ষার সময় কেমন করিয়া জিদ্‌ ধরিয়া মা তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর তাহাদের স্বামী স্ত্রীর প্রেমালাপ, চিঠিপত্র, মিষ্ট সম্ভাষণ ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অনিল তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। তারপর সহসা স্ত্রীর কথা মনে আসিতেই সে আপনাকে চিন্তাস্রোত হইতে ছিনাইয়া আনিল। একি! সে একি করিতেছে! যাহাকে সে ক্ষমা করিতে পারিবে না, পাগলের মত আবার তাহাকেই ভাবিতে বসিয়াছে! হায় রে মানুষের মন!

অনিল উঠিয়া বসিল। বেলা প্রায় বারটা বাজে, মেস্‌ একেবারে নিস্তব্ধ। অধিকাংশ ঘরেই তালা ঝুলিয়াছে, কেবল দু একজন নিষ্কর্ম্মা রান্নাঘরে বসিয়া তখনও চিৎকার করিতেছিল! মাঝে মাঝে তাহাদের মধ্য হইতে রমেনের গলাও শুনা যাইতেছিল। পাশের বাড়ী হইতে একটা অস্ফুট কলরব থাকিয়া

থাকিয়া অনিলের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল—একটা দুরন্ত ছেলেকে শাসন করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী জননী বোধ হয় তাহার নিরাহারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

"এখনও নির্জ্জনবাস টল্‌ছে নাকি?" বলিতে বলিতে রমেন একমুখ হাসি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "ওঠো অনিলদা! খাওয়া দাওয়া সেরে এস। ভাত তোমার ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে বোধ হয়। যা হোক দুটো খেয়ে এস, অমন করে শুয়ে থেকোনা।"

তাহার কথায় কোন প্রকার জবাব না দিয়া অনিল গায়ের র‍্যাপারখানি বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

(৩)

প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। প্রথম বিচ্ছেদের ধাক্কা অনিলের বড়ই লাগিয়াছিল, কিন্তু এই দীর্ঘ দুই সপ্তাহের মধ্যে সে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে; প্রত্যহ কলেজ যাইতেছে, পড়া শুনাও করিতেছে, তবে এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে সে যেন প্রাণ পায়না, তেমন আগ্রহও নাই। করিতে হয়, তাই সে করিতেছে। দম দেওয়া ঘড়ীর মত তার কর্ত্তব্য পথে সে টিক্‌ টিক্‌ করে মাত্র। ঘড়ীর মত সেও যেন প্রাণহীন নির্জ্জীব পদার্থ।

সেদিন কি একটা কারণে কলেজের ছুটী হওয়ায় অনিল তাড়াতাড়ি মেসে ফিরিয়া আসিল। রমেন ঘরে বসিয়া আপন মনে গুন গুন করিয়া রবিবাবুর কি একটা গান গাহিতেছিল, অনিলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "অনিলদা যে, কলেজের ছুটী হয়ে গেল বুঝি। তা তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কি জন্যে। বোস, একটু জিরোও হাঁফ ছাড়; তা না যেমন এলে অমনি আবার বেরুবার জন্য তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। অমন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িও না অনিল দা, শরীরটা খারাপ হলে আমার পড়ার ক্ষতিও হবে, আর কাকীমার কাছে বকুনি খেতে খেতে প্রাণটাও যাবে। তোমার খোকা কি? কাকীমা হয়তো বলবেন, তোর কাছেই তো অনিলকে ছেড়ে দিয়েছিলুম, তুই ওকে অমন করে রোদে রোদে বেড়াতে দিলি কেন? আচ্ছা অনিলদা! তুমি এখনও কাকীমার কাছে আপন ভোলা ছেলে মানুষটা আছ না? সত্যি করে বলতো বৌদি তোমায় কি মনে করেন সেই ছোট্ট ছেলে মানুষটী, না? আমার কিন্তু এ রকম হলে ভারি লজ্জা করতো। বুড়ো বয়সে খোকার মত

আদর, তা আবার শুধু মায়ের কাছে নয়, বৌএর কাছ থেকেও—কি লজ্জার কথা অনিলদা ?"

সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ পুনরায় উঠিতেছে দেখিয়া অনিল তাড়াতাড়ি স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "না রমেন! আমি ভবঘুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে যাচ্ছিনে। আমার মাথাটা এখনও অতটা খারাপ হয়নি। আমি যাব একবার দক্ষিণেশ্বরে সেখান হতে বেলুড়টাও একবার ঘুরে আসবো। কদিন হতে কিছু ভাল লাগছে না, দেখি যদি মনটা ভাল থাকে। পবিত্র জায়গায় মানুষের মনের জ্বালা অনেকটা লাঘব হয়ে যায় শুনেছি। অনেক দিন থেকে দক্ষিণেশ্বর দেখবার ইচ্ছেও ছিল, যাই এই সুযোগে সেরে আসি। তা হলে আর দেরি করবো না, চল্লুম।"

"এই যে বল্লে অনিলদা যে তোমার মাথা খারাপ হয় নি, সেটা দেখ্‌ছি তোমার একটা মস্ত ভুল। বেলুড়ে দক্ষিণেশ্বরে যায় কারা ? হয় এই আমাদের মত অবিবাহিত তরুণ যুবকের দল, না হয় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কিংবা পরিণত বয়সের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। তুমি কিন্তু ওদের মধ্যে একটা দলেরও নও। তুমি হচ্ছ বিবাহিত তরুণ যুবক। তোমার ওখানে যাওয়াটা একটু মাথা খারাপের লক্ষণ বলেই স্বীকার কর্‌তে হবে। আর একটা কথা কি জান ? অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। তুমি মনে কোরছো যে সেখানে গিয়ে ভাবে উন্মত্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর, মানুষের, সংসারের নশ্বরতা তোমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌বে। কিন্তু কখনও তা হবে না, এ আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। তুমি কালী মন্দিরের দিকেই চাও, আর গঙ্গার জলে পৃথিবীর নশ্বরতা খুঁজতেই যাও, তোমার ভাগ্যে সমস্ত নশ্বরতা সমুদ্র মন্থন করে কি উঠ্‌বে যান ? বৌদির মুখখানি। সে কিন্তু ভারি বিপদ হবে, যাবে বলে হিতে বিপরীত। তুমি যেখানেই চাওনা কেন, বৌদি তোমার পিছনে পিছনে ঠিক ছড়ের মতই ধাওয়া করবেন। এখানে হয়তো একখানা মুখ দেখছো কিন্তু সেই নির্জ্জন জায়গায় শত সহস্র মুখ ভেসে উঠবে। সাম্‌নে পিছনে যে দিকেই চাওনা কেন মুখ যে তোমায় কিছুতেই ছাড়বে না এ আমি শপথ করে বল্‌তে পারি!" বলিয়াই রমেন জিজ্ঞাসু নেত্রে অনিলের মুখের পানে চাহিল।

অনিল এ সমস্ত কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া, বাক্স হইতে পাথেয় স্বরূপ কয়টী টাকা মণিব্যাগে রাখিতে রাখিতে ম্লান হাস্যে বলিল, "আমার ঘাড় থেকে নেবে বৌদি এবার তোর ঘাড়েই চেপেছে দেখছি। তুইই না হয় তোর

বৌদির মুখখানা ভার। আচ্ছা তা হলে আমি চল্লুম।" বলিয়াই অনেক দিনের পর ম্লান হাস্যে আপনার বিবর্ণ মুখ কোন প্রকারে রঞ্জিত করিয়া অনিল ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

অনিল চলিয়া যাইলে পর রমেন আপনার শয্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। একি! অনিলদা সত্য সত্যই পাগল হইয়া যাইবে নাকি! কদিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে, তাহার অনিলদার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের সে কলহাস্য নাই। সেই আগ্রহ সেই উদ্যম অন্তর্হিত হইয়াছে। এই রুক্ষবেশ, মলিন অবয়ব, অনিলদাকে দেখিয়া সে সত্য সত্যই মর্ম্ম পীড়া অনুভব করিতেছিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, তাহাদের সুদূর শৈশব, সেই ছোট্ট অনিলদা, সেই কাকামীর কোল। রমেন বেশ বুঝিতে পারিল অনিলদা আর সে অনিলদা নাই। অনিলদাকে যে সে বড় ভালবাসে; সে যে তাহার সত্যকার জ্যেষ্ঠ ভাই। উঃ রমেণের গণ্ড বহিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বৌদির উপর তাহার মন এইবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অবশেষে সে স্থির করিল সমস্ত অপরাধ তার বৌদির। তিনি ইচ্ছা করিলে অনিলদাকে জানাইয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহা করেন নাই।

মেসের ভৃত্য রামচরণ আসিয়া ডাকিল, "বাবু! একখানা চিঠি আছে।" রমেন কাপড়ের খুঁট দিয়া তাড়াতাড়ি মুখ মুছিয়া কহিল, "কই দেখি!" ভৃত্য তাহার হস্তে পত্র দিয়া প্রস্থান করিল। পত্র দেখিয়াই রমেন লাফাইয়া উঠিল, "একি! এ পত্র যে মধুপুর হইতে আসিতেছে! অনিলদার নামে! হাতের লেখা যে তার বৌদিরই। পত্রখানির উপর বেশ পরিষ্কার মেয়েলী ছাঁদে লেখা ছিল :—

পরম পূজনীয়—

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীচরণেষু।

মুহূর্ত্তের মধ্যে রমেনের ক্রোধ কোথায় মিলাইয়া গেল। সে যে বৌদির উপর রাগ করিয়া তাহাকে অপরাধী স্থির করিয়াছিল, তজ্জন্য লজ্জিত রমেন বৌদির উদ্দেশ্যে বার বার যুক্তকরে প্রণাম করিয়া মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

(৪)

বেলা পাঁচটা। গঙ্গার পশ্চিমপারে সূর্য্য অস্ত যায় যায়। উভয় তীরের কলকারখানায় কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। বেকটাকার কলের

চিমনী গুলি সগর্ব্বে আপনার শির উন্নত করিয়া যেন এক একটী আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। তবে এখন আর হুঙ্কার নাই, সারাদিনের ছু টাছুটীর পর এখন যেন তাহারা শ্রান্ত ও নির্জীব হইয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত শ্রমজীবিদল ভাঙ্গা গলায় গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গৃহ পানে চলিয়াছে। সুদূর নীলাকাশের কোলে একখানি রাঙ্গা মেঘ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সন্ধ্যায় গঙ্গা বিদীর্ণ করিয়া একখানি ষ্টিমার কলিকাতার দিকে হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে নানা দেশের নানারূপ যাত্রী, কেহবা বসিয়া, কেহবা দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছিল। ভিড়ের মধ্য হইতে কোন প্রকারে একটু স্থান করিয়া লইয়া অনিল রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া গঙ্গার জলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। সর্ব্বনাশী চিন্তা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছিল না। প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্য্যের মাঝে সে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি সুন্দর ঐ নীলাকাশ, কি সুন্দর ঐ রাঙ্গা মেঘটুকু। কি সুন্দর ঐ নদীর অস্ফুট কলরোল! সে যে ইহাই চায়, প্রকৃতির মাঝখানে সে এবার হইতে আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহে। ঐ যে দক্ষিণেশ্বরের স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি! ও যেন কত যুগের কত সাধনকে আপনার নিবীড় গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, সেই বিবেকানন্দ, ওঃ কি অপার শান্তিই না তাঁরা ওখানে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। বেলুড়ের মঠ! সেও একটা সামান্য বস্তু নয়। সংসারত্যাগী শুদ্ধাচারী, ব্রহ্মচারী তাঁরা দেশের জন্য দশের জন্য আপনাদের স্বার্থ কতটা নিঃস্বার্থ ভাবে বলি দিয়াছেন। তাঁহাদের শুভ্রবস্ত্র উত্তরীয়—সেও তো ভারতের একান্ত ভারতের একমাত্র নিজস্ব বস্তু। অনিলের চক্ষে বহুদিনের পূর্ব্বেকার একটি দৃশ্য জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠিল। সেই বৈদিক যুগের ঋষিরা সেই স্নিগ্ধ তপোবন, সেই সামগান, সেই পবিত্র দেবালয়! ওঃ কি সুন্দর! অনিল মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে, সেও ঐরূপ জীবন অতিবাহিত করিবে। এবার বাড়ী ফিরিয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া সে বেলুড়ে ফিরিয়া আসিবে। ক্ষণেকের জন্য তাহার মনে উঠিল, পত্নীর সেই সহাস্য মুখখানি, অনিল শিহরিয়া উঠিল। নাঃ কিছুতেই না; পত্নীর উপর তাহার কোন অধিকার নাই। সেই তো চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাকে জানাইয়াছে কি? তবে সেও তো চলিয়া আসিতে পারে এবং আসিবার সময় এইটকু উপকার সে করিতে পারে যে

তাহাকে তাহার প্রস্থানের সংবাদটুকু জানাইয়া আসিতে পারে। এইটুকু দয়া তাহার দ্বারা সম্ভব এবং ইহাও তাহার অবাধ্য পত্নীর পক্ষে কম লাভের কথা নহে!

ধীরে ধীরে অন্ধকার ধরণীর কোলে আপন আসনখানি বিস্তার করিতেছিলেন। গঙ্গার উভয় তীরে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। এমন সময় ষ্টিমার আসিয়া আহিরীটোলার ঘাটে লাগিল। লোকের চীৎকারে ও ঠেলা ঠেলিতে অনিলের চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল যে, ষ্টিমার আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। নিজের শ্রান্ত দেহখানিকে কোনরূপে ষ্টিমার হইতে নামাইয়া লইয়া সে ক্লান্তপদে মেসের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

(৫)

"রমেন!"

"কে? অনিলদা!"

"হাঁ ভাই! তুই পড়াশুনো ছেড়ে এই সন্ধ্যেবেলায় গান গাইতে বসেছিস কেন রে? আজকে যে ভারি ফুর্ত্তি দেখছি। ব্যাপার কি?"

"তুমি বুঝি এখনি ফিরলে অনিলদা? কেমন দেখলে?"

"বেশ! খুব ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু তুই যা বল্লি, ঠিক তার উল্‌টো হয়ে গেল। শত সহস্র মুখ দেখা দূরে থাক, আমি আমার সমস্ত পরিচিত মুখগুলো ছেড়ে যাব সঙ্কল্প করেছি। এমন কি তোকেও! আমি বেলুড় মঠে গিয়ে বাস কোরবো।" বলিয়া অনিল ম্লানহাস্যে রমেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

রমেনও হাসিল, কারণ একদিকে ক্ষমা কথাটাও বেলুড় মঠ শব্দটা যেমন তাহার কর্ণে বাজিতেছিল, অন্যদিকে বৌদির চিঠিখানিও তাহার পকেটের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছিল।

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া রমেন কহিল, "অনিলদা! তোমার একখানা চিঠি আছে।"

"কই দেখি!" বলিয়া অনিল সাগ্রহে হাত বাড়াইল।"

চিঠিখানি অনিলের হাতে দিতেই অনিল চমকাইয়া উঠিল। একি এ যে মধুপুর হইতে আসিয়াছে! তাহারই হাতের লেখা! মুহূর্ত্তে অনিল তাহার 'ক্ষমা' 'ব্রহ্মচর্য্য' সমস্তই ভুলিয়া গেল। খামখানা খুলিয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিল।

"রমেন! আমি চল্‌লুম।" বলিয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় অনিলদা?" বলিয়া রমেন একটু হাসিল।

"হাসির কথা নয় রমেন, আমি সত্যিই যাব।"

"আঃ কোথায় যাবে তাই বলনা।"

"আমায় বিরক্ত করিসনে রমেন, আমি মধুপুরেই যাব। এখন তো আর কোন ট্রেণ নেই, কি হবে ভাই? কটা বেজেছে দেখদিকি?"

"সাতটা সাড়ে হবে বোধ হয়।"

"সাতটা! তবে তো পাঞ্জাব মেলখানা ধরতে পারা যাবে, ওতেই যাব, কি বলিস রমেন?"

"হাঁ, হাঁ, যেও যেও, তা অত তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি? দশটায় একখানা প্যাসেঞ্জার আছে তাতেও যেতে পার। না হয় কাল গেলেও তো চল্‌বে?"

"তুই বড় বোকা রমেন! কিছু বোঝবার ক্ষমতা তোর যদি থাকতো! তার ভারি অসুখ করেছে, আমাকে খুব তাড়াতাড়িই এখান হতে রওনা হতে হবে। বিশ্বাস না হয় পড়েই দেখনা।"

রমেন পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আগাগোড়া সমস্তই পাঠ করিল। পরে কহিল, "কোথায় অসুখ বেশী করেছে অনিলদা! লিখেছেন তো কাল্‌কে একটু জ্বর হয়েছিল, আজকেও ছাড়েনি। এর মধ্যে বেশী পেলে কোথায়?"

সুটকেসের মধ্যে কাপড় জামা গুছাইয়া লইতে লইতে অনিল রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "তুই আমার সঙ্গে আর তামাসা করিসনে রমেন! এখন ঠাট্টা তামাসার সময় নয় ভাই। প্রার্থনা কর গিয়ে যেন সব ভালই দেখি।"

অনিলের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া রমেন একেবারে বিস্মিত হইল। কি কোমল প্রকৃতির মানুষ এই অনিলদা! কিছুদিন পূর্ব্বে তো সে বলিয়াছিল ক্ষমা করিতে পারিবে না, আজ কিছুক্ষণ আগেই তো সে মঠে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু যাহার উপর রাগ করিয়া এই সন্ন্যাস লইবার সঙ্কল্প, তাহার একটু অসুস্থতার সংবাদ পাইতে না পাইতেই সে সমস্ত ভুলিয়া ছুটিয়াছে তাহারই উদ্দেশ্যে! আশ্চর্য্য মানুষ!

সন্ধ্যাক্ষণ পূর্ব্বে রামচরণকে গাড়ী আনিতে বলা হইয়াছিল। এখন গাড়ী লইয়া আসিয়া রামচরণ ডাক দিল, "বাবু! গাড়ী এসেছে।"

"আচ্ছা যা," বলিয়া রমেনের দিকে চাহিয়া অনিল কহিল, "তা হলে চল্‌লুম ভাই। তুই মাকে একখানা চিঠি লিখে দিস, আমিও মধুপুর থেকে একখানা পত্র লিখে দেব।"

রমেন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ক্ষমা করবে না বলেছিলে যে অনিলদা বেলুড় মঠের কি ব্যবস্থা করলে? আচ্ছা, আমি লোটা কম্বল কিনে রাখবো কেমন? সাধু সন্ন্যাসী যা হবে তা মধুপুর থেকে ঘুরে এসেই হবে, কি বল অনিলদা?"

অনিল আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। রমেন দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হলে তুমি একখানা চিঠি লিখো আমায়, ভুলে যেওনা যেন?"

"না, না, ভুলবো কেন? আর তো সময় নেই, তা হলে আমি রমেন! এই কোচম্যান জোর্‌সে হাঁকাও।"

মুহূর্ত্তে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল। রমেন দুয়ার ধরিয়া আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, পরে হাসিতে হাসিতে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গাহিতে লাগিল,—"তারে কি সই যায়গো ভোলা।"

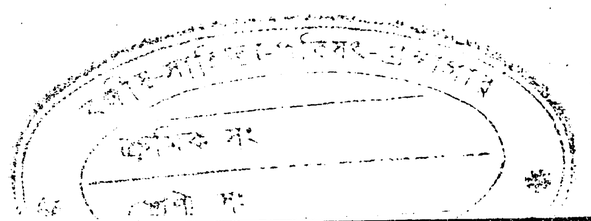

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ড্‌স্‌টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১॥০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৶০, ছোট বোতল ১৶০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৬০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১॥০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্সা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেলথ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ২ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান

সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন —তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন! এটুকু কখনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে-অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ— নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার— কবিরাজ— শ্রী শক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক— শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩১. [৬ষ্ঠ, সংখ্যা

১।	কল্যাণী	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু	১৬১
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৬২
৩।	মরকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৬৭
৪।	আসকাতরা	শ্রীযুক্ত নটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৮
৫।	অশান্তি	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৮২
৬।	স্নেহের জয়	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	১৮২
৭।	বসন্তের ফুল	শ্রীমতী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	১৮৬
৮।	"ভ"কারে ভূমিকা ডাঃ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যবিশারদ	১৮৭
৯।	শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনকালে ব্রজবাসীর উক্তি	...	১৯২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 30-12-24

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৮০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা: "জিজীবিষান"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

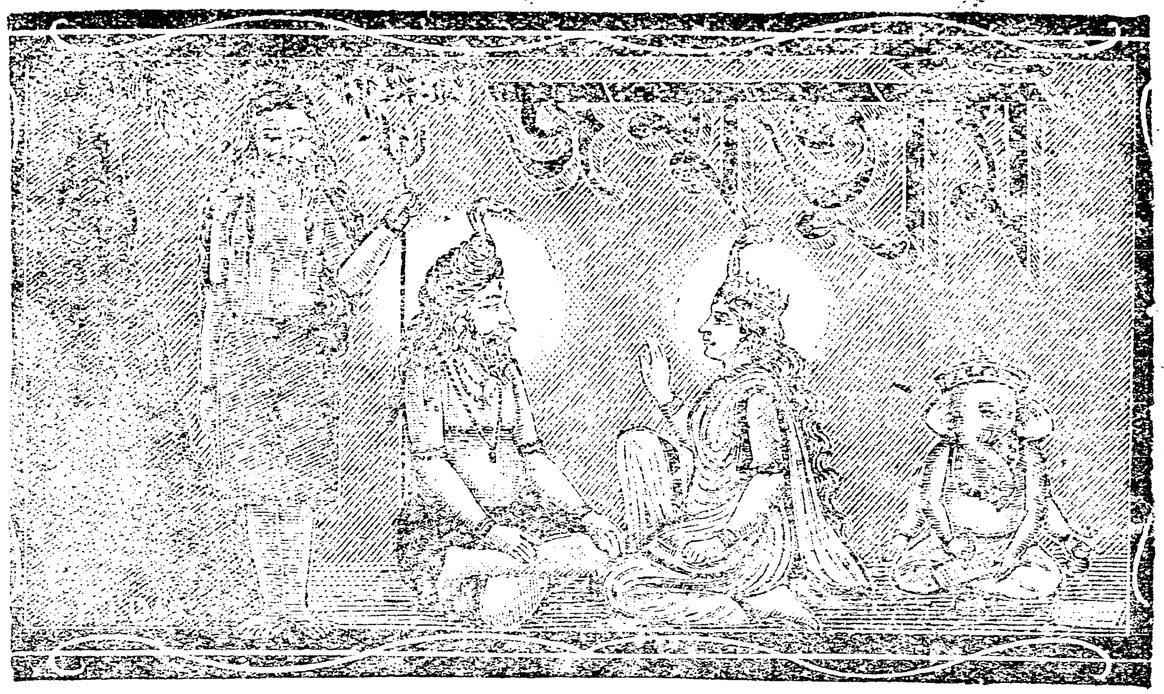

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। ১৩৩১ সাল, আশ্বিন। ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

কল্যাণী।

লেখিকা,— শ্রীমতী শৈলরাণী বসু।

মধুপ তোমার মঙ্গলময়
চরণে নূপুর গুঞ্জে,
চন্দ্রমা ঢালে স্নিগ্ধ কিরণ
তোমার হৃদয়কুঞ্জে,
কল্যাণী ওগো কল্যাণি!
হিল্লোলে তব নির্ম্মল বায়ু
ফুটায় কুসুম পুঞ্জে,
অঞ্চলে তব ঘুমায় বিশ্ব—
মায়ের করুণা ভুঞ্জে।

কল্যাণি, ওগো কল্যাণি !
বন-বিহঙ্গ পঞ্চম তানে
প্রভাতে তোমারে বন্দে,
সন্ধ্যায় তব কুঞ্জ-ভবনে
মুগধ ঝিল্লি ছন্দে,
কল্যাণি, ওগো কল্যাণি !
বরষার তব বিমল গাত্রে
বরিষে জলদ ধারা,
শরতে তোমার শোভনা রাত্রে
উজ্জ্বল হিরণ তারা—
কল্যাণি, ওগো কল্যাণি !
হেমন্তে তব শিশিরসিক্ত
স্নিগ্ধ বদনখানি,
বসন্তে তব অতুল কান্তি—
বিজন ফুলের রাণী,
কল্যাণি, ওগো কল্যাণি।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রজনী প্রভাত হইল। সাধক যথা সময়ে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভক্তবৃন্দের সহিত পরমানন্দে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পর দিন কোটাল হাটে প্রত্যাগমন করিলেন। বিশু ও কেণারাম জানিতেন, ঠাকুরের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, তথাপি তাহারা ভৈটে পালসিটের রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক রহিলেন। দুই একদিন পরে ভৈটে পালসিটের কায়স্থ কোটাল হাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলকে ভৈটে হইতে সুখে প্রত্যাগমন

প্রশ্ন করিয়া কায়স্থ কহিলেন, "আমার গৃহে আপনাদের পদার্পণে আমি আমাকে মহাভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি।" বিশু ও কেণারাম বুঝিলেন, তাঁহাদের বেশে কায়স্থের গৃহে ভক্তবৎসলার আবির্ভাব হইয়াছিল। কেণারাম কিছুমাত্র উত্তর না করিয়া কায়স্থকে মহাভাগ্যবান বিবেচনা পূর্ব্বক অভয়ার চরণ ও সাধকের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাবান্তর অতি গভীর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "মা ইচ্ছাময়ী! তুমি কখন কাহার প্রতি প্রসন্ন নয়নে চাও তুমিই জান।" ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া ভাবিলেন, "ধন্য এই মহাপুরুষ! যাহার ইচ্ছায় কায়স্থের গৃহে ভক্ত বৎসলা অভয়ার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। আমরাও মানুষ কিন্তু আমাদের সহিত এই মহাপুরুষের এত প্রভেদ! একই ভূগর্ভে হীরক ও অঙ্গারের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" সাধক কেণারামের প্রাণের উচ্ছ্বাস বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে অন্য ভাবে লইবার জন্য কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দিন তোমার সমুদয় কর্ম্ম ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন হইয়াছে ত?" কায়স্থ কহিলেন, "আপনার কৃপায় আমার কোন বস্তুরই অভাব হয় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই বলিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে কখনও এরূপ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করেন নাই। আমার আয়োজনের উপযুক্ত লোক অপেক্ষা অনেক লোক অধিক ভোজন করিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছি, আপনার রসনে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছিল। আমি অতি দীন আয়োজনের অভাব পাছে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তৃপ্তিলাভ না করেন, এ ভয়ে আমি অতি ভীত ছিলাম। সমস্ত দিন আমি নয়নজলে অন্নপূর্ণার কৃপা-দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনার শান্তিময় মুখ ও চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম।" সাধক কহিলেন, "তোমার ভক্তিগুণে যথার্থই তোমার গৃহে অন্নপূর্ণার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল।" ইহা কহিয়া সাধক সে দিনের ঘটনা কায়স্থের নিকট গোপন রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ সুখালাপের পর কায়স্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এ স্থলে আর একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন বিশু ও কেণারামের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকার তথায় উপস্থিত ছিল। কেণারাম কহিলেন, "ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কোন বস্তু বিষয়ের প্রতি চিত্তের সন্নিবেশকে সাধনা বলা যায়। আরাধ্য বিষয়ের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিই সাধনার উদ্দেশ্য। তাল মান ও সুরের সহিত আপনাকে মিশাইতে পারিলেই সঙ্গীত সাধনার সাফল্য লাভ হয়। ঈশ্বর সাধনার স্বার্থকতা সাযুজ্য। শব্দ

(২)

একদিন অনেক রাত করে বাড়ী যাওয়ায় খোকার মা জ্বলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লেন। আমি খোকার মাকে অনেক কোরে কাকুতি মিনতি কর্‌লুম—"ওকে মার্‌বেন না, ওর দোষ নেই। আমারই দোষে রাত্তির হয়ে গেল।" কিন্তু খোকার মা খোকাকে ধমক দিয়ে মারধোর কর্‌লেন। বল্‌লেন, "কেন অমন কাজ করিস্? ফের যদি অরুণদের বাড়ী যাবি ত মার খেয়ে মরবি।"

খোকা কোন উত্তর দিলে না। কাঁদতে কাঁদতে ওপরে উঠে গেল।

খোকার মা খোকাকে ওপরে যেতে দেখে বল্‌লেন,—"খেয়ে শুগে যা।" কে তোকে ডেকে খাওয়াবে?" খোকা বললে, "আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।"

(৩)

কলেজ থেকে বাড়ী এসেছি. এমন সময় খোকার দিদি সুধা এসে বল্‌লে—"অরুণদাদা খোকা তোমাকে ডাক্‌চে শীগ্‌গির চল।" সুধা যে রকম ভাবে কথা বল্‌লে, তাতে আমি চমকে উঠে বললুম, "কেন?" চমকাবার একটু বিশেষ কারণ ছিল—সুধা যখন কথা বলছিল তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম তার চোকের কোল থেকে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। দেখে প্রাণের ভেতর অনেকগুলো কাল মেঘ জমাট বেঁধে গেল। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। আমি আর কোন কথা না বলে তখনই খোকাদের বাড়ী চলে এলুম।

খোকাদের বাড়ীতে আস্‌তে, খোকার মা প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, "বাবা অরুণ। কাল রাত্তিরে মার খাবার পর খোকা ওপরে চলে গেলে, আমি ভাবলুম তা কাজ কর্ম্ম সেরে ওকে খাওয়াব। তার পর সকলকে খাইয়ে খোকাকে খাওয়াবার জন্যে, খোকার গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে গিয়ে, গা আগুনের মত গরম বোধ হল। "খোকা খাবি চল" আর এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুল না! তারপর কাল রাত্তিরেও খালি ছটফট ক'রেছে। দু একবার ভুলও বকেছিল!

এইবার খোকার মা কেঁদে ফেলে বল্‌লেন, "কি হবে বাবা? আমার ত ভারি ভাবনা হচ্ছে।"

আমি বললুম—"ভয় কি মা। সেরে যাবে। ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছেন?"

হাঁ।

ডাক্তারে কি বল্‌লে?

এমন কিছু বললে না।

আমি আর কিছু না বলে খোকার বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম খোকা ঘুমুচ্ছে।

* * * *

খানিকক্ষণ পরে খোকা চোক মেলে, আমায় দেখতে পেয়ে অতি ক্ষীণস্বরে বললে, "অরুণদা তোমাদের বাড়ী যাব।" আমি বললুম, "খোকা! অসুখ একটু ভাল হলেই নিয়ে যাব।"

খোকা আবার ক্ষীণস্বরে বললে, "অসুখ ত আমার ভালো হয়ে গেছে।"

খোকার মা তখন খোকার বিছানায় এসে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "হাঁ বাবা, তুমি ওকে ভাল হলেই নিয়ে যেও।" আমি আর কিছু বলব না। ওযে তোমাকে এত ভালবাসে জানতুম না! ঘুম একটু ভাঙ্গে আর বলে, "অরুণদা! অরুণদা!" বুঝেছি—কাল রাত্তিরে আমি ওকে মেরেছিলুম, আর তোমাদের বাড়ী যেতে বারণ করেছিলুম, তাই ওর এমন অসুখ করেছে।"

খোকার মার চোখ দিয়ে আবার অঝর ঝরে জল পড়তে লাগল।

* * * *

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার এলো। খোকাকে দেখে বল্‌লে আগের চেয়ে এখন দেখ্‌ছি ঢের ভালো।

তার পর চার পাঁচ দিন কেটে গেছে।

আজ খোকা সাতদিনের পর আমাদের বাড়ী এসেছে। আজ সে আমাদের বাড়ীতে প্রায় পাঁচ ছ ঘণ্টা কাটিয়ে রাত ন'টার সময় বাড়ী গেল।

আমিও খোকার সঙ্গে খোকাদের বাড়ী গেলুম—কিন্তু অত রাত করে বাড়ী যাওয়া সত্বেও আজ আর খোকার মা খোকাকে কোন তিরস্কার কর্‌লেন না।

পূর্ব্বক স্কন্ধে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। বটবৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বট বনস্পতি পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া স্বর্ণকারকে অপর স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। শবদেহের বিকৃত মুখভঙ্গি অট্টহাস্য ও অঙ্গ সঞ্চালনে স্বর্ণকার পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইল। বিশু উভয় দেহকে স্কন্ধে করিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণকারকে সাধক ও কেণারামের নিকট স্থাপন করিয়া তিনি যেরূপে তাহাকে বটবৃক্ষমূলে পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন। সাধকের ইচ্ছানুসারে বিশু শবদেহ লইয়া সাধনার জন্য কালীগৃহের পৃষ্ঠদেশে গমন করিলেন। কেণারাম স্বর্ণকারের শুশ্রূষা দ্বারা চৈতন্য দান করিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। স্বর্ণকারের মস্তক তখনও ঘুর্ণিত হইতেছিল। সে পুনর্ব্বার শয়ন করিয়া পাগলের ন্যায় সাধক ও কেণারামের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সাধক কহিলেন. "বিশুকে শবদেহ আনয়ন করিবার উপদেশ দিবার সময় স্বর্ণকার এখানে উপস্থিত ছিল। অনভিজ্ঞ ও অনধিকারী ব্যক্তির নিকট কোন গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা উচিত নহে। ইহা তন্ত্র নিষিদ্ধ। আমরা তন্ত্রের উপদেশ অনবধানতা প্রযুক্ত লঙ্ঘন করিয়াছি। দোষ আমাদের, আহা অপরিণামদর্শী স্বর্ণকার নিজ হিত কামনায় মহা অনর্থের ভাগী হইয়াছে।" ইহা কহিয়া সাধক জগদম্বার পানে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। আতুর ব্যক্তির সহস্র দোষ থাকিলেও তিনি তাহার দুঃখে কাতর হইতেন। কেণারাম তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও উপায় দ্বারা ভূতোপহত চিত্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া স্বর্ণকারকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। স্বর্ণকার সাধক ও কেণারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজগৃহে গমন করিল। এদিকে বিশুর শবসাধনা আরম্ভ হইল। কালীগৃহের পৃষ্ঠদেশ গভীর গর্জ্জনে সমুদয় গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল! সাধক ও কেণারাম প্রেতাত্মার বশীকরণ মন্ত্রে উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, বিশু এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর কেণারাম চট্টোপাধ্যায় কিয়দ্দিবস কোটালহাটে অবস্থান করিয়া সাধক ও মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অমরার গড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ

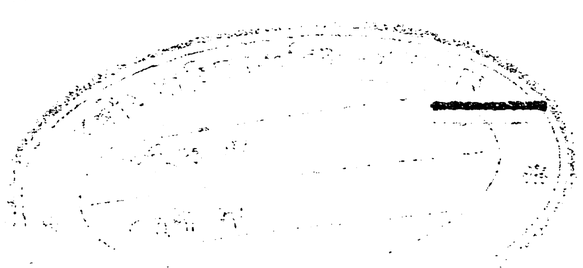

মরকত-মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

দশম পরিচ্ছেদ।

কে কাহাকে চিনিবে?

এক পক্ষের পর আর এক পক্ষ অতীত হইল। রাজা অমরনাথ কন্যা-শোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন, বিবাহ সংক্রান্ত অন্য কোন গুহ্য কথা তাহার মনে ছিল না। শোকটা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। বনের গণক পুরুষের কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, কন্যাও গেল, আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু সেই প্রতারক, উঃ! আমার রাজ্যে বাস করিয়া এতদূর সাহস ধরে, মিথ্যা গণনায় আমাকে প্রতারিত করিতে চায়—তাহাকে সমুচিত ফল প্রদান করিতে হইবে। কুশাঙ্গুরী প্রস্তুত করিয়া নর লোকের বিবাহ বন্ধন করে। কতশত লোক প্রতারিত হয়। তাহাও কি সম্ভব? কাহার সহিত কাহার বিবাহ হইবে, তাদৃশ কদাকার ভণ্ডলোক কি সেরূপ দৈব গণনা জানিতে পারে? ইহাও কি সম্ভব? দিবাভাগে সেই প্রকার ছল পাতিয়া থাকে, রাত্রিকালে দলবল জুটাইয়া ডাকাতি করে। ডাকাতের সর্দ্দার, চেহারাও ঠিক সেই রকম। তাহাকে আমি অতি শীঘ্রই উচিত শিক্ষা প্রদান করিব।

রাজা যাহা ভাবিলেন, ভাবনায় যাহা সংকল্প করিলেন, তাহাই সিদ্ধ হইল। অতি শীঘ্রই তিনি সেই মহারণ্যে যাত্রা করিলেন। সেই অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে লোকটি সেই প্রকারে বসিয়া—সেই প্রকারে অঙ্গুরী প্রস্তুত করিতেছে। পূর্ণ দুই বৎসরেও কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। তাহাকে দেখিয়াই রাজার কন্যাশোক নূতন হইয়া উথলিল। এই লোকটা সেই কন্যার বিবাহ গণনা করিয়াছিল, হায়! হায়! কন্যা আমার কোথায় গেল।

ক্রোধের হেতু বিদ্যমান থাকিলে শোকের সময় ক্রোধের উদয় অধিক হয়। রাজা সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া লোকটিকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! পাষণ্ড, প্রতারক দস্যু! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা? আমার সম্মুখে মিথ্যা কথা? সত্য যদি জ্যোতিষ গণনা জানিস, বল কোথায় এখন আমার সেই মরকত মোহিনী,

তুই যাহার বিবাহ গণনা করিয়াছিলি কোথায় সেই কন্যার বিবাহ হইয়াছে শীঘ্র বল। বিলম্ব হইলে এই মুহূর্ত্তেই স্বহস্তে আমি তোর মস্তক ছেদন করিব।

সগর্জ্জনে এই কথা বলিতে বলিতে রক্তমুখ-রাজা কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণধার তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন। ভবানন্দ স্বামী অটল প্রশান্ত গম্ভীর বদনে রাজাকে তিনি বলিলেন, "যে প্রশ্ন আপনি করিতেছেন, এই স্থলেই তাহার উত্তর পাইবেন! যাহা আমি গণনা করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইয়াছে।"

অনলে আহুতি প্রদান করিলে যেমন অধিকতর প্রজ্জলিত হয়, স্বামীজির উত্তর শ্রবণে রাজা অমরনাথের ক্রোধানল সেইরূপ অধিক প্রজ্জলিত হইল। ক্রোধ কম্পিত হস্তে অসি বিকম্পন পূর্ব্বক বজ্রস্বরে তিনি বলিলেন "এখনও অহঙ্কার? এখনও এত তেজ? এখনও মিথ্যা কথা! দেখিতেছি, মস্তকে তোর মায়া নাই। আমার কন্যা কোথায় গিয়াছে, তোর কাছে আমি কেবল তাহাই জানিতে চাই, গণনা ঠিক হইয়াছে, সে কথা আমি শুনিতে চাই না, আমার তরবারি তাহা এই দণ্ডে শ্রবন করিবে।

ভবানন্দ স্বামী বৃক্ষমূল হইতে উঠিলেন। প্রসন্ন বদনে রাজাকে কহিলেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি। পলায়ন করিব না, আপনার অসিকে আমি ভয় করি না, গণনায় যদি ভুল হইয়া থাকে, অসি স্বচ্ছন্দে আমার বক্ষ রক্ত পান করিবে, শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিতেছি।"

রাজা বাধা দিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, ত্রিই বৎসর যে ব্যক্তি পলায়ন করে নাই, সেই ব্যক্তি আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে, ইহা অসম্ভব। দেখা যাউক, কি করিয়া আইসে।

রাজা স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, স্বামীজী দ্রুতপদে আশ্রমে চলিলেন। আশ্রমে পৌছিয়া, মাধবের মুখ চাহিয়া স্বামীজী একটু হাস্য করিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাধব! আবার একটি সময় আসিয়াছে। আর একবার তুমি সন্ন্যাসী হও। যেদিন সংসারী করি, সেই দিন আমি বলিয়াছিলাম, মৃগ চর্ম্ম অযত্ন করিও না, আর একদিন তোমারে মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে হইবে। সেই দিন আজ। আর একবার তুমি সন্ন্যাসী হও। মৃগচর্ম্ম পরিধান কর, অঙ্গে বিভুতি লেপন কর, রুদ্রাক্ষ ধারণ করে চল আমার সঙ্গে।

কিজন্য সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে, মাধব সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অল্পক্ষণ মধ্যে দিব্য একটী সন্ন্যাসী সাজিল। স্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া বৃক্ষমূলে ফিরিলেন। নবীন সন্ন্যাসীকে রাজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গম্ভীর বদনে গুরুজী কহিলেন, "মহারাজ! দেখুন, এই সন্ন্যাসীটিকে চিনিতে পারেন?"

রাজাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয় কাঁপিল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রাজার চক্ষু স্থির হইল। কে কাহাকে চিনিবে? মুখখানি দেখিয়া রাজা এক একবার কি যেন পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলেন, আবার সন্দেহ ক্রমে ভাবিতেছেন, সন্ন্যাসী কি সেই? অসম্ভব। মুখের গঠন এক প্রকার, কিন্তু সে নয়। এ ছলনা কেন?

রাজাকে নীরব দেখিয়া স্বামীজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "রাজন্! এ নবীন সন্ন্যাসীটিকে কি চিনিতে পারেন?

রাজা। বোধ হয় ইহাকে কোথায় দেখিয়া থাকিব, ঠিক্ মনে করিতে পারিতেছি না। ইহাকে চিনিয়াই বা আমার কি লাভ?

স্বামী। গণনায় পাইয়াছিলাম, ইহার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইবে।

রাজা। মিথ্যা কথা। তুই বলিয়াছিলি, এ সন্ন্যাসী কখনই মাধব নয়; এ আর একজন। হয়ত তোর সঙ্গী ডাকাত। গুপ্ত সন্ধ্যানি ছোকরা চর! আজ আমি তোদের দুজনকেই বিনাশ করিব। (অসি উত্তোলন)

স্বামী। (শান্ত বদনে) না মহারাজ, সন্ন্যাসীকে বিনাশ করিবেন না; এই সেই মাধব! এই মাধব আপনার জামাতা।

রাজা। (সক্রোধে) উঁ! এটা অসহ্য পরিহাস। পাষণ্ড ডাকাতের অসাধ্য কিছু নাই। নরাধম। আমার মুখের উপর পরিহাস। বিবাহের অগ্রেই আমার প্রাণাধিকা মরকত মোহিনী জন্মের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তুই বলিতেছিস্ এই কপট সন্ন্যাসীটা সেই মাধব? ডাকাতের এই চেলাটা আমার জামাতা, এই কথা তুই বলিতেছিস। ইহার কল শিরচ্ছেদন। (পুনর্ব্বার অসি উত্তোলন)

স্বামী। (নিবারণ করিয়া) না মহারাজ, এখন আমাকে কাটিবেন না। দুই দণ্ড বিলম্বে কাটিবেন। দয়া করিয়া একবার আসুন আমার সঙ্গে।

রাজা ভাবিলেন, বলে কি? সঙ্গে যাইতে বলে। ব্যাপার কি? বোধ হয় বনের ভিতর ডাকাতের আড্ডা আছে; আড্ডায় হয় ত অনেক ডাকাত আছে, সেই খানে লইয়া গিয়া আমাকে হয় ত মারিয়া ফেলিবে। না, পারিবে

না। আমি অস্ত্রধারি। দূর হইতে কুলক্ষণ বুঝিলে এই দুটোকে কাটিয়া আমি স্বচ্ছন্দে অন্যপথে প্রস্থান করিতে পারিব। দেখাই যাউক, ব্যাপারটা কতদূর যায়, শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে।

কৌতূহলের সঙ্গে এইরূপে সাহস আসিয়া জুটিয়া রাজা কহিলেন, "চল, কোথায় লইয়া যাইবে, লইয়া চল। যেখানেই লইয়া যাও, তোমাদের জীবন নিশ্চয়ই আজ আমার হস্তে।"

স্বামীজি অটল। গুরুদেবের শান্তমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পূর্ণ সাহসে মাধবও অটল। অগ্রে চলিলেন ভবানন্দ স্বামী, পার্শ্বে নবীন সন্ন্যাসী, গুরুদেবের পশ্চাতে রাজা। স্বভাবজাত বৃক্ষবাটিকার মধ্যে দিয়া তাঁহারা মাধবের আশ্রমের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি ডাকিলেন, "রাজকুমারী!"

দিব্যালঙ্কার বস্ত্র বিভূষিতা রাজকুমারি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আসিয়াই সম্মুখে দেখিলেন, পিতা। সাশ্রু নয়নে ভূমিষ্ঠ হইয়া মরকত মোহিনী পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। রাজা নিঃস্পন্দ নির্ব্বাক। মাধব সেই অবসরে আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল। রাজার বিস্ময় আরও দ্বিগুণ হইয়া বর্দ্ধিত হইল। তিনি যেন চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় উভয়ের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। দুই তিনবার নয়ন মার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে নীরিক্ষণ পূর্ব্বক রাজার আরও বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। স্বপ্ন নহে, ভ্রম নহে, মায়া নহে, সত্য সত্যই তাঁহার সাম্‌নে সজীব মরকত মোহিনী, সজীব মাধব। রাজা হস্তের মুক্ত তরবারি খানি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

কে কাহাকে চিনিবে? মাধব চিনিল রাজাকে, রাজা চিনিলেন মাধবকে, রাজা চিনিলেন মরকত মোহিনীকে, মরকত মোহিনী চিনিলেন পিতাকে। চিনিবার কার্য্য সমাপ্ত হইল। রাজার বিস্ময়ের সমাপ্তি হইল না। রাজা তখনও ভাবিতে লাগিলেন, ঠিক যেন ইন্দ্রজাল। দুই বৎসর পূর্ব্বে মাধবকে বলিদান করা হইয়াছে, একমাস পূর্ব্বে মরকত মোহিনী সর্পাঘাতে মরিয়াছে; কোথা হইতেই বা মাধব আসিল, কেমন করিয়াই বা মরকত মোহিনী বাঁচিল, রাজার অন্তরে ইহাই তখন প্রবল সমস্যা।

ভবানন্দ স্বামী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া রাজা অমরনাথের সংশয় বিস্ময় বিভঞ্জন করিয়া দিলেন। মাধবের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা কথা তুলিয়া স্বামীজী রাজাকে বিলক্ষণ মিষ্ট মিষ্ট ভৎসনা করিলেন। স্বামীজী বলিলেন,

"মহারাজ! এই সেই মাধব। অবিচারে, নিরাপরাধে অকস্মাৎ আপনি এই মাধবের মস্তক চ্ছেদনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। আপনি রাজা, ধর্ম্মাসনে বসিয়া আপনি প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল বিধান করিবেন, অধীন আশ্রিত বর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবেন, ইহাই রাজধর্ম্ম; মাধবের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়া আপনি কি সেই ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন? আপনি রাজা,—আপনার হৃদয়ে দয়ামায়ার স্থান অধিক; কিন্তু মাধবের দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ হইতেছে, আপনার হৃদয়াপেক্ষা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তি দাসানুদাস ইতর বংশোদ্ভব ঘাতকের হৃদয়ে দয়ামায়া অধিক। আপনি অম্লান বদনে অবিচারে নিরাপরাধ ব্রাহ্মণ বালকের শিরঃচ্ছেদনে অনুমতি দিলেন, ঘাতক কিন্তু সে অনুমতি পালন করিতে পারিল না, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, মাধবকে কাটিল না। সেই জন্য বলিতেছি, আপনার অপেক্ষা আপনার অধীনস্থ ঘাতকটী অধিক দয়ালু।"

রাজা অমরনাথ অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। স্বামিজী পুনঃর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? জল্লাদের দয়ায় প্রাণ ভিক্ষা পাইয়া মাধব সেই রাত্রিকালে আমার নিকটে আশ্রয় পাইয়াছিল। মাধব আমার শিষ্য হইয়াছে, ইষ্টমন্ত্রে মাধবকে আমি দীক্ষা দান করিয়াছি, দুই বৎসর কাল মাধবকে আমি সন্ন্যাসী করিয়া রাখিয়াছিলাম, যেদিন আপনার মরকত মোহিনীর পুনঃর্জীবন লাভ হয়, সেই দিন আমি মাধবকে পুনঃরায় সংসারী করিয়াছি। মাধবের সহিত মরকত মোহিনীর গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে। মনে রাখিবেন, ইহাই ভগবান প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ; এখন আপনি কন্যা জামাতা গৃহে লইয়া কুলপ্রথানুসারে যথাশাস্ত্র মাধবের হস্তে মরকত মোহিনী সমর্পণ করুন।"

রাজা আর দাড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; ক্লান্ত হইয়া পদতলের তৃণাসনে বসিয়া পড়িলেন, স্বামিজীকেও বসিবার অনুরোধ করিলেন, স্বামিজীও নিকটে বসিলেন, মাধব আর মরকত মোহিনী একটু দূরে দাড়াইয়া রহিলেন।

রাজা অনেকক্ষণ অধোমুখে নিরুত্তর। কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, পরিশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "এই মাধব হইতেছে বিপ্রসন্তান, আমি হইতেছি রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কুমার কি প্রকারে ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণে অধিকারী হইবে?"

স্বামিজী উত্তর করিলেন, "অশাস্ত্রীয় নহে। শাস্ত্রে আছে, শ্রেষ্ঠবর্ণের পুরুষ অপেক্ষাকৃত হীনবর্ণের কন্যাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিতে পারে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ, অতএব ব্রাহ্মণকুমার শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় কুমারীর পাণিগ্রহণে সম্যক অধিকারী। কোন সংশয় রাখিবেন না, ইহারা ইচ্ছানুসারে এইরূপ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, স্বচ্ছন্দে গৃহে লইয়া গিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মাধবকে কন্যা সম্প্রদান করুন।"

হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজা অমরনাথের অন্তরে যে বিমল আনন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মরকত মোহিনীর পুনর্জ্জীবনের উপলক্ষ ঐ মাধব।

তাহার উপর এই বনবাসী লোকটী মরকত মোহিনীর প্রাণদাতা, আজ্ঞা দাতা, এ বিবাহের এই উপকারী লোকটীর অনুরোধ; তাহার উপর শাস্ত্রের প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এই সকল স্মরণ করিয়া অবশেষে তিনি মাধবকে মরকত মোহিনী দান করিতে সম্মত হইলেন।

কে কাহাকে চিনিবে? সকলেই সকলকে চিনিলেন, রাজা কেবল ভবানন্দ স্বামীকে চিনিতে পারিলেন না। চিনিবার জন্য মহা আগ্রহ জন্মিল। প্রথমে যাঁহাকে দেখিয়া ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল, যাঁহার কার্য্য দর্শনে ভণ্ডামী বোধ হইয়াছিল, পূর্ব্বে যাঁহার গণনা শ্রবণে ক্রোধ উদয় হইয়াছিল, এখন সেই লোকটির অলৌকিক ক্রিয়া এবং অদ্ভুত ক্ষমতা অবলোকন করিয়া রাজা অমর নাথ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কি বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, মনে মনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্তরে ভক্তির উদয় হইল, পূর্ব্বভাব স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জা পাইলেন, আপনাকে অপরাধি জ্ঞান করিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন, নিজমুখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে রাজার তখন সাহস হইল না।

রাজধানীতে লইয়া গিয়া সাদরে মাধবকে কন্যা সম্প্রদান করুন, তৃতীয়বার রাজাকে এরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া, ভবানন্দস্বামী আপন কার্য্যে অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন। অবকাশ পাইয়া রাজা অমরনাথ মাধবকে আর মরকত মোহিনীকে নিকটে বসাইয়া স্নেহে মধুর বচনে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিতে শুনিতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরত স্নেহাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক রাজা কহিলেন, "মাধব! ভ্রান্তিবশে তোমার প্রতি আমি অবিচার করিয়াছিলাম, সে কথা তুমি ভুলিয়া

যাও। ব্রাহ্মণবংশে তোমার জন্ম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। যাহার আশ্রমে তুমি আছ, ভাগ্যক্রমে তুমি যাহার মন্ত্র শিষ্য হইয়াছ, আমি তাঁহার প্রকৃত পরিচয়টী অবগত হইতে ইচ্ছা করি।" বিনম্র স্বরে মাধব কহিল, "মহারাজ, আমার গুরুদেব অসাধারণ মহাপুরুষ, পৃথিবীতে তিনি দেবতা। হঠাৎ দর্শনে চিনিতে পারা যায় না, কিন্তু এই দুইবৎসরে তাঁহার যে সকল কার্য্য আমি দর্শন করিয়াছি, তৎ সমস্তই অলৌকিক, অতি আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য।"

বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন, "মাধব! তুমি ধন্য, এতাদৃশ মহাপুরুষের আশ্রয় তুমি লাভ করিয়াছ, এতাদৃশ মহাপুরুষের তুমি শিষ্য হইয়াছ, তোমার সৌভাগ্যে বহুলোকে হিংসা করিবে, সে হিংসায় পদে পদে তোমার মঙ্গল হইবে; অল্প বয়সে তুমি পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে যশস্বী হইয়া উঠিবে, এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার গুরু-দেবের আর কিছু সূক্ষ্ম পরিচয় তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ কি?"

কিঞ্চিৎ কম্পিত হইয়া মাধব উত্তর করিল, "সূক্ষ্ম পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। গুরুদেব সর্ব্বদা আপন কার্য্যেই নিবিষ্টচিত্ত থাকেন, অন্য প্রকার সম্ভাষণের অবসর পাওয়া যায় না। কুশাঙ্গুরী বন্ধন—কি যে সেই সকল অঙ্গুরী, তাহা আমি বুঝিনা; জগত সংসারের নর নারীর বিবাহ সেই সকল অঙ্গুরী বন্ধনে স্থিরীকৃত হয়। ইহা ব্যতীত আরও অলৌকিক ক্রিয়া বিস্তর। মাসের মধ্যে গুরুদেব ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচদিন ছয়দিন যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল ভক্ষণ করেন, পিপাসা নাই, জলপান করেন না। নিশাকালে নিদ্রা নাই, রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী হইলেও আমার গুরুদেব যেন পৃথিবীর সমস্ত সুপরি-স্কার দেখিতে পান। জগতের কোথায় কি হইতেছে, জগতে কে কোথায় কি করিতেছে, আমার গুরুদেব নখদর্পণে তাহা দর্শন করেন। গুরুদেবের কিছুমাত্র অভাব নাই। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। ইচ্ছা করিলেই তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী করতলে প্রাপ্ত হন। কোথা হইতে আইসে, কে আনিয়া দেয়, কেহই তাহা জানিতে পারে না। অথচ আশ্চর্য্য যে, সংসারের কিছুতেই তাঁহার অভিলাষ নাই, মমতা নাই, প্রয়োজনও নাই। কতদিন তিনি জগতে আছেন, কতদিন তিনি এই মহারণ্যে অবস্থান করিতেছেন, কেহই তাহা বলিতে পারে না! আশ্রম নাই, পরিচারক নাই, ভোগ বাসনা নাই, ক্লেশানুভব নাই, নির্ব্বিকার।"

একমনে শ্রবণ করিতে করিতে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, রাজা বলিয়া

উঠিলেন, "মাধব! আমার ভ্রম হইয়াছিল, অগ্রে আমি চিনিতে পারি নাই, আচ্ছা মাধব আর কোন সংসারী লোক তোমার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় এই মহারণ্যে আইসে, তাহা তুমি দেখিয়াছ ?"

মাধব কহিল, "দুই বৎসর আমি এখানে আছি, সন্ন্যাসধর্ম্ম লইয়া সন্ন্যাসের আচার অভ্যাস করিতেছিলাম, এক একদিন নিশাকালে গুরুদেবের চরণ দর্শন করিতাম যাহা দেখিতাম, তাহা যেন সত্য সত্যই ইন্দ্রজাল মনে হইত, বাস্তবিক কিন্তু ইন্দ্রজাল নয়, আমার গুরুদেব মায়াবী নহেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ অদ্ভুত।"

রাজা। তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু কি প্রকার অদ্ভুত ?

মাধব। এক এক রজনীতে আমি দেখিয়াছি, গুরুদেব বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, রাত্রি অন্ধকার চতুর্দ্দিকে যেন বিদ্যুতের ক্রীড়া—তরুমূলের অন্ধকার সেই তেজে তিরোহিত; বহুলোক করপুটে গুরুদেবের নিকটে দণ্ডায়মান।

রাজা। উহা তুমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ ?

মাধব। দূর হইতে দর্শন করিয়াছি। প্রথম প্রথম ভয় হইত, নিকটে যাইতাম না। যাইতে পারিতাম না, আশ্রমে ফিরিয়া আসিতাম। থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে একটু একটু সাহস বৃদ্ধি হইল, বৃক্ষমূলে ঐ প্রকার নৈশ অভিনয় দর্শন করিবার অভিলাষে নিকটস্থ হইতাম কিন্তু নিকটস্থ হইবামাত্র জনমণ্ডলী লুক্কায়িত হইয়া যাইত, আলোকিত বনস্থলী সহসা অন্ধকারে সমাবৃত হইত, আমি ফিরিয়া আসিতাম। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না; এখনও পারি না।

রাজা। আচ্ছা তোমার গুরুদেব কি এক দিনও আশ্রমে বাস করেন না ?

মাধব। একদিনও না। ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত শীত গাঢ় অন্ধকার কোন বাধাই মানেন না সমভাবে অনাবৃত মস্তকে বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকেন।

যতই শ্রবণ করিতেছেন, রাজা অমরনাথের বিস্ময় ভাব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইতেছে। চিন্তা করিতে করিতে রোমাঞ্চিত কলেবরে পরম কৌতুহলে পুনরায় তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার গুরুদেবের নামটি কি ?"

মাধব। প্রকৃত নাম আমি জানি না, আপাততঃ আমার পূজ্য নাম শ্রীমৎঋষি ভবানন্দ স্বামী। সর্ব্বশাস্ত্রে তিনি সুদক্ষ, পরমার্থ জ্ঞানে সর্ব্বদাই তিনি বিহ্বল।

রাজকুমারী মরকত মোহিনী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন, পরমার্থ জ্ঞানে সর্ব্বদাই তিনি বিহ্বল, মাধবের মুখে সেই অশুষ্ক কথা শ্রবণ করিয়া সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ মহারাজ! পরমার্থ চিন্তায় তিনি সর্ব্বদাই বিহ্বল। অল্প দিনের মধ্যেই গুরুদেবকে আমি এক প্রকার চিনিতে পারিয়াছি, সত্য সত্যই পৃথিবীতে তিনি দেবতা! একদিন রাত্রিযোগে প্রচ্ছন্নভাবে গুরুদেবের দর্শনাভিলাষে অশ্বত্থমূলে আমি যাইতে ছিলাম, আকাশে মেঘ ছিল, জলদের গর্জ্জন ছিল, চপলার চকমকি ছিল, সেই বিদ্যুৎ চকমকি ব্যতিরেকে সে রজনী প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। প্রায় বিংশতি হস্ত দূর হইতে আমি দেখিলাম, বৃক্ষমূলে যেন সহস্র সহস্র মধু বর্ত্তি না জ্বলিতেছে, দেবোপম সহস্র সহস্র সুপুরুষ, দেবকন্যা সদৃশা সহস্র সহস্র দেবকামিনী আমাদের গুরুদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে আমি যেন"——

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে সহসা রাজকুমারীর বদন সুধাকর ঈষৎ রক্তিম আভায় সুরঞ্জিত হইল; সহসা যেন লজ্জা আসিয়া তাঁহারে কথা কহিতে নিষেধ করিল, লজ্জায় মরকত মোহিনী অধোমুখী হইলেন। কি বলিতে ছিলেন, তাহার পর কি বলিতেন, সেইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া তাহা যেন ভুলিয়া গেলেন। কন্যার সলজ্জ বদন নিরীক্ষণ করিয়া অভিনব কৌতুহলে রাজা অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা! নিরুত্তর হইলে কেন? কি বলিতেছিলে বল। ভক্তেরা গুরুপাদপদ্মে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছিল, তাহা দর্শন করিয়া তুমি কি করিলে ?"

সলজ্জ বদনে সুমধুর মৃদুস্বরে মরকত মোহিনী কহিলেন, "কিছুই করিলাম না; অগ্রসর হইতেছিলাম পশ্চাতে ফিরিলাম। মহারাজ শ্রবণ করিয়াছেন, এই বিপ্রকুমার ঐ গুরুদেবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যেদিনের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেই দিন সেই সময়ে আমার বাসনা হইয়াছিল আমিও গুরুদেবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করি।"

রাজা আর নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; অকস্মাৎ তাহার অন্তরে যেন কি এক প্রকার চিন্তা আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, অন্য মনস্ক ভাবে চঞ্চল চরণে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মাধবকে কহিলেন, "মাধব। চল, আর একবার আমি তোমার গুরুদেবকে দর্শন করিব, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

মাধবও তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল। বসিয়া বসিয়া মরকত মোহিনী ভাবিলেন, এ আবার কি ভাব?

মাধবের সহিত রাজা সেই অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গমন করিবার উপক্রম করিতেছেন, মরকত মোহিনী দ্রুত উঠিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, সজল লোচনে কহিলেন, "পিতা। আমি যাইব, আমিও এই বিপ্রকুমারের ন্যায় পিতৃ সমক্ষে আজই সেই পরমপূজ্য গুরুদেবের মন্ত্রশিষ্য হইব।"

রাজা উৎকণ্ঠিত হইলেন। মনে তাঁহার কি ভাবের উদয় হইল তিনিই তাহা জানিতেন। নিকটে মাধব সেই মাধবকে কন্যা দান করিতে ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বামীজীর সাক্ষাতে সম্মত হইয়াছেন; মাধবের সাক্ষাতে কন্যার নিকটে মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহার যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ আসিল, মাধবের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল বদনে সস্নেহ বচনে কহিলেন, "মাধব। তুমি অগ্রে যাও, পুনর্ব্বার আমি দর্শনাভিলাষী গুরুদেবের চরণে এই কথা নিবেদন কর।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া মাধব চলিয়া গেল। নির্জ্জন পাইয়া চিন্তাকুল রাজা গদ গদ কণ্ঠে আদরিণী কন্যাকে কহিলেন, "মা। উদাসীনের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সংসার বাসনা শিথিল হয়। তুমি রাজকন্যা অনূঢ়া তোমার সম্মুখে বহু প্রকার ভবিষ্যৎ আশা ক্রীড়া করিতেছে, তুমি উদাসীনি হইয়া সকল আশায় বিসর্জ্জন দিবে ইহা শুনিয়া আমার প্রাণে বেদনা লাগিতেছে।"

রাজকন্যা কহিলেন, "উদাসীনি হইব না। আপনি আমারে যাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন, তাঁহার যে ধর্ম্ম যে পথ আমি চির জীবন সেই ধর্ম্ম সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকিব।"

কি জানি কেন এই সময় রাজা অমরনাথের যেন কিছু স্মৃতি ভ্রংশ হইয়া আসিতেছিল, চমকিত হইয়া ত্বরিতস্বরে তিনি বলিলেন, "ইহাদের নির্ব্বন্ধ ইহারা বলিতেছেন, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ মাধবের সহিত তোমার বিবাহ হইবে। আপত্তি করিয়াছিলাম ব্রাহ্মণকুমারের সহিত ক্ষত্রিয় কুমারীর বিবাহ হইতে পারে না, শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া ভবানন্দ স্বামী আমাকে প্রবোধ দিয়াছেন, কাজে কাজেই আমি মাধবের হস্তে তোমারে সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছি। মাধব বালক মাধব সন্ন্যাসী মাধবের সহধর্ম্মিণী হইয়া তুমি সন্ন্যাসিনী হইবে, এই তরুণ বয়সে তোমার সুখময়ী সংসার লালসা ফুরাইয়া যাইবে, তাহা স্মরণ করিয়া এখন আমার হৃৎকম্প হইয়াছে। তোমার হয়ত মনে নাই, আমার স্মরণ আছে, আমি তোমারে হারাইয়া ছিলাম, তুমি আমার নষ্ট হইয়া

মনে ভাবিয়া পাষাণে বুক বাঁধিয়া, আমি তোমারে নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, রত্ন প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় স্বামীজির প্রসাদে মাধবের কল্যাণে আমি তোমারে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পরমানন্দ আমার হৃদয় মধ্যে বসন্ত কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতেছে, এই সুখের সময়ে এই সম্ভাবিত পরিণয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি অবসন্ন হইতেছি। প্রাণাধিকে! আমার অনুরোধ উদাসীনের নিকটে মন্ত্র গ্রহণের সঙ্কল্প তুমি পরিত্যাগ কর।"

মাধব ফিরিয়া আসিল। স্বামীজির অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সবিনয়ে মাধব বলিল, "মহারাজ! গুরুদেবের আদেশ হইয়াছে, আপনি এই মুহূর্ত্তে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। আমিও সঙ্গে যাইতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, রাজকন্যাও সঙ্গিনী হইতে পারেন।"

মনের তর্ক বিতর্ক মনে মনেই রহিল। বাক্যব্যয় না করিয়া রাজা অমরনাথ তৎক্ষণাৎ মাধবের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, আগ্রহে আগ্রহে অনুবর্ত্তিনী হইলেন মরকত মোহিনী।

তিন জনে সেই পূজ্যতম অশ্বত্থ তরুতলে উপস্থিত হইলেন। যাঁহাকে দেখিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজার মনে সক্রোধ ঘৃণা ভাবের উদয় হইয়াছিল, রাজা আজ সেই লোকটিকে মহা তেজঃপুঞ্জ দর্শন করিলেন, স্বামিজীর নেত্রদ্বয় যেন ধ্রুবতারার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে, রাজা তৎকালে ইহাই দেখিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজির চরণে প্রণিপাত করিলেন, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নারায়ণ স্মরণ করিয়া স্বামীজি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা কহিলেন, "ভগবন্। আপনি অসাধারণ মহাপুরুষ আমি মূঢ়, আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছিলাম, সদয় হইয়া আমার সেই অজ্ঞান কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার সেবক হইলাম, আমি আপনার শিষ্য হইলাম, কৃপা করিয়া আমাকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিলে আমি চরিতার্থ হইব।"

স্বামীজির বদন প্রসন্ন হইল। প্রসন্ন বদনে রাজাকে তিনি বলিলেন, "[illegible] আমি তোমাকে অভিষেক করিয়া মন্ত্র প্রদান করিব, সত্বর ও, নদীতে স্নান করিয়া আইস। তোমার রাজ্যে অতঃপর আর কোন প্রকার [illegible] উপস্থিত না হয়, আমি তাহার যথাবিহিত উপায় করিয়া দিব, শুদ্ধচিত্তে স্নান করিয়া আইস।"

কৃতাঞ্জলি পুটে সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মরকত মোহিনী কহিলেন, "গুরুদেব! আমিও মন্ত্রগ্রহণ করিব, প্রসন্ন হইয়া এই সঙ্গে আমারেও কৃতার্থ করুন। জন্মাবধি যথার্থ শান্তি আমি উপভোগ করিতে পাই নাই, যদিও আমি বালিকা; তথাপি নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ উপভোগে আমার একান্ত অভিলাষ।"

মৃদুহাস্য করিয়া স্বামীজি বলিলেন, 'ঠিক হইয়াছে, তোমারে দীক্ষা দান করিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না, তোমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে, কিন্তু মা! কিঞ্চিৎ বিলম্ব। বনমধ্যে গার্ব্বর্দ্ধ বিধানে তোমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার পিতা বর্ত্তমান, পিতা সম্প্রদান না করিলে তোমাদের বর্ত্তমান সমাজে কন্যার বিবাহ সুসিদ্ধ হয় না, রাজধানীতে যাও, শুভক্ষণে পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হউক, তাহার পর আমি তোমারে অভিষ্ট মন্ত্র প্রদান করিব।"

মরকত মোহিনী প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা পূতসলিলে স্নান করিয়া পূতদেহে পূতচিত্তে স্বামীজির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তদনন্তর গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দুহিতা সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুরুদেবের আদেশে প্রেমানন্দ মানসে অনুবর্ত্তি হইলেন মাধব।

ক্রমশঃ

আলকাতরা। Coal Tar.

লেখক,—শ্রীযুক্ত ষটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলকাতরা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। ইহা কাল চট্‌চটে দুর্গন্ধযুক্ত ঘন এক প্রকার পদার্থ। গ্যাশের কারখানায় কয়লা হইতে পাওয়া যায়। অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা একটা আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য হইত এবং কারখানা ওয়ালারা বিনামূল্যে লইয়া যাইবার জন্য বিজ্ঞাপন দিত। কিন্তু এখন আর ইহা মনুষ্যের দুঃচক্ষের বিষ নহে। বিজ্ঞান ইহাকে শ্রেষ্ঠ আদরণীয় সামগ্রী করিয়াছে। এখন আলকাতরা হইতে হয় না এমন জিনিষ নাই। অতি সুন্দর সুন্দর রং যাহা ফুল ফল ও সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালীন আকাশ ভিন্ন কিম্বা পক্ষীর ডানায় ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে, নানা রকম

ঔষধ যাহা জ্বর, বেদনা, ঘা আরোগ্য করিয়া শত শত মনুষ্যকে প্রাণদান করিতেছে, তাহা আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধে শত্রু ধ্বংশকারী বিস্ফোরক পদার্থ সমুহের উপাদানও আলকাতা প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষীয় আতরের অপেক্ষা সহস্রগুণ মনোহর গন্ধযুক্ত সামগ্রী আলকাতরা হইতে পাওয়া যাইতেছে। চিনি অপেক্ষা শত শত গুণ মিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য আলকাতরা হইতে উৎপাদিত হইতেছে! এই কুচ্‌কুচে কাল চট্‌চটে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থটার সহিত জগবানের অনির্ব্বচনীয় কৌশল জড়িত আছে।

আলকাতরা হইতে উক্ত নানাবিধ সামগ্রী আবিষ্কার করিবার কৌশল উদ্ভাবনের সহিত জর্জ্জ মানসফিল্‌ড নামক একটি আবশ্যকীয় জীবন পরলোকে প্রেরিত হয়। (George Mausfield) জর্জ্জ মানসফিল্‌ড আলকাতরা হইতে নানাবিধ তৈল পৃথক করিতে সক্ষম হন, ঐ সকল তৈল হইতে নানারকম ব্যবসার সূত্রপাত হয়। তৈলের কারখানায় আগুন লাগিয়া মানসফিল্‌ড মারা যান। তিনি যে প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে অদ্য সভ্যজগতে সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান হইয়াছে।

মানসফিল্‌ডের মৃত্যুর পরে আলকাতরা হইতে ধ্বংসকারী Nitro-boaty সকল আবিষ্কার হয়। এই প্রক্রিয়া কালে কিছু দিন পূর্ব্বে বারসিন নগরের একটা কারখানা একেবারে লোপ পায়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহের সিঁড়ি ও কল কব্জা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং কারখানার সমস্ত লোক মারা যায়।

ইহার পরে (Anllin) এনিলিস আবিষ্কার হয়, ইহা নানাবিধ সুন্দর রঙ্গের জন্মদাতা। এনিলিন আবিষ্কারের গল্প কৌতুহল উদ্দীপক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (William Parkin) উইলিয়াম পারকিন একটা ১৮ বৎসর বয়সের যুবক, কুইনাইন প্রস্তুত করিবার মানসে এনিলিন লইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত দিনের পর অকৃতকার্য্য হইয়া পারকিন যতগুলি তরল পদার্থ লইয়া কার্য্য করিতেছিল সকলগুলি মিশ্রিত করিয়া ফেলিল। তখন হঠাৎ নানারূপ বর্ণ দেখিতে পাইল। অপর কেহ হইলে উহা ফেলিয়া দিত, কিন্তু পারকিন ইহা দ্বারা আরও পরীক্ষা করিতে করিতে নানা প্রকার রং প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিলেন।

জার্ম্মাণীতে ইলবারফিল্‌ডে বেয়ার কোম্পানীর (Beyar & Co) রঙ্গের কারখানায় ৮০০০ মজুর, ৩৩০ ইউনিভারসিটি শিক্ষিত রাসায়নিক, ১০ ডাক্তার ৪০ ইঞ্জিয়ানিয়ার, ৪০০ কর্ম্মকার, (Technical mornr) ১২০০ কেরাণী

প্রভৃতি লইয়া প্রায় ১০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে, এই সকল লোকের স্ত্রীপুত্রাদি গণ্য করিলে অন্ততঃ ২৫০০০ লোক এই একটা মাত্র কারখানার দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এই সকল কারখানায় কৌতুহল উদ্দীপক দৃশ্য দেখা যায়। বিশেষতঃ ছুটী হইলে যখন সকল লোক বাহিরে আসিতে আরম্ভ করে; তাহাদের দেহে রামধনুর রং নানাপ্রকার সুন্দর ফুলের রং দেখিতে পাওয়া যায়। ফাঙ্কফোর্টের একটা স্নান করিবার ঘাটের নিকটে এই সকল কারখানার ময়লা জল নির্গত হইত। একদিন প্রাতঃকালে লোকে স্নানের পর দেখে যে তাহারা নানাবিধ সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। পরে এই দুর্ঘটনার সুবন্দোবস্ত হয়। আলকাতা হইতে রং প্রস্তুত হইয়া আজকাল বাৎসরিক ৫০০০০০০ পাউণ্ড উপার্জ্জিত হইতেছে। কেবল রং প্রস্তুতের জন্য (আলকাতরা হইতে) প্রায় ২০০০ কারখানা সমগ্র পৃথিবীময় স্থাপিত হইয়াছে।

রাসায়নিক নীল (Indigo) ও (Aligarin) এলিজারিন (Red type of Indigo) প্রকৃতিকে টেক্কা দিয়াছে। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে শত শত বিঘা জমিতে নীলের চাষ হইত, অধুনা রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নীলের জন্য ঐ সকল জমিতে অন্য চাষ হইতেছে।

আলকাতরা হইতে সহস্র সহস্র মণ আশ্চর্য্য ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। কুইনাইনের ন্যায় জ্বর নাশক (Antipirin) এন্টিপিরিন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার হয়। (Acetanilide) এসিটানিলাইড নামক ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া অতীব রহস্যময়, এন্টিপিরিন প্রস্তুতকারী একজন রাসায়নিকের কারখানায় হেপ ও কন নামে দুই ব্যক্তি কার্য্য করিত। একজন জ্বর ও খোসযুক্ত রোগী ডাক্তার খানায় আসিলে তাহারা ন্যাপথালিনের গুণ প্রমাণের জন্য কম্পাউণ্ডারকে ইহা দিতে বলে, ভুল ক্রমে এসিটানিলাইড দেওয়া হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য উপকার হয়। কিন্তু যখন পুনরায় ঔষধ আবশ্যক হয়, তখন যথার্থ ন্যাপথালিন প্রেরিত হয় এবং ইহা দ্বারা রোগীর কোনও উপকার না হওয়ায় অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে এসিটানিলাইড প্রেরিত হইয়াছিল। তদবধি জ্বর ও নিউরাল জিয়ায় এসিটানিলাইডের উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

(Sulphonal) সালফোনাল যাহা সেবন করিলে বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রাতে অভিভূত হইতে হয়, আলকাতরা তাহারও জন্মদাতা। আফ্রিকা দেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কারকারীগণ এই ঔষধের সাহায্যে ইচ্ছামত নিদ্রা যাইয়া

সুস্থ হইতেন। ষ্টোভেন, কোকেন প্রভৃতি স্পর্শশক্তি হারকবর্গ (Hamaeshielies) আলকাতরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা মনুষ্য গাত্র অসাড় করিয়া দিয়া দন্ত প্রভৃতি উৎপাটন ও অন্যান্য অস্ত্র চিকিৎসা করা যায়।

(Adrinalin) এড্রিনালিন প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্য গাত্রের রক্ত সেই স্থান হইতে সরাইয়া দিয়া কোনরূপ বেদনা না পাইয়া অস্ত্র চিকিৎসা করা যায়।

জনহপকিন ইউনিভারসিটিতে (Mr. Falbeze) মিষ্টার ফলবাজ আলকাতরা লইয়া বহু পরীক্ষার পর অকৃতকার্য্য হন। একদিন রাসায়নিক পরীক্ষাগার হইতে বাড়ী আসিয়া চা খাইতে আরম্ভ করিলে চা অত্যন্ত মিষ্ট লাগিল। তিনি মিষ্টি একেবারে ভালবাসিতেন না, রন্ধনকারীকে ডাকাইয়া জানিলেন যে সে কোন মিষ্ট পদার্থ দেয় নাই, তখন হাত চাটিয়া দেখিলেন যে, চিনির অপেক্ষা সহস্রগুণ মিষ্ট আস্বাদ পাইতেছেন। তখন রসায়নাগারে যাইয়া দেখিলেন যে, একটা পাত্রের দ্রব্যের আস্বাদ অত্যন্ত মিষ্ট। ইহা চিনি অপেক্ষা ৫৫০ গুণ অধিক মিষ্ট প্রমাণিত হইল এবং ইহা সেকারিন নামে অভিহিত হইল।

এতাবৎকাল সুগন্ধি এসেন্স ও আতর সমূহ নানাবিধ ফুল হইতে উৎপাদিত হইত। জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স প্রতিবৎসর কোটী টাকার সুগন্ধি এসেন্স উৎপাদন করিত। কিন্তু এখন রাসায়নিক উপায়ে আলকাতরা হইতে নানাবিধ সুগন্ধি তরল পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। আজকাল (যুদ্ধের পূর্ব্বে) কেবল জার্ম্মাণী প্রতিবৎসর ২০০০০০০ পাউণ্ড মুল্যের এসেন্স প্রস্তুত করিতেছে।

যাহারা (Lidite) লিডাইট দ্বারা পর্ব্বত ধ্বংস করা দেখিয়াছে, তাহারা আলকাতরার মধ্যস্থিত অপূর্ব্ব স্তম্ভশক্তিতে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিবে না। আলকাতরা হইতে নানা প্রকার ধ্বংসকারী পদার্থ আবিষ্কার হইতেছে। এক মিলিয়ন লোক মারিতে নেপোলিয়নের ১৫ বৎসর লাগিয়াছিল, কিন্তু বিগত যুদ্ধে দুই মিলিয়ন লোক হত হয়। আলকাতরা হইতে প্রস্তুত সামগ্রী সমুহই এই ধ্বংসের প্রধান অস্ত্র হইয়াছিল।

আলকাতরা হইতে নানাবিধ ছাপিবার ও লিখিবার কালী বার্ণিশ, ইলেক্‌ট্রিক ইনসিউলেটার প্রভৃতি শত শত আবশ্যকীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে।

এই সকল আবিষ্কারের মূলে কেবল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়। ইহা হইতে আমাদের শিক্ষা করা উচিত যে, অঙ্গারের মধ্যেও হীরক পাওয়া যাইতে পারে যদি আমরা অনুসন্ধানের কষ্ট সহ্য করি, কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হয় না।

কল্যাণি, ওগো কল্যাণি !
বন-বিহঙ্গ পঞ্চম তানে
প্রভাতে তোমারে বন্দে,
সন্ধ্যায় তব কুঞ্জ-ভবনে
মুগধ ঝিল্লি ছন্দে,
কল্যাণি, ওগো কল্যাণি !
বরষার তব বিমল গাত্রে
বরিষে জলদ ধারা,
শরতে তোমার শোভনা রাত্রে
উজ্জ্বল হিরণ তারা—
কল্যাণি, ওগো কল্যাণি !
হেমন্তে তব শিশিরসিক্ত
স্নিগ্ধ বদনখানি,
বসন্তে তব আকুল কান্তি—
বিজন ফুলের রাণী,
কল্যাণি, ওগো কল্যাণি।

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রজনী প্রভাত হইল। সাধক যথা সময়ে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভক্তবৃন্দের সহিত পরমানন্দে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পর দিন কোটাল হাটে প্রত্যাগমন করিলেন। বিশু ও কেণারাম জানিতেন, ঠাকুরের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, তথাপি তাহারা ভৈটে পালসিটের রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক রহিলেন। দুই একদিন পরে ভৈটে পালসিটের কায়স্থ কোটাল হাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলকে ভৈটে হইতে সুখে প্রত্যাগমন

প্রশ্ন করিয়া কায়স্থ কহিলেন, "আমার গৃহে আপনাদের পদার্পণে আমি আমাকে মহাভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি।" বিশু ও কেণারাম বুঝিলেন, তাঁহাদের বেশে কায়স্থের গৃহে ভক্তবৎসলার আবির্ভাব হইয়াছিল। কেণারাম কিছুমাত্র উত্তর না করিয়া কায়স্থকে মহাভাগ্যবান বিবেচনা পূর্ব্বক অভয়ার চরণ ও সাধকের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাবান্তর অতি গভীর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "মা ইচ্ছাময়ী! তুমি কখন কাহার প্রতি প্রসন্ন নয়নে চাও তুমিই জান।" ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া ভাবিলেন, "ধন্য এই মহাপুরুষ! যাহার ইচ্ছায় কায়স্থের গৃহে ভক্ত বৎসলা অভয়ার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। আমরাও মানুষ কিন্তু আমাদের সহিত এই মহাপুরুষের এত প্রভেদ! একই ভূগর্ভে হীরক ও অঙ্গারের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" সাধক কেণারামের প্রাণের উচ্ছ্বাস বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে অন্য ভাবে লইবার জন্য কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দিন তোমার সমুদয় কর্ম্ম ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন হইয়াছে ত?" কায়স্থ কহিলেন, "আপনার কৃপায় আমার কোন বস্তুরই অভাব হয় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই বলিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে কখনও এরূপ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করেন নাই। আমার আয়োজনের উপযুক্ত লোক অপেক্ষা অনেক লোক অধিক ভোজন করিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছি, আপনার সদনে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছিল। আমি অতি দীন আয়োজনের অভাব পাছে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তৃপ্তিলাভ না করেন, এ ভয়ে আমি অতি ভীত ছিলাম। সমস্ত দিন আমি নয়নজলে অন্নপূর্ণার কৃপা-দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনার শান্তিময় মুখ ও চরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম।" সাধক কহিলেন, "তোমার ভক্তিগুণে যথার্থই তোমার গৃহে অন্নপূর্ণার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল।" ইহা কহিয়া সাধক সে দিনের ঘটনা কায়স্থের নিকট গোপন রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ সুখালাপের পর কায়স্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এ স্থলে আর একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন বিশু ও কেণারামের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকার তথায় উপস্থিত ছিল। কেণারাম কহিলেন, "ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কোন বস্তু বিষয়ের প্রতি চিত্তের সন্নিবেশকে সাধনা বলা যায়। আরাধ্য বিষয়ের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিই সাধনার উদ্দেশ্য। তাল মান ও সুরের সহিত আপনাকে মিশাইতে পারিলেই সঙ্গীত সাধনার সাফল্য লাভ হয়। ঈশ্বর সাধনার স্বার্থকতা সাযুজ্য। শব্দ

(২)

একদিন অনেক রাত করে বাড়ী যাওয়ায় খোকার মা জ্বলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লেন। আমি খোকার মাকে অনেক কোরে কাকুতি মিনতি করলুম—"ওকে মার্‌বেন না, ওর দোষ নেই। আমারই দোষে রাত্তির হয়ে গেল।" কিন্তু খোকার মা খোকাকে ধমক দিয়ে মারধোর কর্‌লেন। বল্‌লেন, "কেন অমন কাজ করিস্? ফের যদি অরুণদের বাড়ী যাবি ত মার খেয়ে মরবি।"

খোকা কোন উত্তর দিলে না। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ওপরে উঠে গেল।

খোকার মা খোকাকে ওপরে যেতে দেখে বল্‌লেন,—"খেয়ে শুগে যা।" কে তোকে ডেকে খাওয়াবে?" খোকা বললে, "আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।"

(৩)

কলেজ থেকে বাড়ী এসেছি. এমন সময় খোকার দিদি সুধা এসে বল্‌লে—"অরুণদাদা খোকা তোমাকে ডাকছে শীগ্‌গির চল।" সুধা যে রকম ভাবে কথা বল্‌লে, তাতে আমি চমকে উঠে বললুম, "কেন?" চমকাবার একটু বিশেষ কারণ ছিল—সুধা যখন কথা বলছিল তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম তার চোকের কোল থেকে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। দেখে প্রাণের ভেতর অনেকগুলো কাল মেঘ জমাট বেঁধে গেল। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। আমি আর কোন কথা না বলে তখনই খোকাদের বাড়ী চলে এলুম।

খোকাদের বাড়ীতে আস্‌তে, খোকার মা প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, "বাবা অরুণ। কাল রাত্তিরে মার খাবার পর খোকা ওপরে চলে গেলে, আমি ভাবলুম তা কাজ কর্ম্ম সেরে ওকে খাওয়াব। তার পর সকলকে খাইয়ে খোকাকে খাওয়াবার জন্তে, খোকার গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে গিয়ে, গা আগুনের মত গরম বোধ হ'ল। "খোকা খাবি চল" আর এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুল না! তারপর কাল রাত্তিরেও খালি ছটফট ক'রেছে। দু একবার ভুলও বকেছিল।

এইবার খোকার মা কেঁদে ফেলে বল্‌লেন, "কি হবে বাবা? আমার ত ভারি ভাবনা হয়েছে।"

আমি বললুম—"ভয় কি মা। সেরে যাবে। ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছেন?"

হাঁ।

ডাক্তারে কি বল্‌লে?

এমন কিছু বললে না।

আমি আর কিছু না বলে খোকার বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম খোকা ঘুমুচ্ছে।

* * * *

খানিকক্ষণ পরে খোকা চোক মেলে, আমায় দেখতে পেয়ে অতি ক্ষীণস্বরে বললে, "অরুণদা তোমাদের বাড়ী যাব।" আমি বললুম, "খোকা! অসুখ একটু ভাল হলেই নিয়ে যাব।"

খোকা আবার ক্ষীণস্বরে বললে, "অসুখ ত আমার ভালো হয়ে গেছে।"

খোকার মা তখন খোকার বিছানায় এসে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "হাঁ বাবা, তুমি ওকে ভাল হলেই নিয়ে যেও।" আমি আর কিছু বলব না। ওযে তোমাকে এত ভালবাসে জানতুম না! ঘুম একটু ভাঙ্গে আর বলে, "অরুণদা! অরুণদা!" বুঝেছি—কাল রাত্তিরে আমি ওকে মেরেছিলুম, আর তোমাদের বাড়ী যেতে বারণ করেছিলুম, তাই ওর এমন অসুখ করেছে।"

খোকার মার চোখ দিয়ে আবার অঝর ঝরে জল পড়তে লাগল।

• • • •

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার এলো। খোকাকে দেখে বল্‌লে আগের চেয়ে এখন দেখ্‌ছি ঢের ভালো।

তার পর চার পাঁচ দিন কেটে গেছে।

আজ খোকা সাতদিনের পর আমাদের বাড়ী এসেছে। আজ সে আমাদের বাড়ীতে প্রায় পাঁচ ছ ঘণ্টা কাটিয়ে রাত ন'টার সময় বাড়ী গেল।

আমিও খোকার সঙ্গে খোকাদের বাড়ী গেলুম—কিন্তু অত রাত করে বাড়ী যাওয়া সত্বেও আজ আর খোকার মা খোকাকে কোন তিরস্কার কর্‌লেন না।

বসন্তের ফুল।

লেখিকা,—শ্রীমতী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ।

(১)

সত্য মৃদু প্রিয় হিতজনক বচন,
কহে সদা সবাকারে, সুধীর সুজন।
আপন প্রশংসা আর পরের নিন্দান,
কদাচ তাদের রত দেখা নাহি যায়।

(২)

নরদেহাশ্রিত তবু ব্যাধি সমুদয়,
নরের অহিত সদা করে অতিশয়।
বহুদূরে বনজাত ঔষধ নিকর,
বনে রহিয়াও হয় নর-হিতকর।
সেই রূপ পর যদি উপকারী হয়,
পরম সুহৃদ বলি তার খ্যাতি রয়।
মিত্র জনে যদি কেহ করে অপকার,
শত্রু মধ্যে গণ্য হয়—ব্যবহারে তার।

(৩)

সমাজে পূজিত সেই গুণ আছে যার;
বশীভূত রহে তার নিখিল সংসার।

(৪)

যে জন বাঁচিলে বাঁচে বহু বহু নরে,
সে জন বাঁচিয়া থাক নীরোগ শরীরে।
পালিত যাহার অন্নে বহু ব্যক্তি হয়,
সার্থক তাহার জন্ম;—সে-ই মহাশয়।

(৫)

স্বার্থহীন হ'য়ে যে বা অন্যের কারণ,
স্থানে স্থানে জলাশয় করায় খনন,
বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা করে, বিশ্রাম আগার,
আতুর আশ্রম, বিদ্যামন্দিরাদি আর,
নদীতটে বাঁধে ঘাট; সেতুর নিৰ্ম্মাণ,
করে যেই ধন্য সে-ই বড় পুণ্যবান্।

"ভ"কারের ভূমিকা।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিশারদ।

"ককারের অহঙ্কার" ও "বকারের বক্তৃতা" শুনিয়া আমার কথা তোমাদের আর ভাল লাগিবে কিনা বলিতে পারি না। ভূতভাবন ভগবান কিন্তু ভাল বাসিয়া আমাকে চিরদিনই কাছে রাখিয়াছেন। ভগবতীও আমা ছাড়া এক দণ্ড থাকেন না। ভচক্র আমারই দ্বারা গঠিত। ভানু আমাকে লইয়াই ভচক্রমণ্ডলে উদিত হন। ভট্টারকগণ আমারই জন্য পূজার্হ হইয়াছেন। ভরদ্বাজ, ভার্গব, নভগ, সৌভরি, ভাগুরি প্রভৃতি মুনি ঋষিরা এবং নাভাগ, ভরত প্রভৃতি রাজর্ষিরা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিলেও আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভৃগুমুনি আমারই জন্য ভগবানের বুকে লাথি মারিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমি ভক্তের সাথে সাথে থাকিয়া বিভুগুণ গাহিয়া বেড়াই বলিয়াই ভগবান বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়েন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

ভগীরথ, ভট্টনারায়ণ, ভর্তৃহরি, ভার্জ্জিন, অভিভ, অভিমন্যু, ভানুমতী, ভীষ্ম, ভারবি, ভাবমিশ্র, ভীমসেন, ভোজপতি, ভৌমী, ভগদত্ত, ভুরিশ্রবা, কুম্ভকর্ণ, বৃষভানু, বৃষধ্বজ, বভ্রুবাহন, সুরভী, সত্যভামা, বিদর্ভরাজ কন্যা বৈদর্ভী, চিরজীবী বিভীষণ, ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণেতা নাভাজী, মার্কিনধনী ভেণ্টার

বিণ্ট, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত জার্ম্মাণ অধ্যাপক ভাণ্টহফ, ভাস্করাচার্য্য, ভগবান দাস, রাণী ভবানী, ভবানন্দ মজুমদার, ভারতচন্দ্র রায়, ভবানী পাঠক, ভীম সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভাস্কো-ডি-গা-মা, ভল্‌টেয়ার, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নরনারীদের মধ্যে আমি সদাই অবস্থিতি করি।

পণ্ডিত শম্ভুনাথ আমারই জন্য জজ হইয়াছেন। হাইকোর্টের ভকিলগণ আমাকে গ্রহণ করিয়াই দুই পয়সা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। আমি "ভোট" না দিলে কেহই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন না।

আমি কখনই ভারত ছাড়া নহি। আমি আছি বলিয়াই ভূগোল আছে। রণক্ষেত্র অনুসন্ধান করিলে দেখিবে সার্ভিয়া ও ভারতুন আমা ছাড়া নহে। মোট কথা, ত্রিভুবন মধ্যে আমি বিদ্যমান। স্বয়ং পদ্মনাভ ও আমা হইতে বিভিন্ন নহে।

মাস তিথি নক্ষত্রের মধ্যেও তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। ভাদ্রমাস আমারই অভিসম্পাতে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়া বিলায়। নক্ষত্রের মধ্যে ভরণী, শতভিষা ও ভাদ্রপদগণ এবং তিথির মধ্যে ভদ্রা আমা কর্ত্তৃকই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, ভীষ্মাষ্টমী, ভীমৈকাদশী, ভূতচতুর্দ্দশী তিথিতেও আমি বিদ্যমান আছি।

রকমারি রংপোপাধিতে যে আমার একেবারেই স্থান নাই তাহা মনে করিও না। ভট্ট, ভট্টাচার্য্য, ভৌমিক, ভড়, ভাদুড়ী, ভাণ্ডারী, ভঞ্জ উপাধিগুলি আমারই প্রদত্ত। অসভ্য ভীল জাতির মধ্যেও আমি প্রবেশ করিয়াছি।

দেশের বড় বড় বিদ্যাভূষণ, ন্যায়ভূষণ, তর্কভূষণ, মহাশয়েরা আমারই জন্য পণ্ডিত সমাজে আদর পাইয়া থাকেন। আমি চলিয়া যাইলে তাঁহারা একেবারেই ভূয়া!

আমার অবর্ত্তমানে সার্ব্বভৌম মহাশয়েরা—এমন কি "ভাইস্ চেয়ারম্যান" মহাশয়েরা পর্য্যন্ত সম্মান গণিবেন।

আমি না থাকিলে মানুষের ভাবনা থাকিত না, ভজন থাকিত না, অভাব থাকিত না, অভিযোগ থাকিত না, অভিলাষ থাকিত না, অভ্যাস থাকিত না, অনুভূতি থাকিত না, অভ্যুদয় থাকিত না, অভ্যুত্থান থাকিত না, ভালবাসা থাকিত না, ভবিষ্যৎ থাকিত না, ভবিতব্যতা থাকিত না, এমন কি শুভ বিবাহও থাকিত না।

আমার অভাবে এভবে ভূপতির অভাব হইত, ভূস্বামীর অভাব হইত, অভ্যাগতের অভাব হইত, ভিষকের অভাব হইত, ভেষজের অভাব হইত, প্রভুর অভাব হইত, ভৃত্যের অভাব হইত, ভিক্ষুকের অভাব হইত, ভ্রমরের অভাব হইত, বিভাবরী থাকিত না, প্রভাত হইত না, অভিমানে ভাস্কর উঠিত না। পঞ্চভূত বিলুপ্ত হইত—ভীষণ ভূকম্প আর জীবের হৃদ্‌কম্প জন্মাইতে পারিত না, শিশু ভূমিষ্ঠ হইত না, ভ্রূণের অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইত। "নভেল" না পড়িয়া যুবক যুবতীরা পেট ফুলিয়া মরিত। ভয়ে ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি দেশ ছাড়িয়া পলাইত। ব্যভিচার, বিভীষিকা অদৃশ্য হইত। ভৌতিক কাণ্ড নিবারণের জন্য আর কেহ গয়াধামে পিণ্ডদান করিতে যাইত না। বিবাহে বাদ্যভাণ্ড বাজিত না, লোকোমোটিভ্ এঞ্জিন আর প্রভঞ্জন বেগে ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দে ছুটিত না! ভ্যাকুয়াম্ ব্রেক আবিষ্কার অসম্ভব হইত।

তোমাদের ভাষার মধ্যে আমার কত প্রভাব দেখ। আমি না থাকিলে বিভক্তি শূন্য হইয়া সমস্ত শব্দই অর্থ শূন্য হইত। একুশটি বিভক্তির মধ্যে (ভ্যাম্, ভিঃ, ভ্যাস্, ভ্যঃ, ভ্যাম্, ভ্যঃ) আমি একাকীই ছয়টি স্থান অধিকার করিয়া আছি। আমি "প্রভৃতি"তে প্রবেশ করিয়া একেবারে অব্যয় হইয়া পড়ি। "অব্যয়ীভাব সমাস" করিলেও আমাকে আহ্বান করিতে হয়।

বহুগ্রন্থের মধ্যেও আমার সাক্ষাৎ পাইবে। অভিধান ত আমা ছাড়া হইতেই পারে না; ভগবদ্গীতা, ভাগবত, ভক্তিযোগ, মহাভারত, খুলিয়া দেখ তন্মধ্যেও আমি রহিয়াছি। সেকালের অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কুমার সম্ভব, অথবা ভট্টি কাব্যই বল, আর একালের গোচকড়ি বাবুর ডিটেক্‌টিভ্ গল্প বল—চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম বল—নবীন সেনের প্রভাস বল—হারাণ রক্ষিতের ভক্তের ভগবান অথবা প্রতিভাসুন্দরীই বল—সুরেন্দ্রনাথ রায়ের ভিষক দুহিতা বল—হারাধন বাবুর সুভদ্রাহরণ বল—কালিপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা নিভৃত চিন্তা বল—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সমসাময়িক ভারত বল—বর্দ্ধমানাধিপতির আমার য়ুরোপভ্রমণ বল—আর কর সাহেবের ভৈষজ্য রত্নাবলী, ভিষগ্বন্ধু, ভিষক সুহৃৎই বল—আমি নই কোথায়? এমন কি বাভট ভাব প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিভেদ, জাতি বিভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই আমি রহিয়াছি। আমিই নিকুম্ভিলায় বসিয়া মেঘনাদবধ করিয়াছিলাম তাই সে কাব্যের এত আদর। ভেনাস্ এডনিস্ আমার হাতে গড়া।

কোন পুস্তক কভার করিয়া ভি, পিতে পাঠাইতে হইলেও আমার স্মরণ লইতে হয়।

আমি আছি আছি, বলিয়াই সংবাদ প্রভাকর এক দিন এ দেশের প্রধান সংবাদ পত্র ছিল।

এখনকার ভারতবর্ষ, ভারতী, নব্যভারত. জন্মভূমি মাসিক পত্র গুলি আমারই গুণে এ দুর্দ্দিনে নিয়মিত ভাবে বাহির হইতেছে। আমি প্রবাসীতে নাই কিন্তু মডার্ণ রিভিউতে থাকিয়া সম্পাদকের ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছি।

ঔষধের মধ্যেও আমার গতিবিধি আছে। আমি না থাকিলে ভুনিম্বাদি কষায় বিক্রয় হইত না। এক বিন্দু মৃগনাভির অভাবে মানুষ মারা যাইত। ভেদে ভুবনেশ্বর, ভাস্করলবণ জুটিত না। করভাদি গুড়িকা, সোমপ্রভা, অভয়ালবণ, কস্তুরী ভৈরব, সৌভাগ্যবটী সুচিকাভরণ জ্বরারি অভ্র সর্ব্বতোভদ্র, মহারাজ নৃপবল্লভ, রত্নগর্ভ, ভুক্ত পাকবটী, শৃঙ্গারাভ্র, ভার্গিগুড়, অমৃতভল্লাতক, শিশু চাতুর্ভদ্রিকা আমারই বলে বলীয়ান।

আবার ভেপার, ভাইনম, ভারমুথ, ভাইব্রোনা, ভেলেরিয়েট, ভেসেলিন, ভিরেট্রাম ভিরিডি, ভার্ম্মিফিউজ, ভেসিক্যানটস্, ভাইবার্ণাম, নক্সভমিকা প্রনাই ভার্জিনিয়ারী, কন্‌ভেলেরিয়া—এ সকল গুলিতেও আমি না থাকিলে ডাক্তারখানা উঠিয়া যাইত। ল্যাভেণ্ডার ও ভিনোলিয়া সোপ আমারই প্রস্তুত।

ভাগ্যে আমি ছিলাম, তাই ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহিয়া থাকেন। আমারই প্রভাবে আভিজাত্য। আমিই আভরণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া কুৎসিতকে শোভান্বিত করি। আমিই কুম্ভকার হইয়া ভাঁড় গড়ি; আবার আমিই ভগ্নদূত হইয়া রণেভঙ্গ দেই। ভক্তকার আমারই জন্য অন্ন পাক করে, দর্ভ আমারই শয্যা, ভুর্জ্জপত্র আমারই অভিজ্ঞানপত্র, বৈদ্যদিগের ভেদক আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। আমিই ভেলায় করিয়া মানুষকে ভবপারে লইয়া যাই। প্রতিভুতেই আমার অভিব্যক্তি।

ভলাণ্টিয়ার হয় সে আমারই ভরসায়। খেয়ার ভড় ভোর না হইতে ভাসিতে থাকে, সে কর্ম্মভোগ আমারই অভিশাপে। কলিকাতার ভিতর এত ভিড় আমি করিয়াছি। ভাবীরা অর্থের প্রলোভনে ভারযষ্টি কাঁধে করিয়া ভ্রমণ করে—ভিস্তী কর্ত্তৃপক্ষের ভৎর্সনার ভয়ে ভস্ত্রী লইয়া রাস্তা ভিজায়—অভাগা ভদ্রাসন বেচিয়া বিভ্রাটে পড়ে—ভাষাবিদ্ গ্রন্থ মধ্যে নিজ নামের ভণিতা দেয়—ভদ্রলোক ভদ্রতা করে—ভক্ত বিটল ভণ্ডামী করে—ভাবুক ভাবে বিভোর হয়—ভালছেলেরা ভগ্নাংশ কসে—ভাদুরে ভাবিয়া মরে—দোকানদার ভক্তিভরে খাতার ভিতর কালিপদ ভরসা লিখে—ভাড়াটিয়া ভবন

ভাঙ্গিয়া যায়—ভাণ্ডার বৈভবে ভরিয়া থাকে—ভাতুড়িয়া ভাত খাবে—মানুষের ভদ্রাভদ্র ঘটে—ভর্ত্তা ভরণ পোষণ করে—সভাপতি সভ্যগণের সম্মুখে অভিভাষণ পাঠ করে—ভাগীরথী ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে—ভাষ্যকার জটিল পরিচ্ছেদের টীকা লিখে—ভুজঙ্গ ভেক খায়—ভৃঙ্গ মধুলোভে ধায়—ভোগী ভূধরবাসী হয়—ভূপাল অভয় দেয়—ভূতনাথ ভস্মমাখে—আর বৈষ্ণবদিগের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় সে আমারই প্রভাবে।

নানাবিধ সম্পর্কের মধ্যেও আমি আছি। ভাই, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভাগ্নে, ভাগ্নী, ভাইপো, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইঝি জামাই, ভাসুর, ভাদ্রবধূ—এ সকল আমারই সৃষ্ট। আমি জননীতে নাই, কিন্তু গর্ভধারিণীতে আছি। স্ত্রীকে ভার্য্যা বলিলে, প্রাণেশকে হৃদয়বল্লভ বলিলে আমার আমলে আসিতে হইবে। প্রাচানারা ষোড়শী নাতনীদের স্বামীর কথা বলিবার সময় অমুকের স্বামী না বলিয়া চলিত কথায় যে শব্দ উচ্চারণ করেন তাহার মধ্যেও আমার দেখা পাইবে। অভাগী বলিয়া গালি দিলে ত আমি সঙ্গে সঙ্গেই থাকি। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর অভিমান, সে ত আমার ভাণ। গৃহিণীর ভ্যান্‌ভ্যানানি আমারই ভ্যাংচানি।

মানবদেহের ভিতরও আমি অনেক স্থানে ভর করিয়া আছি। মস্তিষ্কের ভিতর আমিই ভ্রান্তিরূপে বিরাজমান। আমি কপালে নাই ভালে আছি চক্ষুতে নাই ভ্রূযুগে আছি, গলায় নাই কিন্তু স্বরভঙ্গ হইলেই আসিয়া উপস্থিত হই। হস্তে নাই ভুজে আছি, উদরে নাই, নাভিতে আছি, পাকস্থলীতে নাই কিন্তু ভুরিভোজনে পেট ভরিয়া উঠিলে আমার সাড়া পাইবে। আমি প্লীহায় নাই কিন্তু লিভারে আছি, বস্তিতে নাই পেল্‌ভিসে আছি, জরায়ুতে নাই, গর্ভাশয়ে আছি, পৃষ্ঠে নাই ভার্টিব্রায় আছি, পদে নাই কিন্তু ভোঁ দৌড়ে আছি।

এ সংসারের সকল প্রকার ভোজ্য ত আমার একচেটিয়া। আমি আছি তাই দু'টি ভাত খাইতে পাইতেছ। আমি ডাইলে নাই বটে, কিন্তু ভূষিতে ভাজাভুজি আমারই প্রস্তুত।

আমি সন্দেশে নাই কিন্তু ভীমনাগ স্বয়ং আমাকে পুষিতেছেন। আমি মোহন ভোগে আছি, কিন্তু লুচি কচুরিতে নাই। তোমরা সে জন্য অভিমান করিয়া অভুক্ত থাকিও না। যদি অভিপ্রেত হয়, এ অভাজন সীতাভোগ ও

স্বরভাঙ্গা বাহির করিতে পারে, উদর ভরিয়া ভরপুর ভক্ষণ কর। মাভৈ-তব্যামিতি।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনকালে ব্রজবাসির উক্তি।

কোথায় যাও হে হরি ব্রজবাসি কাঁদায়ে—
বাজে নাকি হৃদে তব শ্রীরাধারে হেরিয়ে।
আমরা ব্রজের নারি,
বৃন্দাবনে বাস করি,
কেমনে থাকিব বল তোমাধনে ছাড়িয়ে—
যেওনা যেওনা হরি ব্রজবাসি কাঁদায়ে।
মা যশোদা পিতা নন্দ,
ব্রজে রাখার বৃন্দ,
সরলা গোপের বালা বাঁচে মুখ চাহিয়ে—
কি ফল লভিবে হরি তারে তুমি কাঁদায়ে।
নাইক সেথা কুঞ্জবন,
নাইক সেথা গোপিগণ,
যমুনা বহেনা সেথা উজানেতে নাচিয়ে—
নিকুঞ্জ করেনা আলো বনফুল ফুটিয়ে।
তাই তোমা করিগো মানা,
ব্রজবাসি কাঁদায়ো না,
কি ফল লভিবে হরি মথুরা ধামেতে গিয়ে—
যেওনা যেওনা হরি ব্রজবাসি কাঁদাইয়ে॥

প্রভাতী।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

বার্ষিক মূল্য ২৷৵০। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার, জলধর সেন, দীনেন্দ্র কুমার রায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, মাণিক ভট্টাচার্য্য, কামিনীরায়, শৈলবালা ঘোষ জায়া প্রভৃতি নিয়মিত লেখেন।

প্রতি সংখ্যায় অনেক ছবি থাকে। ৪র্থ, বর্ষ চলিতেছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—প্রভাতী—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মাতৃ মন্দির।

নারী কল্যাণ বিধায়িনী সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীঅক্ষয় কুমার নন্দী।

এই পত্রে মহিলাগণের উপযোগী নানা প্রবন্ধ কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা যেমন নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তেমনি ইহাতে শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের রচনা থাকে। বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা নগদ মূল্য ৶০ আনা

কার্য্যালয়—"মাতৃ মন্দির" ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জন্মভূমি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত।

বঙ্গের প্রাচীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

২৯শ বর্ষের অভাবনীয় উপহার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "কপাল কুণ্ডলা" সুরঞ্জিত বহুবর্ণের চিত্র শোভিত, রাজ সংস্করণ, জন্মভূমির গ্রাহকগণ বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা, উপহার প্রেরণের মাশুল ৷৹ আট আনা, মোট ২৷৹ আড়াই টাকা সত্বর প্রেরণ করুন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজার।

জন্মভূমি কার্য্যালয়—৩৯২ নং মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সুপ্রশংসিত ও
ব্যবস্থাপিত, হাটখোলা দত্তবাটীর ভুবন বিখ্যাত

পদ্মমধু।

(যাবতীয় চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।)

মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা, ৩ তিন ড্রাম ২৷৹ টাকা, মাঃ ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এন, দত্ত ব্রাদার্স।

জন্মভূমি কার্য্যালয়—৩৯২ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা।

সোহাগভরা প্রীতিমাখান
সুন্দর মুখখানি

কিসে হয় ইহার সমস্যা আমরাই করিয়া দিব। একশিশি পারিজাত গন্ধে ভরা মাথাঠাণ্ডাকরা, "কেশরঞ্জন তৈল" কিনিয়া আপনি যাহাকে জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন, তাহাকে উপহার দিন। দেখিবেন,—তাহাতে তাহার মুখের লাবণ্য, দেহের জ্যোতিঃ, শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে। যে সোহাগ আদর ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি আপনি পাইতেন, তার দশগুণ পাইবেন। দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত "কেশরঞ্জনের" গুণের পক্ষপাতী।

মূল্য এক টাকা। ডাক ব্যয় ।৵০ সাত আনা।

দেশের সকল আশা ভরসা মাতৃরূপিণী রমণী।

যদি বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে তাহার আগে গরীয়সী বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করুন। এটুকু কথনও ভুলিবেন না যে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগে আমাদের "অশোকারিষ্ট" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। সকল প্রকার কষ্টকর স্ত্রী-ব্যাধিতে অশোকের প্রভাব অদ্বিতীয়। কেন বাজে বিদেশী চিকিৎসায় অর্থব্যয় করেন ও নিরাশ হন? অশোকারিষ্টকে পরীক্ষা করুন। ফল মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকব্যয় ॥৵০ আনা।

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন গুপ্ত।

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩১. [৭ম, সংখ্যা

১।	কে এ?	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র হুই	১৯৫
২।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯৮
৩।	মরকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২০৩
৪।	বিপদে প্রার্থনা	শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দাসী	২১৩
৫।	দাদার প্রাণ	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	২১৪
৬।	বিরহিণী	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ	২১৯
৭।	সমালোচনা	... ...	২২৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 26-3-25

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible] যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তৈল
সর্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

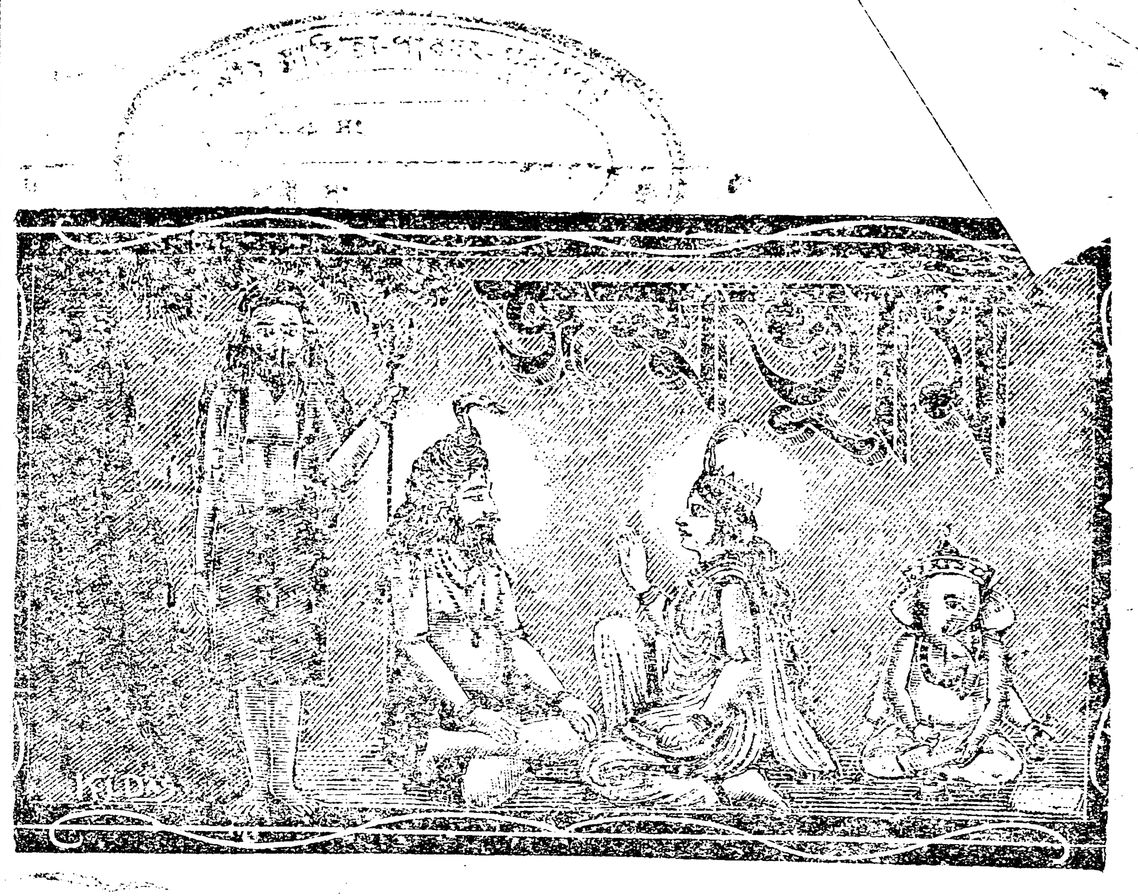

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। ১৩৩১ সাল, কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।

কে এ?

লেখক,— শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র হুই।

কে দিল ছড়ায়ে পরিমল বায়ু
(এ) দগ্ধ হৃদয় মাঝারে।
কোথা হতে এল, কে হেন সুহৃদ
দাও পরিচয় আমারে॥
মাতিল পরাণ সুমধুর বায়
ব্যথিত মরম জুড়াল।
সুশীতল হ'ল তাপিত চিতটী
পুলকে পরাণ নাচাল॥

সারা দিন রাত খুঁজে সারা হ'য়ে
কোথাও পাইনি সন্ধান যার।
যুগ যুগান্তর পুরাণ দর্শনে না পেনু
কোন বারতা তার ॥
কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ধর্ম্ম আরাধনা
দেখালনা কোন গোপন পথ।
দুর দুরান্তর অমরা হইতে
অনিল কি তবে পুষ্পক রথ ॥
নিমিষের তরে পেয়েছি যদি
হেরিগো নয়ন ভরিয়া।
নতুবা জীবনে রয়ে যাবে ক্ষোভ
ঘুচিবে না দুঃখ মরিয়া ॥
কও কথা কও অভিমান ব'ল
তেমনি সোহাগ ভরে।
ভিখারি আমি তব প্রেম লাগি
দাঁড়ায়ে রয়েছি দুয়ারে ॥
(ওগো) যাও চলি যদি করি প্রতারণা
কাঁদায়ে আজিকে আমারে।
(তবে) মাথা খাও মোর বলে যাও ওগো
তুকি কি প্রভার গোপিরে ॥

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অষ্টম অংশ।

জন্ম ও মৃত্যু অতি সাধারণ, কিন্তু মানবের পক্ষে উভয়ই অতি ভয়ানক। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর ভয় অধিক, কারণ মানব জন্মের পর জীবের যে অবস্থা

ঘটিয়া থাকে তাহা সে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, কিন্তু মৃত্যুর পর সমুদয় ঘটনাই তাহার চক্ষে অদৃশ্য, অনিশ্চিত ও কল্পিত। জন্ম অপেক্ষা সাধারণের পক্ষে মৃত্যুর ভয় অধিক হইলেও বিশুদ্ধ আত্মা মোক্ষ প্রয়াসী মানব মৃত্যু অপেক্ষা জন্মান্তরকে অধিক ভয় করিয়া থাকেন, কারণ তিনি দেখেন কাল অনন্ত, সংসারের দুঃখজাল অসীম, জীব সঙ্ঘ সেই দুঃখজালে নিরন্তর পিড্যমান হইতেছে। তিনি আরও দেখেন জন্মের পর মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ রোধ করা মানবের সাধ্যের অতীত নহে। একদা সাধক বিশুকে কহিলেন, "দেখ বিশু! পুনঃ পুনঃ জননী জঠর শয়ন যন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা এ জগতে অধিক কষ্টকর আর কিছুই নাই। বুদ্ধিমান মানব সংসারের দুঃখ জাল হইতে চির শান্তি লাভ করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু শান্তি লাভের বিঘ্ন অনেক, লক্ষ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। শিরোমণি মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন; "ঘুড়ী লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী।" তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি মোক্ষার্থী হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হও।" বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! আপনি ত বরাবরই বলে আস্‌ছেন, আমি থাকতে কিছু হয় না। আমিত্বটুকু ছেড়ে দিতে পারলেই, সুখ দুঃখ, মান অপমান, তুমি আমি সব এক হয়ে যায়। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সেকি সহজ কথা ঠাকুর! ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না। দেহকে উপেক্ষা করে আত্মাতেই মন প্রাণ রাখতে হবে। শরীরের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটলে তার যন্ত্রণা উপেক্ষা কত্তে পারি না। এ দেহটাকে একেবারে মাটীর মত বোধ কর্‌বার শক্তি কবে কিরূপে আমার জন্মাবে আমি বুঝতে পারছি না। ঠাকুর! এ দেহটা কি? আমাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলুন দেখি!" সাধক কহিলেন, "বিশু! মুক্তিলাভ সহজ নয়, সে কথা সত্য। মুক্তি এক জন্মে হয় না। মুক্তি বহু জন্মের সাধনার ফল। দেহ কি জান! বাজীকরের ঝুলি, ইহাতে সব আছে, আমার কিছুই নাই। ভগবান্ বাজীকরের যে গুলি খেলাবার জিনিষ মানুষের এই দেহ ঝুলিতে তিনি সেই গুলিকে আলগা ভাবে রাখিয়া দেন। খেলাইবার জিনিস কি জান? মন, বুদ্ধি, আত্মা। যদি বল মন জিনিসটি কি! আমি বলি তুমি মনকে বায়ু বলিয়া ধর, তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাও, কিন্তু তুমি মন কিম্বা বায়ুকে দেখিতে পাও না। যে শক্তি দ্বারা তুমি মনের ক্রিয়া বুঝিতে পার, তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধিটিকে তুমি সৌগন্ধ বলিয়া ধরিবে। সেই বুদ্ধি মনের সহিত মিশিয়া কাজ করে ও মনকে বেষ্টন

করিয়া থাকে। এই সকলের উপর এক পরমাদ্ভুত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ আছে তাহার নাম আত্মা। তুমি আত্মাকে আকাশের ন্যায় জানিবে। মন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে কালিমার ছবি আত্মার উপর প্রতিভাত হয়। আকাশের উপর মেঘমালা কি ধূলিজাল উত্থিত হইলে আকাশ অপরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে আকাশের স্বরূপত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না, মন ও বুদ্ধির অবিশুদ্ধতা হেতু আত্মা দূষিত আবরণ মধ্যে পতিত হন মাত্র। প্রায়শ্চিত্ত, হোম, যজ্ঞ, প্রাণায়াম, সংযম তপস্যা সাধনা প্রভৃতি দ্বারা আত্মার পবিত্রতা জন্মিলে দেহকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এমন কি মানব রক্তমাংসময় দেহকে একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া কেবল মাত্র মনোময় দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিত থাকিতে পারেন। তুমি বাল্মীকাদি ঋষিগণের তপস্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট দেহে জীবনী শক্তি বর্ত্তমান থাকার ইতিহাস শুনিয়াছ। তুমি সে সকলকে উপাখ্যান মাত্র বিবেচনা করিও না। দেহ মন ও আত্মার আবাস গৃহ। বাসগৃহ ভগ্ন দূষিত বাসের অনুপযুক্ত হইলেও জীব সকল আপন আপন গৃহ সকল ত্যাগ করিতে চাহে না। কর্ম্মের আবরণ সংযুক্ত আত্মার স্বভাবও সেইরূপ। কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও অস্থির উপর আত্মার আসক্তি থাকে। পতিত পাবনী জাহ্নবী আমাদের এ প্রদেশের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বলিয়া মৃতদেহের সংস্কার ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রায়ই তাঁহার তীরে ঘটিয়া উঠে না। ক্ষুদ্র নদী তড়াগ বা পুষ্করিণীর তীরে মৃতদেহ দাহ করিবার সময় লোকে দেহ হইতে অস্থি খণ্ড লইয়া সুরতরঙ্গিণীতে নিক্ষেপ করিয়া আইসে। তুমি এ পদ্ধতি কি অনাবশ্যক ও অযুক্তিকর বিবেচনা কর? ধর্ম্মের কোন ক্রিয়াই অহেতু ও অযুক্তিকর নহে। দেহ পরিত্যাগ মাত্রেই দেহান্তর ঘটে না। প্রকৃতি প্রস্তুত হইবার সময় প্রায়ই দিয়া থাকেন। বৃক্ষ হইতে পক্ক বীজ ভূমে পতিত হইবা মাত্রেই তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মে না। প্রকৃতি অনুকূল হইলে সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। দেহান্তে আত্মা কর্ম্মবন্ধনে সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করেন। মৃত দেহের অস্থিখণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও তাহাতে আত্মার আসক্তি থাকে। দেহান্তে পুণ্য সলিলা গঙ্গাতে অস্থি মাত্র নিক্ষেপে আত্মার বিশুদ্ধভাব ও সদ্গতির সম্ভাবনা থাকে।" ইহা কহিয়া সাধক তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলে বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ, জীব, এ সকল আমি এখানে যত পণ্ডিত আছেন তাঁদের মুখে শুনতে পাই, আপনার মুখে কখনও শুনি নাই, আপনি সর্ব্বদাই বলেন

থাকেন আমার এই মা কালীর চরণে দেহ মন বাক্য একেবারে দিতে পারলে ক্রমে আপনিই আমিত্ব চলে যায়, সব জ্ঞান এসে পড়ে, শাস্ত্র সকলের নানারকম কথা তাঁর এক মা কালীর কথা বলে মনে হয়।" বিশুর কথা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি যদি দেহ মন প্রাণ মা কালীর চরণে দিয়ে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার আর কোন চিন্তারই প্রয়োজন হয় না। তুমি দেহ কি? এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাই তোমাকে এত কথা বলিলাম। কালীনাম মহামন্ত্র যার হৃদয়ে বিশ্ব বিমোহন শক্তিতে কূটস্থ হইয়া জাগরূক থাকে, দেহ মন প্রাণ তার দাস, মুক্তি তার দাসী। ইহা কহিয়া সাধক হাতে তাল দিয়া গাহিলেন —

তুমি যে আমার নয়নের নয়ন মনেরি মন।
প্রাণেরি প্রাণ, এ দেহের দেহী,
জীবনের জীবন ॥
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ, পরধাম প্রাপ্তি গতি,
অগ্যাতর কারণেরি কারণ।
কমলাকান্ত, কুলকান্ত,
প্রবল কৃতান্ত ভব তারণ ॥

সঙ্গীত শেষে সাধক আবার কহিলেন, "বিশু! সর্ব্বশক্তি শূন্য না হইলে একবারে আত্ম বিস্মৃতি ও আত্ম সমর্পণ অতি বড় কঠিন ব্যাপার। তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত আমিত্ব ত্যাগ হয় না।" ইহা শুনিয়া বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! তীব্র বৈরাগ্য কিরূপ? বৈরাগ্য হইতে তাহার বিশেষত্ব কি?" সাধক কহিলেন, "বিশু! কোন ঘটনা বিশেষকে অবলম্বন করিয়া সংসারের মায়া মোহজালকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করাকে নিমিত্ত বৈরাগ্য কহে। সে বৈরাগ্যের তীব্রতা থাকে না। সে বৈরাগ্য অনেক স্থলে স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হইলেও বহুকষ্টে কার্য্যকর হয়। নিমিত্ত বৈরাগ্য জন্ম জন্মান্তরে তীব্র বৈরাগ্য প্রসব করিয়া থাকে। কাহারও কাহারও বার্দ্ধক্যে, কাহারও কাহারও যৌবনে কাহারও বা কৌমার্য্যে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহারা তদবস্থায় সংসারকে অন্যভাবে দর্শন করিয়া সাযুজ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ান। যাহাদের কৌমার্য্যে ও যৌবনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাঁহাদের জন্মান্তরের বিস্তর সাধনা। জন্মগ্রহণান্তর সামান্য জ্ঞান সঞ্চার হইবামাত্র তাঁহাদের আত্মার বিমল দীপ্তিতে সংসারের মায়াজাল ও অন্ধকার শিথিল হইতে থাকে।

জীবের রোগ, শোক, দুঃখ হাহাকার চিৎকারে তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাগের ঘন ঘটার সঞ্চার হয়। সাধারণের চক্ষে প্রথমে তাহা অদৃশ্য থাকে। ক্রমে ঘনঘটা ঘনীভূত হইয়া প্রবল বেগ ধারণ করে। তখন তাঁহারা ভার্য্যা পুত্র পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু কাহারও পানে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পান, ইহা সংসার নহে সচ্চিদানন্দের প্রেম সাগর। রোগ শোক হাহাকার চিৎকার নহে, আনন্দ তরঙ্গমালা ধ্বংসকারী অনন্ত কালের অসীম শক্তির প্রদর্শিনী ক্ষেত্র সংসার নহে। ইহা শাশ্বত চিরপূর্ণ পরম ব্রহ্মময় সুখ বারিধি। ইহা ঘোরতর মায়া-জাল জড়িত অন্ধকারময় সংসার নহে, পূর্ণব্রহ্ম শশধরের বিমল দীপ্তিতে আলোকিত কি এক অপূর্ব্ব স্থান। তোমাকে কয়েকটী মহাপুরুষের তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলিতেছি শোন, তুমি রাজপুত্র ভগবান বুদ্ধের সংসার ত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ? তিনি জীবের শোক দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সাধ্বী প্রিয়তমা প্রেয়সী ও প্রাণসম পুত্রকে অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন পূর্ব্বক গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন তীব্র বৈরাগ্যের ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। গভীর চিন্তা ও কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান বুদ্ধ অবধারণ করিয়াছিলেন অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, পরের উপকারই পুণ্য পরের অপকারই সৃষ্টি প্রকরণে তাঁহার মত সাংখ্যবাদীদিগের মতের অনুবর্ত্তী। তিনি জগতে অসংখ্য আত্মার অবস্থান ও প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় বিধির উপর বিশ্বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই বিধির অনুযায়ী জীবন ধারণ করিতে পারিলে ও বিমল জ্ঞান দ্বারা সেই বিধির প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিলে আত্মার নির্ব্বাণ লাভ হয়। সেই বিমল জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় অহিংসা ও পরোপকার। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে বুদ্ধদেব মতাবলম্বীরা উদাসীন। সাংখ্যবাদীরা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়ার বিরোধী নহেন। আমি আর এক মহাপুরুষের বৈরাগ্যের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার নাম ভগবান শঙ্কর স্বামী। তিনি ভগবানের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌমার্য্যে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি মাতার একমাত্র পুত্র। বিদুষী জননী পুত্রের অমানুষিক শক্তি সন্দর্শনে তাঁহাকে পত্নী গ্রহণ করিয়া

সংসার বন্ধনে জড়ীভূত হইতে অনুমতি করেন নাই। ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি বেদ বেদান্ত বিশারদ হইয়া বুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর তর্ক যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন, একেশ্বর বাদ প্রতিপন্ন করিয়া বেদধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করেন। তুমি ভগবান শ্রীচৈতন্যের সংসার ত্যাগ বৃত্তান্ত বোধ হয় শ্রবণ করিয়াছ। তিনি জননী ও যুবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ও ভক্তি একমাত্র মুক্তির উপায়, এই উপদেশ প্রচার পূর্ব্বক হরিনাম রসে প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পঞ্চনদ তীরবর্ত্তী জন সমূহের ধর্ম্মপথ প্রবর্ত্তক মহাত্মা নানক অতি অল্প বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাত্মার পিতা গোধূম ধান্যাদির ব্যবসা করিতেন। একদা তিনি পিতার আদেশে কোন স্থানে গোধূম ওজনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওজন সময়ে তিনি "একে রাম এক, দুয়ে রাম দুই, তিনে রাম তিন" এইরূপ বার দাঁড়ি পর্য্যন্ত ওজন করিলেন। তের দাঁড়ী ওজন সময়ে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি "তের রাম তের" না বলিয়া "সে তার রাম" এই কথা বলিয়া ওজন বাঠ্‌খারা দূরে নিক্ষেপ করিয়া উন্মাদের ন্যায় তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করেন। তিনি জাতিভেদকে অনাদর পূর্ব্বক একেশ্বর বাদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তুমি বোধ হয় তীব্র বৈরাগ্য কাহাকে বলে এখন উত্তমরূপে বুঝিয়াছ।

ইহা শুনিয়া বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! মহাত্মা নানকের বৈরাগ্যের ইতিহাস শুনে আমার মনের ভেতর কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে। ভগবানের দয়া না হলে অকস্মাৎ এমন হবে কেন?" সাধক কহিলেন, "বিশু! আমি তোমাকে আরও দুই একটী মহাত্মার তীব্র বৈরাগ্যের ইতিহাস বলিতেছি শোন তুমি তুলসীদাসের নাম শুনিয়াছ? তুলসীদাস একজন সাধক, ভক্ত ও কবি। হিন্দি ভাষায় লিখিত তাঁহার রামায়ণ অমৃতময়, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার অকস্মাৎ তীব্র বৈরাগ্য উদয়ের বিষয়ে এক প্রবাদ আছে! কথিত আছে, তিনি যৌবন কালে অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। একদা তাঁহার পত্নী দোলায় চড়িয়া পিত্রালয় যাইতেছেন। তুলসীদাস দোলা ধরিয়া দ্রুতপদে পত্নীর সহিত কথা কহিতে কহিতে গমন করিতেছেন। দোলার প্রবেশ দ্বারে তাঁহার হস্তের ভার পড়াতে দোলা দুলিতেছে। যানবাহীরা তুলসীদাসকে কহিল, "মশায়! দোলায় হাত দেবেন না, দোলা ছেড়ে দিয়ে চলুন।" তাঁহার পত্নী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার লজ্জা হইতেছে না! তুমি কি নিমিত্ত আমার সঙ্গে

সঙ্গে আসিতেছ, যাও ঘরে যাও।" তুলসীদাস লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন আমি যাহার অদর্শন যন্ত্রণা অসহ্য বিবেচনা করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে যাহার অনুসরণ করিতেছি, কই সেত আমারে চাহে না, আমার সহিত বিদায় গ্রহণ কালে কই তাহার হৃদয়ের ভাবান্তর ত কিছুই লক্ষিত হইল না। আমি কি মূর্খ! অনিত্য বস্তুর প্রেমাসক্ত হইয়া ক্ষিপ্ত কুকুর ও শৃগালের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি, আমি অতঃপর নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করিব, যাহার হৃদয় প্রেম সাগর, যাহার সহিত মিলিত হইলে কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। আমি শুনিয়াছি, তিনি সর্ব্বত্র সকল হৃদয়ে অবস্থান করেন। আমার হৃদয়েও অবস্থান করেন, তাই তাঁহাকে আমার প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি আমাকে ভালবাসেন নচেৎ তাহাকে আমার অকস্মাৎ এত ভাল বাসিবার বাসনা হইল কেন? আমি আর ঘরে ফিরিয়া যাইব না, আবার সেই প্রেমের পুরুষ যথায় আছে, তথায় যাইব। যদি তিনি হৃদয়ে থাকেন, নয়ন জলে তাঁহাকে অনিমিশ নয়নে দেখিব, একবারও নয়ন ছাড়া করিব না। স্বার্থভরা সংসারের সব জিনিস আমার মন প্রাণ হইতে চলিয়া যাক্। পত্নী ভ্রাতা ভগিনী আমি কাহাকেও চাহি না। যাহার নিকট আমি বিমল ভালবাসা পাইব, আমি তাঁহার নিকট চলিলাম। ইহা কহিয়া সাধক কবি গৃহ ত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে পরম পুরুষের উদ্দেশে চলিতেছেন। তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া পবিত্র বারাণসীধামে এক বিল্বমূলে আসন করিলেন। তাঁহার গৃহে শ্রীরাম সীতার মূর্ত্তি ছিল, তথায় সেই মূর্ত্তির নিত্য সেবা হইত। তিনি এক্ষণে সেই যুগল মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাঁহাদের কৃপা কটাক্ষপাতের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি কাশীধামে প্রতিদিন কাশীশ্বর আশুতোষের পূজা, করিয়া শ্রীরাম সীতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাদের ধ্যানে বিভোর হইতেন, একদা গভীর রাত্রে তিনি ধ্যানে মগ্ন আছেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল, "তুলসী! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে, বর প্রার্থনা কর।" কবিবর কহিলেন, "আপনি কে? দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিলে আমি কৃতার্থ হই।" অদৃশ্য দেবতা কহিলেন, "আমি কাশীধাম রক্ষক ভৈরব।" তুলসী দাস কহিলেন, প্রভো! আমার আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ। আমি ত্রিভুবন পালক নব দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম সীতার সাক্ষাৎ লাভ প্রার্থনা করি। ভৈরব কহিলেন, "তুলসী! তুমি উদার হৃদয় ভক্তিমান ও প্রেমিক। ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিবার শক্তি তোমার জন্মিয়াছে। তোমার আশা নিতান্ত উচ্চ হইলেও

আকাশ কুসুম নহে। তুমি যেরূপে শ্রেয়োলাভ করিবে তাহা আমি কহিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। সম্প্রতি কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার মন্দিরে মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ হইতেছে। তথায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এক প্রান্তে আসন করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। তিনি রামায়ণ পাঠান্তে সকলের শেষে অবনত বদনে বহির্গমন করেন। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। তিনিই তোমার শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া দিবেন।" ইহা কহিয়া ভৈরব অন্তর্হিত হইলেন। রজনী প্রভাত হইল। তুলসীদাস ধ্যান, পূজা ও উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। দিবসপতি অস্তমিত হইবামাত্র বিশ্বেশ্বরের বন্দনাদি সমাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে জগৎ জননী অন্নপূর্ণার বাটীতে আগমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পাঠক ও শ্রোতাদিগের আগমন দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাঠক ও শ্রোতাদিগের অগ্রে আগমন করিয়া দেবীর বামভাগে আসন স্থাপন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া উপবেশন করিলেন। তুলসীদাস তাঁহাকে ভৈরব নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, পুনঃ পুনঃ দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সীতা-পতিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। রাম চরিত শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি গভীর হইলেও তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীত নয়নে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামায়ণ পাঠ শেষ হইল। সকলে আপন আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস ব্যাকুলিত হৃদয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পশ্চাৎভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে অন্নপূর্ণার বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণ কাশীশ্বরীকে প্রণাম পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বাটী হইতে বহির্গমন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস তাঁহার কৃপাদৃষ্টির লালসায় ও তাঁহাকে প্রাণের যাতনা নিবেদন করিবার ইচ্ছায় কখন তাঁহার পশ্চাৎ কখনও বা পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তুলসীদাস দেখিলেন, অগ্রে এক নব দুর্ব্বাদল শ্যাম ধনুর্ব্বাণধারী পরম মনোহর পুরুষ, তাঁহার পশ্চাৎ ভুবন মোহিনী এক রমণী তদনু বিশাল বক্ষ, আজানু-লম্বিত বাহু, দেবতুল্য এক যুবা পুরুষ অবনত বদনে গজগমনে চলিতেছেন, তাহাদের পশ্চাৎ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষ ও তাঁহার পশ্চাবর্ত্তিনী রমণীকে দর্শন করিয়া তুলসীদাসের তাহার হৃদয়স্থিত উপাস্য দেবতা রামসীতার ভাব মনে হইল। কিন্তু তিনি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুসরণ ও তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদনের ব্যাকুলতা হেতু সেই মানস মোহন পুরুষসিংহ কি ভুবন

মোহিনী বরাঙ্গনার প্রতি অধিকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাহারা সকলে অন্নপূর্ণার বাটী অতিক্রম করিলেন। সেই পুরুষদ্বয় ও রমণী এক পথ দিয়া এবং অন্যপথ দিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী তুলসীদাসের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কয়েক পা মাত্র গমন করিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তুলসীদাসকে কহিলেন, "তুলসী! তুমি ভুবনেশ্বর কাশীনাথের রামরূপ দর্শন করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলে। তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রামরূপে তোমায় দর্শন দিয়াছেন। ওই যে ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষকে দর্শন করিলে ইনিই ত্রিভুবন পালক গোলকপতি, রামচন্দ্র, তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী রমণী আমাদের জননী সীতা, তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী পুরুষ রামানুজ লক্ষ্মণ।" ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তুলসীদাসের হৃদয়ের ব্যাকুলতা অতি গভীর হইয়া উঠিল। তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরল ধারায় নয়নবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ভাব, ভক্তি, আত্মগ্লানি তাহার হৃদয়কে এত বিচলিত করিয়া তুলিল যে তিনি, ব্রাহ্মণের নিকট সজ্ঞানে তাহাদের পুনদর্শন প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "ভাই তুলসী! সাক্ষাৎ ভগদ্দর্শন জন্মান্তরের বহু সাধনার ফল। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি রাম চরিত বর্ণনা কর। তোমার হৃদয় ভরা প্রেম রসায়ণে সিক্ত হইলে তোমার বাক্য অমৃতময় হইবে। পণ্ডিত, মুর্খ সকলেরই তোমার বাক্য হৃদয়গ্রাহী হইবে। তুমি রামায়ণ রচনা ও সাধনায় প্রবৃত্ত হও তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। তুমি পরিণামে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া প্রভু দর্শন লাভ করিতে পারিবে।" তুলসীদাস কহিলেন, "আপনি কে? বৃ ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি রাম দাস হনুমান।" ইহা করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণা তথায় অন্তর্হিত হইলেন। তুলসীদাস আকুল হৃদয়ে তাহাদের চরণে প্রণিপা পূর্ব্বক হনুমান নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়া ছিলেন। দেহকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর তপস্যা পূর্ব্বক অন্তিমে পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণ ভক্তিরস পূর্ণ, আতুর সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তনা শীতলবারি প্রেমিকের নিকট প্রেমের উৎস, সাধারণ গৃহীর নিকট মহামন্ত্র বেদবাক্য।

ক্রমশঃ

মরকত-মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শুভ পরিণয়।

উপযুক্ত সময়ে রাজা রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন। মরকতমোহিনী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, মাধব তাহার পিতার নিকটে দেবালয়ে গেল। রাজপুরীতে কি আনন্দ, সেরূপ আনন্দ যাহারা অনুভব করিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন, অভুক্তভোগী লোকে হয়ত অনুভবেও আনিতে পারিবে না। রাজসংসারে একটিমাত্র উজ্জ্বলদীপ সেই মরকতমোহিনী, সেই দীপের বিসর্জ্জনে রাজপুরী অন্ধকার হইয়াছিল, রাজা রাণীর হৃদয় অন্ধকার হইয়াছিল, রাজ মহিষী কেবল রোদনমাত্র সার করিয়া যেন উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, মরকত মোহিনীর পুনরুদয়ে সংসার আবার সজীব ভাব ধারণ করিল। সমস্ত পৌরজন সমস্ত পুরস্ত্রীগণ মহানন্দে ভাসিলেন।

মাধব কোথায় গিয়াছিল, মাধবের পিতা তাহা জানিতেন না। দুই বৎসর পরে মাধবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। দেবালয়ের সমস্ত দেবদেবীর মন্দিরে মহাসমারোহে পক্ষব্যাপী উৎসব হইল। নৃত্য গীত অগ্নিক্রীড়া, আলোকমালা পুষ্পমালা দান, ধ্যান এই সমস্ত একত্র হইয়া মহেৎসবটিকে পূর্ণাঙ্গে সাজাইল। নগরের শোভা অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। প্রত্যেক বিপনিতে বিপনিতে নূতন নূতন উৎসব। রাজতোরণ হইতে নগরপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাজবর্ত্তের উভয় পার্শ্বে সারি সারি পূর্ণকুম্ভ, আম্রশাখা কদলীতরু, চিত্র বিচিত্র পতাকারাজি সংস্থাপিত হইল। ফটকে ফটকে নহবৎ বসিল। নহবতের সুমধুর বাদিত্র বাদনে সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে লাগিল, সকলের কর্ণ জুড়াইল।

একমাস পরে রাজকন্যার বিবাহ। রাজকন্যা কিছু উন্মনা। বিবাহের আহ্লাদে সচরাচর বরকন্যার বদন প্রফুল্ল হয়। কিন্তু মরকতমোহিনী ম্লান মুখী।

কেন এমন ভাব? মরকতমোহিনী যখন মহারণ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রমে ছিলেন, তখন তাহার চন্দ্রাধরে সুমধুর হাস্যরেখা দেখা যাইত। গৃহে আসিয়া এমন বিমলিন ভাব কেন হইল?

কেন হইল, রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—রাজকন্যার চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সংসারে যাহারা মনুষ্যের চিত্তজ্ঞানে সুপণ্ডিত তাহারা বুঝিলেন সমরনাথের জন্য মরকতমোহিনীর দুর্ভাবনা. সমরনাথ রাজা অমর নাথের পুত্রস্থানীয় হইয়া উল্লাসে উল্লাসে মরকতমোহিনীর প্রতি স্নেহবান হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে এক প্রকার ভাব ছিল, রাজার পালিত পুত্র হইয়া অবধি রাজকন্যাকে তিনি স্নেহময়ী ভগ্নীরূপে আদর করিতেন, বিবাহের সময় সেই সমরনাথ রাজপুরীতে নাই, সেই কষ্টে মরকতমোহিনী ম্লানমুখী।

সমরনাথ যখন বিজয়মাধব নামে পরিচিত ছিলেন, মরকতমোহিনীর পাণি গ্রহণ করিতে তখন তাঁহার অভিলাষ হইয়াছিল। মরকতমোহিনীর অপঘাত মৃত্যুর লক্ষণ দেখিয়া হিংস্র লোকেরা তখন রটাইয়া দিয়া ছিল, কুমার সমরনাথ রাজকন্যাকে বিষ পান করাইয়াছে, সেই অলীক অপবাদটা কেহ কেহ সত্য মনে করিয়াছিলেন, শোক বিভ্রান্ত রাজাও সে কথায় নিতান্ত অবিশ্বাস করেন নাই; অজ্ঞান বসে তিনি সমরনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, সেই কারণ এই সমরনাথের পলায়ন, পর্ব্বতের উপত্যকায় ছদ্মবেশধারী নরোত্ত ঠাকুরের সাক্ষাৎ, নরোত্তমের আতিথ্য, পরিশেষে পরিচয় পাইয়া নরোত্তমের ক্রোধ, জিঘাংসা প্রবলা, তথা হইতে পুনর্ব্বার সমরনাথের প্রস্থান, এ সকল বৃত্তান্ত পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, প্রাণ রক্ষার জন্য সন্ন্যাসী আশ্রমে সোম নাথ আশ্রয় লইয়াছিলেন, মিথ্যা করিয়া আপনাকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা মিত্তি বলেন নাই, সর্পাঘাতে মরকতমোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে, নরোত্তমের নিকট এই সত্য কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন উপকার হয় নাই।

সমরনাথ মরকত মোহিনীকে ঈর্ষা বশে বিষ দিয়াছেন, এই মিথ্যা কথা যাহারা তুলিয়া ছিল, তাহারা এখন বলে কি? বলিবার আর মুখ নাই মরকতমোহিনী স্বয়ং স্বীকার করিলেন সর্পাঘাত, মরকতমোহিনী স্বয়ং স্বীকার করিলেন, সমরনাথের স্নেহ অকপট, এতবড় প্রমাণের নিকটে কুচক্রী মিথ্যাবাদীগণের মিথ্যা অভিযোগ তিলমাত্র স্থান প্রাপ্ত হইল না. জ্বলন্ত হুতাশন মুখে শুষ্ক তৃণ যেন ভস্ম হইয়া যায়, মরকতমোহিনীর অঙ্গিকার মুখে মিথ্যাবাদীগণের

কল্পিত বাক্য সেইরূপ ভস্ম হইয়া গেল। রাজা তাহা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ সমরনাথের অন্বেষণার্থ দিকে দিকে দূত প্রেরিত হইল।

রায় মঙ্গল ওরফে নরোত্তম ঠাকুর তখন সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন. সমরনাথের অনুসন্ধান হইতেছে, সমরনাথ আসিবে, আসিলেই বনস্থলীর সেই বিরোধের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেই শঙ্কায় রায় মঙ্গল শীঘ্র শীঘ্র পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন! রাজার নিকটে আবেদন হইল, রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না, কন্যার বিবাহোৎসব সমাধা হইবার অগ্রে রাজধানী হইতে কাহাকেও তিনি স্থানান্তর গমনে অনুমতি দিবেন না. সেই উপলক্ষে এই রূপ রাজ ঘোষণা প্রচারিল হইল। অধিক কি, সেই দিন হইতে বিবাহোৎসবের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত যে সকল বিদেশী লোক রাজধানীতে আসিবে, রাজার প্রকাশ্য অনুমতি বিনা তাহারাও কেহ নগর পরিত্যাগ করিতে পাইবে না, এইরূপ আদেশ হইল। নগরের চারিদিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত চারিদিকে বহৎ বৃহৎ ফটক; চারি ফটকের মুখে মুখে চারি, চারিজন অস্ত্রধারী প্রহরী দাঁড়াইল, বিদেশী লোকদিগের শয়ন ভোজনের নিমিত্ত রাজধানীর স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সদাব্রত বসিল। উৎসবের সময় সকলেই রাজভোগ আহার করিবে, সকলেই সুন্দর সুন্দর সুকোমল শয্যায় শয়ন করিবে. সাধারণ জনগণেও সমুচিত সম্মানে, আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইবে, ঢেম ঢেম বাদনের দ্বারা রাজার এই অভিনব অনুমতি নগরময় প্রচার করা হইল। নরোত্তম ঠাকুর পলায়ন করিবার সুবিধা পাইলেন না।

সমরনাথের অন্বেষণে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল, দশদিন পরে বিফল মনোরথ হইয়া একেবারে তাহারা ফিরিয়া আসিল, সমরনাথকে পাওয়া গেল না। রাজা বিষণ্ণ হইলেন, মরকতমোহিনীও অধিকতর ব্যাকুলিনী, বিষাদিনী।

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এই সময়ে মহিষী একটী পুরাতন তর্ক তুলিলেন। মাধবের সহিত মরকত মোহিনীর বিবাহ হইবে কি প্রকারে? মাধব হইল ব্রাহ্মণের পুত্র, মরকতমোহিনী হইল ক্ষত্রিয় কুমারী, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বিবাহ হইলে মরকত মোহিনীর অকল্যাণ হইবে, মহিষীর তর্ক এই প্রকার।

এই তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে রাজা অমরনাথের বেশীক্ষণ লাগিল না, মহারণ্যের নদীতটে সিন্দুক, মাধবের দ্বারা সিন্দুক উত্তোলন, ভবানন্দ স্বামীর দ্বারা রাজ কন্যার প্রাণ দান, মাধবের সহিত রাজকন্যার গান্ধর্ব্ব বিবাহ, ক্ষত্র কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহে স্বামী কথিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ, এই সকল

পূর্ব্ব কথা বর্ণন করিয়া রাজা অমরনাথ অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজ মহিষীর শঙ্কা ও সন্দেহ বিভঞ্জন করিয়া দিলেন।

সমস্তই মঙ্গল। স্বামিজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রাজ মহিষীর একান্ত আগ্রহ জন্মিল। বিবাহের দিন স্বায়ংকালে স্বামিজী রাজধানীতে পদার্পণ করিবেন, রাজা এই কথা বলিয়া রাণীর আশা পূর্ণ হইবার আশ্বাস দিলেন, বিবাহের দিন পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছিল, সেই দিনটি লিপিবদ্ধ করিয়া ভবানন্দ স্বামীর নামে নিমন্ত্রণ প্রেরণ করা হইল, একজন প্রবীন রাজভট্ট সেই নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া অশ্বারোহণে মহারণ্যে যাত্রা করিলেন।

স্বয়ম্বর সভায় যে সকল রাজপুত্র আগমন করিয়া ছিলেন, তাঁহারাও নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইলেন। কাহার সহিত বিবাহ, পত্রে সে পরিচয় লেখা থাকিল না, রাজপুত্রেরা ভাবিলেন, আবার বুঝি স্বয়ম্বর, মরা মেয়ে কি প্রকারে বাঁচিল; তাহাও জানিবার জন্য তাঁহাদের ঔৎসুক্য জন্মিল, একে একে তাঁহারা রাজধানীতে সমাগত হইতে লাগিলেন, রাজা উজির কাহারও সাদর অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না।

আর সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব। নগরের উৎসব পূর্ণ মাত্রায় পরিপূর্ণ। রাজা এই কন্যার বিবাহে কল্পতরু হইলেন। যে যাহা প্রার্থনা করিল, রাজসংসার হইতে সে তাহাই প্রাপ্ত হইল, লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্রের দৈন্য দূর হইয়া গেল। দীয়তাং ভোজ্যতাং শব্দ ভিন্ন রাজভবনে কয়েকদিন আর অন্য শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না।

শুভদিন সমাগত। কুলপ্রথা মত মঙ্গলাচরণে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, ঠিক সন্ধ্যাকালে গুরুদেব ভবানন্দ স্বামী জয় উচ্চারণ করিতে করিতে রাজ নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একটি পরম সুন্দর বালক। সম্ভ্রমে গুরুদেবের চরণ বন্দন পূর্ব্বক রাজা তাঁহাকে উপযুক্ত আবাসে স্থান দান করিলেন, শিশুটি গুরুদেবের নিকটেই রহিল। অতি চমৎকার চেহারা। বয়স অনুমান সপ্তম কি অষ্টম বর্ষ। গুরুদেবের শুশ্রূষা করিতে করিতে অপাঙ্গ ভঙ্গিতে রাজা পুনঃ পুনঃ সেই সুন্দর শিশুটির চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ে কেমন এক প্রকার সানন্দ স্নেহ রসের আবির্ভাব হইল। কেন হইল, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। গুরু গৃহে উপযুক্ত পরিচারক নিযুক্ত রাখিয়া, অন্য মনে বালকের মুখখানি দেখিতে দেখিতে তিনি তখন সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্রি এক প্রহর। আর দুই দণ্ড পরেই বিবাহের লগ্ন। নিমন্ত্রিত রাজকুমারেরা দেখিলেন, স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন নাই,—শুনিলেন, একজন পূজারি ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ। মনে মনে ঘৃণা হইল। তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠিয়া যাইবেন, কেহ কেহ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দলের মধ্যে যাহারা কিছু বিজ্ঞ, বাধা দিয়া তাঁহারা বলিলেন, "আমন্ত্রীত হইয়া আসিয়াছি, উঠিয়া যাইলে অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে, কাজ নাই, বিবাহটা হইয়া যাউক, তাহার পর যাহার যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তাহাই করিও। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ভবিষ্যতে এই রাজার বংশবলীর সহিত আর আমাদের করণ কারণ থাকিবে না।"

সকলেই রহিলেন, কেহই উঠিলেন না। রাত্রি দশদণ্ড। শুভক্ষণে যথাবিধানে রাজা অমরনাথ বিপ্রকুমার মাধবকে মরকত-মোহিনী দান করিলেন, শাস্ত্রানুসারে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। লজ্জার অনুরোধে বাসর ঘর আমরা বর্ণন করিতে পারিলাম না, বর কন্যা বাসরে প্রবেশ করিলেন। পুষ্পমাল্যাদি ধারণে উভয়ের রূপের চমৎকার শোভা হইল। মাধব ষোষড় বর্ষীয়, রাজ কন্যাও ষোড়শী। সম-বয়সে যুগল মিলন। বাসরে গুরু সম্পর্কিয়া কুলরমণীগণ এই নবীন দম্পতীকে পূর্ণানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অজয়কুমার।

পরদিন প্রভাতে রাজকুলোচিত বৈবাহিক মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হইবার পর রাজা অমরনাথ অভ্যাগত আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দানে পুরস্কৃত করিলেন। যাহারা শীঘ্র বিদায় হইবার ইচ্ছা করিতে ছিলেন, তাহারা বিদায় লইলেন, যাহারা থাকিবার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য তাহারা থাকিলেন। সকলেই পুলকিত।

রাজা অমরনাথ মহারণ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে ভবানন্দ স্বামীর নিকটে অভিনব ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন। মরকত মোহিনীর দীক্ষা হয় নাই। প্রথম রজনীতেই মাধবের দীক্ষা হইয়াছিল। স্বামীজীর প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া নব বিবাহিতা দুহিতার সহিত মহিষী বিরজাসুন্দরী সেই দিন স্বামীজীর নিকট হৃষ্টচিত্তে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাদানকালে ভবানন্দ স্বামী আপন সমভি-

ব্যাপারী শিশুটিকে অন্তঃপুরে লইয়া যান নাই, দীক্ষাদানের পর একজন পরিচারিকা দ্বারা শিশুটি অন্তঃপুরে আনিত হইল। অভাবনীয় রূপে রাণী সেই অপরূপ শিশুকে দর্শন করিয়া, অভাবনীয় রূপে স্নেহরসে গলিয়া গেলেন, শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার গোলাপী আভা যুক্ত সুকোমল কপলে, নীলোৎপল সদৃশ আকর্ণ বিস্তৃত নয়নে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। কে যেন কোথা হইতে তাঁহার কর্ণে কি এক অপূর্ব্ব কথা বর্ষণ করিল, তিনি যেন সেই কথা শুনিলেন, দুটি চক্ষু দিয়া দর দর ধারে বিমল প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইল। শিশু মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মাতৃনেত্রে অশ্রু দর্শন করিয়া স্নেহময়ী মরকত মোহিনীও আরক্ত বদনে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ভাব গতিক দেখিয়া ভবানন্দ স্বামী শীঘ্র শীঘ্র বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। রাণী অবাক। রাজ কন্যাও অবাক।

কে এই শিশুটি পরিচয় পাইবার নিমিত্ত রাজা অমরনাথ সাগ্রহে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। গৃহে তখন কেবল শিশু, স্বামীজী আর রাজা। বিস্ফারিত নয়নে ক্ষণকাল রাজার মুখাবলোকন করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "নরোত্তম ঠাকুর নামে একজন সন্ন্যাসী ক্ষত বিক্ষতাঙ্গে তোমার আলয়ে আনিত হইয়াছিল, সযত্ন চিকিৎসায় সেই সন্ন্যাসী এখন আরাম হইয়াছে। লোক পাঠাইয়া সেই সন্ন্যাসীকে এইখানে আহ্বান কর, এই শিশুর প্রকৃত পরিচয়, সেই সন্ন্যাসীর মুখেই জানিতে পাইবেন।

রাজা তৎক্ষণাৎ নরোত্তমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, নরোত্তম আসিলেন,—কি—কি—কি—এক রঙ্গ! নরোত্তম এমন করে, কেন? স্বামীজীকে দর্শন করিয়া নরোত্তমের মুখ শুকাইল, শিশুরদিকে কটাক্ষপাত করিয়া নরোত্তম নেত্র মুদ্রিত করিলেন, সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গে কম্প আসিল, সে দিকে তিনি আর চাহিতে পারিলেন না, সরিয়া সরিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

রাজার মুখের দিকে স্বামিজী একবার চাহিলেন, তাহার নয়নের যেন একটু একটু চঞ্চল হইয়া হাস্য করিল, নরোত্তম যেদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, স্বামিজী উঠিয়া সেই দিকে আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিলেন,—গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়! ম—না, নরোত্তম। ঐ শিশুটিকে তুমি চিনিতে পার?"

নরোত্তম আবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। শান্তি রসাস্পদ সাধুগণের ক্ষমাগুণ যেমন প্রকৃতি সঙ্গত, ধূর্ত্তলোকের ধৃষ্টতা দর্শনে তাহাদের কোপাগ্নি

প্রজ্বলিত হওয়াও সেইরূপ স্বাভাবিক। স্বামিজীর চক্ষু আরক্ত হইল। পুনর্ব্বার সম্মুখে আসিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে পুনর্ব্বার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় মঙ্গল। সত্য কথা কও;—ঐ শিশুটিকে তুমি চিনিতে পার?"

রায়মঙ্গল মাথা হেঁট করিলেন, কথা কহিলেন না। স্বামিজীর ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে তৃতীয়বার তিনি কহিলেন, 'দেখিতেছি, সত্যকথা তুমি বলিবে না। ময়ূর পুচ্ছাবৃত বায়স! তোমার অবলম্বিত সন্ন্যাসধর্ম্মে বোধ হয়, সত্য কথা বলিবার উপদেশ নাই! আচ্ছা থাক তুমি! আমি তোমার মৌনব্রতের উদ্‌যাপন করাইব।"

নরোত্তম এই সময়ে ভ্রুকুটি ভঙ্গিতে দ্বারের দিকে চাহিলেন, উঠিয়া পলাইবার উপক্রম। দেখিতে দেখিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামিজীও দ্রুত গাত্রোত্থান করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, এক প্রকার টানিয়া আনিয়া চমকিত শিশুর পার্শ্বদেশে বসাইলেন, আপনিও মধ্যস্থলে বসিলেন। অনন্তর রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া ত্রিকালজ্ঞ সাধু পুরুষ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "রাজন্! এই নরোত্তম—না এই রায় মঙ্গল তোমার মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিবার আশা করিয়াছিল, তাহা তুমি জান, কিন্তু তুমি তখন ইহাকে দেখ নাই। এই রায় মঙ্গল কেবল তোমার কন্যা প্রাপ্তির আশা করে নাই, ইহার মনে তখন আরও উচ্চ আশা ছিল। মরকত মোহিনীকে বিবাহ করিয়া তোমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে, মনে মনে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার পর এই শিশু।

শিশু যখন দুই বৎসর বয়স, সেই সময়ে একদিন এই দুরাচার রায় মঙ্গল সন্ধ্যাকালে বহুরূপী সাজিয়া গৃহস্থ নিবাসের দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকার রঙ্গ ভঙ্গ দেখাইতেছিল, নানারসের গীত গাহিয়া তালে বেতালে নৃত্য করিতেছিল; বালক বালিকাদের স্বভাব কোন প্রকার সং দেখিলে মহা কৌতুকে সেইখানে তাহারা জড় হয়, কেবল বালক বালিকাও নহে যুবতীরা পর্য্যন্ত দ্বারের পার্শ্বে গবাক্ষের পার্শ্বে ঝাঁকে ঝাঁকে উঁকি মারিতে থাকে, প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা—বিশেষতঃ গৃহস্থ গৃহের প্রৌঢ়া পরিচারিকারা এক একটি বালক বালিকা ক্রোড়ে লইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া কৌতুক দেখিতে যায়, নিষ্কর্ম্মা পুরুষেরাও ঐ প্রকার কৌতুক পাইলে হা করিয়া চাহিয়া থাকে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে একটা পল্লীতে বহুরূপী দেখিয়া ঐরূপ জনতা হইয়াছিল, বহুরূপী অনেক প্রকার তামাসা দেখাইয়া দর্শক মণ্ডলীর চিত্ত-রঞ্জনের চেষ্টা পাইতেছিল, বালক বালিকারা

কৌতুকে হাস্য করিয়া করতালি দিতে ছিল, রঙ্গভঙ্গ দর্শনে সকলেই অন্যমনস্ক, অন্যদিকে কাহারও মন ছিল না। বহুরূপী সেই অবসরে আপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করণের কৌশল ভাবিতেছিল।

অবসরও ভবানন্দ স্বামী এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, সেই সময় বিশুষ্ক বদন বিকম্পিত গাত্র নরোত্তম ঠাকুর পুনর্ব্বার গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা দেখিলেন, স্বামিজী তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া তাহার একখানি হস্ত পুনরায় চাপিয়া ধরিলেন। নরোত্তমের মুখের দিকে না চাহিয়াই রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, অন্ধকার ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। বহুরূপী সেই সময়ে অত্যল্প কাল নৃত্য করিতে করিতে সহসা অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে লোকেরা বুঝিতে পারিল, একটি শিশু চুরি হইয়া গিয়াছে; কে চুরি করিল, কোথায় গেল, কোথায় লুকাইল, কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। রাত্রিকালে অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, পরদিন প্রভাতে চারিদিকে লোক ছুটিয়াছিল, শিশুটিকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। লোকালয়ের বিবরণ এই পর্য্যন্ত।

একবার নরোত্তমের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া, পুনরায় রাজার দিকে চাহিয়া স্বামিজী আবার আরম্ভ করিলেন, "জানিনা মহারাজ ঐ ঘটনায় কত দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে নদীতে আমি স্নান করিতে ছিলাম, নদীতীরে নিবিড় বন, সেই বন হইতে এই নরোত্তম অকস্মাৎ বাহির হইয়া ক্রোড়স্থিত একটি শিশুকে নদীতটে বসাইলেন, শিশুটি রোদন করিতে লাগিল, শিশুর অঙ্গে অনেক মুল্যবান অলঙ্কার ছিল, একবার আমি শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দয়া আসিল, দয়ার সঙ্গে চিন্তাও আসিল। এই নরোত্তম অথবা রায় মঙ্গল তখন আমাকে চিনিতেন না। আমিও ইহাঁকে চিনিতাম না। শিশুকে তীরে বসাইয়া স্বয়ং স্নান করিলেন, ডুব দিয়া কিছু অধিকক্ষণ জল মধ্যে অবস্থান করা বোধ হয় ইহার অভ্যাস ছিল, ডুব দিলেন, শীঘ্র উঠিলেন না শিশুটি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

এই সময়ে আবার নরোত্তমের দিকে চাহিয়া স্বামিজী বলিলেন, "কেমন নরোত্তম! সে কথা তোমার স্মরণ হয়? আমারে তুমি চিনিতে পার?"

নরোত্তম মাথা হেট করিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া ভবানন্দ স্বামী সেই সময়ে রাজ সমক্ষে স্বীকার করিলেন, একটি গুহ্য কথা শঙ্কিত কম্পিত নরোত্তম ক্রমশঃই অস্থির হইতে লাগিলেন, পলায়ন করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া

যান, এইরূপ মতলব, কিন্তু পলায়নের উপায় নাই। রাজার দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন, "মহারাজ! নরোত্তম ডুব দিলেন, আমি সেই অবসরে শিশুটিকে কোলে করিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেটি আজ প্রায় ছয় বৎসরের কথা।

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বামীজী পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমি উদাসীন শিশু লইয়া আমি কি করিব, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বন মধ্যে কোথায় রাখিব, ভাবনা হইল। অরণ্যের অপর সীমায় একটি সুবিস্তৃত লোকালয়, শিশু লইয়া আমি সেই লোকালয় চলিলাম, আমার আশ্রম তরুর মূল দেশ হইতে সেই জনপদটি প্রায় একক্রোশ দূর। তথাকার একটি ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণের হস্তে শিশুটির লালন পালনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলাম উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলে এই বালককে আমি লইয়া যাইব, আপনি রাখুন প্রত্যর্পণ সময়ে আপনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পুনরুক্তি করিতেছি শিশুর বয়ক্রম তখন প্রায় দুই বৎসর। শিশু তদবধি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিত হইতেছিল, অবসর উপস্থিত হওয়াতে ছয় বৎসর পরে গত কল্য আমি ইহাকে আনয়ন করিয়াছি। সেই শিশু এই।

রাজা চমৎকৃত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুর বায়ু বিকম্পিত কদলীপত্রের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাহার ললাটে ঘর্ম্মধারা প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। মুখে একটিও বাক্য নাই। শ্লেষপূর্ণ বচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্বামিজী পুনর্ব্বার বলিলেন, নরোত্তম। আঃ! আর তোমাকে নরোত্তম বলিব না। তুমি রায় মঙ্গল, তোমার চরিত্রচর্য্যা সমস্তই আমি জানি। এই শিশুকে চুরি করিয়া যে অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে তুমি প্রয়াস পাইয়াছিলে, বিধাতা সেই দুষ্ট অভিসন্ধি সফল করিতে দিলেন না। এখনও বলিতেছি সত্য কথা কও। মিথ্যাপবাদে বিজয় মাধব যেদিন বৈজয়ন্ত পর্ব্বতের উপত্যকায় তোমার আশ্রমে আশ্রয় লইতে গিয়াছিলেন সেই দিন তুমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলে রাজা অমরনাথ দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন সেই দত্তকের নাম সমরনাথ। বিজয়মাধব আর সমরনাথ অভেদে একজন। তুমি সেই সমরনাথকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলে। মারিতে পার নাই, পারিলেও তোমার দুরাশা কিছুতেই পূর্ণ হইত না।

বৃক্ষপর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিলে যে প্রকার ফল হয় রায় মঙ্গলকে সম্বোধন করিয়া অতগুলি কথা বলাতেও তদাপেক্ষা অধিক ফল হইল না।

রায় মঙ্গল কথা কহিলেন না, একটিবার মাথাও তুলিলেন না। তিনি সজীব কেবল অঙ্গ কম্পনে সেই সঞ্জীবতার পরিচয় হইল মাত্র।

পুনর্ব্বার রাজাকে সম্বোধন করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "মহারাজ! এই রায় মঙ্গলের লোভ ছিল তোমার রাজ্যের উপর আর তোমার কন্যার উপর। বিধি সিদ্ধ উত্তরাধিকারী থাকিলে এই লোভী লোকের দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আশা থাকিবে না, সেই জন্য বনমধ্যে সমরনাথকে বিনাশ করিতে ইহার ইচ্ছা হইয়াছিল। কেন না সমরনাথ তোমার দত্তক পুত্র, সমরনাথ নিজমুখে ইহার নিকট সেইরূপ পরিচয় দিয়া ছিলেন। এই লোকটি বিলক্ষণ চতুর। দত্তক পুত্র গ্রহণের সমাচার পাইয়া সেই সময়ে ইহার মনে তর্ক আসিয়াছিল রাজা অমরনাথের ঔরস পুত্রের অভাব হওয়াতেই তিনি দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই স্বামিজী একবার সমুজ্জ্বল নেত্রে রাজ বদন নিরীক্ষণ করিলেন, স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "বুঝিলেন মহারাজ? ঔরসপুত্রের অভাব। এই রায়মঙ্গল ভাবিয়াছিলেন, রাজা অমরনাথের ঔরস পুত্রের অভাব। সে কথার অর্থ কি? কাতর হইও না, উদ্বেগ আনিও না, সংশয় রাখিও না, অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই, স্থির হইয়া শ্রবণ কর। মরকত মোহিনীর জন্মের কয়েক বৎসর পরে তোমার একটী পুত্র সন্তান জন্মে, দুই বৎসর বয়সের সময় সেই পুত্রটি হারাইয়া যায়। এই রায়মঙ্গল তাহা জানিত। এই লোকটাই চোর! আনন্দ কর—আনন্দ কর! পুনর্ব্বার রাজ্য মধ্যে মঙ্গলাচরণের অনুমতি দাও! সব কথাই আমি বলিয়াছি। যে বালকটিকে আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, এইটিই তোমার অপহৃত ঔরস পুত্র, তোমার এই বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারী বংশধর, আমি ইহার নাম দিয়াছি অজয় কুমার।

এই আনন্দবার্ত্তা প্রকাশ করিয়া ভগবান ভবানন্দ স্বামী অজয়কুমারের হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। আনন্দের উপর আনন্দ! রাজার চক্ষে অবিরল বারিধারা স্বস্নেহে বারম্বার পুত্র মুখচুম্বন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে রাজা সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণিপাত করিলেন। হারানিধি মরকত মোহিনী যাহার প্রসাদে বাঁচিয়া উঠিল, হারানিধি অজয়কুমার তাঁহারই প্রসাদে ক্রোড়ে আসিল, আনন্দের অবধি নাই। এই শুভ সমাচার তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল, মহিষী বিরজাসুন্দরী, রাজকুমারী মরকত মোহিনী তৎক্ষণাৎ গুরুগৃহে ছুটিয়া আসিলেন; হারানিধি ক্রোড়ে লইয়া মহিষী

পূর্ণানন্দে প্রেমাশ্রু প্রবাহে কুমারের কোমলাঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন, মরকত মোহিনী মাতৃ ক্রোড় হইতে অজয়কুমারকে আপন ক্রোড়ে লইয়া স্নেহানন্দে বার বার সেই বিধুমুখে সহস্র সহস্র চুম্ব দিলেন, সে সময়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস বর্ণাবলীতে বর্ণনাতীত।

স্বামীজীর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, রায়মঙ্গলের দিকে পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করিতে করিতে রাজা সেই সকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সংক্ষেপে মহিষীর নিকট বর্ণন করিলেন। মহানন্দের সময়েও রায়মঙ্গলের উপর রাজ মহিষীর মহাকোপ। যেমন কোপ, তেমনি ঘৃণা।

বলিদানের অগ্রে দেব দেবী মণ্ডপে ছাগশিশু যেমন কম্পিত হয়, পাপিষ্ঠ রায়মঙ্গল সে ক্ষেত্রে সেইরূপ কাম্পিত হইতে লাগিল। রাণী সক্রোধ নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আজ যদি আমাদের এই মহা মহোৎসবের শুভক্ষণ না হইত, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডে এই পাপিষ্ঠের প্রাণ সংহারের অনুরোধ করিতাম, কিন্তু মহারাজ পরমেশ্বর আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া এই শুভ দিন আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রসাদে আমরা এই পূজনীয় সাধু পুরুষের চরণ দর্শন পাইয়াছি, সেই মঙ্গলময়ের প্রসাদেই এই গুরুদেবের কৃপায় আমাদের পরম স্নেহাস্পদ দুটি হারানিধি আমরা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, এমন শুভ সময়ে কাহারও প্রাণ বধ করা উচিত হয় না; আপনি এই পাপাত্মার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আর শান্ত নয়নে এই নরাধম পাষণ্ডকে অবলোকন করিতে"—

একজন ভৃত্য গৃহ মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল, "মহারাজ। মহারাজ! পাগল—পাগল—পাগল; সর্ব্বাঙ্গে কাদা—সর্ব্বাঙ্গে ছাই—কাঁদিতেছে—হাসিতেছে—চীৎকার করিতেছে—নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছে, রাজা—রাজা—রাজা—পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে চায়—ধুলায় গড়াগড়ি খায়—প্রবেশে বাধা দিলে পাথরে মাথা ঠুকিয়া রক্তপাত করে খুন! খুন! খুন!

রাজা চমকিত হইয়া গুরুদেবের সহিত দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিলেন। যে ভৃত্যটি সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, বাক্‌শূন্য রায় মঙ্গল তাহার জিম্মায় আটক রহিল।

ক্রমশঃ।

বিপদে প্রার্থনা।

লেখিকা,—শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দাসী।

সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর জননী।
তুমি না করিলে দয়া, কি হবে মা মহামায়া,
সন্তানে সুমতি যদি না দাও মা আপনি॥
তোমার সন্তান তবে, বল মা কোথায় রবে,
বিপদ সাগর মাঝে তুমি যে মা তরণী।
ডুবেছি বিপদ জলে, কৃপা করো নে মা তুলে,
মা হয়ে সুতের দুখ বুঝ না কি জননী॥
অজ্ঞান অন্ধ হইয়ে, তোমা হেন মা ভুলিয়ে,
করেছি মা অপরাধ তব পদে শত শত।
আজি এ বিপদে পড়ে, ডাকি মাগো ভক্তিভরে,
রক্ষা কর রক্ষা কালী তব অধম তনয়ে॥

দাদার প্রাণ।

(গল্প)

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

(১)

বিশ্বনাথ চৌধুরী রঘুরামপুরের একজন অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামের মধ্যে চৌধুরী-বংশ বহুদিন হইতেই নামজাদা বংশ। চৌধুরী বাড়ীতে এখনও বার মাসে তের পার্ব্বন হয়। পূজা পার্ব্বণে বহু অর্থ ব্যয় হয়, গ্রামবাসীদের তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়ান দাওয়ান হয়, দান ধ্যানের ত কথাই নাই। দীন দুঃখীগণ পেট ভরিয়া খাইয়া, মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া চৌধুরী বংশকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গ্রাম কাঁপাইয়া তুলে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে চৌধুরী বংশে

লোকজনের বড় অভাব। পূর্ব্বে শোনা যায় এই বংশে এত লোক ছিল যে, বোধ হইত ঘিরাট বাড়ীখানা ছোটখাট একখানা গ্রাম। তখন বিশ্বনাথ চৌধুরী ও তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা অমরনাথ ব্যতীত আর কেহই নাই। বিশ্বনাথের বয়স প্রায় পয়তাল্লিশ হইবে, অমরনাথের বয়স কুড়ি বৎসরের বেশী নয়। বিশ্বনাথ বিবাহাদি করেন নাই—কেন করেন নাই তাহা তিনিই জানেন। অমরনাথ বিশ্বনাথের নয়নতারা। সেবার যেদিন ওলাউঠার আক্রমণে বিশ্বনাথের জনক জননী দিব্যধামে গমন করেন সেই দিন হইতে বিশ্বনাথ অমরনাথকে আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিজ হস্তে মানুষ করিয়া আসিতেছেন। বাড়ীতে দাস দাসীর অভাব ছিল না তবু তিনি অমরকে কাছছাড়া করেন নাই, কোলে পিঠে করিয়া তাহাকে লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন।

তিনচার বৎসর পূর্ব্বের কথা,—একদিন দেওয়ান সত্যমোহন পাল বিশ্বনাথকে বলিলেন, "দেখুন অমরকে এখন সহরে পাঠান দরকার। গ্রামে থাকলে ত আর উচ্চ শিক্ষা হবে না। ভাল রকম লেখাপড়া শেখাবার জন্য তাকে যতশীঘ্র সম্ভব সহরে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

দেওয়ানের কথায় বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের নিধি অমরনাথকে সহরে যাইতে হইবে। বিশ্বনাথের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অনেক আপত্তি করিলেন। অমরনাথকে ছাড়িয়া তিনি যে একদণ্ডও থাকিতে পারিবেন না এ কথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু গ্রামের মাতব্বর লোকদের পরামর্শে এবং সত্যমোহন পাল মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় অমরনাথের সহরে যাওয়াই স্থির হইল। বিশ্বনাথ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মত দিলেন।

দেওয়ান মহাশয় সহরে অমরনাথের জন্য একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন চাকর ও একজন দরোয়ান ঠিক করিয়া দিলেন। অমরনাথকে পড়াইবার ও দেখাশুনার জন্য একজন গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অমরনাথ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

(২)

আশ্বিন মাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন চৌধুরী বাড়ী পূজার নহবৎ বাজিয়া উঠিল। শরতের শান্ত প্রভাতে সানাইয়ের ভৈরবী আলাপনে সারা গ্রামখানি

মুখরিত হইয়া উঠিল। চৌধুরী বাড়ী আনন্দের একটা তাড়াহাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দের একটি ক্ষীণ রেখা থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চৌধুরী বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ বিশ্বনাথের প্রাণের ভাই অমরনাথ এখনও বাড়ী আসে নাই। পূজার পাঁচদিন পূর্ব্বে তাহার আসিবার কথা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত না আসায় সকলেই একটু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

বেলা যতই বাড়িতে লাগিল বিশ্বনাথের মন ততই আকুল হইয়া উঠিল। সকলেই তাহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "বোধ হয় এখনো ছুটি পায়নি, তাই আসতে পারেনি," কেহ বলিল, "কালকের গাড়ী হয়ত ধরতে পারেনি, আজ বিকেলের মধ্যে নিশ্চয় আসবে।" কেহ বলিল, "সময়মত নৌকা পায়নি হয়ত সন্ধ্যার মধ্যে নিশ্চয় আসবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই" ইত্যাদি। বিশ্বনাথের মন কিন্তু কিছুতেই স্থির হইল না। তিনি রাস্তা আর ঘর করিতে লাগিলেন, আর মাঝে মাঝে চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিলেন, "তারা ব্রহ্মময়ী মঙ্গল করিস মা।"

অপরাহ্নেও যখন অমরনাথ আসিয়া পৌঁছাইল না, তখন বিশ্বনাথ সত্যসত্যই বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি অমরনাথকে আনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যথাসময়ে নৌকা প্রস্তুত হইল। বিশ্বনাথ দুর্গানাম স্মরণ করিয়া সহরে যাত্রা করিলেন। সমস্ত রাত্রি চলার পর প্রভাতে নৌকা সহরের ঘাটে লাগিল। বিশ্বনাথ নামিয়া অমরনাথের বাসার দিকে ছুটিলেন, নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিল, হারু মাঝি ও তাহার পুত্র কানাই নৌকাতেই রহিল।

অমরনাথ তখন বাসাতেই ছিল বাড়ী আসিবার সে জিনিস পত্র গুছাইতে ছিল। এমন সময় বিশ্বনাথ তথায় গিয়া হাজির। অমরনাথকে দেখিয়া তিনি যেন হাতে চাঁদ পাইলেন, একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলি-লেন, "অমর, এমনি করেই কি কষ্ট দিতে হয়? পঞ্চমী কেটে গেল এখনো যাবার নাম নেই, আমাকে সব ফেলে চলে আসতে হল। মায়ের পূজো, তুই এখনো বসে? ভেবেছিস কি বল ত?"

অমরনাথ দাদার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "দাদা! একদিন আর আপনার তর্ সইনি? আপনি দেখছি কোন দিন পাগল হয়ে যাবেন! কালই যেতাম কটা জিনিস কেনার দরকার ছিল বলে পেরে

উঠিনি, ছুটি মোটে পরশু পেয়েছি! যাক্ আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, বিকেলে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

আহারান্তে বিশ্বনাথ বিশ্রামার্থে উপরের ঘরে গমন করিলেন। অমরনাথও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া দাদার নিকট গিয়া বসিল। নানা কথাবার্ত্তার পর অমরনাথ ছেলেমানুষের মত বায়না ধরিয়া বলিল, "দাদা অনেক দিন আপনার গান শুনি নাই, আজ একবার সেই আগমনী গানটা গান না। সে গানটা আপনার মুখে বড় মিষ্ট লাগে। মা আসছেন, এখান থেকেই আমরা বোধনটা সেরে নি।"

ভক্তিপাগল বিশ্বনাথ একেবারে গলিয়া গেলেন। ছোট ভাইটীর এ আবদার তিনি পূরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনেক দিন পরে তিনি আবার মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন,—

'হের গিরিরাণী তোমার নন্দিনী
রাজরাণীর সাজে এসেছে,
ভিখারী শঙ্করী কে বলে তোর মেয়ে
রাজরাজেশ্বরী সেজেছে।
চরণে তার রক্ত উৎপল
কোটি চাঁদ তাতে চমকিছে,
সে চরণ পরে নূপুর শোভে যে
রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে।
ক্ষীণ কোটি হেরি বুঝি বা কেশরী
ও পদে আশ্রয় নিয়েছে,
ছিল যে দ্বিভুজা হ'য়ে দশভুজা
ভবোপরে আসন করেছে॥"

(৩)

সহরের ঘাট হইতে নৌকা ছাড়া হইল, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অনুকূল বাতাস পাইয়া নৌকা পালভরে সাঁই সাঁই চলিতে লাগিল, হারু হালখানি চাপিয়া ধরিয়া মনের আনন্দে গান ধরিল,—

"ও মন! ওপারেতে আঁধার হল
মেঘ উঠেছে জ'মে,

ও তুই, এ পারেতে অবাক্ হ'য়ে
রইলি কেন থেমে!"

হারু প্রাণ খুলিয়া গাহিতেছিল। তাহার মুক্ত স্বর গোধূলীর বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ভাবপ্রবণ বিশ্বনাথ তন্ময় হইয়া সেই মধুর সুধোরা পান করিতেছিলেন। হারু তখনও গাহিয়া চলিয়াছে,—

"ও তার বয়ান যখন পড়ে মনে
নয়ান ভাসে জলে,
ঘাটের পথে আনাগোনা
সন্ধ্যে হ'য়ে এলে।"

হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া নৌকাকে ধাক্কা মারিল। কানাই বলিয়া উঠিল,—"বাপ হাওয়া বড় জোর ধরল যে।"

হারু হালটা আরও কসিয়া ধরিয়া বলিল, "ভয় নেই, জোর করে টান বাপ, ঐ বাঁকের মুখটা পেরুলেই গোপালগঞ্জে পৌঁছাব, ওখান থেকে আমাদের গাঁ ত তিন চার ঘণ্টার পথ; বেকায়দা হয়—র'য়ে গেলেও চলবে।"

বিশ্বনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, "হারু আমরা নিরাপদে পৌঁছিতে পারব ত?"

হারু সাহসের সহিত বলিল, "ভয় কি বাবু, ঝড় উঠবার আগেই আমরা গোপালগঞ্জের ঘাটে লা ভিড়াব।"

আর লা ভিড়াব! বোঁ বোঁ করিয়া ঝড় উঠিল, নদীর বুক স্ফীত হইল, নৌকা মোচার খোলার মত দুলিতে লাগিল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া নৌকাকে চূর্ণ করিয় দেবার উপক্রম করিল।

কানাই একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু বাতাসে তাহার কথা কিছুই বোঝা গেল না। বিশ্বনাথ অমরনাথকে বুকের মধ্যে আকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তারা, মা আমায় রক্ষা করিস মা—"

আর কিছু শোনা গেল না। একটা ভয়ানক জোর বাতাতে নৌকা উল্‌টাইয়া গেল। বিশ্বনাথ অমরনাথকে চাপিয়া ধরিয়া সাঁতার দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উন্মত্ত নদীর প্রবল তরঙ্গ দুইজনকে ছিন্ন করিয়া কোথায় সরাইয়া দিল। হারু ও কানাইকে দেখাই গেল না।

কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে দেখা গেল অদূরে এক

জলমগ্ন চড়ে বিশ্বনাথ দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা কে ডাকিল, "বাবু!" বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, হারু উঁচু হইয়া বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, নিকটের জিনিস সবই বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বিশ্বনাথ হারুর নিকট সরিয়া গিয়া বাষ্প বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "হারু, অমর আমার—তোমার কানাই—"

আর বলিতে পারিলেন না, দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। হারু কোন উত্তর দিল না, সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিশ্বনাথের চোখের জলও আর বাধা মানিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

* * * *

বিশ্বনাথ আর বাড়ী ফিরেন নাই। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। হারুর সহিত নৌকা করিয়া এদেশ সে দেশ ঘুরিয়া বেড়ান আর আকুল সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহেন,—

"আমিই শুধু রইনু বাকি,
যা ছিল তা গেল চলে,
রইল না তা কেবল ফাঁকি।
আমার বলে ছিল যারা
আর ত তারা দেয়না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা
কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।"

বিরহিণী।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

উঃ জগতের কি পরিবর্ত্তনশীলতা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হু হু করে চোখের সামনে দিয়ে শীত ঋতু পালিয়ে গেল। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে হা হা

করতে করতে ফিরে গেল। উঃ জগতের কি উপেক্ষা। আমার ওপর কি তার ঈর্ষা! ভাবতে পারি না। ভেবেই বা কি করব? কি-ই বা ভাবব ছাই!

আবার আমার সেই জাগরণ। সেই স্মৃতির জাগরণ। ওঃ স্মৃতি জিনিষটা কি ভীষণ! কি কালকুট হলাহল। এতদিন শীত ছিল, শীতের কাজে সে জ্বালা কতকটা ভুলেছিলুম,—উঃ জগতের কি হিংসা। কি ঘোর বিদ্বেষ। নিমিষহারা চোখের সমুখ থেকেও তাকে কেড়ে নিলে। উঃ আবার কেন ভাবি?

সেন অবজ্ঞা করতে করতে একটা বছর অতীতে চলে পড়ল। কত পরিবর্ত্তনই তার মাঝে দেখলুম। ওঃ সেই যখন 'ঋতুরাজ' চলে গেল—তারপর কি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। ওঃ সে কি সূর্য্যের প্রখর তেজ—জগৎ ফেটে যাচ্ছে,—ক্ষুটি ফাটার মতন ফেটে যাচ্ছে! মাঠে মাঠে, ক্ষেতে ক্ষেতে আগুন ছুটছে—ভূপুর যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে—পথে কেউ নেই—পাখী নেই, জীব নেই, কেউ নেই—চারিদিক শুক্‌নো, কে কোথায় থাকবে। পলকে সে দগ্ধ হয়ে যাবে। ওঃ সে কি রুদ্র রবির রুদ্র রৌদ্র। পুড়ে যাচ্ছে—সব পুড়ে যাচ্ছে। গাছ, পালা, লতা, গুল্ম একধার থেকে সব পুড়ে যাচ্ছে। ছায়া নেই। কোথায় ছায়া? গাছে গাছে বাসা শূন্য—পাখী নেই, শাবক নেই। কোথায় তারা? গাছের ফাঁকে ফাঁকে, পাতায় পাতায়—পাতার তলে তলে—শাখায় শাখায় ডালে ডালে যে যেখানে পেরেছে—আশ্রয় নিয়েছে। বাসা তো খালি এ রোদে কে বাসায় থাকে? কেউ নেই,—সব খালি,—কেউ নেই।

বাতাস বয়ে যাচ্ছে—ধূলিকণা সব তার সঙ্গে উড়ছে। ওঃ সে কি ধূলিকণা? সে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আগুনের জ্বলন্ত ফিন্‌কি। গায়ের ওপর দিয়ে চুল খেলিয়ে খেলিয়ে সেই উত্তপ্ত বায়ু বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু কষ্ট নেই, সে বরং ভাল। কোথায় তাপ? কে বলে আগুন? আমার তার ভাল, এ ঋতুরাজ বসন্তের চাইতে আমার সেই প্রচণ্ড গরমই ভালো, তা'তেই আমার সুখ।

তারপর—তারপর—তারপর আবার সেই জগতের কঠোর বিদ্বেষ। চলে গেল গ্রীষ্ম—নিমেষহারা আঁখির সামনে দিয়ে চলে গেল—অভাগিনীকে ফেলে রেখে গেল, জগৎ তাকে কেড়ে নিলে। এ সুখ প্রাণে তা'র সইল না। ক'দিনই বা রইল? এল আর চলে গেল।

তারপর তারপর? তারপর দেখলুম, মেঘেরা আকাশের বুকে রাশীকৃত মেঘ জমে উঠেছে। কোথাও কোথাও নিবিড় নীলে ছেয়ে গেছে। ঘন ঘন নর্ত্তনে জগৎ ভেসে যাচ্ছে। ওঃ নীরদ মেঘের মালা থেকে সে কি ভীষণ বজ্র নির্ঘোষ। মুষলধারে বৃষ্টি, জলদের গর্জ্জন, বন্যা বাত্যা, সৌদামিনী। ওঃ দেখতে দেখতে এ আরেক দৃশ্য উপস্থিত। একদিন ধরার বুক খর তাপে ফেটে যাচ্ছিল, আবার আজ ঘোর বর্ষণে ভেসে যাচ্ছে। দুই-ই দেখলুম, চোখের সামনে পর পর দুইই দেখলুম। নীরব প্রদোষের মেঘ—কোথাও হাক ডাক নেই। আর আজ? সেই কোথায়—সে নিস্তব্ধতা? ঐ ঐ ঐ নিবিড় মেঘের বুক চিরে কড় কড় কড়াৎ। ঐ ঐ ঐ আবার পরক্ষণে—হড় হড় হড়াৎ। কই নীরবতা? নীরবতার কোলে আছে মুখরতা। সে স্থানে অধিকার পেয়েছে মুখরতা মুখরতা।

তারপর—তারপর—তারপর আবার কি? যা হ'বার তাই। সে সব চলে গেছে। বিশ্বপটের ওপর থেকে সে দৃশ্য একেবারে মুছে ঘুচে গেছে। ওঃ চোখের সামনে কি শান্ত, নম্র ভাব। কে বিশ্বাস করবে? আকাশের গায়ে গায়ে মাখনের মতন সাদা সাদা মেঘ রাশি রাশি ভেসে যাচ্ছে। ক্বচিৎ সেই আভরাজ; সেই নর্ত্তন। প্রকৃতির দেহে এ যে অতি সৌম্য শোভা। এ যে রমণীয়—কমনীয়—আর কি বলব? খুঁজে পাই না।

তারপর—তারপর কি বলি? তাও যে চলে গেল। সে শোভাও যে ঢেকে গেল। জগৎ নিম্নে নিলে। সজোরে গায়ের জোরে অতি প্রবল ভাবে কেড়ে নিলে। সে দৃশ্য চলে গেল। চোখের সমুখে এ আবার আর এক পট—নতুন পট। ঐ গেল গেল দিন গেল। সাঁই এল। টিপ টিপ ঝিপ ঝিপ ঐ যে আরম্ভ হ'ল, ওঃ ঐ যে ঐ যে, মুহূর্ত্ত পরে দেখি। কোথায় কোথায়—দিক্‌দিগন্ত? শিশির শিশির—গাছ হিমে ঢাকা; ওঃ সে যে চারিদিক হিমে জড়িয়ে গেছে। সকাল, সকাল? হা সকালেও হিম। দুপুর, বিকেল, রাত—সব সময়েই হিম। শুধু হিম। কিছু নেই—শুধু হিম। হিমের রাজ্য হেমন্ত।

তারপর তারপর—আর জানি না। তারপর—হ্যাঁ, এই যে চলে গেল। কবেই বা এল—কখনই বা গেল। ওঃ কে তাকে ধরে রাখবে। প্রচণ্ড জগৎ সব সময় পাছে পাছে ঘুরছে—কে ধরবে? ধরবে কে। কত এলো, কত চলে গেল, কে ধরলে? ধরলে কে! জগৎ আছে—পরিবর্ত্তনীয় আসবে

যাবে, কেউ ধরবে না। কত আসবে, কত যাবে, কে পারে? কেউ না—কেউ পারে না ধরতে। সামনে দিয়ে কত এল, সমুখ দিয়ে কত ফিরে গেল—কে? কে? কে? ধরলে কে? কেউ না—কেউ না—কেউ না—জগৎ আছে কেউ না।

এই তো দেখলুম হেমন্তের প্রকৃতি—কখন চলে গেল কে জানে? এ যে আর এক দৃশ্য তাইতে মিশে গেছে—ওঃ এ যে শীত—শীত শীতের দেখা। শরতের লতা কই—সে হরিৎ ক্ষেত কই। ওঃ সে যে সব চলে গেছে। হিমে হিমে সে যে সব সর্ব্বনাশ হয়েছে। কই কই, লতা, পাতা, প্রকৃতি? ওঃ কেউ নেই কেউ নেই—সব খালি, খালি হিম। জড় নিবিড় হিম। মাঘের হিম—ওঃ শীতে শীতে সর্ব্বনাশ গাছের পাতা নেই, ঝরে গেছে সব ঝরে গেছে, আছে কি? কিছু নেই, কিছু নেই, হিম আছে, সুধু হিম। মাঘের হিম!

উঃ জগতের যে তা'তেও ঈর্ষা। যায় যায়, যায়—ঐ যায়, যায়, গেল, গেল, তাও চলে গেল। নতুন নতুন, এ যে আবার আরেক দৃশ্য। কতই দেখলুম। ওঃ এ যে না আর বলতে পারি না! ওঃ এ কি ভীষণ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত হেমন্ত বয়ে গেল, কিছু কষ্ট হল না—ওঃ এ কি দারুণ। গ্রীষ্ম যে এর কাছে শত গুণে ভালো ছিল। ওঃ কি বলব? এ যে বসন্ত হেমন্ত যে এর কাছে শত গুণে ভালো। চলে গেল, চাকার মতন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল। ধরবে? আবার বলি ধরবে? কেউ না, কেউ না।

হিম নেই—হিমের অভাবে লতা জেগে উঠেছে। নানান্ ফুল ফুটে উঠেছে। পাখী গেয়ে উঠেছে। ঋতুরাজের অনুচর এয়েছে—ও, কোকিল কোকিল। ও, না থাক। উঃ কি স্মৃতির দহনেই না দিন রাত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। না, না, ও, কোকিল—না থাক।

আমার কুঞ্জে—ও, কার কুঞ্জে? এ বিরহিনীর কুঞ্জবনে—ও, ঐ যে ঋতুরাজের আগমন! ঐ যে মধুর হাসি। ও, কি বলছিলুম, না, না, বিষের হাসি! ওঃ কোথায় মধু? মধু না, না, বিষ, বিষ, কালকুটহলাহল! ঐ যে সঙ্গে সঙ্গে অনুচরও এয়েছে। পাখি কোথায় ছিলে, পাখি কোথায়? উঁ, না, বসন্তপ্রিয় তুমি, না, পাখি ভুল হয়েছে, বিরহিনী অভাগিনীর ব্যথা তুমি কি বুঝবে? কি করে কেমন করে কি ভাবে বুঝবে? ও, বিলাসপ্রিয় তুমি গ্রীষ্ম চাও না, বর্ষা চাও না, শীত চাও না, সুধু যেখানে বিলাস ও, সেই দেশ। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সেই করে এয়েছিলে আবার, আবার বহুদিন পরে বহুদিন

পরে তোমার দেখা। ও, চোকের সমুখ দিয়ে কত ঋতু হু হু করে কেটে গেল। কোথায় ছিলে? কি জিজ্ঞেস করব? না, না, বাহিরে, বিদেশে যেখানে বসন্ত, শুধু বসন্ত, তাপ নেই, শীত নেই, অথচ একটা মেশানো ভাব, ও, সেই দেশে সেই দূর বসন্তের দেশে। অভাগিনীকেও, আবার কেন বলি? না, না, বিলাসী তুমি, বিলাসী চির সুখী।

স্মৃতি? মনের স্মৃতি? ও, কি ভীষণ জিনিষ। যায় না, মোছে না, ঘোচে না। ঋতুর পর ঋতু মুছে, ঘুচে চলে গেল, তবু স্মৃতি? ও, সে যায় না, সে যাবার জিনিষ নয়, তার যাবার যো নেই। সে মনকে পোড়াতে এসেছে। মন পোড়ান জিনিষ সে, যাবার কি? না, একেবারেই না! তবে, তবে কি?

ও, আমার স্মৃতির কথা? সে কি যাবে? যাবার নয়। সে থাকবে মনে চিরদিন, যতদিন বেঁচে আছি আমি। তারপর? তারপর আমি নেই, স্মৃতির জ্বালা কে সহিবে? লোক নেই চির অবসান।

চির অবসান। ও, তবে কি মরব? মরলেই সব শান্তি? না না মরব কেন? ক'টা দিন জীবন তো ফুরিয়ে এল। ও কেটে যাবে। ভয় কিসের ভয়? না, না, শুধু এই ঋতুরাজকেই ভয়। গ্রীষ্ম আসুক, বর্ষা আসুক, সব সইব, সব মাথা পেতে নেব, কিন্তু কিন্তু বসন্ত? ওঃ যে বিষ! বিষের জ্বলন দাহ, ও যে! কি করি! সইব, হ্যাঁ সইতে তো হবেই! তবে? তবে আর কি? হ্যাঁ যাক, কেটে যাক।

হু হু করে যদি সামনে দিয়ে চোখের সমুখ দিয়ে, এত ঋতু চলে যায় তবে এটা কি চলে যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কেড়ে নেবে, নিশ্চয়ই কেড়ে নেবে! বাঁচব বাঁচব—তখন!

কি বললুম—জগৎ কেড়ে নেবে? ওঃ আমার পরে জগতের কি ঈর্ষ্যা। জগৎ জ্বালা কেড়ে নেবে? দুরাশা! নিরাশা সে! জগৎ জগৎ চায় কি করে আমাকে নিশিদিন স্মৃতির চাপে দাবদহনে পুড়িয়ে মারবে। জগৎ ঋতুরাজকে কেড়ে নিয়ে অভাগিনীকে শান্তি দেবে? হতাশা! সে আশা বৃথা।

তবে? কিসের স্মৃতি? না, না, তা আমি তোমাদের বলব না, বলতে পারি না, আমাকে সে কথা কেউ জিজ্ঞেস কর না, ভুলেও না, ওগো না।

স্মৃতি কি ভোলা যায়? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে তবু ভুলে ছিলুম, কিন্তু কিন্তু

বসন্ত এসে পোড়া ঋতুরাজ এসে আবার, হায়, কাবার জাগিয়ে দিল! ঐ কাল কোকিলটা! ঐ পোড়া! নীল আকাশ এল, লতা পাতা ফুল ফল এল, জাগিয়ে দিলে, সব এসে এক সঙ্গে আবার জাগিয়ে দিলে।

আগুক। তাই জাগিয়ে দিক্। স্মৃতির দহনে পুড়ে মরুব! তবু তোমাদের কাছে হ্যা, তোমাদের কাছে, কি বলব? তোমরা কখনও সে কথা আমায় জিজ্ঞেস করোনা! ওগো না! ভুলেও না!

আমি বিরহিণী! বিরহ স্মৃতিই তো আমার চির সাথী, চির সঙ্গী। তবে কেবা? কেন জিজ্ঞেস কর? করনা বৃথা; জবাব পাবে না। বিরহিণী, বিরহিণীর কুঞ্জবনেই ত আমি থাকি। স্মৃতি বিষে নিতি জলে মরি। ওঃ কি দাবদাহ। বিরহিণীর কাহিনী তোমরা শুনোনা! শুনতে কখন চেয়োও না! জগৎকে সারা বিশ্বকে জিজ্ঞেস কর,—বসন্ত নয়, আর সব সুদ্ধকে জিজ্ঞেস কর, উত্তর পাবে! আমায় নয়! না, ভুলেও নয়,—ওগো না। আমি বিরহিণী—বিরহিণী!*

সমালোচনা।

কর্ম্মফল। (গার্হস্থ্য উপন্যাস) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মজুমদার লাইব্রেরী, ১০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আমরা "কর্ম্মফল" উপন্যাস খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। প্রকৃত সামাজিক উপন্যাস আজ কাল বঙ্গ সাহিত্যে অতি বিরল দু-চারি খানির অধিক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবীণ গ্রন্থকার কঠোর সংসার সংগ্রামে মানব চরিত্র বিশ্লেষণে যে বিশেষ পটু, তাহা আলোচ্য উপন্যাস খানি পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার উপন্যাসের নায়িকা গৃহিনী অন্নপূর্ণা দেবীর চরিত্র চিত্রে তিনি যে চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য; উপন্যাস খানি চিত্তাকর্ষক, পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এমন কি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ছাপা, কাগজ, চিত্র সবই উৎকৃষ্ট।

---

* অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে "বসন্ত সমাগমে" চিত্র দর্শনে রচিত।

বটকৃষ্ণ পালের এড্ওয়ার্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যা-বধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১॥০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১॥০ মাত্র।

গোল্ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে দিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

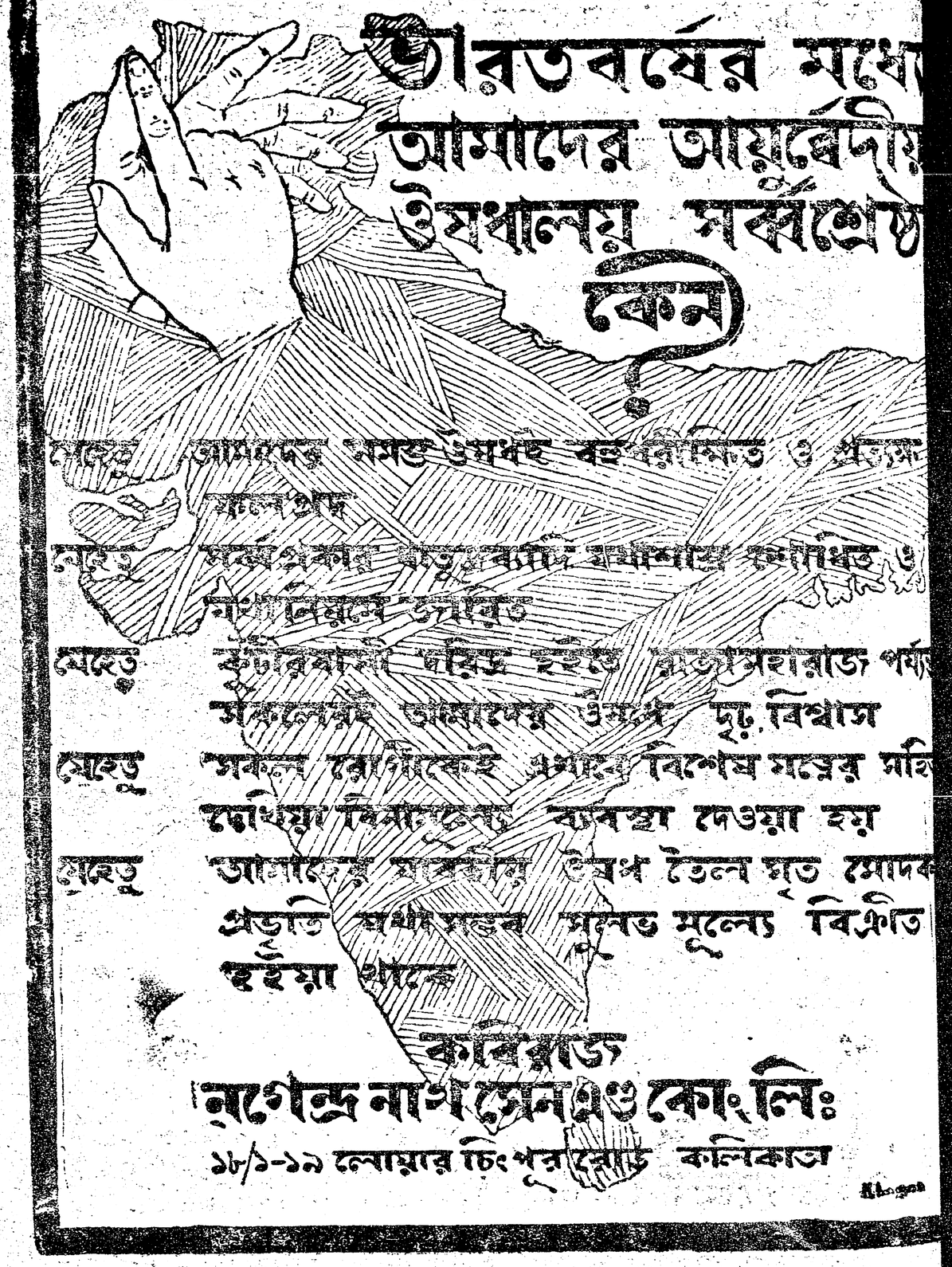

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.
Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, [৮ম, সংখ্যা

১।	বিদায়	শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	২২৫
২।	অশ্রুকণা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	২২৬
৩।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৩৬
৪।	কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ	২৪২
৫।	মংকত মোহিনী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৩
৬।	বিমুক্ত	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	২৫২
৭।	সমালোচনা	... ...	২৫৬

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত 9-4-25

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য
একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!
মূল্য ৮০, ডজন ৭৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।
জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।
হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।
Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible]
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

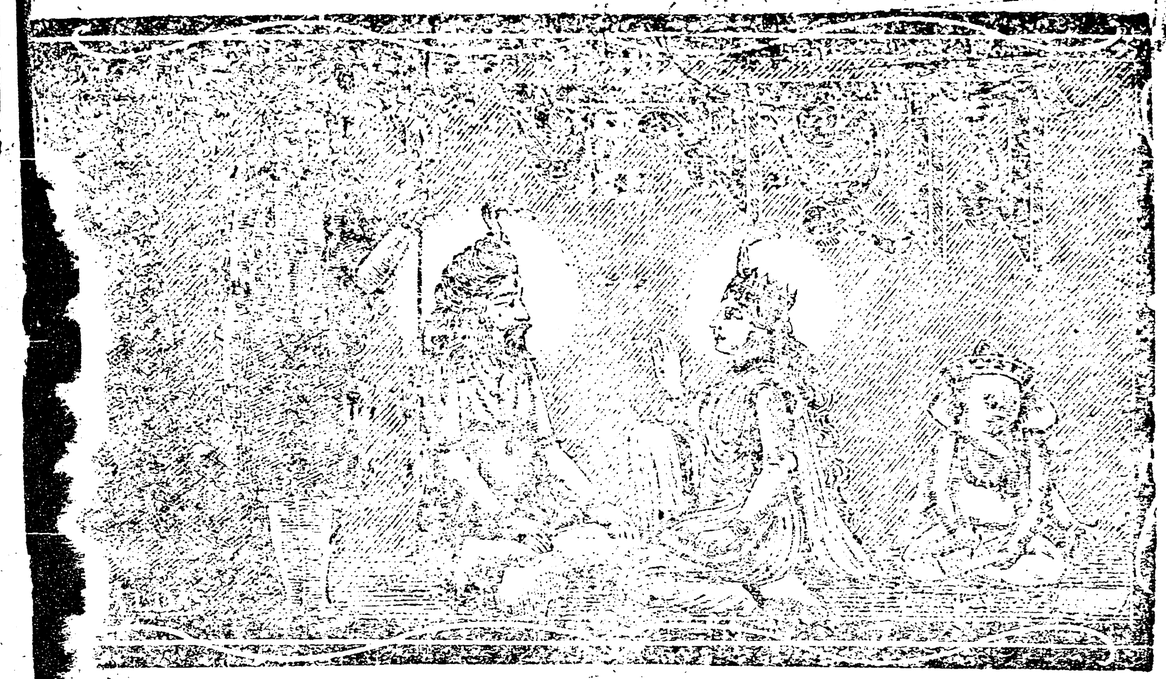

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। | ১৩৩১ সাল, অগ্রহায়ণ | ৮ম, সংখ্যা।

বিদায়।*

লেখক,— শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

যাও বহে সুখে সচ্ছ তটিনী
ঢাল প্রেমভার সাগর বুকে।
না আসিব আর তীরেতে তোমার
চিরতরে ছাড়ি চলিনু তোকে॥ ১

*Lord Tennyson এর 'Flow down cold rivulet to the sea'র পদ্যানুবাদ।

নিঝর হইতে তটিনী হইয়া
কলগান গেয়ে বহিয়া যাও।
তোর বুকে নদী আর না খেলিব
এ জনম তরে বিদায় দাও ॥ ২

শতেক সুখের হাসিবে বক্ষে
শতেক চাঁদিনী যামিনী মেলা।
খেলা ফুরায়েছে তীরেতে তোমার
গেয়ে চলে যাই বিদায় পালা ॥ ৩

অশ্রু-কণা।

লেখক,—শ্রীহরিধন মিত্র।

(১)

"প্রমিদা"!

"কি অশ্রু"?

"জোনাকি পোকাগুলো ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলে আর নেভে কেন বলতে পার'!

প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল—তুমি বলতে পার'?

অশ্রুকণা একটু অপ্রতিভের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'তা ত আমি জানিনা প্রমিদা। তুমি বল না'।

প্রমথ। কেন জ্বলে আর নেবে তা বলা যায় না। তবে ওরা অন্ধকার রাত্রিতে আলো দেয়।

অশ্রুকণা। আচ্ছা প্রমিদা, যে দিন চাঁদ ওঠে সে দিন ওদের তত দেখতে পাইনা কেন?

প্রমথ। ওরা বেশীর ভাগই অন্ধকার রাত্রিতে আলো দিতে গাছের ঝোপ বা গর্ত্ত হতে বাহিরে আসে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ওরা আলো দেওয়া নিরর্থক বিবেচনা করে। তাই তত দেখতে পাওয়া যায় না। তবে গোটাকতক আলো দেয়।

অশ্রুকণা। গোটাকতক আলো দেয় কেন প্রমিদা?

প্রমথ। তারা চাঁদের সঙ্গে গর্ব্ব করে। তারা মনে ভাবে তাদের আলোর জোর বেশী। তাই তারা বেরিয়ে আসে।

কমলপুর গ্রামের একটী খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী কিশোর ও বালিকার মধ্যে উক্ত কথোপকথন হইতে ছিল; এই গ্রামটী ষ্টেশন হইতে কিয়ৎদূরে অবস্থিত। এখানে কলিকাতার মত বৈদ্যুতিক আলো অথবা বৈদ্যুতিক পাখা নাই। মোটর, ট্রাম, অথবা যানাদির অবিশ্রান্ত ঘড় ঘড় শব্দ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধও সৌম্যভাবে পরিপূর্ণ। গ্রামটীর চারিধার ঘন বৃক্ষসমাচ্ছন্ন তাহাতে নানাপ্রকার পাখীর বাসা, কি সকাল কি দুপুর কি সন্ধ্যায় এই সকল বৃক্ষ হইতে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙ্গা, বুলবুল, ঘুঘু ইত্যাদি পাখী গান গাহিয়া সমস্ত গ্রামটীকে মাতাইয়া তুলে। তাহার উপর ঝিঁঝিঁদের গানেরও বিরাম নাই।

গ্রামের পার্শ্ব দিয়া মৃদুমন্দ গতিতে "মধুমতী" নামে একটী স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহমান। উহার উপরই এই গ্রামটী অবস্থিত। এখানে শ্যামল ক্ষেত্র, ফলবান বৃক্ষ ও ফুলভরা তরুলতার অভাব নাই। এখানে বেশীর ভাগ লোকই চাষবাস করিয়া থাকে। এখানে ধান্যের ক্ষেত্রই খুব বেশী দেখা যায়।

গ্রামে বেশীর ভাগই উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস। তবে নিম্নশ্রেণীর কায়স্থের বাসও কম নহে। এখানে কয়েক ঘর কামার, গোয়ালা ও নাপিতের বাসও আছে।

এখানে কোটা বাড়ী অতি অল্প। বেশীর ভাগই খড়ের ও তালপাতার। গ্রামের জমিদার, কয়েকঘর ধনাবান ও মধ্যগৃহস্থের বাটীই ইষ্টক নির্ম্মিত। নিম্নগৃহস্থের একখানি করিয়া খড় অথবা তালপাতার ঘর ও তাহার চতুঃপার্শ্বে তাহাদের কয়েক বিঘা করিয়া জমি আছে। এই জমিতে কেহ ধান্য, কেহ কলায়, কেহ পটল, কেহ আলু, কেহ কপি প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকে। গ্রামের জমিদারকে তাহারা মাসিক কর ও জমির ফসল উপঢৌকন দিয়া থাকে। বৃদ্ধ জমিদার শ্রীদীনদয়াল মিত্র মহাশয় খুব সদাশয় লোক। তিনি অত্যাচারী অথবা করপীড়ক নহেন। তাঁহার গুণে গ্রামের সকলেই বেশ সুখ ও সচ্ছন্দ ভোগ করে। কাহার মনে দুঃখ নাই।

দুঃখ নাই বলিলাম তাহার কারণ জমিদার মহাশয়ের নামের সহিত কার্য্যের অনেকটা সৌসাদৃশ্য ছিল। তিনি সকলের বিপদে মুক্তহস্তে সাহার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার দুয়ার হইতে ভীক্ষার্থী কখনও ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া যাইত না। তিনি কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এবং তিনি

সকলের সুখ ও সচ্ছন্দ বিষয়ে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতেন।

এই সকল কারণে গ্রামে বেশ একটা শান্তি ছিল। সকলেই জমিদার মহাশয়কে ভক্তি করিত। তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রত্যেকেই সকল সময় প্রস্তুত থাকিত। আর তাহারা জমিদার মহাশয়কে দেবতার মত জ্ঞান করিত।

বৃদ্ধ জমিদার গৃহে প্রতি বৎসর মহা সমারোহে দুর্গাপূজা হইত। গ্রামবাসী সকলেই পেট ভরিয়া খাইয়া আনন্দ করিত। ভিন্ন গ্রামাগত অতিথি ও দরিদ্রকে যথেষ্ট দান করা হইত।

জমিদার মহাশয়ের এই সকল গুণ তাহার প্রজাবর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তাহারাও অতিথি ও ভিন্ন গ্রামের যে কোন ব্যক্তিকে সানন্দে স্থান ও আহার দান করিত।

বৃদ্ধ জমিদার মহাশয়ের সংসারে তাহার পৌত্র শ্রী প্রমথরঞ্জন মিত্র ও পুত্রবধূ অমিয়বালা ভিন্ন আর কেহই ছিলনা। প্রমথ যখন পঞ্চম বৎসরের, সেই সময় তাহার পিতা নীরোদরঞ্জন মিত্র একটা সাংঘাতিক অসুখে ইহলোকের দেনা-পাওনা মিটাইয়া যান। সেই অবধি বৃদ্ধ জমিদার দীনদয়াল বাবু ও তাহার পুত্রবধূ অমিয়বালা প্রমথকে তাহাদের বুকভরা স্নেহে লালন পালন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রমথ গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহারা প্রমথকে কলেজে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, বিশ্বস্ত দাওয়ান, পরেশ বাবুর সহিত কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

সেখানে প্রমথ পরেশ বাবুর সহিত একটা মেস ভাড়া করিয়া থাকিত ও লেখাপড়া শিক্ষা করিত। ছুটী হইলেই গ্রামে আসিত।

জমিদার মহাশয়,—তাহার পুত্রবধূ না থাকিলে প্রমথকে কখনই কলিকাতায় প্রেরণ করিতেন না। কেন না তাহা হইলে তিনি স্বজন হীন হইতেন। এবং তাহার পক্ষে এই বৃদ্ধাবস্থায় কালাতিপাত করা অসম্ভব হইত। কিন্তু তিনি তাহার পুত্রবধূকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। এবং প্রমথর অনবস্থিতি, তাহার সবটুকু স্নেহ অমিয় বালার উপরই পড়িত। তাই তিনি কোন রকমে কাল কাটাইতেন।

আর এক কথা,—দীনদয়াল বাবু প্রমথকে উচ্চ লেখাপড়া শিক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল এবং পাছে তাহার এই শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়ে নিজে, প্রমথর অনবস্থান-হেতু কষ্ট, সহ্য করিয়া চলিতেন।

প্রমথ কিছুদিন হইল কলিকাতার সিটী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গ্রামে আসিয়াছে। শীঘ্রই আবার উক্ত কলেজে বি, এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাইবে।

প্রমথ রঞ্জনের বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর হইবে। প্রমথ চরিত্রবান, ধীর অধ্যবসায়শীল ও কার্য্যক্ষম। তাহার মুখখানি উজ্জ্বল দীপ্যমান ও তাহাতে দৃঢ়তার চিহ্ন বর্ত্তমান। তাহারও সহিত তাহার দাদামশয়ের প্রত্যেক সৎগুণগুলির সংযোগ ছিল। তাহাকে যে দেখিত সেই ভালবাসিত।

(২)

নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর অশ্রুকণা বলিল, "চল প্রমিদা রাত্রির হয়ে যাচ্ছে, বাড়ী যাই।"

"চল।"

উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিল।

অশ্রুকণা। আচ্ছা প্রমিদা জোনাকীগুলো অত ছোট ছোট থাকে কেন? ওরা কি বড় হয় না?"

প্রমথ। হুঁ। তবে ওরা বেশী বড় হয় না।

অশ্রুকণা। কেন প্রমিদা?

প্রমথ। ওরা বেশী দিন বাঁচে না। অনেক দিন বাঁচলে বোধ হয় বড় হতে পারত। তার ওপর ভগবান ওদের যে রকম বাড় নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ওরা তার চেয়ে কোন রকমেই বড় হতে পারে না।

অশ্রুকণা। ওরা কামড়াতে পারে প্রমিদা?

প্রমথ। না। (পরক্ষণেই একটু হাসিয়া বলিল) আচ্ছা অশ্রু যদি অনেক গুলো জোনাকীপোকা ধরে মালা গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দিই ত বেশ হয় না?

অশ্রুকণা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"না প্রমিদা ওদের ছেঁদা করে সুতোয় গাঁথতে গেলে ওরা যে মরে যাবে প্রমিদা!"

প্রমথ। কে বল্লে মরে যাবে? ওরা গলার মালাতে ঝিকমিক করে জ্বলবে! বেশ দেখতে হবে!

অশ্রুকণা। গম্ভীর ভাবে বলিল, "না প্রমিদা ওরা ঠিক মরে যাবে। আর জ্বলবেও না নিববেও না।

প্রমথ বালিকার সরলতাপূর্ণ যুক্তিতে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কে বল্‌লে ?"

অশ্রুকণা। ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "আমি জানি।"

প্রমথ। কে তোমায় বল্‌লে ?

অশ্রুকণা। আমি জানি প্রমিদা মরে যাবে! তার চেয়ে ফুলের মালা গাঁথাই ভাল।

প্রমথ অশ্রুকণার দিকে সহাস্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, অশ্রু তুমি যদি ফুলের মালা গাঁথ ত কার গলায় পরিয়ে দেবে ?

অশ্রুকণা যেন ইহার কোন উত্তর খুজিয়া পাইল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রমথ। তোমার বরের গলায় না ?

অশ্রুকণা নলাজ হাসি হাসিয়া বলিল, "ধ্যেৎ তা বুঝি।"

প্রমথ। তবে কি ?

অশ্রুকণা। তোমার গলায় পরিয়ে দোব।

প্রমথ। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন আমি কি তোমার বর ?

অশ্রুকণা। যাও প্রমিদা আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ব না।

প্রমথ। না না আর বল্‌ব না।

অশ্রুকণা বালিকাসুলভ চপলকণ্ঠে বলিল, "প্রমিদা একটা কথা মনে পড়েছে—কতবার মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছি তুমি আমাকে কোনদিনও মালা গেঁথে পরিয়ে দাওনি। আচ্ছা আচ্ছা! এবার কিন্তু আমায় একছড়া মালা গেঁথে দিতে হবে প্রমিদা।"

প্রমথ। আচ্ছা।

অশ্রুকণা। প্রমিদা তুমি আর কলকাতায় যেও না কিন্তু। এখানে আমাদের কেমন বেড়ানো হয়।

প্রমথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা পাগলি যা হোক। আমাকে পড়তে যেতে হবে না।"

ভারি গলায় অশ্রুকণা বলিল, "আবার কবে কলকাতায় যেতেহবে প্রমিদা ?"

প্রমথ। শীগ্‌গীর!

এইরূপ নানা প্রকারের কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাড়ীর নিকট আসিয়া পহুছিল।

প্রমথ বলিল, "অশ্রু তুমি বাড়ী যাও। আজ আর আমি তোমাদের বাড়ী যাব না। আজ একটু বিশেষ কাজ আছে।"

অশ্রুকণা "আচ্ছা কাল যেও" বলিয়া আপনাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। প্রমথও আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য উভয়েরই বাড়ী কমলপুর গ্রামে ও খুব কাছাকাছিও বটে।

(৩)

দিবাকর সবিশেষ ক্লান্ত হইয়া আলোক ছটায় আকাশে লাল, নীল, হরিৎ ধুসর ইত্যাদি ছোট বড় নানারকমের মেঘ রাখিয়া পশ্চিমগগনে বিশ্রামের জন্য ঢলিয়া পড়িলেন। অদূরে বেগবতী মধুমতী সূর্য্যাস্তের কনককিরণ গায় মাখিয়া প্রবাহিত হইতেছিল—কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গাঘাতে ছল ছল শব্দ শোনা যাইতেছিল। এপারে শ্রেণীবদ্ধ বনের গাঢ় অন্ধকার আর ওপারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর খানিকটা আলো পড়িয়াছে—সেইটুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যাইতেছিল না। এপারে নিশাদেবী তাঁহার আঁধার রাজত্ব বিস্তার করিতে একান্ত ব্যস্ত, আর ওপারে এক বিচিত্র রহস্যময় স্বপ্নের দেশ প্রতীয়মান হইতেছিল।

ক্লান্তিবশতঃ মলয়ের আর সে বেগ ছিল না—সে ছুটাছুটি করিতে একান্ত অক্ষম হইয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। পাখীরা ক্লান্ত হইয়া স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আনন্দসূচক কলরব লাগাইয়া দিল।

এমন সময় গৃহপার্শ্বস্থিত উদ্যানে একটি দীর্ঘকায় পুরুষ বসিয়া চাপা গলায় গাহিতেছিল,—

"ওপারে নূতন দেশে
সবই মধুর সবই ভালো,
এ পারে প্রাচীন দেশে
সবই আঁধার কালো!
ও পারে নিয়ত সুখ
ও পারে নিয়ত হাসি,
এপারে নিয়ত দুঃখ
নিয়ত বেদনা রাশি,

এপার আঁধারে ঘেরা
ওপারে চাঁদের আলো।”

কিছু দূরে তাহার মধ্যমকন্যা অশ্রুকণা রঙ বেরঙের ফুলের একছড়া মালা গাঁথিয়া ছোট ভাই অবনীর গলায় পরাইয়া সহর্ষে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, “ভাই অবু! তোকে বেশ দেখাচ্ছে।” অবু হাসিতে হাসিতে দিদির গড়া ফুলের মালাছড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, “বাঃ দিদি বেশ মালা গেঁথেছ ত!”

উপরি উক্ত দীর্ঘকায় পুরুষটীর নাম জীবনবাবু। ইহার পুরা নাম শ্রীজীবনচন্দ্র ঘোষ। জমীদার দীনদয়াল বাবুর বাটীর অনতিদূরে ইহার বাটী। ইনি প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কোনও সুপ্রসিদ্ধ উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখন retired হইয়া নিজ ক্ষুদ্র জমিজমা সংক্রান্ত কর্ম্ম দেখিতেছেন। ইহার আয়ও মন্দ নহে, Pension আছে, তাহার উপর জমিজমা হইতেও আয় হয়।

জীবনবাবুর পিতা ৺রমণীমোহন বাবু দীনদয়াল বাবুর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। নানা কারণে এই দুই পরিবারবর্গের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে। সেই জন্য জীবনবাবুর কলিকাতায় অবস্থানের সময় দীনদয়ালবাবু তাঁহার সংসার দেখিতেন ও বিষয়কর্ম্ম চালাইতেন।

জীবনবাবুর স্ত্রীর নাম নীহারবালা। নীহার বালার পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। সেই কারণে নীহারবালা অপেক্ষাকৃত ধনবান স্বামীর হস্তে পড়িয়াও গর্ব্বে মত্তা হন নাই। নীহারবালা ঝি, চাকর রাখা পছন্দ করিতেন না। এটা তাঁহার কৃপণতা নহে, এটা তাঁহার দরিদ্র পিতার নিকট হইতে লব্ধ গুণ। তাই তিনি রান্নাবান্না, ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি গৃহের সকল কর্ম্মই নিজ হাতে সম্পন্ন করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ হাস্যপ্রিয়া চতুরা ও মিষ্টভাষিণী।

জীবনবাবুর উপস্থিত দুই কন্যা ও এক পুত্র। কন্যা দুইটী বড় ও পুত্রটী ছোট।

বড় কন্যা কিরণমালার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। সে সংসারের কর্ম্মে বেশীর ভাগ ব্যাপৃতা থাকে। বড় একটা অশ্রুকণা অথবা অবনীর সঙ্গে খেলা করে না।

কিরণমালার বোন অশ্রুকণার বয়স দ্বাদশ বৎসর। অশ্রুকণা অশ্রুর মত কোমল ও স্নিগ্ধ ছিল। তাহার বাল্যের চঞ্চলতা এখনও খুব কমে নাই।

এখন সে তাহার ছোট ভাই অবনীর (অবুর) সঙ্গে ‘খেলাঘর’ অথবা ‘চাড়ি-ভাতি’ অথবা ‘পুতুলের বিয়ে’ খেলা করে। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই সব খেলা তাহারও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সে এখন সংসারের অনেক কর্ম্মেই মাতার ও দিদির সাহায্য করিয়া থাকে। তার উপর সে এখন সুশিক্ষিতা জননীর নিকট Royal English Reader Childrens Poems নামক দুই খানি ইংরাজি পুস্তক ও আখ্যানমঞ্জরী (তৃতীয় ভাগ) চরিতাবলী ও পদ্য কুসুম নামক তিনখানি বাঙ্গালা বই পাঠ করিতেছে। সে কিছু কিছু গানও গাহিতে পারে।

ছোট ভাই অবুর বয়ঃক্রম আট বৎসর। সে গ্রামে একটী স্কুলে লেখাপড়া শিখিতেছে।

ইহা ভিন্ন জীবনবাবুর অশ্রুর পরেই স্বর্ণলতা নামে দশ বৎসরের আর একটী কন্যা ছিল, সে আজ প্রায় নয় মাস হইল কলেরা রোগে তাহার জীবনের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়াছে।

(৪)

দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

প্রমথ এবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া চৈত্র মাসে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। দীনদয়ালবাবুর এখন প্রমথর হস্তে একটী সুন্দরী কন্যা সমর্পণ করিয়া ও তাহারই উপর জমিদারী সংক্রান্ত ভার দিয়া সাংসারিক চিন্তা হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিবার একান্ত ইচ্ছা, তিনি তাহাকে আর এম, এ পড়াইতে চাহেন না।

প্রমথ দাদামহাশয়ের মনোভাব অবগত হইয়া আর পড়িতে ইচ্ছুক নহে। সে এক বার এম, এ, পড়িতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দাদামহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আর পড়িবে না ঠিক করিয়াছে। তবে সে বিবাহ করিতে ততটা রাজী নহে। প্রমথর মাতা অমিয়বালাও আর প্রমথকে কলিকাতায় পাঠাইতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারও ইচ্ছা প্রথম ঘরে থাকে ও বিবাহ করিয়া সংসার ও জমিদারি সংক্রান্ত ভার গ্রহণ করে।

* * * *

দ্বিতলের একখানি ঘরে দীনদয়ালবাবু স্নানান্তে আহারে বসিয়াছেন। ঘরখানি নিতান্ত ছোট নহে। ঘরটীতে একটী পালিশ করা ড্রয়ার, আলমারি ও খাট আছে। ইহা ব্যতীত ছোট টুলের উপর একটী ট্রাঙ্ক ও ঘরের কোণে একটী লোহার সিন্ধুক আছে। একটী আলনা হইতে একখানি থান, একখানি

উড়ানো ও তোয়ালে ঝুলিতেছে। ঘরের মধ্য কড়িকাঠ হইতে একটি কাঁচের বিলাতী ঝাড় লম্বমান রহিয়াছে। মোটের উপর ঘরটি বেশ পরিষ্কার ও ঝরঝরে অধিকন্তু সজ্জিত।

এইটী দীনদয়াল বাবুর কক্ষ। তিনি এই ঘরেই আহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীনদয়াল বাবু আহারে বসিয়াছেন। পাচিকা আহার্য্য দ্রব্য দিয়া যাইতেছে। কিছু দূরে একটা বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া অমিয় বালা তাঁহার শ্বশুরের আহার দেখিতেছেন। এমন সময় দীনদয়াল বাবু বলিয়া উঠিলেন, "দেখ লক্ষ্মী মা এইবার প্রমথর একটা উপায় করা উচিত। আমি আর কত দিন।"

অমিয়বালা। আপনি কি উপায়ের কথা বল্‌ছেন?

দীনদয়াল। উপায় আর কি, আমি বল্‌ছি প্রমথর বে দিয়ে তার হাতে জমিদারীর ভার দিই। সে উপযুক্ত হয়েছে। বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। তার উপর সে আমার বংশের তিলকস্বরূপ। তার এইবার জমিজমা বুঝে নোয়া উচিত। আর এক কথা, আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আমি আর এখানে কতদিন বা আছি। মর্‌বার আগে প্রমথর বে না দিলে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পার্‌ব না।

অমিয়বালা শান্ত নম্র কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন তাই করুন, তবে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে ওসব কথা বল্‌বেন না, আমার বড় কষ্ট হয়। আমি কিছুতেই আপনাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।"

দীনদয়ালবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা পাগ্‌লি মেয়ে! আমি কি এখনই মর্‌ছি নাকি যে অত ভাবনা!

অমিয়বালা কোন উত্তর দিলেন না, বাতায়ন পথে বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।

দীনদয়ালবাবু আবার বলিলেন, "যাক্ ওসব কথা! এখন প্রমথর বিয়ের কি কর্‌ব তাই বল।"

অমিয়বালা। আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন তাই করুন।

দীনদয়াল বাবু। ভাল বিবেচনা করা করি নয়, আমি এ বিষয়ে তোমার স্পষ্ট মত জান্‌তে চাই।

অমিয়বালা। আমার কি আপনার বিরুদ্ধে মত হতে পারে?

দীনদয়াল। তাহলে তুমি রাজি আছ ত বৌমা?

অমিয়বালা। বাবা আমি একশ বার রাজি আছি। প্রমথর বে'র কথা শুনে আমার মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। তবে তার বিয়েতে ততটা মত নেই।

দীনদয়াল। না তার অমত হবে না। আমরা বল্‌লেই রাজী হবে। কখনই কথা অগ্রাহ্য করবে না।

অমিয়বালা আর কিছু বলিলেন না।

এদিকে দীনদয়াল বাবু আহার সম্পন্ন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

(৫)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীনদয়াল বাবুদের সহিত জীবনবাবুদের বেশ একটা পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটিতে গৃহে আসিলেই জীবনবাবুদের বাটীতে আসিত। জীবনবাবুর পরিবার নীহারবালা কন্যা কিরণমালা ও অশ্রুকণা এবং অবু তাহাকে অতিশয় ভালবাসিত। প্রমথও তাহাদিগকে আপনার ভাই ভগিনীর মত ভাল বাসিত।

এই প্রমথই ছেলেবেলায় কতদিন গিয়াছে, অশ্রুকণার হাত ধরিয়া তাহাদের গ্রামের মধুমতী নদীটীর পার্শ্বে বিচরণ করিয়াছে। এমন কত দিন গিয়াছে প্রমথ ও অশ্রুকণা চড়িভাতি রান্না করিয়াছে। এমন কতদিন গিয়াছে অশ্রুকণা বাগানে ফুল তুলিয়া, ফুলের মালা গাঁথিয়া, তাহা প্রমথর গলায় পরাইয়া দিয়াছে। এমন কতদিন গিয়াছে, বালিকা প্রমথর উপর অভিমান করিয়া "যাও তোমার সঙ্গে আড়ি আর আমার সঙ্গে কথা বলো না" ইত্যাদি বলিয়া আবার আপনিই সাধিয়া কথা বলিয়াছে। মোট কথা বলিতে গেলে তাহাদের দুজনার প্রাণেই একটা নির্ম্মল ভ্রাতৃস্নেহ শিশুকাল হইতেই জাগ্রত ছিল।

প্রমথ যখন কলিকাতায় থাকিত, মধ্যে মধ্যে সেই বালিকার সহিত খেলা, তাহার ফুলের মতন মধুর হাসি, তাহার সেই গভীর অভিমানের কথা ভাবিত। কি একটা মহা আনন্দ তাহার হৃদয় খানি ভরিয়া উঠিত। কিছুই বুঝিতে পারিত না।

বুঝিতে না পারিলেও প্রমথ গৃহে আসিলেই অশ্রুকণাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। অশ্রুকণাও তাহাকে দেখিয়া নাচিয়া উঠিত। হাসিতে হাসিতে বলিত, "প্রমিদা আজকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে?"

অশ্রুকণা বেড়াইতে বড় ভালবাসিত। প্রমথ ইহা জানিত বলিয়া সহাস্যে উত্তর দিত, "হাঁ নিয়ে যাব।"

কখন অশ্রুকণা বলিত,—"প্রমিদা, অবুকে নিয়ে যেও না। ও বড় দুষ্টু হয়েছে। আমি ওকে অত ভালবাসি ও কিন্তু রাতদিন আমার সঙ্গে একটা না একটা ছুতো নিয়ে ঝগড়া করে।"

প্রমথ বলিত, "তবে অবু তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব না।"

অবু অমনি সগর্ব্বে বলিত, "বড় বয়ে গেল আমি যেতে চাই না।"

প্রমথ অবুকে যখনই এইরূপ সামান্য মিথ্যা তিরস্কার করিত, তখন বালক অবু প্রায়ই হাসিতে হাসিতে বিদ্রূপচ্ছলে আর একটা কথা বলিত, "ওগো সবাই শোন প্রমিদা মেজদির বর।" এই কথা বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিত।

অশ্রু লজ্জায় একটু অভিভূত হইয়া অমনই অবুর গায়ে একটা চড় মারিয়া বলিত, "দূর পোড়ার মুখো ও তোর বর!"

সরল বালক অবু দিদির কাছ হইতে চড় খাইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া আবার বলিত,—"প্রমিদা মেজদিকে বড় ভালবাসে। প্রমিদা মেজদির বর।"

অশ্রু অবুকে ধরিবার জন্য আগাইয়া আসিলেই চঞ্চল অবু একছুটে আরও দূরে সরিয়া যাইত।

বালিকা অবুর সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া যখন তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিত না, তখন বলিত, "আচ্ছা রোস্ মাকে বলে দেব অবু খালি আমার সঙ্গে ইয়ারকি করে।"

ক্রমশঃ

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নবম অংশ।

ইহা কহিয়া সাধক কহিলেন আমি আর এক মহাত্মার যৌবনে সংসার ত্যাগ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া মৃগচর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুবর্ণনির্ম্মিত পানপাত্রের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পানপাত্রে

তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তুমি ভক্তিরস পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতময়ী কথা শুনিয়াছ। যে মহাত্মার কথা বলিতেছি, তিনিই ভাগবতের টীকাকার। তাহার ব্যাখা ব্যতীত ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অবধারণে কেহই সমর্থ ছিলেন না তাঁহার নাম শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী। প্রবাদ আছে শ্রীধর স্বামীর পিতা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক মদ্র দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর গর্ভবতী হইবার সময় অতীত হইলে তিনি পত্নীর সহিত পবিত্র কাশীধাম বাসের অভিপ্রায় করেন। তদনুসারে তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া সুদূর কাশীধাম যাত্রা করেন। দক্ষিণাত্য হইতে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে আগমন সময়ে তাঁহার পত্নীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া উপাস্য দেবতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, 'কৃপাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার পত্নীর গর্ভ ক্রমে পূর্ণ কলেবর ধারণ করিতে লাগিল। সাধ্বী রমণী গমনে অশক্তা হইলেও আহ্লাদের সহিত পত্নীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক বিস্তীর্ণ অরণ্য পার হইতেছেন এমন সময় তাঁহার পত্নীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি পত্নীর সহিত এক বৃক্ষতলে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পত্নী এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। ব্রাহ্মণ বহুযত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া বুঝিলেন তাহার পত্নী জীবিত নাই। তিনি সেই ভীষণ সময়ে সত্ত্বগুণ প্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পত্নীর পার্শ্বস্থিত জীবিত সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিরূপে তাহার জীবন রক্ষা হইবে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন, গাছের ডাল হইতে একটী টিকটিকির ডিম পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহা হইতে বাচ্ছা বাহির হইল। তিনি বাচ্ছটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহারও তাহার সদ্য প্রসূত সন্তানের অবস্থা একরূপ ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন, গাছের ডাল হইতে একখণ্ড উইমেকা পড়িয়া তাহা হইতে কয়েকটী উই বাহির হইয়া বাচ্ছাটীর মুখের নিকট উপস্থিত হইল। বাচ্ছাটী সেইগুলি ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিল। শ্রীধর স্বামীর পিতার তদ্দর্শনে নয়নে প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা সমুদয় জীবের রক্ষাকর্ত্তা! তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। যিনি এই বালকের জীবন দান করিয়াছেন তিনিই ইহার জীবন রক্ষার উপায় করিবেন। ইহা ভাবিয়া তিনি একটী [illegible] লইয়া [illegible] শ্লোকটী লিখিলেন—

যেন শুক্লা কৃতা হংসী শুকাস্য হরিতা কৃতা।
ময়ুর চিত্রিতা যেন তেন রক্ষাং বিধাষ্যতি॥

তদন্তর তিনি ভূজ্জপটীর উপর বালকের মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক মৃতপত্নী ও জীবিত বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ইত্যবসরে সেই দেশের অধিপতি মৃগয়া উদ্দেশে বনমধ্যে আসিয়া সদ্য প্রসূত বালকের ক্রন্দন শব্দ শ্রবণে তথায় আসিয় উপস্থিত হইলেন। পূর্ণ শশধর সম বালককে ভূমে পতিত ও প্রসূতিকে গতাসু দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অনুগামীদিগকে রমণীর মৃতদেহ সৎকারের অনুমতী দিয়া বালককে গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্টে দ্রুতপদে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি যে রূপে সেই পুত্ররত্নকে বনমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন. তাহা মহিষীর নিকট বর্ণন করিলেন, পুত্ররূপে পালন করিবার জন্য পুত্রটীকে মহিষীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। রাজা ভূজ্জপত্র লিখিত সেই শ্লোকটী তাম্র ফলকে লিখিয়া নিজ প্রসাদ উপরে লম্বিত রাখিলেন। বালক রাজভোগে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, রাজার পরলোক গমনের পর রাজা হইয়া সর্ব্বজন প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদা তাঁহার জন্মদাতা ঘটনা ক্রমে তাহার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বলিখিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী প্রসাদ উপরে খোদিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার কৌতুহল জন্মিল। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নির্জ্জন কাননে পরিত্যক্ত বালকের মুখ প্রতিমা মধ্যে মধ্যে তাহার মনোমধ্যে উদয় হইত। এখন যৌবনে পূর্ণ বিকসিত মুখপদ্ম তাঁহাকে অতিবড় বিচলিত করিয়া তুলিল। পুরাতন কবিগণ আত্মাকে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতি পুত্র রূপে পত্নীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পত্নীর নাম জায়া। এক্ষণে নিজ আত্মার রূপান্তর মাত্র রাজসিংহাসনে দেখিয়া, এবং সেই পুত্রকে যে অবস্থায় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া তাহার মনে হর্ষ, বিষাদের আবির্ভাব হইল। রাজারও হৃদয় আগন্তুকের প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হইল। নরপতি তাহাকে যথাযোগ্য আসন প্রদান পূর্ব্বক নাম ধাম ও তাহার নিকট আগমনের কারণ অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ স্নেহাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার নিকট একটী প্রার্থনা আছে, প্রার্থনা অতি সামান্য, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। রাজা কহিলেন, আপনার দর্শন মাত্রেই আমার আত্মা প্রফুল্ল হইয়াছে। নিশ্চয় আপনি আমার হিতার্থে আগমন

করিয়াছেন। আপনার প্রার্থনা আপাততঃ যতই অপ্রীতিকর হউক তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।" শ্রীধর স্বামীর পিতা কহিলেন, "আমি আপনার মাতার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। তাঁহাকে কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিব।" রাজা তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ মাতার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! জনৈক প্রিয়দর্শন পরিব্রাজক আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন।" জননী ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলে শ্রীধর স্বামীর পিতা বৃদ্ধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "মা! বর্ত্তমান নৃপতি কি আপনার গর্ভজাত সন্তান? আপনি আমার কথার প্রকৃত উত্তর দিবেন, আপনার পুত্রের শ্রেয়োলাভ হইবে।" রাণী তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ রাজা যেরূপে বর্ত্তমান নৃপতিকে বনমধ্যে পাইয়াছিলেন তাহা যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার নিকট আসিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার ঔরসজাত সন্তান। আমি তোমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতিপালনের ভার বিধাতার উপর দিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।" রাজা জন্মদাতার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন ব্রাহ্মণ কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পুত্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। শ্রীধর স্বামীর আত্ম বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর কি এক মনের বিকার উপস্থিত হইল। তিনি রাজভোগ ও রাজ সিংহাসনকে অতি তুচ্ছ বোধ করিতে লাগিলেন। একদা গভীর রাত্রে তিনি রাজ ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বেশে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন পণ করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। মর্ত্ত্যলোকে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিবার শ্রীধর উপযুক্ত পাত্র এই বিবেচনা করিয়া ভগবান ব্যাসদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "আমি ব্যাস. আমি তোমাকে কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহদেবের ইচ্ছায় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ভাগবতের প্রকৃত অর্থ প্রচার কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। শ্রীধর স্বামী ভগবান ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা রচনা ও সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকৃত টীকা সমাপ্ত হইলে কাশীধামস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট পঠিত হয়। তাঁহারা তাহা অপদার্থ বলিয়া অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা পুস্তকখানি অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেও দগ্ধ হইল না দেখিয়া পণ্ডিত

মণ্ডলী তাহা সাবগর্ভ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামী অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহা কহিয়া সাধক পুনশ্চ কহিলেন, "বিশু! প্রৌঢ়ে অকস্মাৎ বৈরাগ্য উদয়ের তুমিই এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। আমার সুমধুর সঙ্গীত প্রভাবে তোমার চিত্ত বিকার উপস্থিত হয় নাই, একথা নিশ্চয় জানিবে। ইহা তোমার জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। বরিষার কালে যেমন মেঘমালা যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হয় সুকৃতিই তেমনি সময়ে আসিয়া ফলবতী হয়। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ, তোমার বৈরাগ্যের নিমিত্ত মাত্র। সেই ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় তোমার পূর্ব্ব অনুচরগণ সকলেই আমার সঙ্গীত শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের তাদৃশ বিকার উপস্থিত হয় নাই, কেবল মাত্র তুমিই জন্মান্তরের সুকৃতি বলে মুগ্ধ হইয়াছিলে, আমাতে তোমার মা কালীর আবির্ভাব দৃষ্টি করিয়াছিলে। দেখ বিশু! একই কথা এক সময়ে অনেকের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে, কিন্তু হৃদয়ের গভীরতা ও অধিকারিত্ব অনুসারে সেই বাক্য বিবিধ ব্যক্তি দ্বারা বিবিধ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার মুখের কালী নাম তুমি অধিকারী হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। সেই কালীনাম তোমার সুকৃতি বলে তোমার অন্তরে ফলবান হইয়াছে। এখন তুমি সাধনার অধিকারী হইয়াছ, সাধনার পথে অগ্রসর হও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাধনার ফলে তোমার আত্মার জন্মান্তরের কলুষ আবরণ ক্রমে ছিন্ন ও দূরীভূত হইবে।" ইহা শুনিয়া বিশু কহিলেন, 'ঠাকুর! আমিত আমার সুকৃতি দেখতে পাই না। আপনার বাক্য বেদ বাক্য, সুকৃতি আছে, কর্ম্ম আছে, কর্ম্ম ফল আছে, কিন্তু আমি দেখছি আমার বিধাতা আপনি। এমন সাক্ষাৎ আনন্দদাতাকে ছেড়ে আমার সুকৃতি বলে আমি আনন্দ পথের পথিক হয়েছি, এ বিশ্বাস কর্ত্তে আমার প্রবৃত্তি হয় না সে বিশ্বাসসে অহঙ্কার আছে পাপ আছে। মা বাপ ছেলেকে লালন পালন করেন, লেখাপড়া সেখান জ্ঞান দেন ছেলে যদি বড় হয় বলে আমার সুকৃতি বলে আমি মানুষ হয়েছি, সে ছেলে কত বড় দুর্জ্জন? ঠাকুর! তুমি যে আমার সুমতি কুমতি সুকৃতি কুকৃতি দাতা। আমি আপনার পায়ে ধরে পড়েছি, যেখানে যান পায়ে করে নিয়ে যেতে হবে।" সাধক কহিলেন, "না হে বিশু! সুকৃতি মানিতে হয় তবে সুকৃতির ভরসা করিতে নাই কারণ তাহা অদৃষ্ট। তুমি আপনার বিবেক বুদ্ধিকে বিমলা আনন্দময়ীতে সমর্পণ করিয়া বিবেক বুদ্ধির নিয়োগ মত কার্য্য করিবে তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

বিশু কহিলেন, "ঠাকুর! আপনিই আমার বিবেক বুদ্ধি। আপনার সংসর্গে আমার নিতান্ত কলুষিত আত্মার ভাবান্তর ঘটেছে। আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি আমার যা কিছু আছে, সব আপনি। সংসার সাগর উদ্ধারের কর্ত্তা আপনাকে ধরে দাঁড়িয়েছি আমি আপনাকে ছাড়বোনা। আমার উদ্ধারের উপায় আপনাকে কর্ত্তেই হবে।" বিশুর কথা শুনিয়া সাধক কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জগদম্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "শোন বিশু! যদি ভরসা করিতে হয় তাহা হইলে নিত্য বস্তুর ভরসা করিবে। মানুষ মূর্খতা বশতঃ মানুষের ভরসা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ অসীম শক্তির শরণাপন্ন হও, সাধনা কর, নিশ্চয় ফল লাভ করিবে। আমি নিত্য নয়, আমি দেখিতেছি আমার পরমায়ু কাল শেষ হইয়াছে। আমি শীঘ্র ইহধাম পরিত্যাগ করিব। সাধকের কথা শুনিবামাত্র বিশু ভীত নয়নে তাঁহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার মাথায় যেন শত বজ্রাঘাত পতিত হইল। বিশু জানিতেন ঠাকুরের মুখ হইতে কখনও মিথ্যা বাক্য বাহির হয় না, তিনি নিশ্চয় শীঘ্র তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। বিশু সজল নয়নে কহিলেন, 'ঠাকুর সেকি! আপনি আমাদিগকে ছেড়ে যাবেন। আমরা কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকবো। সুখে, দুঃখে সব সময়ে কার মুখ চেয়ে প্রাণ জুড়াবো।" ঠাকুর কহিলেন, "বিশু! যাহার মুখ চাহিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে সেই অমূল্য রত্ন তোমার মা কালী তুমি সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা করিয়া থাক। তুমি আমাকে তোমার মা কালীতে লীন দেখিবে, তাহা হইলেই তোমাকে আমার বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যদি তোমার মনের বাসনা জানাইতে ইচ্ছা হয় তুমি অন্তর্যামিনী চৈতন্যরূপিণীকে জানাইবে। যদি তোমার সুখালাপের প্রয়োজন হয়, তুমি হৃদয়বাসিনী সস্মিত বদনার সহিত সুখালাপ করিবে। যদি তোমার সখার অভাব হয় তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যিনি তোমায় সর্ব্বদা হৃদয়ে আছেন তিনিই তোমার একমাত্র প্রিয়বন্ধু বলিয়া জানিবে। ছি ছি বিশু! তুমি জগদম্বার দাস, মানুষের বিয়োগ যন্ত্রণায় তোমার হৃদয় ব্যথিত হইবে।" সাধক পুনশ্চ কহিলেন, "শোন বিশু! তোমাকে আর এক কথা বলিয়া রাখি, তুমি আমার অবর্ত্তমানে এ আশ্রম ত্যাগ করিও না। তুমি কোটালহাটে অবস্থান করিয়া জগদম্বার সাধনা করিবে। তীর্থ পর্য্যটন সরিৎ সমুদ্র শৈব সম্ভবা বসুন্ধরার সন্দর্শনে বিশ্ব জননীর অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ দেখিয়া শরীর ও মন প্রফুল্ল হয় সত্য কিন্তু তুমি আমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া আশ্রম ত্যাগ

করিলে সে সুখে বঞ্চিত হইবে।” ইহা কহিয়া সাধক তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলেন। বিশুর শোকাবেগ গুরুতর হইয়াছিল। তিনি গদ্ গদ্ কণ্ঠে কালী কালী বলিয়া জগদম্বার পাদপদ্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু।

ঘুট্ ঘুটে আঁধারে
ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না।
নিরীহ পাদপে
পবনের ভৎর্সনা॥
মিট্ মিটে আকাশে
খিট্ খিটে তারকা
দূরে দূরে বিচ্ছেদে
ক্রন্দনে যথী যথা।
টিপ্ টিপ্ শিশিরে
ধৌত কাননে।
হাস্নাহানা বিরাজে
গৌর আননে।
ভেসে আগে গন্ধ
মন্দ মন্দ—
গুঞ্জিত অলিকুল
পরিমল অন্ধ।
টুক্‌টুকে জবাফুলে
ভক্তির সঞ্চার।

উজ্ বুকে দেবভাব
দেব-দেবতার।
ভোর হলে ঝরে যাবে
ঠাকুরের চরণে,
হাসি মুখে বরে লবে
আপনার মরণে।
পাগলা চক্ষের নেই ঘুম
আঁখি পাত,
কৃষ্ণপক্ষের “তৃষ্ণ” দৃষ্টি
সারারাত॥

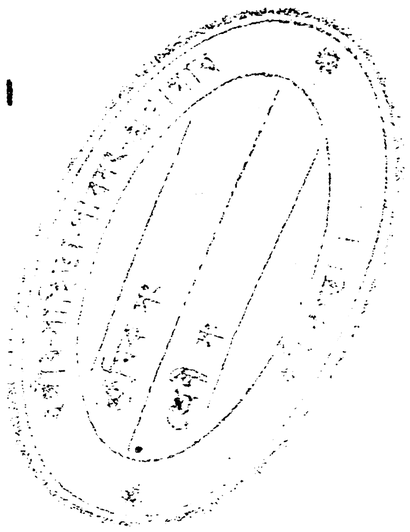

মরকত-মোহিনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সমর নাথ।

রাজা সম্মুখদ্বারে পদার্পণ করিবা মাত্র দশহস্ত দূর হইতে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া পাগল তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল; কেমন এক প্রকরে বিকৃত স্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, হোঃ—হোঃ ?—রম্ভা, মহারাজ, রম্ভা ?—বি—বি বি—বিজয় মাধব—হাঁ,—রম্ভা মহারাজ,—বি—বি—বি বিজয়? মরকত মহারাজ, রম্ভা?

রাজা নির্ব্বাক হইয়া পাগলের ভঙ্গী দেখিলেন, পাগলের উক্তি শুনিলেন। সত্য সত্য কাদা মাথা, ছাই মাথা, মাথা নেড়া। পাগল ছুটিয়া অতি নিকটে আসিতেছিল প্রহরীরা মধ্যবর্ত্তী হইল। রাজা একদৃষ্টে পাগলের মুখখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিলেন, মুখখানা

পরিস্কার থাকিলে বোধ হয় একটু একটু চিনিতে পারিতেন, কোথায় যেন ঐ রকমের একখানা মুখ দু একবার তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল, রাজার মনে ক্ষণকাল এইরূপ বিতর্ক উঠিল। তৎক্ষণাৎ আবার বাতাসে মিসাইয়া গেল। মাথা নেড়া; কাদা মাখা; মুখ চিনিবার উপায় হইল না।

তিনজন প্রহরী মধ্যবর্ত্তী হইয়া পাগলের গতিপথ রোধ করিতেছিল, দুইজন প্রহরী দুইদিকে দাঁড়াইয়া পাগলের হাত দুখানা ধরিয়া রহিয়াছিল, পাগল আর ছুটিতে পারিতেছিলনা। আকার প্রকারে চিনিতে না পারিয়া, রাজা একটু বিনম্রস্বরে পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ?

হি হি করিয়া হাসিয়া পাগল উত্তর করিল, হাঃ—হাঃ—হাঃ ?—রম্ভা, মহারাজ রম্ভা !—উঃ !—জলিয়া গেল ! মরকতমোহিনী ! মহারাজ !

এত প্রলাপের পরেও, দুই তিনবার ধমক দিয়া রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা বাপ তোমাকে যে নামে ডাকিত, সে নামটা কি স্মরণ নাই ?

যেন নৃত্য করিতে করিতে পাগল বলিয়া উঠিল, আছে—আছে—আছে—খুব আছে ! বি—বি—বি—বীরবরেন্দর !

রাজা চমকিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্য ! সেই লোকের এই দশা ! প্রথম আমাকে দেখিয়াই রম্ভা নাম করিয়াছিল ; এখন বুঝিতেছি, উহার সেই প্রাণাধিকা গণিকা রম্ভাবতীকে মনে করিতেছে ! রম্ভাবতীর বিরহেই বোধ হয় পাগল হইবার কারণ ! তবে ও সব কেন ?—আমার নাম, আমার কন্যার নাম, বিজয় মাধবের নাম,—এসব উপসর্গ তবে কেন ? কেবল রম্ভাবতীর বিরহেই যদি পাগল হইবার হেতু হয়, তবে এসব উপসর্গ কেন ? নিশ্চয় পাগল ! বদ্ধ পাগল ! ইহাকে আস্কা রাখা উচিত হয় না।

রাজার ঠিক পশ্চাতে লুকাইয়া ভবানন্দ স্বামী ঐ লোকটার ভাব ভঙ্গী দর্শন করিতেছিলেন, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রলাপ বাক্য শ্রবন করিতেছিলেন, রাজা-বাহাদুরের চিন্তাধিক্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া দ্রুতবেগে সম্মুখে আসিলেন ; সস্নেহে অথচ কিছু উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি তোমার এত চিন্তা ? নিসন্দেহ বদ্ধ পাগল। এ পাগলকে তোমার ধাতুলালয়ে বদ্ধ রাখিবার আদেশ দাও।"

রাজা অমরনাথ গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না, পাগলকে পাগলা গারদে রাখিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনুচরেরা রাজ আজ্ঞানুসারে পাগলকে বন্ধন করিয়া ধাতুল নিবাসে লইয়া গেল। পাগল দেখিবার জন্য

নগরের অনেক লোক রাজদ্বারে জমা হইয়াছিল. তাহাদের কৌতুকের সামগ্রী বিদায় হইল,—আশা ফুরাইল,—অল্পক্ষণ মধ্যেই জনতা ভাঙ্গিয়া গেল।

রাজা পুনর্ব্বার পুরী প্রবেশের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ সম্মুখে কিছুদূরে একজন অশ্বারোহী অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছে দেখিলেন ! গুরুদেবকে কহিলেন, দেখুন, বোধ হয় কোন সমাচার লইয়া একজন অশ্বারোহী এইদিকে আসিতেছে ;—হাঁ, এই দিকেই আসিতেছে। গুরুদেব কহিলেন, তিষ্ঠ !

অশ্বারোহি নিকটে আসিয়া পৌছিলেন, পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, অশ্বারোহী যুবা পুরুষ ;—প্রশান্ত বদনে লম্ফ দিয়া অশ্বারোহি অশ্ব হইতে নামিলেন ; অগ্রে গুরুদেবের, তদনন্তর রাজার পদধুলি গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিস্ময়ে বিস্ময় তখনকার যতটুকু প্রশ্ন উত্তর সম্ভব, শীঘ্র শীঘ্র সেইটুকু সমাধা করিয়া রাজা সেই যুবা পুরুষকে অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। অগ্রে অগ্রে গুরুদেব, তৎপশ্চাতে রাজা, তৎপশ্চাতে যুবা।

যে ঘরে রাজমোহিষী, রাজকুমারী, উভয় উৎফুল্ল নয়নে বসিয়া নূতন সমাচরের তথ্য জানিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন, যে ঘরে প্রহরীর জীম্মায় বিশ্বাসঘাতক বন্দি রায় মঙ্গল ওরফে নরত্তোম ঠাকুর আটক ছিল, যুবাকে লইয়া গুরু পশ্চাদ্বর্ত্তি রাজা অমরনাথ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। যুবাকে দেখিয়া রাণী এবং রাজনন্দিনী আনন্দ বিস্ময় চমকিত হইয়া উঠিলেন। রায় মঙ্গলের বদনে দুর্জ্জয় কালিমা রেখা দেখাদিল।

এখন আমরা এই যুবা পুরুষের পরিচয় দিব। অজ্ঞানে পূর্ব্বে যিনি রাজকন্যার পাণিপ্রার্থি হইয়াছিলেন, তত্ত্ব জানিয়া শেষে যিনি রাজা অমরনাথের পালিত পুত্র হইয়াছিলেন, রাজকন্যাকে বিষ প্রয়োগে নিধন করিবার মিথ্যা অভিযোগে যিনি রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইনি সেই বিজয়মাধব ;—রাজদত্ত নূতন নাম সমর নাথ।

সমস্ত মঙ্গল সংঘটন একসঙ্গে মিলিত হইতেছে ! সজীব সমর নাথের প্রত্যাগমনে রাজা রাণী পরম পুলকিত হইলেন ;—মরকতমোহিনীও দাদার পুনঃ দর্শনে ললনা সুলভ আমোদ প্রকাশ করিলেন। গুরুদেবের নিকট পরিচয় দিবার ভূমিকা হইতেছিল, হাস্য করিয়া গুরুদেব কহিলেন, 'সমস্তই আমি জানি আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই।' সমর নাথকে সম্বোধন পূর্ব্বক সগৌরবে তিনি কহিলেন, বৎস ! তোমার ঈর্ষা বৈরী রায় মঙ্গল—সন্ন্যাসী নামে নরত্তোম ঠাকুর

এই ঘরে উপস্থিত আছেন, ঐ দেখ প্রহরী কবলে তাহার কেমন সুন্দর সন্ন্যাস ধর্ম্ম আচারিত হইতেছে।"

বিজয় একবার বন্দির দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক জগত পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিলেন; রাজাকেও পুনরায় প্রণিপাত করিয়া, রাজমহিষীর চরণধূলি লইয়া, মরকত-মোহিনীর শিরশ্চুম্বন করিলেন। ক্ষুদ্র একটী কক্ষ সাগরে মহানন্দের প্রবাহ বহিল। সমরনাথ ভাবিলেন, দুর্ব্বলের সহায় ধর্ম্ম। কোথাকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকারে কোথায় হয়, ধর্ম্মই তাহার ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত দুরাচার রায় মঙ্গল। মরকতমোহিনীর পুনর্জ্জীবনের সমাচার সমরনাথ ইত্য অগ্রে জনরবে শুনিয়াছিলেন, মাধবের সহিত মরকতমোহিনীর বিবাহ হইয়াছে, ইহাও তিনি শুনিয়াছেন। এক্ষেত্রে আর সে প্রসঙ্গের উল্লেখ হইলনা। বীর বরেন্দ্র পাগল হইয়া পাগলা গারদে রহিয়াছেন, রাজার মুখে ও সমরনাথ সেই সংবাদটি নূতন শুনিলেন। এই রাজার পাগলা গারদ আছে, কেবল একটা গারদ নয়, এই রাজধানীতে রাজার নিজের সকল প্রকার গারদ আছে। ইনি একজন রাজা। ইহার ব্যবস্থার উপর ইহার কার্য্যের উপর, ইহার বিচারের উপর, ইহার দণ্ডাজ্ঞার উপর দ্বিরুক্তি করিবার লোক নাই; ইহার কার্য্যকলাপেরউপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ কে?

শিশু রাজকুমার অজয় কুমার এই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। অমর নামটি তবে কি! রাজা ইহাকে পুত্রবৎ স্নেহে ইদানীং রাজপুরীতে রাখিয়া পালন করিতেছিলেন, লোকে তজ্জন্য জানিয়া লইয়াছে, সমর নামটি রাজা অমরনাথের পালিত পুত্র। কেহ কেহ বলে দত্তক পুত্র। পালিত পুত্রই বলুন অথবা দত্তক পুত্রই বলুন, ভবিষ্যতে এই সমরনাথ রাজধনের উত্তরাধিকারীত্বের কিছু অংশ পাইবেন কি না?

অবশ্যই পাইবেন। সমরনাথ এই রাজার পালিত পুত্রও নহেন, দত্তক পুত্রও নহেন, ঔরষ পুত্র। সে রহস্যটি কেবল রাজা ভিন্ন আর কেহ জানিতেননা। মরকতমোহিনীকে বিবাহ করিবার জন্য বিজয় মাধব যখন উন্মত্ত প্রায় হন, রাজা সেই সময়ে তাহাকে তাহার জন্ম বৃত্তান্ত শুনাইয়া দেন। নিগূঢ় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিজয় মাধবের পরিণয় আশা দূর হইয়া যায়।

এক্ষেত্রে পিতা পুত্রের সে পরিচয় প্রসঙ্গে কোন নূতন কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইলনা; কেবল পাঠক মহাশয়গণের অবগতির নিমিত্তই আমরা যথা সম্ভব সংক্ষেপে সেই পরিচয়টি এইখানে প্রকাশ করিব।

সমরনাথ কে? সমরনাথ পূর্ব্ব নামে বিজয় মাধব;—সমরনাথ রাজা অমরনাথের ঔরষ পুত্র। রাজা অমরনাথের বয়ক্রম এখন ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪০।৪২ বৎসর। তীর্থ ভ্রমনে ইহার অত্যন্ত অনুরাগ। দুই তিন বৎসর অন্তর কোন না কোন তীর্থে যাত্রা করা চাই ই চাই। ইহার যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম, ইনি তখন কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া গুপ্তভাবে সর্ব্ব প্রথম তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এখনকার মত সে সময়ে অত্যল্প সময়ে তীর্থ ভ্রমণের সুবিধা ছিল না। নানা প্রকার যান বাহনে বহুদিনে ধনী সন্তানগণের এক একবার তীর্থ দর্শন হইত। বৈদ্যনাথ, গদাধর, বিশ্বেশ্বর, বিন্ধ্যাচল, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, পরিভ্রমণ করিয়া অমরনাথ সর্ব্বশেষে প্রয়াগ ধামে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার একটি অন্তরঙ্গ পিতৃবন্ধুর সহিত আলাপ পরিচয় হয়, তাঁহার অনুরোধে দুইবৎসর অমরনাথকে প্রয়াগে বাস করিতে হয়। সেই বন্ধুর নিকেতনেই অমরনাথ থাকেন। বন্ধুর একটি অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা ছিল, উপযুক্ত পাত্রাভাবে কন্যাটী কুমারীকালে প্রায় যৌবন সীমায় উপস্থিত; আশু বিবাহের জন্য কন্যার পিতা মাতা অতিশয় ব্যস্ত, অমরনাথকে সেই কন্যা বিবাহ করিবার অনুরোধ করা হয়। অমরনাথের পিতা তখন বর্ত্তমান ছিলেন, কন্যাটি রাজকন্যা নহে, পিতা সে বিবাহে সম্মতি দিবেন না, সেই আশঙ্কায় অমরনাথ বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন, অবশেষে কিন্তু কন্যার পিতা মাতার নিতান্ত আগ্রহে গোপনে তিনি সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা অথবা পিতৃ রাজ্যের অপর কেহ সে সংবাদ প্রাপ্ত না হন, তৎপক্ষে কন্যার পিতাও বিশেষ সতর্ক ছিলেন। গুপ্ত সম্বন্ধ, গুপ্ত বিবাহ, গুপ্ত বাস। প্রায় দুই বৎসর, এই সময়ের মধ্যে সেই কন্যাটি গর্ভ ধারণ করিয়া একটি পুত্র প্রসব করেন। প্রসবের দুই মাস পরে সুতিকা পীড়ায় প্রসুতির মৃত্যু হয়, মাতামহের আশ্রমে

মাতৃহীনা শিশুটি প্রতিপালিত হয়, সেই শিশু এই সমরনাথ। পুত্রটি জন্মিবার কয়েক মাস পরে অমরনাথ পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া যান। বিবাহ হইয়াছে কেহই সে তত্ত্ব কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। সমরনাথ প্রয়াগে বিজয় মাধব নামে পরিচিত হইয়া ষোড়শবর্ষের অধিক কাল মাতামহালয়েই বাস করিয়াছিলেন, মরকত মোহিনীর রূপ লাবণ্যের বার্ত্তা দেশে দেশে ঘোষিত হইলে বিজয়মাধব ঐ মরকতমোহিনীর লালসায় অজ্ঞাত পিতৃরাজ্যে গমন করেন। কে তাঁহার পিতা বিজয়মাধব তাহা জানিতেন না, অল্পদিন পরে নির্জ্জনে পিতার মুখে গুপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিজয়মাধব বড় লজ্জা পান, বিবাহের আশা ত্যাগ করিয়া তদবধি ইনি অপরিচিত বিদেশীর ন্যায় পিতৃ ভবনেই বাস করিতেছেন, এই খানেই নাম হইয়াছে সমর নাথ। গণনায় সমরনাথের বয়স এখন প্রায় এক-বিংশতি বর্ষ। সমরনাথ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজা অমরনাথের ঔরসপুত্র, অচিরেই এই পরিচয় রাজধানী মধ্যে প্রচার হইবে, উত্তরকালে এই সমরনাথ পিতৃরাজ্যে অজয়কুমারের সহিত সমান অধিকারী হইবেন।

রাজার মুখে পরিচয় প্রকাশ হইবার অগ্রে অভিনিবেশ পূর্ব্বক সমরনাথের মুখখানি যাহারা দর্শন করিবেন, সমরনাথকে অমরনাথের পুত্র বলিয়া চিনিতে তাঁহাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। নরোত্তমের আশ্রমে সমরনাথ যে রাত্রে আশ্রয় লইতে যান, সেই রাত্রেই নরোত্তম তাঁহার মুখখানিতে রাজা অমরনাথের মুখাকৃতির পূর্ণ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াছিলেন। বিস্ময় জন্মিয়াছিল, কিন্তু উভয়ে তাঁহারা পিতা পুত্র, নরোত্তম তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিবেন।

রাণী বিরজাসুন্দরী এতদিনে সমরনাথকে আপন সপত্নী পুত্র বলিয়া জানিলেন, মরকতমোহিনী পাঁচবৎসরকাল সমরনাথকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছেন, এখন বুঝিলেন, সত্য সত্য সমরনাথ তাঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পূর্ব্ব স্নেহ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রগাঢ় হইল।

সমরনাথ এখন আর একবার ছদ্মবেশী নরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, নরোত্তম আর মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না অকারণ বৈরিতার এই শোচনীয় পরিণাম, অনধিকারী হইয়া অতিলোভের এই শোচনীয় পরিণাম, ধনলোভে রাজবংশের শিশু চুরির এই শোচনীয় পরিণাম, এই তিনটে কথা নরোত্তমকে স্মরণ করাইয়া দিয়া রাজার সহিত সমরনাথ সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

পাগল কি করিতেছে, তাহা একবার চক্ষে দেখিবার কৌতূহলে সমরনাথকে সঙ্গে লইয়া রাজা অতঃপর বাতুলালয়ে চলিলেন। পথে মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমার সমরনাথ স্বস্নেহে মাধবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পাগল দর্শনের অভিলাষে মাধবও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পাগলা গাদরে পাগল। পুত্র জামতার সহিত রাজা সেই গারদ ঘর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাগল একধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। দুরন্ত পাগল হস্ত পদে নিগড়। স্নান করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হইয়াছে, মনভাল থাকিবে বলিয়া তাহার সম্মুখে পার্শ্বে এবং গৃহের চারিধারে গোলাপ মল্লিকা চম্পক গন্ধরাজ জুঁই কামিনী প্রভৃতি নানা-জাতী সুগন্ধ কুসুম বিকীর্ণ রাখা হইয়াছে। ঘরের শোভা নেত্ররঞ্জিনী ফুল-কুলের সৌরভ অতি মনোহর। পাগল কিন্তু সে শোভা দেখিতে ছিল না, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল ঘরে মনুষ্য প্রবেশ করিল, পদশব্দ পাইয়া পাগল একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। পাগলের মুখ দেখিয়া সমরনাথের ভয় হইল, মাধবও ভয় পাইল, রাজা কিন্তু অটল ভাবে দাঁড়াইয়া পাগলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনিমেষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাজাকে দেখিয়া পাগলের শোক উথলিল। দন্ত বিকট করিয়া মাথা ঘুরাইয়া, বিকৃত কণ্ঠে পাগল বলিয়া উঠিল, রম্ভা! রম্ভা! রম্ভা! কোথায় রম্ভা! কেন তোর এই দশা! —না,—হা,—বিজয়,—বি—বি—বি—বিজয় মাধব, রম্ভা!—মহারাজ!—রাজা!—সোহাগী—হায়—হায়!—হোঃ—হোঃ! দুইকুল মরকতমোহিনী—রম্ভা মহারাজ—মরকতমোহিনী—কই—কই—রম্ভা—

ললাটে করাঘাত করিবার জন্য পাগল সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া হাত দুখানা কপালে তুলিতে ছিল, ঝন্ ঝন্ শব্দে শিকল বাজিয়া উঠিল;—হাত উঠিলনা; সজোরে মাথাটা আসিয়া হাতের উপর পড়িল;—লৌহ শৃঙ্খলে কপালের দুই তিন ঠাঁই কাটিয়া গেল;—দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, রম্ভা রম্ভা বলিয়া চিৎকার করিয়া পাগল সেইখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

কোথায় তাহার রম্ভা? রম্ভা আর আসিবেনা। দেশান্তরে রম্ভা এখন নায়কান্তর ভজনা করিতেছে,—রসিক রাজ বলিয়া রম্ভা আর তাহাকে ডাকিতে আসিবেনা,—রসিকরাজ বাঁচিল কি মরিল, রম্ভা আর তাহা দেখিতে আসিবেনা রম্ভা পলায়ন করিয়াছে। মিথ্যা প্রেম—দুষ্টের দুষ্ট প্রেম এইরকমই পলায়ন করে।

পাগল অচেতন। পাগল এখন আর পৃথিবীময় রম্ভা দেখিতেছেনা। পাগল এখন রাজা অমর নাথকে রম্ভা বলিয়া ডাকিতেছেন। পাগল অচেতন। উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা সেই ঘৃণিত গারদ হইতে বহির্গত হইলেন। পশ্চাত চলিলেন সমরনাথ আর মাধব।

উপসংহার।

আখ্যায়িকার উপসংহার করা আনন্দের কথা। যেমন আনন্দ, সেইরূপ আশঙ্কারও কথা। পুস্তকের অঙ্কে নায়ক উপনায়ক, নায়িকা উপনায়িকা প্রভৃতিকে কোথায় কি অবস্থায় রাখিয়া আসা হইয়াছে, উপসংহারে তাহার সামঞ্জস্য রাখিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, কাহার ভাগ্য কোথায় কি প্রকারে ঘুরিয়া কোথায় দাঁড়াইল, তাহাও মিলাইয়া দিতে হইবে, ত্রুটি হইলে মূল আখ্যায়িকার রস ভঙ্গ হইয়া যাইবে, সেই নিমিত্তই আশঙ্কার কথা। আনন্দে আনন্দে, শঙ্কায় শঙ্কায় আমরা এখন এই পুস্তকের উপসংহার করিব।

বিপ্র কুমারে কন্তা সমর্পণ করিয়া ক্ষত্র রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিশ্চিন্ত হইলেন, হৃত পুত্র অজয় কুমারকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলেন, সমরনাথকে স্বপুত্র বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়া নূতন আনন্দ অনুভব করিলেন; অনেক প্রকার আকস্মিক শোক দুঃখের পর রাজ সংসার সুখময় হইল।

মরকতমোহিনীর বিবাহ উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন, রাজার সমাদরে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজপরিবারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুদেব ভবানন্দ স্বামী মহারণ্যে যাত্রা করিলেন। মরকতমোহিনীকে পুত্রবধূ রূপে লাভ করিয়া দেব পূজক জটাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপ্রত্যাশিত পরম সুখে নিমগ্ন হইলেন। রাজকন্যার শ্বশুর হইলাম, সেই আনন্দে, সেই গৌরবে জটাধর ঠাকুর রাজার অনুমতি লইয়া দেবালয়ের পূজকতা পরিত্যাগ করিলেন, মাধবের নিমিত্ত রাজধানী মধ্যে রাজব্যয়ে একখানি মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল, প্রচুর পরিমাণে মহামূল্য যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গিনীগণ সহ রাজকুমারী মরকতমোহিনী সেই অভিনব নিকেতনে আসিয়া বাস করিলেন। জটাধর ঠাকুর সেই রমনীয় নিকেতনের কর্ত্তা হইয়া রহিলেন। মাধবের গর্ভধারিণী জননীও স্বদেশের কুটীর বাস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিয়া অট্টালিকাবাসিনী হইলেন,

পরিচর্য্যার জন্য অনেক গুলি দাস দাসী নিযুক্ত হইল, দ্বারে চারিজন ব্রজবাসী দ্বার পাল বসিল, কোন সুখের অভাব রহিল না।

অমরনাথের পিতা রাজা রণধিন সিংহ প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন, ধর্ম্ম পরায়ণ, প্রজা রঞ্জন নরপতি ছিলেন, তাঁহার অপক্ষপাত সুক্ষ্ম বিচারে রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজা নিরাপদে পরম সুখে বাস করিত, রাজা অমরনাথ সে সকল পিতৃ গুণ অধিকার করিতে পারেন নাই, না পাইবার প্রধান হেতু বুদ্ধির অল্পতা আর আশুর প্রত্যয়িতা, তাঁহার কর্ণে যে যাহা বলিত, সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাতেই বিশ্বাস করিতেন, সেই বিশ্বাসের ফল অনর্থ। বনের একজন সাধু পুরুষ রাজ কন্যার বিবাহ গণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া অমরনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াই অকস্মাৎ ব্রহ্মহত্যা করিবার আদেশ দিলেন, সমরনাথ মরকতমোহিনীকে বিষ খাওয়াইছেন, দুষ্ট লোকের মুখে সেই মিথ্যা জনরব শ্রবণ করিয়া বিনা প্রমাণে সমরনাথের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রকারের অনেক হটকারিতা তাঁহার নামকে কলঙ্কিত করিয়াছিল, শেষে কিন্তু তিনি সকল বিষয়ে সুখী হইলেন।

এক বৎসর পরে রাজস্থানের একটি সুকুমারীর সহিত রাজকুমার সমরনাথের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল।

কুমার অজয়কুমার উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দিন দিন ক্রমশঃ নূতন নূতন জ্ঞানার্জ্জন করিতে লাগিলেন, বর্ষবৃদ্ধি সহকারে সঙ্গীত বিদ্যায়, অস্ত্র সন্ধানে এবং অশ্বারোহণে তাঁহার দক্ষতা জন্মিল, পিতৃ যত্নে, মাতৃ স্নেহে ভ্রাতৃ গৌরবে ভগ্নির আদরে অজয়কুমার সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্লতা উপভোগ করিতে লাগিলেন। ভবানন্দ স্বামী মধ্যে মধ্যে এক এক দিন রাজধানীতে আসিয়া রাজ পরিবারবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, উপযুক্ত সময়ে কুমার সমরনাথ সস্ত্রীক তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সকলেই জানিল নন্দিগ্রামের রাজ পরিবার অবিচ্ছেদে ভবানন্দ স্বামীর মন্ত্র শিষ্য।

নরোত্তম ঠাকুর নামে পরিচিত রায়মঙ্গল সিংহ আপন দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইল। রাজ কন্যার বিবাহের পর দিন রাণী বিরজাসুন্দরী ঐ পাষণ্ডের দণ্ড বিধানের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাজা অমরনাথ তদনুসারেই রায় মঙ্গলের দণ্ডদান করিলেন, মস্তকমুণ্ডন করাইয়া কৌপীন পরাইয়া গাধায় চড়াইয়া সেই দুরন্ত পাপিষ্ঠকে রাজধানী হইতে জন্মের মত দূর করিয়া দিলেন।

পাগলা গারদে অভাগা বীর বরেন্দ্রের মৃত্যু হইল। তাহার প্রেম নায়িকা রম্ভাবতী কোথায় রহিল, আর তাহার সে কথা মনে রহিল না; দয়াময় মৃত্যু তাহাকে চিরকালের মত সেই পাপ ভাবনা ভুলাইয়া দিল।

রম্ভাবতী কোথায় রহিল? অনেক দিন পরে জনরবের রসনায় প্রকাশ পাইল, উপর্য্যপরি দ্বাদশজন অবিবেকী লম্পট রাজপুত্রকে বরেন্দ্রের মত কাঁদাইয়া অবশেষে বিলাসিনী রম্ভাবতী শেষবার রাজ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, উত্তর পশ্চিমদেশে একজন পাঠান সেনাপতির পুত্র তাহার ঐন্দ্রজালিক প্রেম-রাজ্যের মায়ামুগ্ধ অধিশ্বর হইয়া পরকালের পন্থা দুর্গম করিতেছে।

অদ্য আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। সাহিত্যবন্ধু পাঠক মহাশয়েরা আমার অযোগ্য হস্ত প্রসূত এই আখ্যায়িকাটি পাঠ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুগ্রহ বর্ষনের অনুরূপ যদি কিছু মাত্র তৃপ্তি অনুভব করেন, সর্ব্বশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমার অন্তঃকাল আসন্ন; সূর্য্যদেবের দুজ্জয়কুমার দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র যদি আমাকে সাদরে আহ্বান না করেন তাহা হইলে আমার অনুগ্রাহক পাঠক মহোদয়গণকে আরও কিঞ্চিৎ তুচ্ছ্য উপহার প্রদান করিবার যত্ন করিব, এইরূপ আশা রহিল।

বিমুক্ত।

লেখক—শ্রীকমলা কান্ত বসু।

(১)

আর কত দিন, দিদি? কত কাল পরে শান্তি পাব? আমি কি মুক্ত হবনা রোগের উপশম কি হবেনা, দিদি? আর ত এ কষ্ট সহিবে পারছিনা—এযে দারুণ যন্ত্রাণ, কেউ যেন কখনও না ভোগ করে দিদি?"

"কি বলছিস, মঞ্জরী! কেন অত ভাবছিস—তুই শীগগীরই সেরে উঠবি, আর বেশী দেরী নেই—তাঁকে শুধু দিন রাত্তির স্মরণ করিস, তাহ'লেই সুখ পাবি; তিনি যখন কষ্ট চাপিয়ে দিয়েছেন তখন নিশ্চয় তিনি সইবারও ক্ষমতা দেবেন—ভাবিসনে মঞ্জরী, ও যন্ত্রণা তোর কেটে যাবে, কোন ভয় নেই।"

"দিদি, দিদি, কি বলছ তুমি—কেটে যাবে! না দিদি এর মুক্তি পাবনা আমি। আগুনের মত আমাকে সকল সময় পুড়িয়ে মারছে—একটা নিশ্বেস যে মিতে আটকে যাচ্ছে। বল কি, দিদি আমার মত অভাগী শান্তি পাবে? কখন' যে আশাও করিনা, দিদি। যমও যে আমাকে ছলনা করছে। দিদি দিদি?"

"কি মঞ্জরী? স্থির ২, স্থির ২।"

"জান্‌লা খুলে দাও দিদি; দিদি, আর টিক্‌তে পার্‌ছিনা খোল, খোল, দিদি, গেলুম, গেলুম।"

"ক্ষেপছিস্ মঞ্জরী! তোর যে ভয়ানক রোগ। জানলা খুলে শুবি কি? ক্ষান্ত ২, ক্ষান্ত ২—আমি পাখার বাতস করছি। অত ছট্ ফট্ করিসনে! শেগকালে—আরও বাড়িয়ে তুলবি নাকি? ওরে সাবধান মঞ্জরী সাবধান।"

"পাখা রাখ দিদি আগে মাথার জানলা খুলে দাও—বড় গরম, সহিতে পারিনা—খোল খোল।"

"মঞ্জরী!"

"আঃ কি মধুর বাতাস! প্রাণ জুড়োল! আঃ! দিদি বাগান থেকে কি সুন্দর ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে, আঃ পাচ্ছ দিদি! ভারি সুন্দর! এতক্ষণে প্রাণের তাপ গেল দিদি প্রাণ জুড়োল, আঃ! শান্তি হ'ল তবু ঘরে রাতদিন বিছানায় পড়ে' চুপ করে' কি শুয়ে থাকতে পারা যায় দিদি?—ঐ সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে! আঃ বাতাসটাকে যেন ধ'রে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। দিদি সারাদিনে এখন একটু তৃপ্তি হ'ল—শান্তি পেলুম দিদি।"

"ছট্‌ফটানি ক'মল মঞ্জরী। শো' তবে একটু চুপ ক'রে। আশ্বিনের হাওয়া দক্ষিণ থেকে বহিছে আঃ গা শির শির ক'রে উঠছে। ঐ পশ্চিম দিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পাখীরা বাসায় ফিরে আসছে, পুবদিকে অন্ধকার নামছে, এখনি চাঁদ উঠবে—প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। শো একটু শান্তিতে শো মঞ্জরী, তাপের উপশম হবে, পাশ ফিরে শো।"

(২)

কি এক উৎকট ব্যধিতেমঞ্জরী কয়েক মাস হইল ভুগিতেছিল। তাহার স্বামী প্রভাত কুমার সম্প্রতি প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। মঞ্জরীর পুত্র কন্যা প্রসব হয় নাই; তাহার দিদি মাধবীর নিকট সে ছিল। শুশ্রূষা করিবার গৃহে একমাত্র সে।

মাধবীও বিধবা। তাহার স্বামী রজত ভূষণের সহিত তরণী বাবুর পরম বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বাটীর পার্শ্বেই থাকিতেন; বন্ধুর অবর্ত্তমানে তিনিই সংসারের ভার স্বকরে গ্রহণ করিয়াছিলেন; বিখ্যাত তিনি একজন homeopathic ডাক্তার; প্রতিদিনই তিনি মঞ্জরীকে দেখিতেন, যত্নের ত্রুটি কখনও করিতেন না।

মাধবীর দুইটি পুত্রের মধ্যে একটিমাত্র জীবিত এখন, তাহার নাম—বিজনমোহন। আর একটির নাম, বিপিনবরণ—কিন্তু ইহাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

বিজনমোহনের বয়ঃক্রম প্রায় বিংশ বৎসর। কলেজে বি, এ, পড়িতেছিল কিন্তু পিতার মৃত্যুতে সে লেখাপড়া ছাড়িয়াছে। তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি বশতঃ সকল সময়ে সে সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিত না। তবে সে অতিশয় সচ্চরিত্র, সত্যবাদী ও মাতৃভক্তিপরায়ণ। এইটুকু জানিয়া রাখিলেই আমাদের চলিবে।

আজ মঞ্জরীর অসুখ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া অতি মৃত্যুর হইতে এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে অনবরত যন্ত্রনায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে। এক তিল ঘুমাইতে পারে নাই। পাশে তাহার দিদি মাধবী বসিয়াছিল। তাহার কাতর চিৎকারে মাধবী শিয়রের জানলা খুলিয়া দিল। মঞ্জরী শরীরে হাওয়া স্পর্শ পাইয়া অতি শান্তিতে কথোপকথন করিতে করিতে দিনশেষে যন্ত্রণার কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্রমে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

মাধবী শর্য্যাপার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিল। মঞ্জরীর সারা দেহে তাহার কোমল কর বুলাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল। শরতের চতুর্থী চন্দ্রের কিরণে আকাশ ভরিয়া উঠিল। সমস্ত দিবস এত পরিশ্রমের পর তাহার চক্ষু নিদ্রায় জড়াইয়া আসিল। সেও মঞ্জরীর পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

আহা সারাদিবস মঞ্জরীর শুশ্রূষা করিয়া, রাত্রি জাগরণ করিয়া, কি কঠিন পরিশ্রম। এই নিদ্রা তাহার পক্ষে কত শান্তিপ্রদ। কত তৃপ্তিজনক।

(৩)

মধ্যরাত্রি তখন—মঞ্জরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চাঁদের আলোকে ঘর হাসিয়া উঠিয়াছে।

মঞ্জরী কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—" দিদি, দিদি "

মাধবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, " কি মঞ্জরী "

" না কিছু না। দিদি ঐ ঘড়িতে কটা বাজছে ? "

" বারটা ভাই "

" এই যে সন্ধ্যা থেকে ক' ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলুম, এতে প্রাণের ভার একটু হাল্‌কা বোধ হয়েছিল। সমস্ত দিনের ছট্‌ফটানি কমে গেছল। —— আজ কি বার, দিদি ? "

" বৃহস্পতিবার "

" তুমি কি এতক্ষণ জেগে বসেছিলে, না একটু ঘুমিয়েছিলে দিদি ? "

হাঁ, এই যে তোর পাশেই ঘুমিয়েছিলুম। তোর ডাক শুনে আর ঐ হাতখানা গায়ে ঠেকতে ত আমি জেগে উঠলুম। "

" কখন চাঁদ উঠেছে দিদি, দেখেছ ? আজ কি তিথি হল, দিদি ? "

" আজ চতুর্থী; সন্ধ্যার পরেই ত চাঁদ উঠেছে। "

... ...

নানাগুজবে রাত্রি কাটিল। সারারাত শীতল বাতাস সেবনে মঞ্জরীর জ্বর বাড়িয়া উঠিয়াছে; অল্প অল্প বুকে সর্দ্দি বসিয়াছে। মাধবী জানলা বন্ধ করিয়া দিল। মঞ্জরীর যন্ত্রণা আবার বৃদ্ধি পাইল—শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—প্রাণ যেন যায় যায়।

(৪)

" দিদি ঐ শাখ ঘণ্টার কিসের ; এত আওয়াজ শুন্‌ছি। আজ কি কিছু পূজো পার্ব্বণ আছে ? "

" হ্যাঁ, ভাই, আজ যে মায়ের বোধন, ঐ " মুখুজ্যেদের বাড়ী " থেকে বোধ হয় আওয়াজ আসছে, ওদের বাড়ীতে এবার যে মা'র খুব ঘটা করে পূজ তা জানি নে। "

" মায়ের বোধন আজ ? উঃ এই দারুন যন্ত্রণার ত উপশম হ'ল না! মা কি সত্যি মা, না মাটীর মূর্ত্তিই সুধু ? মা হ'লে এই এত আনন্দের সময়ে মেয়ের এত কষ্ট ভোগ কেন ? আনন্দময়ী কি আনন্দময়ী, না পাষাণী ? আজ বোধন হ'চ্ছে কাল তার পূজো ;—মার কি এ দিকে চক্ষু নেই ? মা হ'লে কি মার বুকে মাতৃস্নেহ নেই ? দয়াময়ীর কি তবে দয়ামায়া সব শূন্য ?

দিদি তার মূর্ত্তি ত এবার চক্ষে দেখ্‌তে পাব না। তা না পেলুম, তার এক কণা করুণা অনুকম্পা থেকেও কি বঞ্চিত হব?—না ও নির্জ্জীব প্রতিমার ভেতর সজীবতা কিছু নেই। মা কি এই মার মতন মা?"

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

দেওয়াল পঞ্জিকা। কলিকাতা হাটখোলা ১১ নং গুরুপ্রসাদ ষ্টায়ের লেনস্থ মজুমদার এড্‌ভার্টাইজিং এজেন্সীর নিকট হইতে আমরা মাস বার ও তারিখ পরিবর্ত্তনশীল কার্ড পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। তারিখ নির্দ্ধারণে ও গৃহের শোভাবর্দ্ধনে সমান উপযোগী। আমরা ইহাঁদের এজেন্সীর মঙ্গল কামনা করি।

চিত্র পঞ্জিকা। আমরা বিখ্যাত বি, কে, পাল কোম্পানির চিত্র পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। চিত্রখানি সুদৃশ্য মনোহর এবং গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক।

শ্রীশ্রীদশভুজা। (শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন পূজা।) আমরা কলিকাতা ৩৬ নং খোঙ্গরাপটী বড়বাজারের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ নাথ গুঁই কোং নিকট হইতে উক্ত চিত্র পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। চিত্রখানি প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যহ দর্শন ও স্মরণ করিলে ইহকাল ও পরকালের পরমগতি লাভ হইবে, দোকান ইহাদের ১২৭৮ সালে স্থাপিত, তাই ইহাঁদের পৌরাণিক চিত্রের সমাদর।

৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ বি, সি, ধর ব্রাদার্স আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর হইতে সুন্দর চিত্র পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

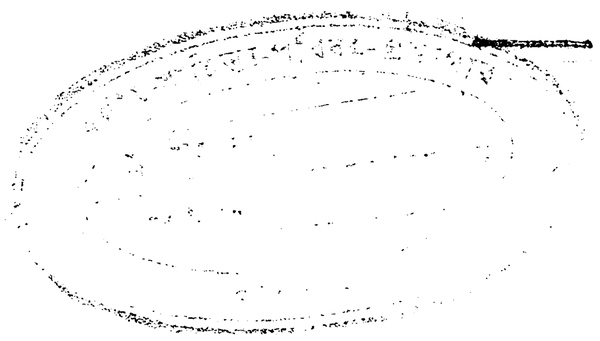

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ড্‌স্‌টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

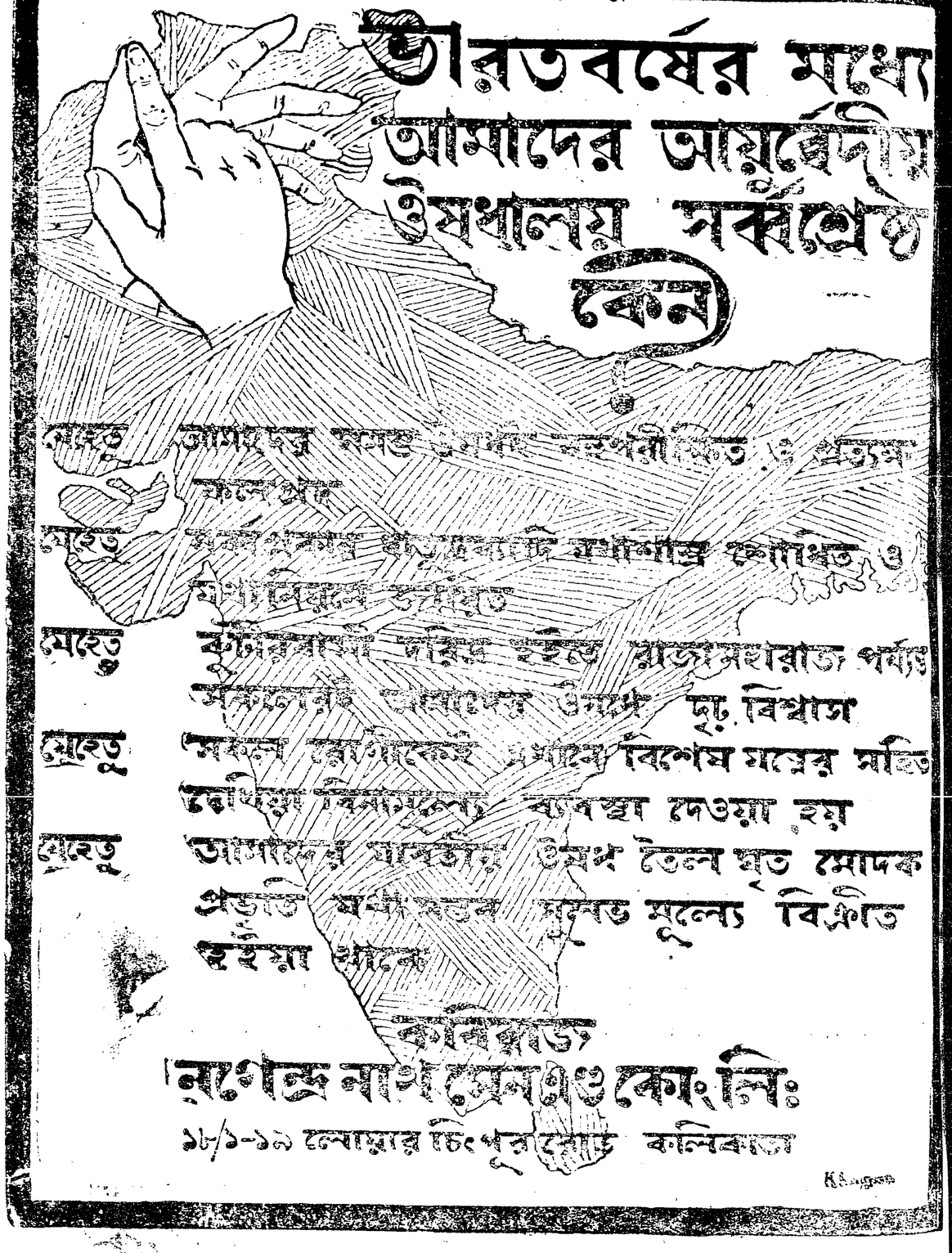

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] পৌষ, ১৩৩১, [৯ম, সংখ্যা

১।	মিনতি	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	২৫৭
২।	বলিদান	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৮
৩।	সাধক-কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৬০
৪।	বিমুক্ত	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	২৬৬
৫।	অশ্রুকণা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	২৬৮
৬।	মায়াবী ও পথিক	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	২৭৭
৭।	স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জীবন চরিত		২৮০
৮।	স্বপনে	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	২৮৭

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 18-4-25

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

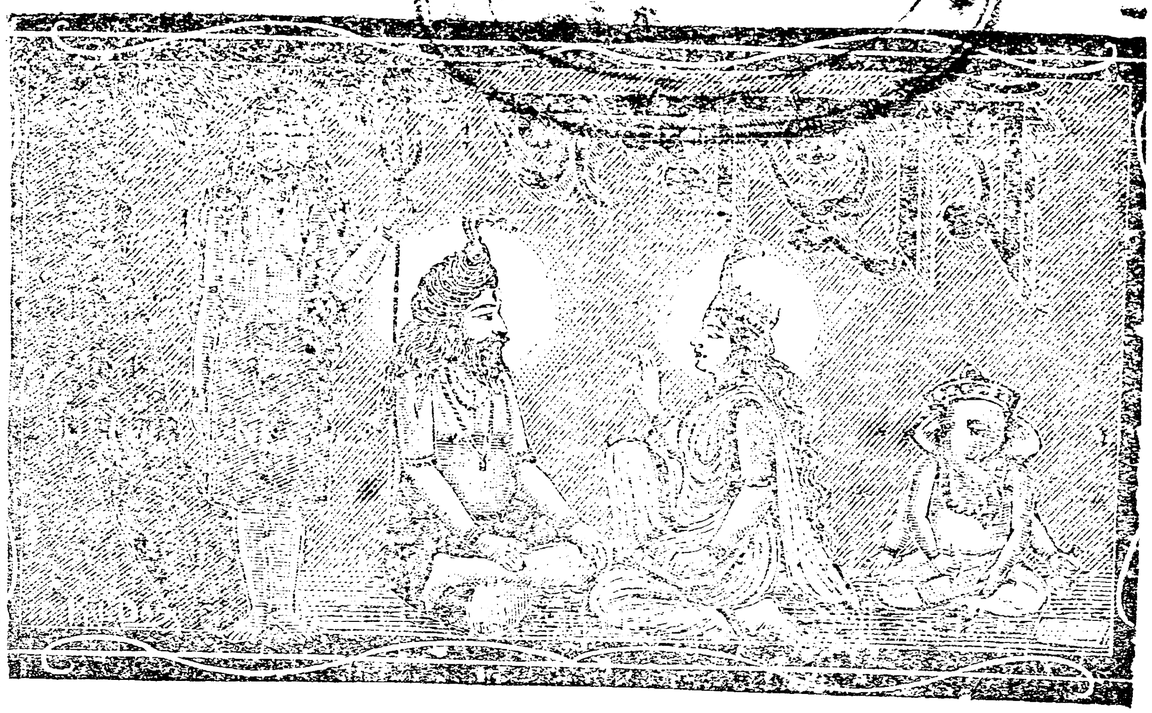

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। | ১৩৩১ সাল, পৌষ। | ৯ম, সংখ্যা।

মিনতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

হে প্রভু তোমার মোহন গীতির হারে
ভ'রে দাও মোর চির বিশুষ্ক প্রাণ,
দয়াল, তোমার করুণা—অমিয়া-ধারে
জাগ্রত করি কর সজীবতা দান।
মোহ গমন অলসে ভুলিয়া নাথ
তোমারি মন্ত্র পুলকে গাহিতে দাও,
আঁধারের মাঝে অধমের ধরি হাত
সন্তানে রাঙ্গা চরণে তুলিয়া নাও।

বলিদান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলিদান কি? আমরা সাধারণতঃ বলিদান বলিলে কি বুঝিয়া থাকি? বলিদান বলিতে আমরা বুঝি যে—কোনও জীবকে দেবোদ্দেশে হনন বা বধ। যেমন কালী বা শীতলা দেবীর তৃপ্তির জন্য পাঁঠা বা পুরুষ ছাগল কাটিয়া নিবেদন বা উৎসর্গ করা।

আচ্ছা এত প্রাণী, এত দ্রব্য থাকিতে মা কালী বা শীতলা দেবীর এই বাক্-শক্তি-হীন ছাগশিশুর ভোজনে এত প্রীতি কেন? আবার দেখিতে পাই সকলেই এই সমস্ত দেবীকেই আমরা জগন্মাতা বা মহামায়া বলিয়া, দয়াময়ী বলিয়া উক্ত দেবীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। কিন্তু মাতৃগণ যদি জগন্মাতা তবে ক্ষুদ্র ছাগ শিশু কি জগৎ ছাড়া, কিম্বা ঐ ক্ষুদ্র জীবেও কি সেই জগন্মাতাই উহার মা নয়? জগন্মাতার প্রীতি অপ্রীতি ত কিছুই নাই। তাঁহাদের বা তাঁহার প্রীতি কেবল মাত্র জীবগণের ভক্তিতে বা নামোচ্চারণে তিনি ত ঘুস প্রার্থী নয়। তিনি সকল জীবকেই তাহাদের অভাব পূরণার্থে যাহার যাহা প্রয়োজন সমস্তই দিতেছেন, তদ্বিনিময়ে চান কেবল মাত্র জীবগণের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ ভক্তি।

তবে আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিদান করি কেন? আত্ম তৃপ্তির জন্য, তাঁহার প্রীতির জন্য নয়। আর এক কথা তিনি ছাগ শিশুর প্রার্থী নন, আমরাই স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ছাগ শিশুর বলি দিয়া থাকি। কিন্তু তিনি যে ছাগ শিশুর প্রার্থী আমরা ত সে ছাগশিশু দিই না। আমরা বিপরীতার্থ গ্রহণ করি। তিনি ছাগ অর্থে যাহার লঘু গুরু জ্ঞান নাই, সেই মনের অসাদিচ্ছারূপ কাম ছাগের বলি অর্থাৎ ত্যাগ বা দমন প্রার্থী। আমরা ঠিক তদ্বিরীত কামনারূপ ছাগের পরিবর্ত্তে জীব জাগ শিশুই বলি দিই। এই শিশু অর্থে অঙ্কুর অর্থাৎ অসাদিচ্ছা মনে আসিবা মাত্র সেই সময় মা ব্রহ্মময়ী বা জগর্জ্জননীকে মনে মনে স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করা উচিৎ যে "হে মাতঃ! আমার এই পাপপূর্ণ কলুষিত কাম ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর, তৎপরিবর্ত্তে সদিচ্ছারূপ রোগমুক্তি প্রদান কর।" কিন্তু হায়! আমরা কি এ ভাবে কোন দিন মাতৃগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি? তাই না

আমাদের এই দারুণ দুর্ব্বিসহ শোক তাপ রোগ যাতনার তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হয়।

আমরা ত স্পষ্টই দেখিতে পাই, কলির জীব নানা প্রকারে নানা ভাবে পাপসাগরে মজ্জমান। মায়ের অপরাধ কি? আবার যে যেমন কর্ম্ম করিতেছি সেই রূপই ত ফলভোগ করিতেছি! যে যেমন ভাবে সাধনা করে, যে যে বস্তু চায়, তাইত পাইতেছে। যে খারাপ ইচ্ছা পূরণ করিতে মায়ের নাম নিচ্ছে সে ভালও ত চাইতে পারে, কিন্তু চায় কয় জন?

আমাদের ভাবা উচিৎ নয় কি? "আমার একমাত্র শিশু সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় পীড়িত, আমি তখন সেই শিশুকে বাঁচাইবার জন্য—কেন জগন্মাতার ছাগ সন্তান, জগন্মাতার প্রীত্যর্থে বলি দিব মানস করি?" মা যে জগন্মাতা, তিনি কি তাঁহার এক সন্তানকে বাঁচাইয়া আর এক সন্তানকে খাইতে চান? এই জন্যই ত বেশীর ভাগ আমার সেই একমাত্র সন্তান অকাল কাল কবলিত হয়। যদিই বা কখন কখন দেখি, কোথাও কাহার সন্তান রোগ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু সে কি মায়ের দয়ার বসে তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলেই রোগমুক্ত হয়। তখন আবার মনে করি, যে মায়ের দয়ায় বাঁচিয়াছে; দাও একটা দুর্ব্বল পশু বলি! কিন্তু এ বলি কি বলি? এ প্রকারান্তরে আত্মতৃপ্তি ভ্রাতৃহত্যা, ভিন্ন আর কি? প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ত বটেই।

আমরা বেশ জানি যে, মা কালী বা মা শীতলা ত পাঁঠা খানই না; খায় আমরা নিজে আর যারা উহা খাইয়া রসনার তৃপ্তি করে।

তাই বলি যে, ছাগশিশু আমাদের ভাষায় বঞ্চিত সেই নীরিহ ছাগ বলি না দিয়ে প্রকৃত যে কু-বাসনারূপ কাম ইচ্ছা সেই কামনাকে নিয়ে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে সত্য সনাতনী মহামায়ার নিকট প্রকৃত কামছাগকে বলি দিই এস। দেখি তাহাতে মা জগন্মাতা আমাদের উপর সদয় হন কি না? তা যদি না হয়, তবে তিনি কখনই দীন দয়াময়ী "মা" নন। তিনি রাক্ষসী। মা কখন রাক্ষসী হতে পারেন না, মা চিরদিনই মা। যে কেউ হক যে মন প্রাণ এক করে বলবে, "মা তুমি বলি প্রিয়া যদি তবে লও মা আমার প্রাণের অসৎ কামনা প্রেমহীন কামনারূপী ছাগশিশু লও। মা! এ ভিন্ন আমি তোমার ছাগ সন্তান তোমায় কি বলে নিবেদন করে দোব। তাই বলি মা যদি তুমি এই দীনহীনের কামনার ফাঁস বাসনার ছাঁদ রূপ আমার অভক্তি ছাগল শিশু বলি নাও। তা ছাড়া এ জগতে তোমাকে দেবার মত অন্য বলি কোথায়

পাব ? মা গো ! তুমি জগৎ জননী আমার পুত্র—আমার স্ত্রী—আমার বিষয় বৈভব বলে ত কিছুই নাই ; এ সকলই ত তোমার। তোমার জিনিষ তোমায় আর কি দিব মা ? তাই বলি মা গো। এই কু-মনের কাম ইচ্ছারূপ দুর্জ্জয় অজা গ্রহণ কর জননী।" এই ত প্রকৃত বলিদান। এ ছাড়া কি আর অন্য বলি হতে পারে ? তাই বলি মা আজ এই দীনের এই কামনারূপ বলিদান গ্রহণ কর মা।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী দেবী নমহস্তুতে ॥

সাধক-কমলাকান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

একমাত্র কালই অনাদি অনন্ত। অনন্ত আকাশের ন্যায় নিশ্চল শবরূপ মহাকালের (পুরুষের) উপর ত্রিভুবন প্রসবিনী মহাশক্তি (প্রকৃতি) কালী নামে অভিহিতা। কোটী কোটী নশ্বর সংসার সাগর লহরীর ন্যায় তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত ও তাহাতে লীন হইতেছে। মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরু লতা ভূধর বারিধি পর্য্যন্ত প্রকৃতির সেই অনিবার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী। মনীষি মানবই কেবল প্রজ্ঞাবলে স্বকীয় পরিবর্ত্তনের সময় অবধারণ করিতে পারেন। কেহ যোগবলে কেহ বা ব্যাধির বশীভূত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। মহাত্মা কমলাকান্ত বুঝিয়া ছিলেন তাঁহার দেহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কলেবর পরিত্যাগের সময় অবধারণে সক্ষম হইবার জন্য মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করিয়া হাস্য মুখে সচ্চিদানন্দধামে গমন করিবার জন্য মহাত্মাগণ আজন্মই প্রস্তুত হইতে থাকেন। প্রথমত প্রবৃত্তি সকলের নিবৃত্তির অভ্যাসের প্রয়োজন। ভোগ লালসা থাকিলে লালসার নিবৃত্তির জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক প্রকার ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, নানা প্রকার জনশ্রুতিও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে রাম রসায়ণ প্রণেতা মহাত্মা রঘুনন্দন গোস্বামী যৌবন কাল হইতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি-

তেন। তিনি অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংযম সাধনা প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস মাড়োগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্ত্তী। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি শশীশেখরের বংশধর। তিনি সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলে বৈদ্যগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আহার দিবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন দ্রব্যে তাঁহার অভিরুচি হয়। তিনি মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইবার অভিপ্রায় **প্রকাশ** করিয়া কহিলেন, "যথাসাধ্য প্রচুর পরিমাণে মাগুর মৎস্য সংগ্রহ করাইয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য লোক সমূহের নিমন্ত্রণ দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তি সাধন করা হউক, তাহার পর আমি মাগুর মৎস্যের ঝোল গ্রহণ করিব। আযৌবন হবিষ্যাশী শুদ্ধাচারী পুরুষের অন্তিম সময়ে আমিষ ভক্ষণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক প্রচুর পরিমাণে মাগুর মৎস্য সংগ্রহ করিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য লোককে মধ্যাহ্নে ভোজন করাইয়া কিঞ্চিৎ মাগুর মৎস্যের ঝোল তাঁহার নিকট আনীত হইল। তিনি শয্যা হইতে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই বুঝিলেন, তাঁহার মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিলেন। মানব নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিলে সংসারের আসক্তি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে। আসক্তির অনুচর মায়ামোহ সুতরাং মায়ামোহ সেই ত্যাগী পুরুষকে বিপথগামী করিতে পারে না। তিনি সংসারে থাকিয়া সচ্ছন্দে মনের আনন্দে সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হন। মৃত্যুকালে তাঁহার চির প্রসন্ন বদনের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। রোগাদির বিভীষিকা তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। মানব যেমন ক্রীড়া কৌতুক স্থানে আহ্লাদের সহিত গমন করে তেমনি তিনিও হাসিতে হাসিতে স্বর্গারোহণ করেন। মহাত্মা কমলাকান্ত শেষ সময়ের জন্য আজীবন প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ব্যাধির যন্ত্রণা তাহাকে বিষন্ন করিতে পারে নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দকে প্রসন্ন বদনে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শয্যাগত হইয়াও দর্শনার্থীদিগের সহিত সস্মিত বদনে সুখালাপ করিতেন। আশার চাদরে মুখ ঢাকিয়া অনেককেই ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সাধক কমলাকান্ত আপন কার্য্য

সম্পন্ন করিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি মাতৃভাবে উপাসনার শ্রোত অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অমৃতময়ী পদাবলী উপাসনার অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে।

কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের সাধকের নিকট বিদায় গ্রহণের কিছুদিন পরে সাধক পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ দূরস্থ ও নিকটস্থ ভক্তমণ্ডলীর নিকট প্রচারিত হইল। অনেকেই কোটালহাটে সাধকের শুশ্রূষার নিমিত্ত আগমন করিলেন। কেণারাম পুনর্ব্বার কোটালহাটে আসিয়া সাধকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ও যুবরাজ প্রতাপচাঁদ দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকটে অবস্থান পূর্ব্বক বিশিষ্ট বৈদ্যগণ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতে লাগিলেন। সাধকের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে বৈদ্যগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ বাহাদুর সাধককে গঙ্গাতীরস্থ করিবার অভিপ্রায়ে বিনীত ভাবে কহিলেন, "গুরুদেব! অম্বিকা কাল্‌না আপনার জন্মস্থান। সর্ব্বসন্তাপ হারিণী সুরতরঙ্গিনীর তীরে জননীর প্রিয় সন্তানের ন্যায় আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস আপনি কাল্‌নায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে পারিবেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা আমরা আপনাকে কাল্‌নায় স্থানান্তরিত করি।" সাধক মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, "এই স্থানই আমার গয়া গঙ্গা বারাণসী। সম্মুখবর্ত্তিনী অভয়া বরদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যেখানে সদানন্দময়ীর আবির্ভাব, গদাধর যাহার চরণে পতিত, সেখানে পতিত পাবনীর অভাব কি?" ইহা কহিয়া সাধক হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি স্মরণ নেব।

অতি ক্ষীণ স্বরে এই গান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত দুই চরণ মাত্র উচ্চারণ করিয়া প্রেম ও আহ্লাদে সাধকের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি আর বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধকের পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিয়া জনৈক ভক্ত কহিলেন, "সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন—

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব।

আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ তলে কত শত গয়া-গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে কালীর পদে স্মরণ নেব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব॥

পদটী শ্রবণ করিতে করিতে সাধকের দুইগণ্ড বাহিয়া প্রেমবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ভক্ত পুনশ্চ কহিলেন, "মহাত্মাদিগের হৃদয়েই সব আছে। তাঁহারা হৃদয় ছাড়িয়া কুত্রাপি যান না।" অপর একজন ভক্ত কহিলেন, "মন চাঙ্গা তো শিয়রে গঙ্গা।" সাধক মহারাজা বাহাদুরকে কহিলেন, "মহারাজ! আমাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই। আমার কলেবরকে এই স্থানে জগদম্বার সম্মুখে সমাধিস্থ করিবেন।"

সাধকের পবিত্র আত্মা আজ পূর্ণানন্দ ধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার কলেবর ক্ষীণ হস্তপদাদি অবশ, উজ্জ্বল নয়ন ক্ষীণপ্রভ। বিশু সাধকের পদতলে বসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। গিরিগাত্র নিঃসৃত নির্ঝরিণীর ন্যায় শোক বারি। সাধক তাহার হৃদয়ের উদ্বেগ অতি গুরুতর জানিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "অনিত্য বস্তুর আসক্তি ত্যাগ কর।" মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কেহ নত বদনে, কেহ বা সাধকের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কালী বাড়ীর উদ্যানস্থিত বিটপী শাখায় বিহঙ্গমকুল পূর্ব্বের ন্যায় কলধ্বনিতে সমুদয় আশ্রম মুখরিত করিতেছে না, শাখা হইতে শাখান্তরে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে না, গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া উর্দ্ধ ও অধো দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে না, বোধ হইতেছে যেন কি এক অপূর্ব্ব দুঃখে আকৃষ্ট হইয়া নয়ন নিম্নদিকে নিক্ষেপ করিয়া স্থির ভাবে উপবিষ্ট আছে, আশ্রম মধুকর নিকরের কুসুমদলে উপবেশন নাই। তাহারাও সাধকের বিয়োগ যন্ত্রণায় জড়ীভূত ও নিশ্চল। আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী পথগামী অশ্বাদি চতুষ্পদগণ আশ্রমের নিকট আসিয়া ধীরভাব ধারণ করিতেছে, শোকসূচক শব্দে অন্তরের দুঃখ জানাইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। আকাশ নির্ম্মল সূর্য্যদেব প্রসন্ন, সমুদয় দ্যুলোক সাধকের পবিত্র আত্মার স্বর্গারোহণের জন্য আহ্বান করিতেছেন। বর্দ্ধমানের প্রত্যেক স্থানে সাধকের শঙ্কটাপন্ন অবস্থার উল্লেখ ও দুঃখস্রোত চলিতেছে। সাধকের হস্ত হৃদয়ে স্থাপিত, তিনি করাল বদনা মূর্ত্তির সম্মুখে শায়িত। সাধক অতি ক্ষীণস্বরে সলিল পানের ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন। কমণ্ডলু হইতে বারি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সলিল পান করাইবার পূর্ব্বেই পতিত পাবনী ভোগবতী মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে সুন্দর ধারায় সাধকের মুখ মধ্যে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহারাজা প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী নিতান্ত বিস্মিত হইয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের সকলের নয়নে প্রেমবারি। সলিল পান করিয়া সাধক উৰ্দ্ধদিকে নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিস্পন্দ হইলেন। সকলে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। বিশু ও অন্যান্য ভক্ত মণ্ডলীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি সকলেই অবনত বদনে নয়ন বারি বিসর্জ্জন করিলেন। সাধকের কলেবর গেরুয়া বসনে আবৃত হইল। দেবীর সম্মুখে তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

সাধকের মৃত্যু সংবাদ দুঃখস্রোতে সমুদয় বৰ্দ্ধমান সহর প্লাবিত হইয়া গেল। সকলেই দুঃখিত। চিরকালের জন্য সাধকের দর্শন লালসায় কোটালহাটে বহু লোকের সমাগম হইল। মহারাজা বাহাদুর যুবরাজ প্রতাপচাঁদ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী নয়ন জলে সাধকের কলেবরকে সমাধিস্থ করিলেন। কথিত আছে, সাধকের সমাধি সময়ে কালী কীৰ্ত্তন কি হরিনাম সংকীৰ্ত্তনাদি হয় নাই। কারণ তিনি প্রাপ্ত বয়সে দেহ ত্যাগ করেন নাই। প্রায় ৫২।৫৩ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গভূমির অঙ্ক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালা ১১৭০ সালে সাধকের জন্ম হয়, প্রায় সন ১২২৩ সালে সাধক কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোভাবের সময় নির্ণয় করা তত কষ্টসাধ্য নহে। কথিত আছে, সাধকের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে যুবরাজ প্রতাপচাঁদের কঠিন পীড়া হয় ও তাঁহাকে কাল্‌নায় অন্তর্জলী করা হয়। সন ১২২৫ সালে যুবরাজকে কাল্‌নায় অন্তর্জলী করা হইয়াছিল। যে ব্যাধিতে সাধকের দেহ ত্যাগ ঘটে, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, গৃহিণী রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ বলেন, উরু দেশে দুষ্ট ব্রণ হইয়াছিল।

মহাত্মা কমলাকান্ত কলেবর ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আত্মার পবিত্র জ্যোতিঃ চিরকালই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল রাখিবে। যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন আর্য্য ঋষি প্রণীত ধর্ম্মের প্রাধান্য থাকিবে, যতদিন ধার্ম্মিক লোক থাকিবে, যতদিন ভক্তি ও প্রেমে মানুষের হৃদয় দ্রবীভূত হইবে, ততদিন তিনি জীবিত থাকিবেন। তাঁহার সৃজিত গীতাবলী সরোবর

হইতে ভক্তি ও প্রেমবারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া প্রেম পিপাসু মানব তৃপ্তিলাভ করিবেন। তাঁহার রচিত পদাবলী আতুর হৃদয়ের শান্তনা বারি, দরিদ্রের ধন, সাধুজনের সঙ্গী, সংসারীর সংসার জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়।

সাধকের পিপাসা শান্তি হেতু কোটাল হাটের কালী বাড়ীতে দ্রবময়ী গঙ্গার আবির্ভাব সন্দর্শন করিয়া যুবরাজ প্রতাপচাঁদের নিতান্ত ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যোগবলকে পার্থিব সমুদয় পদার্থ হইতে বলবান বিবেচনা করিয়া স্বীয় রাজাস্পদকে নিতান্ত তুচ্ছ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে নিজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন! মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে বৰ্দ্ধমানে আনিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মানসিক উদ্বেগের শান্তি করিতে পারিলেন না। তাঁহার কঠিন পীড়া হইল, জীবন সংশয় জানিয়া তাঁহাকে কাল্‌নায় অন্তর্জলী করা হইল। কেহ কেহ বলেন, যুবরাজের পীড়া সাঙ্ঘাতিক হয় নাই। তিনি হঠযোগ বলে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ সৈকত শয্যায় শায়িত হইলে ঘোরতর বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হয়, অনুগামীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হন। তিনি সেই সুযোগে দেহ সঙ্কোচ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করেন। যাহা হউক, যুবরাজের মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে যুবরাজ প্রতাপচাঁদের অনুরূপ এক ব্যক্তি বৰ্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে অনেকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু বৰ্দ্ধমান রাজবংশে কেহই তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্বীকার না করায় হুগলীর বিচারালয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। কলিকাতার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আগন্তুকের পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু বিচারে তিনি জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এই ব্যক্তি শ্রীরামপুরের কর্ত্তাভজন সম্প্রদায়ের কর্ত্তা রূপে গৃহিত হইয়া কিছু দিন পরে মারা যান। বিশু সাধকের স্বর্গারোহণের পর গুরুর আদেশ অনুসারে কিছু দিন কোটাল হাটে অবস্থান করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। বিশুর ইচ্ছানুসারে সাধকের সমাধির চরণ তলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। অমরারগড়ের কেনারামও সাধকের দেহ ত্যাগের পর অল্প দিন পরেই দেহ ত্যাগ করেন।

সম্পূর্ণ।

বিমুক্ত।

লেখক—শ্রীকমলা কান্ত বসু।

(৪)

"চুপ কর্ মঞ্জরী, বেশী বকিস্‌নে। একে ত মগজ বিকড়ে গেছে, কি বাজে সব আবোল তাবোল বক্‌ছিস, শেষে কি বদ্ধ পাগল হবি?—কর্, মাকে মনে মনে স্মরণ কর্, পাবি তার মাতৃস্নেহ, পাবি করুণা—দয়া। মিছিমিছি বকিস্ কেন? ওতে যন্ত্রণাও বাড়ে, মাথাও গরম হয়। অত ভেবে আকুল হ'স না। তিনি ত করুণাময়ী, দয়াময়ী,—তিনি নিজের কন্যাকে করুণা না করে' থাকবেন কি? ভাবিস্‌নি, ভাবলে আরও ব্যথা বাড়বে, আরও দুঃখবোধ হবে। তাকে স্মরণ কর সুধু—"

... ...

"সত্যিই ত দিদি, ঐ কে আমার পাশে বসে' দু'হাত ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনা। ঐ যে কার অঙ্গ সৌরভ ভেসে আসছে। ঐ যে কা'র আশ্বাস বাণী কাণের পাশে শুনতে পাচ্ছি। ঐ যে দিদি আর কোন ভুল নেই মা স্বয়ং তবে কাছে এসেছেন।"

"থেকে থেকে কি বক্‌ছিস মঞ্জরী! এই খানিক আগে এক বল্‌লি আবার পরেই একি সব বল্‌ছিস্—"

"না দিদি আবোল-তাবোল নয়, সত্যিই মা এবার অলক্ষ্যে দেখা দিয়েছেন। আঃ প্রাণ জুড়োল, শরীরের সব তাপ দূর হ'ল। আর কি, দিদি, আর কোন ভয়ে নেই। শীঘ্র মার কোলে স্থান পাব। আশা আমার মিটেছে।

মাধবী মঞ্জরীর এ অপরিসীম আনন্দের—কিছু মাত্র ভাব বুঝিতে পারিল না। "মঞ্জরীর পূর্ণ বিকার হইয়াছে" এই ধারণায় সে অত্যাধিক ভীত হইল। মঞ্জরীকে থামাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে প্রলাপ বাক্যের মত কত কি মহোল্লাসে কহিয়া যায়, তাহা মাধবীর শক্তিকে পরাজিত করে।

(৫)

সপ্তমীর সকাল। ভোর হইতে না হইতেই মঞ্জরীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সে যেন আজ রুগ্ন দেহে এক মহাশক্তি লাভ করিয়াছে, উঠিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"দেখ, দিদি, কাল রাত্রিতে সত্যিসত্যিই মা দশভুজে স্বপ্নে অন্তরে দেখা দিয়েছিলেন। তুমি হয় ত বিশ্বাস করবে না,—মার সঙ্গে কাল কথা ক'য়েছি। মাকে জিগ্যেস করলুম,—'মা, এতদিন আমি কি কষ্টই না ভোগ করেছি, তোমার মা কি তখন মনে ব্যথা জাগেনি, তনয়ার যন্ত্রণা দেখ মনে কি অনুকম্পা বোধ হয়নি?' মা আমাকে একটু হেসে বল্‌লেন (কি জান, দিদি)—'মা, তুমি বুঝতে পারনি। আমাকে অকারণে সে দিন 'পাষাণী' বলেছ। মেয়ের রোগ শোক হ'লে জননী কি অটল থাক্‌তে পারে। যতই হোক, মার মনটাও ত মন, সে মন সর্ব্বদা স্নেহে ও দয়ায় ভরা, মেয়ের ওপর টান সকল সময়, তবে কেন উল্টো বুঝেছিলে। তোমার শিয়রে যে আমি সকল সময় বর্ত্তমান ছিলুম, তুমি ত তা বোঝনি। আমি—সকালে এসেছি, বিকালে এসেছি, ফুলের গন্ধে এসেছি, তোমার সুখে দুঃখে এসেছি, অশ্রুমাঝে এসেছি, তবু তুমি বুঝতে পারনি, তাই মিছিমিছি দিনরাত কেঁদেছ।"

আজিই ত মার পূজো দিদি? সপ্তমী? চল, শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ি—

"কর কি কর কি, শোও শোও, উঠো না উঠো না।"

"কি দিদি শোব? আজ দেহে বল এয়েছে, ক্লান্তি, রোগে, শোক, সব মুচে গেছে, আজ যে মা'র পূজো।—উঠব, চল, আজ বেস সেরে উঠেছি,—এবার মার বন্দনা,—চল সব যোগার যন্ত্র করিগে। মা মহামায়ার করুণা পেয়েছি বটে, সেদিন কি সব ভুল বক্‌ছিলুম। এস দিদি ঐ শোন উৎসবের বাঁশী বেজে উঠেছে;—কে গাহিছে—

এস এস উমা হর মনোরমা
প্রাণের বেদনা তোমারে কই,
মরণের কথা হৃদয়ের জ্বালা
আর কে বুঝিবে জননী বই?

* * * *

সর্ব্বসিদ্ধিময়ী তুমি মা ভবাণী
কণামাত্র তব করুণা চাই,
অনন্তের পথে অনন্ত ভ্রমণে
পরিণামে সিদ্ধি যেন মা পাই।"

অশ্রুকণা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

(৬)

দুই তিন দিবস হইতে প্রমথ গ্রামে আসিয়াছে। সে কলিকাতায় অবস্থানের সময়েই অমিয়বালার পত্রে জানিতে পারিয়াছিল জীবনবাবুর কন্যা কিরণমালার কলিকাতা শ্যামপুকুরে এক মধ্য গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্রের সহিত বিবাহ হইতেছে এবং আরও জানিয়াছিল যে জীবনবাবু প্রীতিভোজনের দিবস তাহাকে ও দাওয়ান পরেশ বাবুকে শ্যামপুকুরে লইয়া যাইবে। কথিত দিবসে সে এবং পরেশবাবু কিরণমালার শ্বশুর বাটীতে জীবনবাবুর সহিত নিমন্ত্রণে গিয়াছিল।

প্রমথ কার্য্যগতিকে গ্রামে আসিবার পর একদিনও জীবনবাবুদের বাটী যাইতে পারে নাই। আজ সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইবে ঠিক করিয়া পুনরায় কি ভাবিয়া জীবনবাবুদের বাটীতে উপস্থিত হইল। বাহিরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রমথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল,—"অবু! অবু!"

ডাক শুনিয়া কুসুমস্তবক তুল্য একটী ফুটফুটে বালক বাহিরের দিকে ছুটিল—অর্দ্ধেক পথেই প্রমথ তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল,—"কি গো অবনী বাবু!"

বাধা দিয়া অবনী একরাশ হাসি ছড়াইয়া বলিল, "বাঃ! প্রমিদা তুমি বুঝি আমাদের বাড়ী আসতে পার না?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "না ভাই সময় পাইনি ভাই। মোটে ত আজ তিন দিন এইছি।"

ঠোঁট ফুলাইয়া অবনী বলিল, "যাঃ ভারি তো কাজ! সময় পাইনি! ও কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রথম বলিল,—চল মার কাছে যাই।"

"আচ্ছা" বলিয়া অবনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"প্রমিদা আমার জন্যে কি এনেছ এবার?"

কি বল দিকি—বলিয়া প্রমথ হাসিয়া উঠিল।

তা আমি কি করে বল্‌ব—বলিয়া অবনী প্রমথর দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিল।

দুয়ো বল্‌তে পার্‌লে না—বলিয়া প্রমথ আবার হাসিয়া উঠিল।

কথা কহিতে কহিতে বাটীর ভিতর উভয়েই আসিয়া পড়ায়—অবনী ও-মা প্রমিদা এসেছে! প্রমিদা এসেছে! বলিয়া হাঁসারব করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরে মেজদি তোর বর এয়েছে বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে উপরে উঠিল।

কাছেই পাকশালায় নীহারবালা কি একটা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। অবনী ও প্রমথর গলা পাইয়া তিনি বাহিরে আসিতেই প্রমথ নীহারবালাকে প্রণাম করিল। নীহারবালা "জয় হোক ধর্ম্মে মতি হোক এবং আরও কয়েকটি শুভসূচক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তাহার কুসলাদি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিলেন,—ওরে অশ্রু। কে এয়েছে দেখে যা।"

অশ্রুকণা পূর্ব্বেই অবনীর কাছ হইতে এই সুখবর পাইয়া ছিল। পাইতেই তাহার বুক কি একটা পুলক হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল। সে কি জানি কেন হঠাৎ বাহির হইতে পারিল না। আনন্দের অথবা লজ্জার আতিশয্য কাটিয়া গেলে সে উপর হইতে নীহারবালা অথবা প্রমথর অলাক্ষাতে বহু দিনের দৃষ্টি বহির্ভূত প্রমথকে অজানিতে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

এমন সময় নীহারবালা আবার বলিলেন,—ওরে অবনী প্রমিকে ওপরে নিয়ে যা।

আত্মহারা অশ্রুকণা উত্তর দিতে অথবা নীচে নামিয়া আসিতে ভুলিয়া গেল।

এদিকে নীহার বালা কথা কহিতে কহিতে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন।

অশ্রুকণার কাছে যাইবার জন্য প্রমথর মন উপরের দিকে টানিতে ছিল।

এবং সে কেন নীচে এখনও নামিয়া আসিল না, তাহাই ভাবিতে ছিল। কিন্তু নীহারবালা অন্যমনস্ক ভাবে কথার পর কথা কহিতে লাগিলেন—কাজেই প্রমথর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

নীহারবালার একটা অভ্যাস ছিল কথা কহিবার সময় তিনি আর সব ভুলিয়া যাইতেন। তিনি যে অশ্রুকণাকে ডাকিয়াছেন এবং অশ্রুকণা যে এখনও আসে নাই তাহা তিনি একদম লক্ষ্য করেন নাই।

নীহারবালা বলিলেন,—আমি প্রায়ই তোমাদের বাড়ী যাইয়া তোমার খপর লইয়া আসিতাম। কিন্তু তুমি বেশ ছেলে। কখনও একখানা চিঠি লিখিয়া কেমন আছি খবর লইতে পার নাই।

প্রমথ একটু অপ্রতিভের মত বলিল,—বাঃ আমি ত মার কাছে প্রত্যেক চিঠিতেই আপনার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতাম। মাও ত আপনার সংবাদ লিখিতেন। অবশ্য আপনাকে আমি স্বতন্ত্র পত্র লিখি নাই এটা ঠিক্।

নীহার ঘাড় নাড়িয়া কৃত্রিম গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—কেন কি দোষে।

প্রমথর হাসি পাইল, বলিল,—দোষ আবার কিসের ?

নীহারবালা এইবার হাসিয়া বলিলেন,—তবে লেখ নাই ?

প্রমথ আবার হাসিয়া বলিল,—স্বতন্ত্র পত্র দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

নীহারবালা কথা উল্টাইয়া বলিলেন,—এখন বুঝি কলেজের ছুটী ?

প্রমথ বলিল,—হ্যাঁ মা।

নীহারবালা বলিলেন,—আবার কবে যাবে ?

প্রমথ বলিল,—না মা আর যাব না। দাদা মহাশয় আর মার ইচ্ছা এখন আমি জমিদারী দেখি ও বিষয় কর্ম্ম চালাই।

নীহারবালা হাসিয়া বলিলেন,—তা বেশ ত বাবা। তবে সুধু জমীদারী দেখলে কি হবে—তার সঙ্গে আর "একটিও" পছন্দ মত দেখ !

প্রমথ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখের উপর দিয়া অলক্ষিতে একটা হাসির লহর খেলিয়া গেল।

এই সময় অবনী সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—মা নীরেন এয়েছে—আমি খেলতে যাব ?

নীহারবালা বলিলেন,—যা সকাল সকাল বাড়ী আসবি !

নীহারবালার কথায় কোন লক্ষ্য না করিয়া অবনী বলিল,—প্রমিদা !

তুমি ওপরে যাও—মেজদি কি একটা সেলাই করছে—আমি তোমার কথা বলিছি।

হঠাৎ নীহারবালা সচকিতের মত বলিয়া উঠিলেন,—কই অশ্রু ! কি কর্‌ছিস ? প্রমথ যে দাঁড়িয়ে রইল। ওপরে নিয়ে গেলিনি !

এদিকে দিদির বিবাহের পর হইতে অশ্রুকণার আর সে চঞ্চলতা নাই। এখন সে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়াছে। তাহার দেহে জলভরা নদীর মত সৌন্দর্য্যের ঢেউ ছাপাইয়া উঠিতেছে। সে এখন প্রমথর সম্মুখে কি ভাবিয়া বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছে।

নীহারবালা আবার ডাকিলেন,—অশ্রু।

অশ্রু এইবার উত্তর দিল,—কি মা ?

কথায় ঝঙ্কার দিয়া নীহারবালা বলিলেন,—পোড়ার মুখি তুই শুনতে পাচ্ছিস না—প্রমম এয়েছে—ওপরে নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।

অশ্রুর বুকটা প্রমথর নাম শুনিয়া আবার দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, যাই।

পরক্ষণেই সারা অঙ্গে একটা রূপ ও লজ্জা মাখান মাধুরী লইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্রু সঙ্কোচ ভরে বলিল, কি প্রমিদা যে, চল ওপরে যাই। এইটুকু বলিতেই তাহার গলা কাঁপিয়া গেল।

প্রমথ বালিকার গম্ভীর ভাব দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিল,—চল যাই।

নীহারবালা বলিলেন, তোমরা একটু গান অথবা গল্প সল্প কর গে যাও, আমি একটু পরেই যাব।

দ্বিতলে সানে বাধানো বারান্দার মেঝ ঈষৎ বক্রভাবে তিন দিকে গিয়া শেষ হইয়াছে। ইহারই এক পাশে অশ্রুকণার কক্ষ ! ঘরের ভিতরে একটী আলমারির মধ্যে নানারকমের পুতুল রহিয়াছে। ইহাদের সরল সাজ সজ্জার দিকে চাহিতেই কোমলমতি অশ্রুকণার প্রাণের প্রকৃত সরলতার পরিচয় মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। ঘরের মাঝখানে একটী পালিস করা টেবিল ও তাহার চারিধারে চারিখানি চেয়ার রহিয়াছে। ঘরের দেওয়ালে বিলাতি ফ্রেমে বাঁধানো খান কতক অয়েলপেন্‌টিং ও কাগজের চিত্র শোভা পাইতেছে।

অশ্রু প্রমথর আগেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। প্রমথ ঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আপনার মনে ভাবিতেছে,—কই অশ্রু ত আমার সহিত

আর আগেকার মত কথা কহিতেছে না। সে বেড়াইতে যাইতে এত ভালবাসিত কই আর বেড়াইবার কথা উল্লেখ করিতেছে না। কেন সে এমন হইল?

তবে শোন প্রমথ! বালিকার চঞ্চলতা চিরদিন সমান থাকে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চঞ্চলতা কমিয়া আসিয়াছে। সে এখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়াছে। সঙ্কোচের ভাব ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। আর এক কথা প্রমথ! মনে নাই বালিকাকে তুমি শৈশবকাল হইতে ভালবাসিয়াছ, তাহার সহিত খেলা করিয়াছ, তাহার সহিত বেড়াইয়াছ তাহাকে কত গল্প বলিয়াছ, সেও তোমাকে কতবার ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছে, খেলা করিয়াছে, তোমাকে অবিচলিত ভ্রাতৃস্নেহে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু আজ, সে আর তোমাকে ভ্রাতৃস্নেহে ভালবাসিতে চাহিতেছে না, আজ আর সে "পুতুলের বিয়ে" খেলা খেলিতে চাহিতেছে না। আজ সে ভ্রাতৃস্নেহ হইতে ঢের উচ্চ একটা স্নেহে তোমাকে ভালবাসিতে চাহিতেছে। আজ সে "পুতুলের বিয়ে"র মতনই একটা সত্যি ঘরের খেলা খেলিতে চাহিতেছে। আজ সে আর তোমাকে ফুলের মালা পরাইতে চাহিতেছে না। আজ সে তার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সব প্রেম, স্নেহ ও ভালবাসার মালা গাঁথিয়া তোমার চরণতলে আপনাকে উপহার দিতে চাহিতেছে।

আজ তার হৃদয় কানন নূতন সাজে সাজিয়া উঠিয়াছে। সেখানে ঘাসে ঘাসে, গাছে গাছে, লতায় লতায় থরে থরে নূতন ফুল ফুটিয়াছে। সেখানে আকাশ বাতাস কার যেন মধুর বাঁশীতে সঙ্গীত মুখরিত হইয়া আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

জীবনে এমন একদিন আসে যখন নিত্যকার দেখা এই জগতই যেন নবীন স্বপ্নময় রাজত্ব বলিয়া মনে হয়। আকাশ নবীন সাজে সাজিয়া উঠে। বাতাস নবীন সুরে গান তুলে। জ্যোৎস্না নবীন আলো ছড়াইয়া দেয়। ফুলের মুখে নবীন হাসি নাচিতে থাকে।

তখন যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই মিষ্টিমাখা বলিয়া মনে হয়। সবেরই যেন নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। দূরের আকাশের তলে ছোট বড় বাড়ীগুলি মন্দিরের ছোট বড় চূড়াগুলি, আঁকা বাঁকা ছোট বড় পথগুলি সব যেন জীবন্ত বলিয়া ধারণা হয়।

জীবনে এমন একদিন আসে, অশ্রুরও বুঝি সেদিন আসিয়াছে। আগে

কার স্নেহ, আগেকার ভালবাসা, ভ্রমণে যাওয়া, পুতুল খেলা, এখন তার মনে অস্পষ্ট—এখন তার প্রাণে নূতন নূতন সাধ ভাসিয়া আসিতেছে যাইতেছে। সেই সাথেই সে নাচিতেছে—হাসিতেছে।

প্রমথ! বুঝিতে পারিতেছ না?

অশ্রু প্রমথকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিজেও লজ্জায় মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখেও একটী কথা ফুটিল না। আঁচলের এক প্রান্ত সে হাতে তুলিয়া এক একবার আঙ্গুলে জড়াইতে এবং এক একবার খুলিতে লাগিল। আবার এক একবার নত দৃষ্টি তুলিয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান একখানি ছবি দেখিতে লাগিল, আর এক একবার তাহার মনে হইতেছিল ঘর হইতে পলাইয়া যায়, কিন্তু প্রমথ ঘরের দরজায় এমন ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে অশ্রুর পক্ষে সে ঘর হইতে পলান একেবারে অসম্ভব বলিলেও বলা যায়।

এই ঘরে প্রমথ ও অশ্রুকণা ভিন্ন যদি আর একটী প্রাণী থাকিত তাহা হইলে সে প্রমথ ও অশ্রুকণার তখনকার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিত যে কি একটা মহা সমস্যার সন্ধিস্থলে তাহারা দাঁড়াইয়া আছে।

প্রমথর এইরূপ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, কিন্তু অশ্রুর লজ্জাবনত রাঙ্গা মুখের দিকে চাহিয়া সে সব ভুলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু অশ্রুকণা কি করিবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রমথ বলিল—অশ্রু, কিরণ কোথায়? কিন্তু এই সামান্য কথা বলিতেই প্রমথর গলা বাধিয়া যাইতে লাগিল। প্রমথ নিজেই বুঝিতে পারিল না যে এরূপ অসংলগ্ন কথা হঠাৎ তাহার মুখ হইতে কিরূপে বাহির হইল। সে ত জানিত কিরণ শ্যামপুকুরেই আছে।

অশ্রু কোন উত্তর দিল না হেট মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আর এ কথা ফিরাইয়া লইবার উপায় ছিল না, তাই প্রমথ একটু গলা ঝাড়িয়া লইয়া পুনরায় বলিল, অশ্রু কিরণ কোথায়?

অশ্রু এইবার নত দৃষ্টি তুলিয়া প্রমথর দিকে চাহিল, পরক্ষণেই উত্তর দিল, শ্বশুর বাড়ী।

প্রমথ এইবার সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, জীবনবাবু কোথায়?

অশ্রুকণা আবার নত মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, বেড়াইতে গেছেন।

ঠিক এই সময়ে নীহারবালা উপরে বারান্দায় আসিলেন। প্রমথ ও অশ্রুকণাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইলেন, বলিলাম, তাহার কারণ প্রমথ ও অশ্রুকণার মুখে চোকে তখন এমন একটা ভাব মাখানো ছিল যাহা দেখিয়া সংসার অভিজ্ঞা, প্রবীণা নীহারবালা কি একটা সন্দেহ করিলেন এবং এই সন্দেহেতেই তিনি বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক সেই দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে বড় মধুর লাগিল—তিনি একটা কি কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—কি রে অশ্রু! প্রমিকে বসতে বলিস নি? তোর রকম কি?

অশ্রু কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহার মুখ চোক অসম্ভব রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বুকের স্পন্দন বর্দ্ধিত হইল। অশ্রু অপরাধীর মত লজ্জায় মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীহারবালা অশ্রুর কাছ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া প্রমথকে বলিলেন, প্রমি! তুমিও ত আচ্ছা! নিজে কি বসতে পার না? তোমাকে কি বসবার জন্যে একজন লোক বলে দেবে?

পুলক লজ্জায় প্রমথর বুকের ভিতরটা দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল এই কাঁপুনিটুকুও বুঝি বা নীহারবালা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। সেই উদ্ধত বেগটাকে বাধা দিবার জন্য প্রমথ প্রাণপণ চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না।

উত্তর না পাইয়া নীহারবালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রমথর দিকে চাহিলেন,—প্রমথর দৃষ্টি আপনি আপনি নত হইয়া পড়িল। প্রমথ যদি সে সময় নীহারবালার দিকে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিত নীহারবালার চোকে কি এক হাস্যোৎজ্জ্বল কৌতুক লহরী নাচিতেছে। কিন্তু প্রমথ পূর্ব্বেই মুখ নত করিয়াছিল, তাই ইহা তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

নীহারবালা এ ভাব সামলাইয়া লইয়া কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, কি কোমার হ'ল কি? ব'স না।

কম্পিত কণ্ঠে বসছি বলিয়া প্রমথ একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। ফাঁক পাইয়া অশ্রুকণা নিমেষের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

নীহারবালা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া প্রমথকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

প্রমথ ইহার মধ্যে নিজের চিত্তকে যথাসম্ভব দৃঢ় করিয়া লইয়াছিল, সেও বেশ সহজভাবে উত্তর দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর প্রমথ বলিল, মা, তবে আজ আসি?

নীহারবালা বলিলেন, তা একটু জল খেয়ে যাও, কি বল?

প্রমথ প্রথমে একটু অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু নীহারবালা তাহাকে বার বার অনুরোধ করায়, অবশেষে বলিল, আচ্ছা দিন।

নীহারবালা একটু হাসিয়া ডাকিলেন, অশ্রু!

বাহিরে আসিয়া অশ্রুকণা একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছিল। পাকশালার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া, সে নখ দিয়া দেওয়ালের বালি খুঁড়িতে খুঁড়িতে আপনার উপর আপনিই রাগ করিতেছিল,—কেন সে অমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রমিদাকে বলিলেই হইত। আবার তাহার প্রমথর উপরও অভিমান হইতেছিল, কেন সে ঘরে ঢুকিয়া আপনি বসিল না, বা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিল না।

এমন সময় নীহারবালা আবার ডাকিলেন, অশ্রু!

অশ্রুকণা নীচ হইতে উত্তর দিল, কি মা? তাহার গলা অনেকটা সহজ।

নীহারবালা বলিলেন, ওপরে শুনে যা।

অশ্রুকণা যথা সম্ভব আত্মসংবরণ করিয়া উপরে আসিল। তবুও তাহার পা বড় কাঁপিতেছিল।

কক্ষের দুয়ারে আসিয়া সে নীহারবালার দিকে চাহিয়া বলিল,—কি মা?

নীহারবালা বলিলেন,—খানকতক লুচি, আর একটু চিনি এনে প্রমিকে দে। আর এক গ্লাস জল আনিস।

* * * আহার শেষ হইলে নীহারবালা বলিলেন,—অশ্রু ও ঘর থেকে পান নিয়ে আয়।

অশ্রু পান লইয়া প্রমথর হাতে দিতে কাছে আসিল। প্রমথও হাত পাতিল। কিন্তু প্রমথর হাতে পান দিবার সময়, অশ্রুকণার হাত হইতে পান পড়িয়া যাইল।

লজ্জায় অশ্রুকণা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল। কানের কাছে গরম রক্ত শোঁ শোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

প্রমথ পান তুলিয়া লইয়া বলিল, আসি আজ?

নীহারবালা মনে মনে কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, আবার আসছ কবে?

প্রমথ পান চিবাইতে চিবাইতে সহজ কণ্ঠে বলিল, এখন আমি ত আর কলকাতায় যাচ্ছি না মা। চার পাঁচ দিন পরে আসব।

নীহারবালা গম্ভীর স্বরে বলিলেন; তা বই কি, আমাদের বাড়ী তোমাদের বাড়ী থেকে ক্রোশ সাতেক দূরে, তাই চার পাঁচদিন পরে আসবে।

প্রমথর মুখের উপর দিয়া হাসি খেলিয়া গেল, প্রমথ বলিল, আচ্ছা মা দু'এক দিন পরে আসব।

নীহারবালা মেঝের উপর বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া অশ্রুকণার খাটের উপর শুইয়া পাখার বাতাস খাইতে খাইতে বলিলেন, অশ্রু! সিঁড়ির ল্যাম্পটা হাতে কোরে প্রমথকে নীচে দিয়ে আয়।

অশ্রু ঘরেই এতক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। বাগানের ফোটা ফুলের গন্ধ মৃদু বাতাসে খোলা জানালার পথে ভাসিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে দুই একটী তারা উঁকি দিয়া অশ্রুকণার দুর্দ্দশা দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল।

মার কথায় অশ্রুকণা কক্ষের বাহিরে আসিল। সিড়ির ল্যাম্প লইয়া সে এক বার পিছনের দিকে তাকাইল—প্রমথ তাহার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, চল।

অশ্রুকণার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা না কওয়ায় প্রমথরও এতক্ষণ নিজের উপর বেশ একটু রাগ ছিল। তাহার উপর তাহার মন অশ্রুর সহিত কথা কহিবার জন্য উসখুস করিতেছিল, তাই ফটকের কাছে আসিয়া প্রমথর মুখ খুলিয়া গেল, বলিল, অশ্রু! তবে আজ আসি?

অশ্রু প্রমথর দিকে প্রতিমার মত উজ্জ্বল নয়ন দুটী মেলিয়া একবার চাহিল, উত্তর দিল না।

অশ্রুকণার নয়নে এমন এক দৃষ্টি মাখান ছিল, যাহাতে প্রমথ বুকে একটু ব্যথা অনুভব করিল। আর একবার "অশ্রু আসি" বলিতে তাহার স্বর ধরা ধরা হইয়া গেল।

অশ্রু এইবার ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া ভাঙ্গা অথচ একটু জোর গলায় বলিল,—কবে আসবে?

হায় রে মূঢ় বালিকা! ইহার ভিতর বাধাবাধি নাই। সে যদি না আসে! তবু—তবু—বিদায়ের সময় বুঝি প্রাণে বেশী করিয়া ব্যথা বাজে। যাওয়ার আর আসা, সার্থকতা বুঝি যাওয়ার ভিতর দিয়াই, যাওয়ার ভিতর দিয়াই বুঝি ফিরিয়া পাওয়া যায়? তাই বুঝি অত আগ্রহ?

অশ্রুর কথা শুনিয়া প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, পরশু।

প্রমথর কথায় অশ্রুকণা মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটাইয়া বলিল,—আচ্ছা, এসো।

বালিকার কথায় ভাবে ভঙ্গীতে প্রমথ বেশ বুঝিতে পারিল, আজ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বালিকার প্রাণে কি একটা অব্যক্ত বেদনা বাজিয়া উঠিতেছে। প্রমথর মনেও দারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল, বলিল;—অশ্রু! আবার আসবো, তুমি কিছু ভেবো না, বা দুখ্যু কোর না।

অশ্রুর মুখখানি ক্ষণিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সহজ কণ্ঠে বলিল,—আচ্ছা।

ক্রমশঃ

মায়াবী ও পথিক।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

অমাবস্যার রাত্রি সে দিন, কি ভীষণ! কি ভয়ঙ্কর। আকাশের অবস্থা তখন নিতান্ত ভয়াবহ। উজ্জ্বল কৃষ্ণ মণ্ডিত নিবিড় মেঘমালা অবাধ আক্রোশে উড়িয়া বেড়াইতেছে—উহার কোলে মুহুর্মুহুঃ ভীতিপ্রদায়ক দামিনীস্ফুরণ হইতেছে আর অবিরত ভীম গর্জ্জন তুলিয়া ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রবাহিত হইতেছে।

নিম্নে অনন্তা ধরণী। দেখিলেই মনে হয় শীঘ্রই মহাসঙ্কট সমাগত হইবে। সুগভীর তমসায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উহার সমুদয় সৌন্দর্য্য যেন লুপ্ত হইয়াছে। অদূর সুবিশাল বিরাট বারিধি অনন্ত প্রবাহে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির ভীমকল্লোল তুলিয়া বেগে ধাবিত হইতেছে। আর তাহারই এক পারে এক সুমন অন্ধকারাচ্ছন্ন নিবিড় গিরিসঙ্কুল গহন তাহার মধ্যে কোথায় বৃক্ষ কোথায় কি কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেবল সুদূর ঝঞ্ঝাঘাতে প্রবল বৃক্ষস্পর্শী গর্জ্জন গম্ভীর শ্রুতিগোচর হইতেছে।

উহার মধ্য দিয়া এক পথিক নির্জ্জন সঙ্কটময় রাত্রে অবিচলিত গতিতে চলিতেছে, যেন সে কোন অমৃতলোকের সন্ধানে, সে কোন দুষ্প্রাপ্য চরণোদ্দেশ্যে, অথবা বুঝি কোন আকাঙ্ক্ষা সফলাভিপ্রায়ে। কত কণ্টকাকীর্ণ, কত

বন্ধুর, কত ভূমির উপর দিয়া—অধিত্যকা উপত্যকা ডিঙ্গাইয়া সে চলিয়াছে—কত দূর চলিয়াছে—সীমা নাই অন্ত নাই পশ্চাতে সে কত পথ ফেলিয়া আসিয়াছে ভ্রুক্ষেপ নাই। দৃষ্টি নাই।

সহসা এক ভীষণ ব্যাত্যা উঠিল। আকাশের তমসাচ্ছন্ন মেঘের দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। আকাশ পৃথিবী যেন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। সর্পের ন্যায় ফণা তুলিয়া বিদ্যুৎজ্যোতিঃ যেন কাহাকে গ্রাস করিতে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ বনের মাছে হিংস্র পশুদল হাসিয়া উঠিল।

তবুও ভ্রুক্ষেপ নাই। বিপদের চিন্তা নাই! অনন্ত পথের যাত্রী অনন্তের মুখেই চলিয়াছে। থামিবে কেন?

নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন কোন মায়াদেবী এই গহনবনে দীপ্ত আভাষে পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"কোথায় চলেছ হে পথিক ভেদি মন
তমসাকীর্ণা গভীরা অমানিশীথিনী;
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, চেয়ে দেখ, দেখ ফিরে—
কি ভয়াবহ আকৃতি গহন বনের?"

সহসা চকিল কায় থামিল পথিক,
অগ্রসরি কত পদ। আরম্ভিল তবে,—
"বল কে মায়াবী তুমি অবরোধিবারে
মোর পথ পশ্চাৎ হইতে কহিতেছ
এরূপে আমারে? কি বাসনার বাসা
বাধিয়াছ মনে? কেন অবরুধ পথ?"

উত্তর করিল তবে মায়াবী পশ্চাতে,
"সুনিশ্চয় হাঁা, সুনিশ্চয় জেন পান্থ
নহি কেহ আমি রুধিতে তোমার গতি।
তুমি অনন্তের—কোন অসীম মার্গের
যাত্রী, হে পান্থ, বাধিতে তোমার গতি
সাধ্য কি আমার?
কেবলি চলেছ তুমি,—
নিবধিয়া তাহা করিনু দু'এক প্রশ্ন?

শুধু শুনিবারে তব অনন্তের মধুমাখা
দু' চারিটী কথা, কহ তবে পান্থ, নমি
নমি তোমা।" নীরবিলা মায়াবী প্রকৃতি।
তবে শুন আরম্ভিল পথি "শুন দেবী,
এ অসীম ভবমণ্ডলে সকলে পথিক।
হের ঐ সুদূর গগনমণ্ডলে দীপ্ত
নক্ষত্রমণ্ডলী—প্রত্যেকে উহারা জেনো তুমি,
এক এক অনন্তলোকের যাত্রী দেবী?
আকাশ বাতাস সাগর পৃথিবী তুমি আমি
প্রতি জীব সবে অনন্তলোকের যাত্রী।
কি চাও শুনিবারে আর—পথিক আমি
চলিব ধরিয়া পথ—অসীম অপার।
যদি হেরিয়াছ মোরে আধার মাঝারে
তুমি, তবে চেয়ে দেখ এ ধারাত্মা পানে।
হবে না বিচলিত হৃদি হেরি আসন্ন
বিপদ, অথবা ডরিবে না কভু চিত্ত
মোর—যত ঘোর আশঙ্কার মাঝে দেবি?
আসুক প্রলয় বহ্নি গ্রাসিতে আমারে,
ঘনাক উন্মত্ত বাত্যা নাশিতে পরাণ,
কি ভয়—কিসের ভয় আমার তাহাতে?
চাহি আমি দিতে বুক পাতিয়া তাহার
সম্মুখে। তবেই ত বীর হৃদয় তাহা?
লুকাব কি তবে আমি শুনিয়া ঈষৎ
বজ্র কড়মড়ি নভস্তলে? দেখেছ কি
সিংহশিশু ডরে কভু হেরি ফেরুপাল?
চলিনু তবে, বৃথা ক্ষয় কাল,—অনন্ত
পথের যাত্রী আমি—নাহি পথের শেষ,
অবিরাম গতি মোর নাহি শ্রান্তি ক্লেশ।"

সহসা বিভীষণ বজ্রনিনাদ উত্থিত হইল—আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঝম্ ঝম্ রবে প্রবল ধারাসম্পাতের সূত্রপাত হইল। পথিকের কণ্ঠস্বর উহারই

সহিত মিশিয়া গেল। পরিশিষ্ট কথা শোনা গেল না। দুইজনে যেন সেই গহনের দুই প্রান্তে এক মুহূর্ত্তে বিলীয়মান হইল।

স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভুষণ মহাশয়ের জীবন চরিত।

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত খোষ কামতা নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে "সিদ্ধবিদ্যা" ঠাকুর বংশে ১৭৭১ শকে চৈত্র মাসে শুক্লা চতুর্থী তিথিতে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম ৺জয়গোপাল বিদ্যাভূষণ, মাতার নাম ৺শিবসুন্দরী দেবী, (বংশ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে) সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়েরা সাত ভ্রাতা এবং পাঁচ ভগিনী। তাঁহাদের নামের একটি বাংলা পদ্য আছে, ইহা অন্যান্য অনেক দেশে প্রসিদ্ধ যথা,—

"কালী কাশী অজয় জয়,
ভুবন যাদব দয়াময়।
যুনী টুনী করুণা,
কমল বিমল দক্ষিণা॥"

দক্ষিণা নামটী বড় ভ্রাতার বড় কন্যার নাম দিয়া শ্লোকের পাদ পূরণ করা হইয়াছে।

মিথিলাধিপতি লক্ষ্মণ মাণিক্য নোয়াখালী চরভুমিতে নিজ রাজধানী স্থাপন করিলে কিছু দিন পরে সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ প্রধান পণ্ডিত আনন্দরাম তর্কপঞ্চানন চন্দ্রশেখর তীর্থ দর্শনোপলক্ষে রাজার দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার বিশেষ অনুরোধে সেই দেশে বাস করিতে বাধ্য হন। উক্ত আনন্দরাম হইতে সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয় নবম পুরুষ। তার পরে ভ্রাতৃ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ পুরুষ চলিতেছে। তাহা হইলে আনুমানিক আড়াই শত বৎসর কাল নোয়াখালীতে আগমনের সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের প্রপিতামহ ৺কাশীদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পরম ধার্ম্মিক ও ভাগ্যবান

ছিলেন। তৎপত্নী ৺কালিকা দেবী সহমৃতা হইয়া ছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহাদের শ্মশানে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই পুণ্য প্রাণদের পতকারূপে যশ ঘোষণা করিতেছে। তৎপুত্র রামলোচন সিদ্ধান্ত পঞ্চানন তৎকালে তৎপ্রদেশে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নাটোর মহারাজের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র ৺জয়গোপাল বিদ্যাভূষণ ধনী মানী পণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ পুত্র এবং লক্ষ্মী গৃহিণী ভাগ্য অনন্য সদৃশ ছিল।

পুত্রগণ সকলই নীরোগ, সবল, সুশ্রী, দীর্ঘায়ু, কর্ম্মী, মানী, ধনী ও পণ্ডিত। প্রথম ৺কালীচন্দ্র বহুদিন তীর্থ বাস করিয়া ৮৫ বৎসরে পুত্র পৌত্র রাখিয়া স্বর্গত হন। দ্বিতীয় ৺কাশীচন্দ্র ঐ ৮২।৮৩ বৎসরেই পরলোক গমন করেন। তৃতীয় অভয়চন্দ্র ২৭।২৮ বৎসরে অকালে কাল কবলে গমন করিয়া সকলকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন। ইনি অল্প বয়সে অনেক যশ লাভ করিয়া ছিলে। চতুর্থ ৺সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ৭৫ বৎসরের অধিক বয়সে কাশীলাভ করিয়া তাঁহার অনন্ত কুল উদ্ধার করিলেন। সিদ্ধান্তভূষণের শৈশবে মদনকান্তি বিনিন্দিত শরীর সৌন্দর্য্য দর্শনে অনেকে বলিতেন, "বাঁচিয়া থাকিলে এই বালক শ্রুতিধর ক্ষণজন্মা হইবে।" বাল্যকাল হইতে সিদ্ধান্তভূষণ রসিক ও কৌতুক প্রিয় ছিলেন। গান বাদ্য আমোদ প্রমোদ বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল যাত্রা কবি প্রভৃতি সখের দলের নায়ক হইয়া প্রশংসার সহিত গান করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাহার প্রিয় একটী গেতার কাশীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন মতিতে লোক সকল বিস্মিত হইত।

একদিন তাঁহাদের পুরাতন বাটীতে একটী আমগাছে সুমিষ্ট পরিপক্ক একটী আম সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় প্রথম দেখিতে পান। যিনি প্রথম যাহা দেখেন তাহারই সেই বস্তুতে অধিকার ইহা বাল্যকালীন নিয়ম। কিন্তু সঙ্গীয় দুষ্টবুদ্ধি বাল্য বন্ধুগণ ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বশক্তিতে পিপীলিকা পরিপূর্ণ এই আম গাছে উঠিয়া ঐ আম আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে। সিদ্ধান্তভূষণও ঐ গাছে উঠিয়া আম পাড়িবার চেষ্টা করিলে নীচ হইতে বালকগণ তাহার পা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বাধা দিতে থাকে, তিনি সেই বাধা অতিক্রম করিয়া আম্র ফলটী আত্মসাৎ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের গায়ে পস্রাব করিয়া দেন। সুতরাং বালকগণ পরাস্ত হইয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পিতার নিকট তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করে, বিচার ফল যাহাই হউক সিদ্ধান্তভূষণের ঐরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা সকলকে পরাস্ত করিয়া নিজের কার্য্যসিদ্ধি দর্শন করিয়া

অনেকে হাসিলেন, কেহ বা ক্রোধ করিলেন, কেহ বা উহা সিদ্ধান্তভূষণের ভাবী উন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির করিলেন।

অল্প বয়সেই সিদ্ধান্তভূষণ লেখা পড়া আরম্ভ করেন। বাড়ীতে কিছু দিন পড়িয়া স্বগ্রাম হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী সোনাইমুড়ী গ্রামস্থ নিজ জ্ঞাতি ৺মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরের নিকটে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন; অধ্যয়ন কালে অধ্যাপকের স্নেহ লাভ তাঁহার পক্ষে অতি সুলভ ছিল। ইনি পিতার নিকট ব্যাকরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত দুই এক স্কন্ধ, উপনিষদ দুই এক সর্গ, এইরূপ রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, ভারবীমাঘ, ভট্টি-কাব্য, বিখ্যাত বিজয় প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। পরে কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে মহাকাব্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক বিদ্যার্থীকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এবং তাঁহারাও অনেকে পণ্ডিত হইয়াছেন। একমাত্র কাব্যাদর্শক পরে পড়িয়া ছিলেন; নিজ বাড়ীতে পড়া অনেক বাধ হয় দেখিয়া স্বদেশেই সোমপাড়া ও খিলপাড়া টোলের অধ্যাপক রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণে বিশিষ্ট অধ্যয়ন, পরিশিষ্ট গোপীনাথ টীকাপঞ্জী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণে সুব্যুৎপন্ন হন। ছাত্রাবস্থায় সভাতে তাঁহার বিচার চতুরতা শাস্ত্র কৌশল দর্শনে সকলে বিস্মিত হইতেন।

চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি রূপ গুণে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন। আমরা এমন কথাও শুনিয়াছি পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের স্থানে স্থানে অসংলগ্ন পাঠ আছে এই কথা বলিলে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তর করিতেন, "আমি ত অসংলগ্ন কথা কোথাও কখন পাই নাই।" এই সময় অনেক পণ্ডিতই সগর্ব্বে তন্মধ্যে স্বাভিপ্রেত অসংলগ্ন স্থান উত্থাপন করিলে সিদ্ধান্তভূষণের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা অবনত মস্তকে আত্মাভিমান অবৈধ চিত্তে সম্বরণ করিতে বাধ্য হইতেন। সেই সময় সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা বক্তৃতা করা প্রভৃতি সকলেই আশ্চর্য্য জনক মনে করিতেন। এমন কি, যিনি একটু একটু বলিতে ও লিখিতে পারিতেন তাহার আর প্রশংসার সীমা থাকিত না।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় যৌবন সময়ে অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। পিতার চেষ্টায় কিছু উপকার হয় নাই। পুনর্ব্বার চিকিৎসার জন্য সিদ্ধান্তভূষণ মায়ের দ্বারা নিজ চিকিৎসার জন্য পিতাকে অনুরোধ করাইলে পিতা বলিয়া ছিলেন, আর চিকিৎসা করায় কিছুইত হইতেছে না, কোনও দৈব করার ইচ্ছা আছে,

সিদ্ধান্তভূষণ পিতার ঐ কথায় দুঃখিত হইলেন, মনে করিলেন আমার চিকিৎসায় জন্য পিতা উদাসীন। অভিমান করিলেন, মায় নিকটে একখানা পত্র লিখিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া বাড়ীতে শিষ্যবাড়ী যাওয়ার কথা বলিয়া একজন ভৃত্যকে লইয়া খালিশপাড়া নামক গ্রামে কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক শিষ্যের বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আহার করিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিয়া আত্মভাব গোপন করিয়া তিনি চাঁদপুর আসেন, এবং ষ্টীমারযোগে গোয়ালনন্দ চলিলেন।

দৈবক্রমে গোয়ালনন্দের মধ্য রাস্তায় ষ্টীমার বালুর চড়ায় আবদ্ধ হইয়া দুই দিন আটক রহিল। সিদ্ধান্তভূষণ বিল্বপত্রের অভাবে ৺শিবপূজা করেন নাই এবং দুই দিন উপবাস করিলেন। তিন দিনে ষ্টীমার খুলিল, গোয়ালন্দে আসিলে সিদ্ধান্তভূষণ বিল্বপত্র অনুসন্ধান করিয়া অতিকষ্টে পাইলেন—সন্ধ্যাদি শিব পূজা করিলেন। পাক করিয়া আহার করিলে গাড়ী ফেল হইবেন, মনে করিয়া ছাতু ও মিষ্ট কিনিলেন। এদিকে আহার করিতে বসিলেন সমন সময় কে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর শীঘ্র যাও, গাড়ী ছাড়িতেছে।" তখনই দুই গ্রাস মুখে দিলেন। গাড়ী পান বা না পান তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না—কিন্তু ভগবান কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলেন, খুব বাতাস আসিয়া ছাতুর পাত্রটী উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার লোভে পাত্রটি ধরিলেন এবং দেখিলেন, সামান্য কিছু আছে, তাহাও তিনি ভগবানের উপর অভিমান করিয়া ফেলিয়া দিয়া, গাড়ী ধরিতে ছুটিলেন। গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে গাড়ীও ছুটিল। আর ধরিতে পারিলেন না। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দ্রুতপদে চলিলেন! গাড়ী ধরিতে পারিবেন না, অনেকের এইরূপ উক্তিকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন, বাস্তবিক রাজবাড়ী ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ী ধরিলেন, এবং কলিকাতায় আসিলেন। এই ঘটনা দ্বারা কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, দেবভক্তি আস্তিকতা তেজস্বিতা প্রভৃতি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কলিকাতা অপরিচিত স্থান, কোথাও সুবিধা না পাইয়া গঙ্গা তীরে তীরে কয়েকদিন কাটাইলেন। পরে একটী শ্লোক লিখিয়া সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গিয়া নিজের নানাবিধ রোগের কথা ব্যক্ত করিলেন, তন্মধ্যে একটী শ্লোকের কিয়দংশ আমাদের এইরূপ জানা আছে, যথা—

অর্শোবিশোষকশিরো বমহরীদেহ,
গ্রন্থিজ্বরোদরবরো ... ...
... ... সহৃৎমস্তক শূল শূলো

গৃহ্ণামি কিং ফলোমতোধোন ক্রমেভ্যঃ !

তাহার নিকট হইতে ঔষধ নিয়া থাকিবার স্থানের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকেন। অবশেষে কালীদাসী নামিকা এক কলহপ্রিয়া খলস্বভাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহাকে রাস্তা দিয়া ঘুরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"ঠাকুর ! তোমার চেহারাত বেশ, বয়সও অল্প, তুমি কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ? কোথাও স্থান পাও নাকি ? আচ্ছা তুমি ভাল সুর দিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পার ত ? তাহা হইলে আমি স্থান দিতে পারি। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হা, ! পারিব এ আর বেশী কি ? কালীদাসী একখানা ঘর এবং রান্না করিবার স্থান দিলেন। তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া আহারাদি করিতেন এবং দুর্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে থাকেন। সেখানে নিশিকান্ত সেন ও বিজয়রত্ন সেনকে পড়াইতে যে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতেন। কিন্তু সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে উক্ত পণ্ডিতকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া নিশিকান্ত সেন প্রভৃতির অধ্যয়নের সময় তিনি আর তথায় যাইতেন না।

এদিকে সিদ্ধান্তভূষণের হাতের টাকা পয়সা ফুরাইয়া আসিয়াছে, সামান্য কিছু আছে, তাহার দ্বারা কিছু গুড় কলা এবং গঙ্গাজল পান করিয়া তিন দিন অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ দিনে কেবল গঙ্গাজল পান করিলেন। শরীর অসুস্থ পাক করিবেন না বলিয়া কালীদাসীকে বুঝাইলেন।

এই বংশে কেহই কাহারও নিকট আজ পর্য্যন্ত হাত পাতে নাই বরং অন্যের হাত পাতা পূরণ করিয়াছেন। এই ভাবিয়া কাহারও নিকট কিছুই চাহিতে পারিলেন না। গঙ্গাজল সার করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করতঃ প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া ভাবিতেছেন কি হবে ? এমন সময় নিশিকান্ত সেন আসিয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এবং ৫৲ পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাৎকালিক বিস্ময় আনন্দ ও উপবদনুগ্রহ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে কিম্ভূত কিমাকার করিয়া তুলিল। তিনি কথায় বলিয়াছিলেন যে ঐ ৫৲ টাকা তখন পাঁচ লক্ষ টাকা হইতেও অধিক বলিয়া বোধ হইল। ঐ অবস্থাতেও তিনি অন্তরের সহিত (ভদ্রতার খাতিরে নহে) বলিয়া ছিলেন,—"বাপু ! অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে অত প্রণামী কেন দিলে ?" ইত্যাদি দুরবস্থায় পরিয়াও তিনি এতই নির্লোভ ছিলেন।

অতঃপর বিজয়রত্ন সেনও তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঐ সময় যে রাস্তায় মহিষ গরু প্রভৃতি চলিত বর্ষাকালে কর্দ্দমাক্ত, সেই পথ অতিক্রম করিয়া তিন মাইল দূরে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কাব্যোদর্শ পড়িয়া স্বহস্তে লিখিয়া নিয়া বিজয়রত্ন প্রভৃতিকে পড়াইতেন।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ঔষধ-সেবনেও আশানুরূপ ফল না পাইয়া এক সংক্রান্তিতে গঙ্গায় স্নান করিয়া সংকল্প পূর্ব্বক স্বকৃত এক এক শ্লোক গঙ্গা স্তোত্র গঙ্গাতীরে পাঠ করিতেন অপর সংক্রান্তিতে তাহা শেষ করিলেন। (বিস্তৃত ভয়ে ঐ শ্লোক লেখা হইল না।)

বাস্তবিক ভক্তির প্রভাবেই ঐ উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হন। এই দিকে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এবং মাসতুত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ এই দুই জন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে কুমারটুলীতে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন ! তখন সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন কোন রূপ গোলমাল করিতে দিলেন না।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর অবস্থা ভাল থাকিলেও কুমারটুলীতে এরূপ আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাঁহারা দরিদ্র নহে তিনিই দরিদ্র এখানে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠালাভ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

স্বনাম প্রসিদ্ধ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের সহিত স্বরচিত কতগুলি শ্লোক নিয়া দেখা করেন এবং সম্পূর্ণ "শব্দকল্পদ্রুম" পুরস্কার লাভ করেন। এত বড় শব্দকল্পদ্রুমের গোড়া না বাধাইলে যে পতিত হইয়া যাইবে এইরূপে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কাব্যোক্তি শুনিয়া লজ্জিত হইলেও রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নাম ধাম দিয়া ভালরূপে পুস্তকগুলি বাধাইয়া দিলেন। সামান্য চেষ্টায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থে দুইখানা মোহর কিনিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া পিতার মন দ্রবীভূত করিলেন। পিতা কিন্তু ঐ মোহর পাইয়া বলিলেন, "আমার জয় অনন্ত মোহর স্বরূপ সে না আসিলে আমি সামান্য মোহর লইয়া কি করিব।" এই বলিয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মাতার নিকট গিয়া বলিলেন, "জয়চন্দ্র আসিলে দিও।" এই যাত্রায় কলিকাতা দেড় বৎসর কাল বাস করিয়া ঐ শব্দকল্পদ্রুম লইয়া দেশে গেলে পুস্তক সহ পুত্রকে পাইয়া পিতা আনন্দ সাগরে ভাসিলেন। তাহার পর তিনি ভাল

রূপে পড়া শুনা করিবার জন্য বিক্রমপুরে যান। বাদার্থ ও অবশিষ্ট ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিবার জন্য কনিষ্ট ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র সিদ্ধান্ত চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত সিদ্ধান্তভূষণ বিক্রমপুরে গেলে, তাঁহাদিগকে লইয়া বিরাট সমালোচনা, সকলেই "আমার নিকট অধ্যয়ন, আমার নিকট অধ্যয়ন কর" বলিয়া নিরতিশয় যত্ন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিক্রমপুরে অধ্যাপক স্বীকার করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত সভায় বিদ্যার্থী উপাধি বিহীন জয়চন্দ্র ও ভুবনচন্দ্র ব্যাকরণাদির বিচারে সেকালের প্রধান প্রধান পণ্ডিত সকলকেই বিস্মিত ও পরাজিত করিয়া পণ্ডিত সমাজে ধন্যার্হ হন। তখন স্বভ্রাতৃক জয়চন্দ্রকে নিয়া মহা হৈ চৈ ও টানাটানি পণ্ডিত সমাজে উপস্থিত হয়। কাহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, কোনটিই বা প্রত্যাখ্যান করিবেন এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল বিব্রত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, যে কারণেই হউক বাসাইল গ্রাম নিবাসী বৈয়াকরণ কেশরী ৺অভয়চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ এবং জীবসারা নিবাসী প্রধান শাব্দিক ৺হরিশচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় ও বাদার্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ৺অভয়চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সময় সময় ভুবনচন্দ্র ও জয়চন্দ্রকে পড়াইতে কষ্ট হইত। এ জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয় অধ্যাপক ৺কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া জয়চন্দ্র প্রভৃতিকে পড়াইতে বাধ্য হইতেন। এখনও বিক্রমপুরে এবং অন্য দেশীয় প্রাচীনগণের নিকট শুনিতে পাই যে সিদ্ধান্তভূষণ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র দ্বারাই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অত্যধিক অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

একই সময়ে স্বভ্রাতৃক সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বিদ্যারত্ন এবং তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকেন. ঐ বৎসরই ঢাকা নগরীতে "পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ" নামক একটি শাস্ত্রীয় পরীক্ষা সমিতি সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পণ্ডিত ও ছাত্র পুরস্কারার্হ হয়।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় দ্বারা যদি তাঁহার অধ্যাপক কিঞ্চিন্মাত্র আর্থিক সাহায্য লাভ করেন তাহাও তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন, সুতরাং সারস্বত সমাজের পরীক্ষা দিবার জন্য সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় চেষ্টিত হন।

অভিনব সমস্যায় তখন সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় পতিত হন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ইচ্ছা তাঁহার নামে পরীক্ষা দেওয়া হউক। তর্কবাগীশ মহাশয়েরও ইচ্ছা তাঁহার নামেই পরীক্ষা দেওয়া হউক। দুই দিক রক্ষা কিরূপে হইবে

চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যুৎপন্নমতি জয়চন্দ্র স্থির করিল, দুই জনেরই নামে একই দিবস দুই বেলা পরীক্ষা দেওয়া হইল।

এই ভাবে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাইয়া যথা সময়ে "বাদার্থ, ব্যাকরণ, সাহিত্য" এই তিন শাস্ত্রের এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়া অত্যন্ত প্রশংসার সহিত সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উভয় অধ্যাপকের নামেই উত্তীর্ণ হন, এবং অনেক পারিতোষিক লাভ করেন। যেখানেই অবস্থান করেন না কেন সকলের স্নেহ লাভ সিদ্ধান্তভূষণের সুলভ ছিল।

ক্রমশঃ

স্বপনে।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

(১)

স্বপনে ঘুমের ঘোরে তাহারে হেরেছি রে।
কচি হস্ত প্রসরণ, ধরিতে করিনু মনন,
অমনি চলিয়া গেল, আর না হেরিনু রে.
স্বরগের জ্যোতি পুন আঁধারে ডুবিল রে॥

(২)

ভেবেছিনু তবে বুঝি, চিরতরে ভুলে গেছি,
ডুবায়ে দিয়েছি তারে বিস্মৃতির নীরে রে।
মুর্খ আমি তাকি হয়, তারে কিরে ভোলা যায়,
আঁখির অঞ্জন সে যে হৃদয়ের হার রে॥

(৩)

সে যে এ অভাগার, নিতান্তই আপনার,
জনক জননী সে যে সোদর সোদরী রে।
তাহারি শকতি লয়ে, এ দেহে শোণিত বহে,
তারি স্মৃতি এ দেহের সঞ্জীবনী শক্তি রে॥

(৪)

শরতে শারদ শশী, হাসে সদা তারি হাসি,
সে হাসির অনুরূপ এ জগতে নাই রে।

মৃদুল বসন্ত বায়, তারি গন্ধে সদা বয়,
সেই সে অমৃত গন্ধ ভোলা কভু যায় রে ॥

(৫)

স্মরিলে তাঁহার নাম, মৃত দেহে পাই প্রাণ,
পাপিয়া ডাকিলে বনে, তারি তান শুনি রে,
ঘুচে যায় জীবনের শত অবসাদ রে।
তারি নাম সুধামাখা, অমর অক্ষরে লেখা,
জনমে জনমে রবে মরমে মরমে রে ॥

(৬)

ভালবাসে যে যাহারে, ভুলিতে সে পারে তারে ?
সে যে গো সাধনা তার দিবসে দিবসে রে।
এ বিশ্ব টুটিয়া যাবে, অনুতে মিশিয়ে রবে,
মুছিতে নারিবে তবু প্রেমিকের স্মৃতি রে ॥

(৭)

সাধ ছিল মনে মনে, বসন্তের আগমনে,
ফুটিবে কুসুম যবে কাননে কাননে রে।
মধুর সকাল বেলা, গাঁথিয়া ফুলের মালা,
উপহার দেব তার চরণ সরোজে রে ॥

(৮)

সেই সাধ সে কামনা, এ জনার পুরিল না,
মুকুলে শুকিয়ে গেল সে আশা কলিকা রে।
শতধা হইল হৃদি, চক্ষে অশ্রু নিরবধি,
ঝর ঝর ধারে কত ঝড়িয়া পড়িল রে ॥

(৯)

ঝরুক না আঁখি বারি, সে তবু রবে আমারি,
তারি স্মৃতি রবে হৃদে জনমে জনমে রে।
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে, ঘনঘটা বজ্রনাদে,
পারিবে ভুলাতে তারে বারেকের তরে,
সে যে গো হৃদয়ে গাঁথা পরতে পরতে রে ॥

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ডস্‌টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৶০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড নার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে দুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। শূন্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ টিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ব, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

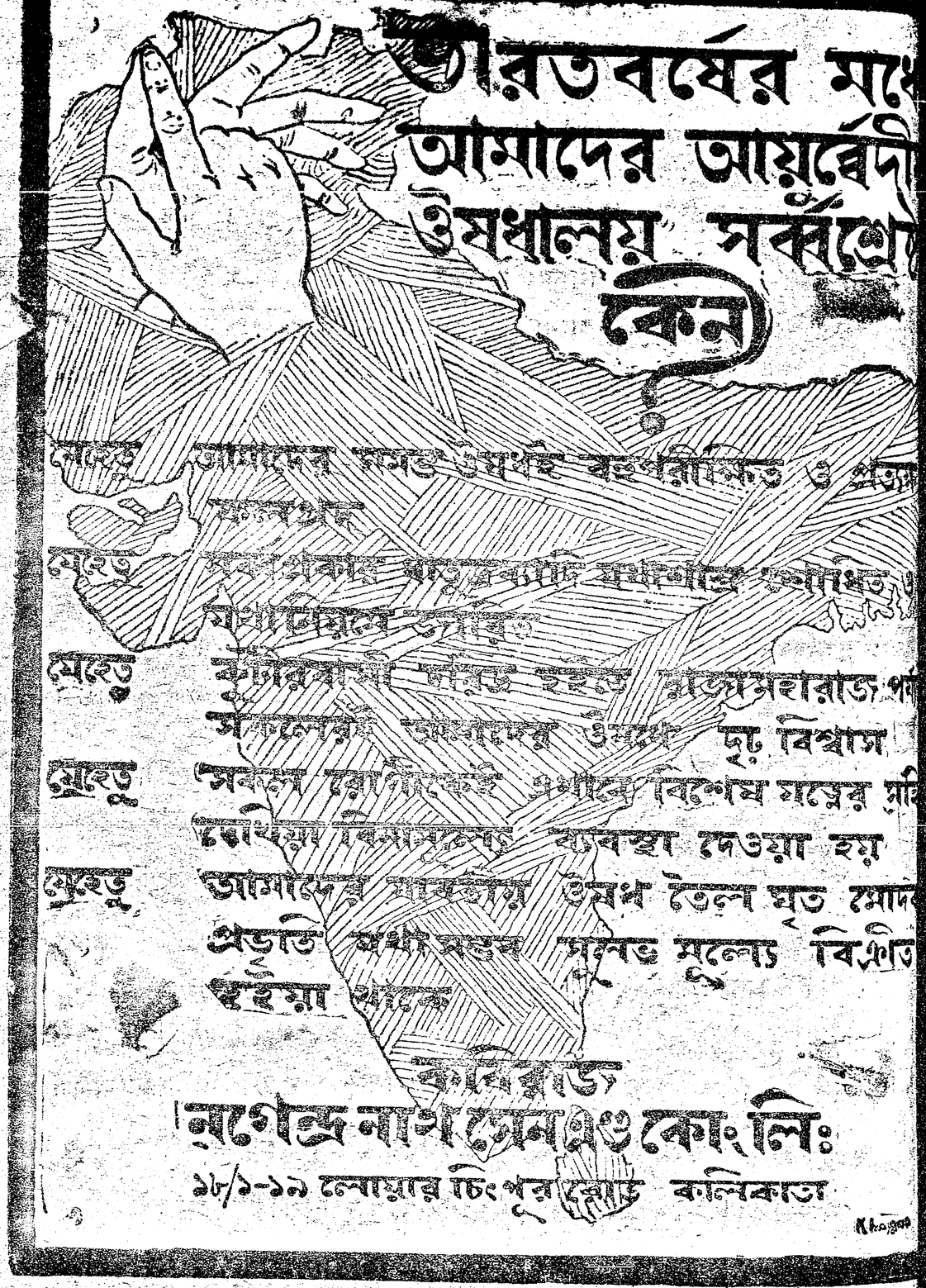

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] মাঘ, ১৩৩১, [১০ম, সংখ্যা

১।	জ্বরের হাওয়া	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	২৮৯
২।	অশ্রু-কণা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	২৯১
৩।	তুমি	... ...	৩০৬
৪।	স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জীবন চরিত		৩০৭
৫।	ইন্দিরা	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	৩১৪
৬।	প্রাপ্তি স্বীকার	... ...	৩২০

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 6-5-25

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৹, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible] যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "জিজীপিরান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

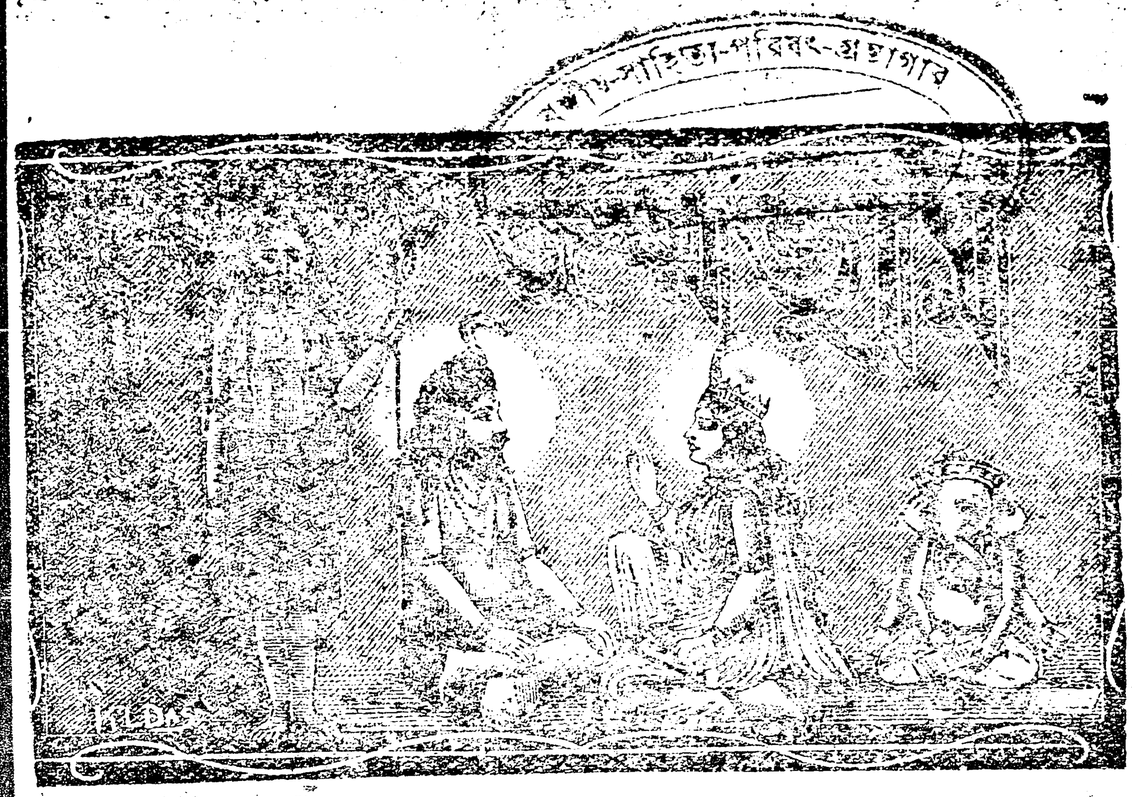

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। ১৩৩১ সাল, মাঘ। ১০ম, সংখ্যা।

সুরের হাওয়া।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ।

সুরের দেশের হাওয়া তুমি, তাই সুরের মতন প্রাণ। তোমার প্রাণে প্রাণে সুধু সুর। সুর যেমন এক জায়গায় চুপ করে বসে থাক্‌তে জানে না, আপনাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়; তুমিও ঠিক সুরেরই মতন নিজের প্রাণকে বিশ্বমাঝে ভাসিয়ে দিতেই জান, বড় চঞ্চল তুমি, ঠিক সুরেরই মতন,- কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকতে জান না। অখিলের যেখানে যখন যে সুর ওঠে, আপন মনে তাহাই তুমি বয়ে নিয়ে যাও—সেই সুরের দেশে, যেখানে তোমার বাসভূমি। নিত্যই নব নব গান সেথায় সঞ্চিত কর, তুমি সুরের দেশে সে একখানি সুরের আবাস বটে।

হে সুরের হাওয়া! তবে আজ একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তোমায়—বল তবে।

বল্‌বে কি? আমার সেই বহু বহু জনমের যুগ যুগান্তের অতীত সুরের কথা? সুরের হাওয়া তুমি! নিশ্চয়ই সে সঞ্চয়ের সন্ধান তুমি জান। হে সঞ্চয়ী! সে সুর কি সব তোমার সঞ্চয় পাত্রে তবে সঞ্চিত করে রেখেছ? না সেই সুরের দেশে সুরের সঙ্গে সব মিশিয়ে দিয়েছ?

সন্ধানী তুমি,—হে সঞ্চয়ী, সে সন্ধান দিবে কি তুমি? সুরের দেশ দেখিনি কখনও! বুঝি, মানবের আবাসভূমি সে নয়—সে দেশের অধিবাসী শুধু তুমিই একা।

আমার অনুরোধ শুন্‌বে কি তবে? সে সুর সঞ্চয় পাত্র হতে একবার উজাড় করে আন্‌বে কি? আমি চাই সেই সুরের সন্ধান—যে সুর নিয়ে গেছ তুমি শত শত যুগ যুগান্ত ধরে—জন্মে জন্মে আমার কাছ হতে। সেই সুর, যে সুর তোমার সুরের দেশে সুরের পেয়ালায় বহু যুগ যুগান্ত হ'তে পূর্ণ আছে।

এস তবে হে সুরের হাওয়া, সেই সুর সব নিয়ে এস। অতীতের সঞ্চয় আজ সমাপ্ত করে—আজ সব শেষ হোক।

যাও তবে, হে সুরের হাওয়া, সেই সুরের দেশে একবার ফিরে যাও! আর শোন বলি যদি সে সুরের ভার অতি গুরু মনে কর, তবে তোমার সেই সুরের দেশেই পাত্র উজাড় করে রেখে এসো। যুগ যুগান্তের সঞ্চিত সুর অতি অল্প নয়—পার যদি নিয়ে এস, না হয় সেখানে বিলিয়ে দাও।

সুরের দেশে সুরের পাত্র কখনও শূন্য রবে না। ভবিষ্যের শত যুগ যুগান্তে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার ভরে উঠ্‌বে। ধন্য তুমি হে সঞ্চয়ী, জীবনের যবে শেষ হবে, তখন আমায় সে দেশ একবার দেখাবে?

সঞ্চয়ী তুমি, হে সুর সন্ধানী, আমার একটী অনুরোধ রাখবে কি তুমি? মরণের শেষ অনুরোধ?

ভুলোনা তবে! যেদিন এ নশ্বর তনু আমা হতে বিচ্ছিন্ন হবে, সেদিন শুধু তুমি সে সুর নিয়ে যেও না! বাঁশী তোমায় দিয়ে দোব আমি—ইচ্ছা হয় পরজন্মে আবার ফিরিয়ে দিও; কিন্তু সেই "শেষ" সুরটুকু নিও না। অনুরোধ তোমার কাছে, হে পাবন, সে সুর ছড়িয়ে দিও তুমি—নিত্য নবীন উষার অরুণ আলোয়, পূর্ণেন্দুর সন্ধ্যা স্নিগ্ধ স্বর্ণ দীপ্তিতে, প্রাবৃটের কাজল,

কালো মেঘের গায়ে, নবোৎফুল্ল বনমল্লিকায়, তটিনীর উচ্ছ্বসিত জল-কল্লোলে, নির্ঝরের ঝরঝরে, বর্ষণের অবিরাম ঝমঝমে, শৈলে শৈলে, বিহঙ্গের কল কল স্বরে, দূরে দূরে, প্রবাসে, বিদেশে।

শুধু স্মৃতি চিহ্নের জন্যে! পরজন্মে আবার যখন এ জগতে আসব তখন সব মনে হবে বটে। চির জন্মের সব সুর দিলুম তোমায়—সঞ্চিত কর, হে সঞ্চয়ী, অলক্ষ্যে শুধু এ অনুরোধ আমার রেখ তুমি!

অশ্রু-কণা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

(৭)

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রাণে প্রেমের ফুল ফোটে, তখন তরুণ-তরুণীর বুকে কি একটা হিল্লোল খেল্‌তে থাকে।

চাঁদের আলো গা এলিয়ে দিয়ে ধরার বুকে ঘুমিয়ে পড়লে, বিচিত্র রঙের ফুলগুলি ছোট শিশুর মত একরাশ হাসি নিয়ে ফুটে উঠ্‌লে, সবুজ ঘাস বনের ওপর ঝিরঝিরে নদীর মত বাতাসের ঢেউ খেলে গেলে, তরুণ বা তরুণীর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—তাই অসীম চাঁদের আলো, বিচিত্র ফুলের হাসি, অনন্ত সবুজ মাঠ, সে ভাল ভোগ করতে পারে না—নিজেকে বড় একলা একলা মনে হয়—একলা কি অত সৌন্দর্য্য ভোগ করা যায়? সে চায়, কেউ তার সঙ্গে ঐ দেখার ভার নেয়—তা না হ'লে সে দেখে তৃপ্ত হয় না—সব আলো, সৌন্দর্য্য চোখের সাম্‌নে নিভে আসে।

অশ্রুকণার কাছ হইতে বিদায় লইয়া গৃহে আসিতেই অমিয়বালা তাহাকে আহার করিবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ দুটী কারণে তখন আহারে রুচি ছিল না,—প্রথমতঃ সে জীবনবাবুদের বাড়ীতে জলযোগ করিয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অশ্রুর কাছ হইতে বিদায় লইয়া আসিবার পর হইতে তাহার

কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অশ্রুর মলিন মুখ তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আর জীবনবাবুদের বাড়ী ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। কাজে কাজেই সে আহারে অমত করিল।

আপনার কক্ষে আসিয়া প্রমথ পরিচ্ছদাদি মুক্ত করিতে লাগিল। বাতায়ন পথে বাহির আকাশের দিকে চাহিবামাত্র বাসন্তী চতুর্দ্দশীর চাঁদের মিষ্ট আলো তাহার চোখে পড়িল, কি ভাবিয়া সে পরক্ষণেই ছাতে উঠিয়া আসিল।

ছাত ভরা চাঁদের আলো। দূরে আকাশের বুকে দুই একখানি মেঘ, সাদা পাল তোলা ধীর নৌকার মত ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু প্রমথর এ সব ভাল লাগিতেছিল না, তাহার মন কাহার দুইখানি ছোট বাহুর নিবিড় বাঁধনের ভিতর তখন হারাইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কোথায় সে? কে তাহার এই স্নেহ ব্যাকুল মৌন কাতরতা বুঝিবে? ওই যে অত আলো, অত রূপ, তাহার চোখের সাম্‌নে অনন্ত সৌন্দার্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে, কিন্তু কই সেত উপভোগ করিতে পারিতেছে না।

ছাতে উঠিয়া আসিয়া সে জীবনবাবুদের বাটীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সম্মুখে ঘন ভালবন, আধ আলো আধ ছায়ার অপূর্ব্ব সম্মিলনে আজ অশ্রুদের বাগানটী বিচিত্র স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল, তালগাছ গুলির উপর দিয়া লীলা চঞ্চল দখিন মলয় সর্ সর্ করিয়া বহিয়া যাওয়াতে কোন্ এক অপূর্ব্ব মর্ম্মর তানের ঝঙ্কার উঠিতে ছিল।

সেই আলো ছায়ার ভিতর দিয়া অশ্রুদের বাটী ভাল কিছু দেখা যায় না, কিছু অংশ দৃষ্টি গোচর হয় বটে—কিন্তু তালবনের ভিতর দিয়া যে অংশ দেখিলে, জ্যোৎস্নালোকে তাহা কেন্দ্রীভূত রশ্মি বলিয়া প্রতীতি হয়।

প্রমথ সেই দিকে আত্মহারা হইয়া চাহিয়া থাকিতে, তাহার অতীত জীবনের ঘটনা গুলি একে একে স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মানস চক্ষে অশ্রুর সহিত বনে বনে কাঁচা আম ও তার আর ফল পাড়িয়া বেড়ানর চিত্র, প্রজাপতির পিছনে ছুটিয়া বেড়াইবার চিত্র, পুকুর হইতে পদ্মফুল তুলিবার চিত্র, মালা গাঁথিবার চিত্র, পুতুলের খেলা চড়িভাতি ইত্যাদির চিত্র একে একে সজীব বস্তুর দৃশ্যপটের ন্যায় ভাসিয়া উঠিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার মনে পড়িল, একদিন সে ছেলেবেলায় অশ্রুকে তাহাদের গ্রামের মধুবতীর তীরে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল। নদীর জলে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকায় সে বলিয়াছিল, "অশ্রু ঐ জলে নাববে? নাবিয়ে দোব?"

অশ্রু ধীর গম্ভীর স্বরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিয়াছিল, "তুমি যদি নাব ত আমিও নাবব।" সে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, "হ্যাঁ আমি নাবব।" স্বভাব সরলা অশ্রু পরক্ষণেই উত্তর দিয়াছিল, "তবে আমিও নাবব।" তাহার কথা শুনিয়া যে বালিকাকে আদরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "অচ্ছা নেবে কাজ নেই, পুকুরের জলে হাত দেবে?" অশ্রু স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল,—"দোব।" তারপর জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বালিকা সহর্ষে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "প্রমিদা জলে কেমন তোমার আর আমার মুখ দেখা যাচ্ছে, দেখ দেখ!" তখন বালিকার মুখখানি কি উজ্জ্বল ও কি মধুর ভাবে প্লাবিত ছিল, প্রমথ আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"আহা কি মধুর!"

আবার তাহার মনে পড়িল, বালিকার সেই মধুর কথাগুলি, "প্রমিদা! অবুকে আমি কত ভালবাসি. ও কিন্তু রাতদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, তুমি ওকে বেড়াতে নিয়ে যেও না।" আর তাহার সঙ্গে মনে পড়িল, অবুর সেই মিষ্ট আধ আধ কথাগুলি,—"প্রমিদা! মেজদির বর! প্রমিদা মেজদিকে বড় ভালবাসে।"

"প্রমিদা, মেজদির বর!" প্রমথর দেহের ভিতর দিয়ে ঝির্ ঝির্ করিয়া একটা কম্পন চলিয়া গেল। প্রমথ ভাবিল, "আহা তাই যদি হয়! না—না—তাকি হয়—কেন? সে মাকে বলিবে দাদা মহাশয়কে বলিবে,—না—না, সে বড় লজ্জার কথা—তাঁহারা কি বলিবেন, কি ভাবিবেন, আর জীবনবাবুদের বাড়ীর ... ...

হঠাৎ তাহার চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া ছাতের দরজায় দাঁড়াইয়া অমিয়বালা ডাকিলেন, "হ্যাঁরে খাবি না, তোকে আমি কত ডাকছি, শুনতে পাস না?"

প্রমথর একটু লজ্জা বোধ হইল, সে বুঝিতে পারিল, তাহার জন্য তাঁহার স্নেহময়ী জননীর এখনও আহার করা হয় নাই, রাত্রিও ত অনেক হইয়া গিয়াছে।

প্রমথ সমস্ত চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কোমল স্বরে বলিল, "চল মা যাই, তোমাতে আমাতে একসঙ্গে খেতে বসিগে।"

(৮)

কাল প্রমথ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে অশ্রুকণার মন প্রমথর দিকে পড়িয়াছিল। আজ প্রমথ আসিবেনা, অশ্রু জানিত, কেননা প্রমথ

নিজেই বলিয়া গিয়াছিল, দুই এক দিন পরে আসিব। কিন্তু অশ্রুকণার ইহা সহ্য হইতেছিল না—তাহার প্রণয়ের উপর অভিমান হইতেছিল। নানা চিন্তায় তাহার মন দোলুলার মত দুলিতে ছিল। প্রায় সব কাজেই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বৈকালে সে নিয়মিত হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিত। আজও হারমোনিয়ম লইয়া গান গাহিতে বসিয়াছিল, কিন্তু ভাল না লাগায় গাহে নাই।

অশ্রুকণা নৈশ আহারের পর প্রায়ই একটু সুচিকর্ষ করিত। আজ আহারের পরই শয়নের জন্য তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই অশ্রু একবার শয্যায় দেহভার রাখিল, কিন্তু পর ক্ষণেই কি ভাবিয়া তাহার কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইল।

চৈত্র মাস। পূর্ণিমা রাত্রি। আকাশে এক খণ্ড মেঘ নাই। ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোৎস্নাধার সুনীল আকাশের বুক হইতে ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া, জগৎ ভাসাইয়া দিতেছে—তবু তাহার বিরাম নাই।

বিশ্ব জগত ঘুমে চেতনহীন। যে গ্রামের বুকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত শব্দ মুখরিত ঢেউ বহিতেছিল, এখন তাহা শান্ত নিস্তব্ধ। তবে কোকিলদের চক্ষে ঘুম নাই—তাহারা অবিশ্রান্ত ডাকিতেছে। ঘুম নাই, পেচকদের চক্ষে, তাহারা দস্যি ছেলের মত মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। ঘুম নাই, ঝিঁ ঝিঁদের চক্ষে—তাহারা ঝিল্লী রবে ঘুম পাড়ানির গান গাহিয়া শ্রান্ত গ্রামটীকে নিদ্রায় অচেতন করিতেছে। আর ঘুম নাই—অশ্রুর চক্ষে, তবে সে কি করিতেছে, অথবা কি করিবে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

অশ্রু খোলা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই চাঁদ তাহার গায়ের উপর এক ঝলক সাদা আবির ছড়াইয়া দিল। লীলা চঞ্চল বাতাস তাহার বাসভরা মুক্ত চুলগুলি নাচাইয়া নাচাইয়া মুখে চোখে ফেলিয়া দিল—অশ্রু ক্ষিপ্র হস্তে তাহা কপোলের দুই পাশে সরাইয়া রাখিল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার দুষ্ট বাতাস সাঁ করিয়া আসিয়া তাহার চুলগুলি উড়াইয়া মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল—তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আকাশে চাঁদ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নবাগতা বয়স্কা বধূর মত তারাগুলি মুখ টিপিয়া হাসি রোধ করিবার জন্য শত চেষ্টা করিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

সামনের বাগানে একরাশ গন্ধরাজ ও করবী ফুল ফুটিয়াছিল। তাহারই পাশে একটা বাতাবি নেবুর গাছে বসিয়া একটা কোকিল অনবরত ডাকিতেছিল, "কুহু, কুহু, কুহু।" আর একটু দূরে, "মধুমতী" অশ্রুকে উপহাস করিয়া কল্ কল্ ছল্ ছল্ স্বরে অস্পষ্ট গান গাহিয়া যাইতেছিল,—

"মিছে করা তার আশা
মিছে তারে ভালবাসা।
মিছে সাধ ক'রে
বুকে প্রেম ঘোরে
বেদনার স্রোতে ভাসা!
মিছে বসে নিরজনে
ফেল জল আন মনে,
মিছে দেখা হ'লে
চাও দিতে বোলে
পরাণের মূক ভাষা।"

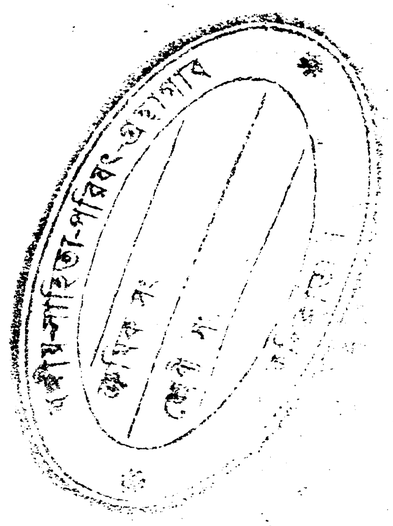

অশ্রুর কিন্তু বাস্তব জগতের এ সব দেখিবার বা শুনিবার সাড় নাই। সে আপনার মনে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা বিচিত্র স্বপ্নময় দেশে চলিয়া গিয়াছিল! সে দেশে এক মস্ত বড় বিবাহ সভা বসিয়াছে। সে সভার রং বেরংয়ে সাজ সজ্জায় দেশের সকল সুন্দরী বালিকা উপস্থিত হইয়াছে। রাজার একমাত্র পুত্র যাহাকে ইচ্ছা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে। অশ্রু বেশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, রাজার পুত্রটী আর কেহ নয়—তাহারই প্রমিদা! তাহার পর সে আরও দেখিল—সে নিজে সেই সভার একটী কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার বসন মলিন, ছিন্ন ও শত গ্রন্থিযুক্ত। বুঝিয়া দেখিল, তাহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে। কিন্তু একি একি? প্রমিদা সে আসিয়া তাহারই হাত ধরিল। চারিদিকে, অলক্ষ্যে পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল—হুলু ধ্বনি দিতে লাগিল, একি, একি!

অশ্রু কি একটা সুখের আশায় বিভোর হইয়া, উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল—তাহার যারা দেহে একটা পুলক হিল্লোল খেলিয়া গেল। ইহাতেই অশ্রুর চমক ভাঙ্গিল—সে মনে মনে ভাবিল, "আহা তাই যদি হয়। একবার জোড় হাত করিয়া উপর দিকে চাহিল, "ভগবান্ এ যেন সত্য হয়।" তখনও প্রমিদার চাঁদের মতন মুখখানি, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি, অশ্রুর মানস চক্ষে

ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। তখনও প্রমিদার স্পর্শে তার বুকের ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বাস্তব জগতে আসিয়াও অশ্রু চারিদিকে প্রমিদার উজ্জ্বল ছবিখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইল—আর তাহার প্রাণ "প্রমিদা! প্রমিদা!" করিয়া আকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু হায়। কোথায় প্রমিদা?

আবার কিছুক্ষণ পরে ভাবিতে ভাবিতে, বালিকা নূতন সুখ স্বপ্নে আত্মহারা হইয়া উঠিল, এ স্বপ্নে কিছু নাই—শুধু যে, আর তার চির দিনের সাধের প্রমিদা!

এইরূপ চিন্তার পর চিন্তা করিতে করিতে বালিকার অবসাদ আসিয়া জুটিল। সেইখানেই পরণের বস্ত্রের এক প্রান্ত পাতিয়া অশ্রুকণা শুইয়া পড়িল। পরক্ষণেই তাহার অজানিতে সর্ব্বচিন্তাহারী নিদ্রা জননী আসিয়া সাদরে তাহার সন্তাপ দূর করিবার জন্য চক্ষু দুইটী ছায়িয়া ফেলিল। অশ্রুও ঘুমাইয়া গেল।

(৯)

প্রমথ না আসায় আজও সারাদিন অশ্রু বড় কাতর ছিল। গৃহের শত শত কাজে তাহার নয়ন দুইটীর মৌন কাতর দৃষ্টি প্রতীক্ষায় পথের দিকে পরিয়া ছিল, একটী বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখিবার আশায়। কিন্তু সে সারাদিনে একবারও দেখা দিল না। হায় এমনি নিষ্ঠুর পাষাণ সে।

বৈকালে অশ্রুর চিত্তে অকটা দারুণ অবসাদ আসিয়া পরিয়াছিল। তাহার কচি বুকখানি আইঢাই করিতেছিল। প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সে কি করিবে কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

অনেক ভাবিয়া সে তাহার পুতুলের আলমারী সাজাইতে বসিল।

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। পাখীরা স্ব স্ব নীরে প্রত্যাগত হইয়া আনন্দ সুচক কলধ্বনি করিতেছে। কয়েকটি গাভী গ্রামের পথ দিয়া হাম্বা হাম্বা রব করিতে করিতে তাহাদের গোয়ালঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে পাচন বাড়ী ও হুঁকা লইয়া রাখাল শিষ্ দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছে। পুকুর ত নদীর তীর হইতে গ্রামের বধূগণ জলভরা কলস লইয়া ধীর ও সঙ্কোচ পদ বিক্ষেপে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে। দুই একটী তারা আকাশে মেঘের আড়াল হইতে, ঘোম্টা ঢাকা লজ্জাশীলা বধূর মত উঁকি মারিতেছে। সন্ধ্যারাণী ধূসর

বাস পরিয়া রজনীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। খেলা সাঙ্গ করিয়া বালক বালিকা ধূলা মাখা গায়ে জননীর কোলে ঘুমাইবার জন্য ফিরিয়া আসিতেছে।

ঠিক এমন সময় জীবন বাবুদের বাহির বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে প্রমথ ডাকিল, "অবু—অ—অবু!"

কাহারও সাড়া না পাইয়া প্রমথ ভিতরদিকে অগ্রসর হইল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পথেই তাহার অশ্রুকণার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া অশ্রুকণার মলিন মুখেও একটা হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল, সে হাসি বড় মধুর, বড় মিষ্ট।

অশ্রুকণার প্রমথকে দেখিয়াই সেদিনের কথা মনে পড়িয়াছিল, সে সেখান হইতে লজ্জায় অধোমুখে সরিয়া যাইতেছিল—প্রমথ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "মা কোথায়?"

হঠাৎ অশ্রুকণা নিজেকে সংযত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর চাবির রিংটা আঙ্গুলে গলাইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "মা রান্নাঘরে।"

প্রমথ তাহাকে তাহার সম্মুখে অমন সংযত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিজে একটু থতমত খাইয়া গেল, সে কি বলিবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, "তুমি এখন কি কচ্ছিলে?"

অশ্রুকণা অধোমুখে উত্তর দিল, "পুতুলের আলমারি সাজাচ্ছিলুম।"

ইহার পর প্রমথ কি করিবে অথবা বলিবে, তাহা প্রমথর মস্তিষ্কে উত্থিত হয় নাই, সে যেন অশ্রুর সহিত কথাবার্ত্তায় এটুক অপ্রস্তুতে পড়িয়াছিল, এই কথা শুনিয়া তাহার বহুদিনের একটা কথা মনে পড়িল, প্রমথ বলিল, "দেখ অনেক দিন আগে তোমাকে যে খেলার বিষয়ে একটা রচনা লিখতে বলেছিলুম, তার কি হ'ল?"

প্রমথর দিকে মুখ তুলিয়া অশ্রু বলিল, "রচনা ত আমি অনেক দিন লিখে, ওপরে ডেস্কর ভিতর রেখে দিইছি, তুমি চাওনি বলেই দিইনি।"

প্রমথ বলিল,—"বেশ আজ আমায় চাই-ই।"

আগে অশ্রুকণা প্রমথকে পড়াশুনা দেখাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইত। এবার কিন্তু প্রমথকে তাহার রচনা দেখাইতে কেমন বিপরীত ভাব জন্মিল, তাহার উপর সেটী অনেক দিন আগেকার লেখা, হয়ত যা তা লিখিয়াছে ভাবিয়া বলিল,—"না প্রমিদা সে তোমার দেখে কি হবে—আমি ত তেমন রচনা লিখতে জানিনা।"

কথা কহিতে কহিতে দুজনের পূর্ব্বভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল. প্রমথ বলিল,—"বাঃ ওসব বাজে কথা থাক। তুমি মার কাছে অনেক ইংরাজী ও বাঙ্গালা বই পড়েছ. আমি জানি নাকি? আমার সে রচনার কাগজ গুলো আজ চাই। তুমি বের করে রাখগে যাও। আমি মার সঙ্গে কথা কয়ে যাচ্ছি।"

অশ্রুকণা ইহার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিতে পারিল না, সে হাসিতে হাসিতে "আচ্ছা" বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

... ...

প্রমথ নীহারবালার সহিত দেখা করিবার জন্য রান্নাঘরের দিকে যাইতেছে, এমন সময় নীহারবালা জুতার শব্দ পাইয়া রান্নাঘরের দরজা হইতে উঁকি দিয়া প্রমথকে দেখিয়া বলিল, "কে, প্রমি! আয়, আয়!"

প্রমথ নীহারবালার কাছে আসিলে, নীহারবালা বলিলেন, "দেখ প্রমি! তোকে আজ একটা খুব আনন্দের সংবাদ দিচ্চি।"

প্রমথ আগ্রহের সহিত বলিল, "কি আনন্দের সংবাদ মা।"

নীহারবালা বলিলেন, "ও গ্রাম থেকে সুরেন বাবু দু একদিনের মধ্যে অশ্রুকে দেখতে আসবে। তাঁর ছেলের সঙ্গে অশ্রুর বে দোবার ঠিক করচি। ওরা ছেলে দেখে এসেছেন। কথাবার্ত্তা এক রকম ঠিক। ছেলেটি মন্দ নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই পাকা দেখা হয়ে যাবে। বৈশাখ মাসেই বে দেবার ইচ্ছে আছে।"

জানিনা ইহা প্রমথর পক্ষে কতটা আনন্দের সংবাদ ছিল, তবে ঐ কথা শুনিয়া সারাবিশ্ব তাহার নয়ন সম্মুখে দোলার মত দুলিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুখখানি নিমেষ মধ্যে সাদা হইয়া গেল।

যাহা হউক চতুর ও সুশিক্ষিত যুবক প্রমথ তৎক্ষণাৎ এ ভাব দমন করিয়া একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "বেশ আনন্দের কথা, অশ্রুর বে তা কি শুন্‌লে কার আহ্লাদ হয় মা।"

কিন্তু তাহার গলা এই কথাটুকু শেষ করিতেই অনেকবার বাধিয়া গেল এবং জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইতে গিয়া, তাহার মুখের আরও আকৃত বিশ্রী হইয়া গেল।

চতুরা শিক্ষিতা নীহারবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রমথর মুখের ভাব ভঙ্গীতে কিছুই এড়াইল না। বস্তুতঃ প্রমথর মুখ চোখের ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করিবার

জন্যই নীহারবালা এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, প্রমথর মনে আঘাত লাগিয়াছে। নীহারবালার সে দিন প্রমথর ও অশ্রুকণার উপর যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা দৃঢ়তর হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, প্রমথ ও অশ্রুকণা পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রমথ আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতে ছিল না। তাহার মাথা ভয়ানক ঘুরিতে ছিল, শরীর অবশ হইয়া আসিতে ছিল। একবার বাড়ী চলিয়া যাইতে প্রমথর ইচ্ছা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, সে অশ্রুর রচনা দেখিয়া যাইবে বলিয়াছে।

যাহা হউক তাহাকে আর সেখানে দাঁড়াইতে হইল না। নীহারবালা নিজ হইতেই বলিলেন, "যাও, তোমরা একটু গান টান করগে, এখানে ধোঁয়ায় দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।"

প্রমথর সেখানে আর একতিল দাঁড়াইবার ইচ্ছা ছিল না। তাহার আপনার উপর বড় রাগ হইতেছিল। সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, অশ্রুর বিবাহ শুনিয়া তাহার মুখের একটা অসম্ভব রকম চেহারা হইয়াছিল, আর তাহা বোধ হয় নীহারবালা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বারে বারে এই কথা ভাবিয়া সে খোঁচা খাইয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

নীহারবালার কথায় প্রমথ কি একটা অসংলগ্ন কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নীহারবালা তাহার কথার আগেই বাধা দিয়া বলিলেন, "যাও, তবে আমার যেতে দেরী হবে। এখনও রান্নার কিছু যোগাড় হয় নি! আগুন দিতে দেরী হয়ে গেছে।"

প্রমথ আর কিছু না বলিয়া একটী বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অশ্রুর কক্ষে প্রবেশ করিল। সে নিশ্বাসটী খুব আস্তে আস্তে ফেলিয়াছিল। তবু তাহার মনে ভয় হইতেছিল বুঝিবা নীহারবালা ওই নিশ্বাসটুকুও ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রমথ উপরে আসিয়া দেখিল, অশ্রু টেবিলের উপর কতকগুলি লেখা কাগজ রাখিয়া পুতুলের আলমারীর দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে যেন কি একটা গভীর মলিনতা মাখান।

প্রমথকে দেখিয়া অশ্রু আঁখি নত করিল। তাহার মলিন মুখ মণ্ডলেও অলক্ষ্যে কে যেন একরাশ সিন্দুর আবীরের মত ছড়াইয়া দিয়া তখনই

মুছিয়া দিল। অশ্রুকণা বলিল, "রচনা দেখ্‌বে না?" প্রমথ টেবলের উপর হইতে কাগজ গুলি হাতে তুলিয়া পাশের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এই বুঝি?"

অশ্রুকণা অস্তগামী সূর্য্যের মত বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

প্রমথর চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যেক অক্ষর গুলি জড়াইয়া যাইতে ছিল, তবুও সে দম দোয়া কলের পুতুলের মত হর্ষে বিষাদে ধীর কম্পিত কণ্ঠে পড়িতে লাগিল,—

খেলা বিষয়ে রচনা।

"খেলা একজনে হয় না, তিন চারি জন চাই। সেই তিন চারিজনে বেশ মনের মিলে খেলা উচিত, নচেৎ বিষাদ ঘটিতে পারে। আমি, দিদি ও অবু, আমরা এই তিন জনে একসঙ্গে খেলিতে বড় ভালবাসি। আমাদের বেশ মনের মিলও আছে। কিন্তু কখন কখন অবু দুষ্টামি করে, আমাদের সহিত খেলিতে চায় না। কিন্তু আমি ও দিদি বেশীর ভাগ সময়ই খেলা করিয়া থাকি, আর আমরা সকল খেলা অপেক্ষা 'চড়িভাতি' খেলাটাই বেশী পছন্দ করি।

কোন দিন ভাঁড়ার ঘর হইতে চুপি চুপি এক মুঠা চাল লইয়া, সেই চাল খেলাঘরের হাঁড়িতে চাপাইয়া জলে ভিজাইয়া ভাত রান্না করি। কখন বা ছোট ছোট গাছের পাতা ছিঁড়িয়া, সেই সকল জলে ভিজাইয়া খেলাঘরের উনানে চাপাইয়া শাক্ ভাজা করি।

আমাদের ছোট একটি উনান আছে। আমাদের কয়লা হল ইটের ছোট বড় কুঁচি, তেল হল জল, শাক হল গাছের পাতা, হলুদ হল ইটের গুঁড়া। আবার আমাদের নোয়ার বঁটি, হাতা, খুন্তি, কড়া, বেড়ি, চাটু ইত্যাদিও আছে।

তাহার উপর আবার আমাদের মেসি বলিয়া একটী ছোট বেরাল ছানা আছে। তার সঙ্গেও আমরা অনেক খেলা করি। কখন কখন আমরা তাহাকে ছোট বাটী করিয়া বা বড় ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতে দিই, কখন বা আমরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিই, কখন তাহাকে লইয়া ছুটাছুটি করি, কখন ধামা চাপা দিয়া মজা করি।

কোন কোন দিন আমি ও দিদি প্রমিদাদের বাড়ী যাইয়া প্রমিদাকে

আমাদের সঙ্গে খেলা করিবার জন্য আসিতে বলি, প্রমিদা বলে, "যাও তোমাদের যত বিট্‌কেল খেলা, মানুষে আবার ইট পাট্‌কেল নিয়ে কি খেলে।"

একদিন আমি ও দিদি প্রমিদার ঘরে ঢুকিয়া প্রমিদার হাতে একখানা লাল বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম প্রমিদা ও লাল বইটা কি?

প্রমিদা কিযে উত্তর দিল, বেশ মনে পড়ে না। তবে এইটুকু মনে আছে, যেন রাগতঃ স্বরে বলিয়াছিল, তোমরা কি বুঝবে, এ হল উইলিয়ম সেক্‌সপীয়রের ফেমাস ডামা মার্চ্চেণ্ট অফ্ টেনিস্। টেনিস্ না ভেনিস্ কিযে বলিয়াছিল, কিছু মনে নাই।

দিদি বলিল, "অশ্রু! প্রমিদা ভাল ছেলে, ওকি আমাদের পুতুল খেলা রান্না বান্না, এ সব খেল্‌বে। ও ড্রামাই পড়ুক।

দিদির কথা শুনিয়া প্রমিদা খুব হাসি লাগাইয়া দিল। তাহার হাসির কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

প্রায়ই বিকালে আমরা পুতুল খেলা খেলি, তাদের সাজাই কত রকম পোষাক পরাই, কখন বা বর-কনে করিয়া বিবাহ দিই।

ইচ্ছা জিল আমাদের খেলার আরও অনেক ঘটনা লিখিব কিন্তু—

কোথা মম অবকাশ
ওহে রঞ্জিতে আকাশ?

অতএব এই খানে ইতি।

পুনঃ—প্রমিদা! আমি ছেলে মানুষ। বালিকা বুদ্ধিতে কি সব লিখিয়াছি, মার্জ্জনা করিও। আমি রচনা লিখিতে জানি না। তুমি ভাল ছেলে—মার্চ্চেণ্ট অফ্ টেনিস্ পড়। তুমি ভাল লিখিতে পার! আমি দুষ্ট মেয়ে—টেনিস্ ভেনিস্ কিছুই পড়ি না! কেমন করিয়া ভাল লিখিব বল?

কমলপুর গ্রাম। তোমার স্নেহের—
১২ আশ্বিন। অশ্রুকণা।

প্রমথ অশ্রুর রচনা পড়িয়া একটু মলিন হাস্যের সহিত বলিল, "বাঃ! যত দোষ আমার ঘাড়ে। বেশ রচনা যা হোক্।"

অশ্রুও মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, কেন?

প্রমথ এবার অনেকটা সহজ হাস্যের সহিত বলিল, কেন আবার কি? প্রমিদা ভাল ছেলে, আমি দুষ্টমেয়ে এ সব বুঝি রচনা? সব ভুল।

অশ্রুকণা একটু অভিমান সূচক স্বরে বলিল, সব ভুল! আমি তাইত

লেখ্‌বার আগেই বলেছিলুম.—প্রবন্ধ লিখ্‌তে পারব না। তুমি বলেছিলে হাঁ পারবে—তাইত আমি লিখেছিলুম।

প্রমথ এইবার কি ভাবিয়া কথা ঘুরাইয়া অশ্রুকণার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্রু! তোমায় নাকি দেখতে আসবে?

অশ্রু চুপ্ করিয়া রহিল। কিন্তু তার ঠোঁটের পাতা দুটী অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

প্রমথ তাহার দিকে আগ্রহ সূচক দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, কি চুপ্ করে রইলে যে?

অশ্রুকণা তবুও নির্ব্বাক।

প্রমথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কি উত্তর দেবে না?

অশ্রুকণা এইবার অধোমুখ তুলিয়া প্রমথর দিকে চাহিয়া বলিল, কিসের উত্তর?

প্রমথ ধরা ধরা গলায় বলিল, তোমায় নাকি দেখতে আসবে তা হলে তোমার বে হচ্চে?

নীহারবালা পূর্ব্বেই অশ্রুকনাকে বিবাহের জন্য দেখিতে আসিবে জানাইয়া ছিলেন। অশ্রুও জানিত তাহার বিবাহ হইবে, কিন্তু সে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে উত্তর দিল জানি না।

প্রমথ বলিল, কেন?

অশ্রুকণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি না।

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, আলো আন্‌চি, বলিয়া অশ্রুকণা নীচে নামিয়া গেল। প্রমথ সেই অন্ধকারের ভিতর চেয়ারে একলাটী বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এখন তবুও আলো আছে, ইহার পর যখন এটুকুও থাকিবে না, তখন কি হইবে? হায়! ওই রকম ঘন অন্ধকারেই বুঝি তাহার চির জীবন যাপন করিতে হইবে।

আলো লইয়া আসিবার পর অশ্রুকণা একবার প্রমথর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, প্রমথও একবার অশ্রুর দিকে চাহিল। তাহার পর দুজনেই নির্ব্বাক।

হঠাৎ অশ্রুকণা বলিল, আচ্ছা প্রমিদাদা তুমি কি আমায় ... ... !

এই সামান্য কথাটুকু বলিতে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। শেষের কথা আর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না, তাহা বাধিয়া গেল।

প্রমথ বলিল, তোমায় ভালবাসি কিনা জিজ্ঞেস কচ্চ? আচ্ছা তুমিই ভেবে বল তোমায় ভালবাসি কিনা?

অশ্রুকণা কিছু বলিল না।

প্রমথ এইবার নিজেই বলিল, কি ভালবাসি?

অশ্রুকণা বলিল, হাঁ, বাস।

সারা আকাশ তখন তারায় ভরিয়া গিয়াছিল। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাহির বাগানের মিষ্ট ঝির্ ঝিরে বাতাস আসিয়া ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িতে ছিল, প্রমথ বলিল, তবে তুমি আমায় জিজ্ঞেস কচ্চ ভালবাসি কিনা?

এ জীবনে প্রাণের কথা, মনের কথা—মনেই রহিয়া যাইবে, বলা হইবে না, যখন উপলব্ধি করা যায়, তখন মনের কথা বলিবার জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতে থাকে। লজ্জাও হয় বটে, কিন্তু তবু অনেক কথা আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে।

অশ্রুকণার ঠিক তাহাই হইল। সে প্রমথর ও কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল, প্রমিদা! আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে... ...!

প্রমথর সারা প্রাণে একটা পুলক হিল্লোল চলিয়া গেল। আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিল, শোন অশ্রু, তোমাকে একটা কথা বল্‌চি, আমার উপর রাগ করনা, বেশ বুঝে দেখ যা বলি।

অশ্রুকণা বেশ একটু আগ্রহ ভাব দেখাইয়া বলিল, আচ্ছা বল।

প্রমথ ধরা ধরা গলায় বলিল, অশ্রু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। তোমার মা একজনের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেচেন, কথা প্রায় পাকাপাকি এমন সময় কথা ভাঙ্গা উচিত নয়!

ইহা প্রমথর মনের কথা কিনা বলা যায় না, তবে ইহাতে একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান নিহিত ছিল!

অশ্রুকণা একটু জোর গলায় বলিল,—ওঃ এই ভারী ত কথা, আমি মাকে বল্‌ব ... ...।

প্রমথ বলিল, মা তোমায় খুব ভালবাসেন সত্য, কিন্তু তিনি যদি না রাজী হন?

অশ্রুকণা অনেকক্ষণ নির্ব্বাক রহিল। তাহার পর বলিল, হবেন।

প্রমথ যেন এ কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছিল না। সে আবার বলিল, যদি না হন?

অশ্রুকণা প্রমথর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি একবার বল্‌বে ? তাহার স্বরে বোধ হইল ইহাতে যেন সুফল ফলিতে পারে. তাহার ইহাই ধারণা হয়।

নীহারবালার কাছে এই কথাটী তুলিবার জন্য প্রমথর একবার খুব ইচ্ছা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বড় লজ্জা পাইতে লাগিল, সে বলিল, না অশ্রু ! সেটা বড় লজ্জার কথা, তোমার মাকে আমি এ কথা বল্‌তে পারব না, তবে তুমি বোলো। আমি আমার মাকে আর দাদা মহাশয়কে বল্‌তে পারি, কিন্তু তোমার মার কাছে পারি না, সেটা কি রকম দেখায়, আর সেটা ভারী অভদ্রতা হয় !

অশ্রুকণা অনেক খানি দমিয়া গেল।

এক ঝলক বাতাস ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, যেন সে ছুটিয়া বলিয়া গেল হায় নিষ্ঠুর ! অশ্রুকণার জন্য তোমার জন্য তুমি আর এইটুকু বলিতে পার না ?

কিছুক্ষণ পরে ভগ্নপ্রায় স্বরে অশ্রুকণা বলিল, আচ্ছা আমিই বলবো, তুমি আমায় কর্‌তে ... ... ? তাহার কথা আবার আটকাইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরেই সে আপনাকে সামলাইয়া কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলিল,—রাজী আছ ?

প্রমথ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কি কর্‌তে ?

অশ্রুকণা অধোমুখে বলিল বুঝতে পাচ্ছনা ? তাহার মুখ ডালিম ফুলের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

পিপাসার্ত্ত পথিকের শ্রবণে নদীর ছল্ ছল্ শব্দের মত ক্লান্ত কৃষকের কাণে বাদলের মেঠো বাঁশীর মত বালিকার কথাগুলি প্রমথর প্রাণে একটা বিচিত্র রঙ্গ ফুটাইয়া দিল। প্রমথ কম্পিতকণ্ঠে বলিল—বুঝেছি তোমায় আমি একশ-বার করতে রাজী আছি তোমার মা যদি দেয়। শোন অশ্রু ! যখন কলকাতায় থাকতুম তখন তোমার স্মৃতিটুকু সর্ব্বদাই আমায় বিভোর করে রাখত। তোমার হাসিমাখা মুখখানি সর্ব্বদাই ভাবতুম। আর তোমাকে আমার প্রাণের খুব একটা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে নীরবে আমার সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ভালবাসতুম। কিন্তু একদিনও ভাবিনি যে তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে তুমি আমার না হলে আমার সারা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে ! আজ বুঝতে পাচ্চি সে আমার ভলেবাসা আমাকে তোমার জন্য পাগল কর্‌তেই অমন তর লুকিয়ে ছিলো। যাক্ ও সব কথা—শোন অশ্রু ! তুমি মাকে বোলে দেখো মা যদি রাজী হন ভালই। যদি না রাজী হন তা হলে মা তোমার সঙ্গে যার

বিয়ে দেবেন, তুমি তাকেই বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়ো। যদি তুমি না হও, তা হলে তোমাকে মার নিকট দোষী হতে হবে, আর আমিও বুঝব তুমি আমায় ভালবাস না।

অশ্রু কোন উত্তর দিল না। তাহার চক্ষু দুইটী সজল হইয়া উঠিল ও তখনই সুকোমল গণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

প্রমথ সান্ত্বনার স্বরে বলিল, ছিঃ অশ্রু, অমন কোরে কেঁদনা, মা দেখলে কি মনে করবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীহারবালা সেদিন ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রমথ ও অশ্রুর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে কি সন্দেহ করেন। আজ তাই তিনি তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য সেই কক্ষের বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য প্রমথ ও অশ্রুকণার সকল কথা নীহারবালা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন।

অশ্রুকণার চক্ষে জল দেখিয়া প্রমথ বড় বিপদে পড়িয়াছিল, সে বুঝিল আর বেশী কথা ঘাঁটাঘাটি করা উচিত নয়—হঠাৎ আজ আসি বলিয়া বাহির হইতেই প্রমথ দরজার পাশে নীহারবালার সম্মুখে পড়িয়া গেল।

কিন্তু শিক্ষিতা চতুরা নীহারবালা এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি এইমাত্র উপরে আসিয়াছেন এবং প্রমথর ন্যায় শিক্ষিত যুবকও তাঁহার চাল ধরিতে পারিলেন না।

যাহা হউক বাহিরে রীতিমত কিস্তি দেওয়া সত্ত্বেও ভিতরে নীহারবালা একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন—তিনি কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলি-লেন, কাল রাত্তিরে তুমি আমাদের এখানে খাবে।

প্রমথ আচ্ছা বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না নীহারবালা প্রমথর দিকে একবার খর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর তিনিও নীচে নামিয়া গেলেন।

নীহারবালা ও প্রমথর মধ্যে সামান্য কথাবার্ত্তা হইতেই মাতার আগমনে জানিয়া অশ্রুকণা তখন আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল।

ক্রমশঃ

তুমি।

তুমি মোহ অন্ধকারে বিজলির হাসি
এ ভব সাগরে তরি।
তুমি স্বপন রাজ্যের মোহিনী মুরতি
গমনা গমন বারি॥
তুমি জোছনার রাতে চাঁদিনীর হাসি
প্রণয়ে মদিরা রাশি।
তুমি বসন্ত নিশিতে মলয় অনিল
তাই তোমা ভালবাসি॥
তুমি চাতকের তৃষা নিবারণ তরে
নিল নভে মেঘ মানী।
তুমি আঁধার বিজনে পথ প্রদর্শক
রূপ তব চন্দ্র কলী॥
তুমি শারদ নিশিতে ফুল্ল নলিনী
শশধর প্রণয়িনী।
তুমি মধুর প্রভাতে বালার্ক কিরণ
প্রেমে বাধা কমলিনী॥
তুমি বিরহ ব্যথিত প্রণয়ির হৃদে
চির মিলনের হাসি।
তুমি পিরিত জনের পরিত্রাণ কারি
(ওগো) তাই তোমা ভালবাসি॥
তবে এস ওগো সখা পিড়িত গো আমি
সকরুণে ডাকি তোমা।
ঢালি করুণার রাশি ঘুচাও যন্ত্রণা
কর সব শেষ ক্ষমা॥

স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিক্রমপুরে কয়েকটী সভায় সভ্রাতৃক ৺সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শাস্ত্রীয় বিচার দর্শনে তত্রত্য প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট কিছুদিন অধ্যয়ণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে ৺সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহাকে ও অধ্যাপক স্বীকার করেন।

সারস্বত সমাজ হইতে "সিদ্ধান্তভূষণ" উপাধি লাভ করিয়া নিজ বাড়ীতে বহু (প্রায় চল্লিশ জন) বিদ্যার্থিকে অন্নদান করতঃ অধ্যাপনায় ব্রতি হন। ঐ সময়ে সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০ জন বিদ্যার্থি প্রতিদিন যথা নিয়মে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সাগ্রহে সানন্দে বিদ্যা লাভ করিতে থাকে। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বিদ্যার্থির সংখ্যা এতই বাড়িয়া পড়িল যে একাকী সকলকে পড়াইবার সময় হইয়া উঠিত না। সুতরাং ৺সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র সিদ্ধান্ত চুড়ামণি মহাশয় দুইজনেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এককালে একই চতুষ্পাটীতে এত ছাত্র সমাবেশের কথা আজকাল কোথাও শুনা বা দেখা যায় না পুরাণাদিতে দেখিতে পাই দশ সহস্র বিদ্যার্থিকে অধ্যয়ণ করাইলে তাহাকে কুলপতি বলে। কাল অনুসারে আজকাল কুলপতির লক্ষণ করিলে ৺সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ই ঐ উপাধির দাবী করিতে পারিতেন।

বাল্যাবস্থা হইতে ব্রাহ্মণোচিত আচার বিচার সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতিতেও অনেক সময়ে তাঁহার চলিয়া যাইত। নানাদেশ হইতে আসিয়া কত অসংখ্য বিদ্যার্থি তাঁহাকে অধ্যাপক পাইয়া জীবন কৃতার্থ মনে করিতেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ণ করিয়া কতলোকেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅন্নদা চরণ তর্ক চুড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিত বর্গই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দেশ বিদেশে যত পণ্ডিত সভায়ই নিমন্ত্রিত হইয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় গিয়াছেন সর্ব্বত্রই বিচার কৌশলে ও অগাধ পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত সমাজকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। একদিনের জন্যও কুত্রাপি পরাজিত হন নাই।

কতকষ্ট স্বীকার করিয়াই যে সভ্রাতৃক সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বিদ্যাভ্যাস করিতেন তাহার আরও একটি ঘটনা লিখিতে ভুল করিয়াছি। অর্থাৎ জীবসারা ও বাসাইল ২৷৷০ মাইল পরস্পর দূরবর্ত্তী, অত্যন্ত শীত, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, ভীষণ বর্ষা প্রভৃতি অম্লান চিত্তে সহ্য করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় দিবা-রাত্রি অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে থাকেন। বর্ষাকালে গামছা পরিধান করিয়া হাটু পরিমিত কর্দ্দমময় কোথাও বা জল পরিপূর্ণ পথ এবং ভয়ঙ্কর প্রবল বর্ষা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পৃষ্ঠে পুস্তকের বোঝা বহন করতঃ যখন দুইভাই বিদ্যালয়ে গুরু সমীপে উপনীত হইতেন তখন দর্শকবৃন্দ বিশেষতঃ উপধ্যায় মহাশয় অধ্যয়নোৎসাহে আনন্দিত রোমাঞ্চিত হইতেন। এবং ইহার যে অসাধারণ দেবতুল্য মনুষ্য হইবে তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে অনেকের নিকট ব্যক্ত করিতেন।

১২৮৬ বাংলা সালে সিদ্ধান্তভূষণ মিথিলায় বাড়গ্রামের প্রধান পণ্ডিত ববুজানঝার নিকটে বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ এবং দর্শন অধ্যয়ন করেন। তৎকালে তদানীন্তন মিথিলাধিপতির নিকটে শ্লোক রচনা করিয়া গমন করিলে রাজা ১০০ শত টাকা পুরস্কার দান করেন।

সেই বৎসর পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান সাগর কার্য্যে কাশী নবদ্বীপ পূর্ব্বস্থলী ভট্টপল্লী বিমক্রপুর প্রভৃতির বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রন ও দেশস্থ বহু ব্রাহ্মণাদি ও পণ্ডিত নিমন্ত্রিত করিয়া গরদের জোড় ও স্বর্ণাঙ্গুরীর বরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দ্বারা সকলকে সম্মানিত করেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কার্য্যে আশাধিক সম্মান পাইয়া সকলে আনন্দিত হন। ঐ পণ্ডিত মণ্ডল সভাতে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় সংস্কৃতে বক্তৃতা করিয়া সকলকে স্তম্ভিত বিস্মিত করিয়াছিলেন এবং সকলের আদর আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন।

কলিকাতায় বাস কালে অনেক সময় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নির্জ্জন সাধনা করিতে দক্ষিণেশ্বর আগং রাজার বাগী প্রভৃতি স্থানে গঙ্গাতীরে ৩।৪ দিন বা ততোধিক সময় থাকিয়া কার্য্য করিতেন। একবার দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর নিকটে রাত্রিতে জপ কালে একটী গোখুর শাপ তার এক পার্শ্বে ফণা ধরিয়া ঝুলিতে ছিল, দেখিয়া তিনি ভীত হইয়াও জপ ত্যাগ করিলেন না, তদূরবর্ত্তি এক সাধু তাকে ডাকিয়া বলিলেন "পণ্ডিতজী মৎ ডরো", আপনা কাজ

কর" ক্ষণকাল পরেই সাপটী ফণা গুটাইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গাতীরে বাস করার ইচ্ছা পূরণ করিতে অনেক দিন হইতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন নগর পর্য্যন্ত তীরভূমি অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কলিকাতার গঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া এড়িয়াদহ একটী বাগান বাড়ী ভাড়া করিয়া তিন বৎসর কাল তথায় বাস করিয়া একটুকু তীরভূমি লাভ করিয়া তাহাতে ঘর করিবার সঙ্কল্পকালে ভূস্বামীর কুটীলতায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একেবারে কাশীধামে আসেন। শিষ্য ও ভক্তগণের সাহার্য্যে ছোট এক টীন বাড়ী ক্রয় করেন, কয়েক বৎসর পরে তৎসংলগ্ন আর একটী জীর্ণ শীর্ণ বাটী খরিদ করিয়া তাকে নূতন প্রস্তুত করিয়া তাতেই বাস করিয়া পূর্ব্ব বাটি ভাড়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

৺কাশী আসিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মাতৃ বিয়োগ ঘটে। মাতৃ শ্রাদ্ধে দান সাগর ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি বিদায় পিতৃ শ্রাদ্ধের দান সাগর হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন রূপে করিয়াছিলেন। এবং মাতৃ চিতাতে বড় একটি মন্দির প্রস্তুত করাইয়া পৈতৃক সিদ্ধেশ্বরী নামক দক্ষিণা কালী স্থাপন করিয়া ৺কাশী বাস করিতে চলিয়া যান।

সেই মন্দিরের দরজার উপরে শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এই শ্লোকটি লিখা আছে, যথা—

রামদ্ব্যষ্ট শশিসি শাক খিমিতে রাধস্য পক্ষেইসিতে,
সপ্তম্যাং শিব সুন্দরী জপরতা মাতাতি মৃত্যুং গতা।
চৈত্রেতচ্চিতি বৈধ বেশ্মনি নবদ্বীন্দ্রেশকে পৈতৃকীং,
মদ্বাদা ববলোহপি সোদরঃ বলঃ সংস্থাপ্য সিদ্ধেশ্বরীং॥ ১
সপ্ত ভ্রাতৃষু বিত্ত পুত্র রহিত স্তদ্বিত্ত পুত্রঃ সুখী,
দ্বিত্রানাং মহতামনুগ্রহবলাৎ পূর্ণ স্পৃহস্তুর্য্যকঃ।
কাশ্যাং দেহ জিহাসয়া বসতয়ে দ্বাষষ্টিবর্ষোদ্গতং,
সস্ত্রীকো জয়চন্দ্র বিপ্রক ইতো জন্ম ক্ষতেঃ প্রাপ্তিতঃ॥ ২

সিদ্ধান্তভূষমহাশয় একাকী কাশীতে যান নাই। তৎপত্নি ও ভাতুষ্পুত্র শ্রীগোপীচন্দ্র সঙ্গে গিয়াছিলেন।

ঐ বয়সেও তিনি ৺মম কৈলাশ চন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে মীমাংসার শারব ভাষ্য পড়িয়াছিলেন। অধ্যয়নে তাঁর এমনই আদর ছিল।

বাল্যকাল হইতেই পুস্তক সংগ্রহ করা তাঁর যেন ব্রত ছিল। তিনি বহু

পুস্তক কতক ক্রয় করিয়া, কতক পুরস্কার স্বরূপ পাইয়া, কতক উপহার স্বরূপ পাইয়া—ও দান পাইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। মোট দুই তিন হাজার টাকার পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এমন অমুল্য গ্রন্থও আছে যাহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়না। সংস্কৃত পুস্তকই অধিক। এতবড় পুস্তকালয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে অতি বিরল। এই পুস্তকালয়ে বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিজ্যোতিষ, দর্শন কাব্য নাটক ইতিহাস পুরাণ তন্ত্র জ্যোতিষ ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি যাবতীয় বিষয়েরই সমাবেশ আছে। বহুলোক এই পুস্তকালয় দ্বারা উপকার পাইয়াছেন ও পাইতেছেন।

কলিকাতা থাকিতে সংস্কৃত চন্দ্রিকা পত্রিকা বোস্তায়ের একজন উত্তম পণ্ডিত অন্নাশাস্ত্রী ঐ পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া কিছুদিন চালাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে পত্রিকা সেই হইতে বন্ধ থাকে। বর্ত্তমান বৎসর ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবভুতি বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় বিদ্যোদয় নামে মাসিক সংস্কৃত পত্রিকার সহিত নামের সম্মিলনে অভিনব ভাবে চালাইতে সিদ্ধান্তভূষণের নিকট প্রস্তাব করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন নাই। তারপরে কি হইল জানি না ভবভূতি বাবুর জানা থাকিতে পারে।

এক সময় রংপুর ডিমলার জমিদার পণ্ডিত প্রিয় জানকিবল্লভ রাজার বাড়ী সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় গেলে সমস্যা পুরাণের ব্যাপারে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশকে রাজা আহ্বান করেন, উভয় পণ্ডিত রাজার সম্মুখে সমস্যা পুরণ করিতে লাগিলেন। ভাব, পদবিন্যাস ক্ষিপ্রকারিতাদিতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতে সমস্যা পুরণ চলিতে চলিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল বিরাম নাই, পুর্ণ উৎসাহ, যেন জানকীবল্লভ উভয়ের হাতের কাগজ কলম নিয়া গেলে তাঁহারা ক্ষান্ত হন।

জয় পরাজয়ের কথা সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মুখে শুনি নাই, এই মাসের (১৩ই পৌষ) অত্রত্য সাহিত্য পরিষৎ সভায় তর্করত্ন মহাশয় নিজ মুখে বলিয়া ছিলেন যে তিনিই পরাজিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক।

তারপরে জানকীবল্লভের মাতৃ শ্রাদ্ধে পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ পত্রের জন্য নুতন নুতন ১০৮টি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। সেই সকল শ্লোক এখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষিত রহিয়াছে।

দেবতার নামের উপর তাঁর বড় ভক্তি ছিল, প্রায়শঃই উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে দুর্গা নাম শিব নাম রাম নাম ইত্যাদি উচ্চারণ করিতেন।

যাত্রা করিয়া কোথাও যাইতে হইলে জয় গণেশ শ্রীগণেশ জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা করিতেন, নিত্যকৃত্য শিক্ষাতে সে সকল প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্গা নাম করিতে করিতে সকালে গঙ্গায় যাইতেন এবং আসিতেও দুর্গা নাম বলিতে বলিতে আসিতেন। পথিকগণ ঐ ভাব দেখিয়া ও নাম শ্রবণে মুগ্ধ হইতেন।

দুই বৎসর পুর্ব্বে শিরোঘুর্ণন উপস্থিত হইলে পরিজনগণ কেদারের উচ্চ সিঁড়িতে উঠা নামা করিতে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে বারণ করিলে, তিনি বলিতেন তোমাদের কোন ভয় নাই দুর্গা নামে কি কখনও বিপদ হইতে পারে?

এক সময়ে কাশীতে খুব বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট জলে পরিপুর্ণ করিলে সিদ্ধান্ত ভূষণ জলে পুর্ণ রাস্তা দিয়া আসিতেছেন, একটী গর্ত্তে অনেক গুলি কুকুর জলস্রোতে আকৃষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে, জলের নীচে গর্ত্ত দেখা যায় না জলের আবর্ত্ত চলিতেছে, সিদ্ধান্তভূষণ ঐ স্থানে আসিয়া এক পা বাড়াইলেই ঐ গর্ত্তে পতিত হন, এমন সময় কে আসিয়া তাঁকে পশ্চাৎ দিক হইতে টানিয়া বহুদূরে নিয়া গেল, তিনি যেন কিছুই জানিলেন না।

এদিকে জল কমিয়া গেল সিদ্ধান্তভূষণ পুনর্ব্বার সেই পথে সেই স্থান দিয়া আসিতে অদূরবর্ত্তী দোকান হইতে এক ব্যক্তি বলিল পণ্ডিত মহাশয় যে লোকটী আপনাকে পিছন হইতে টানিয়া নিয়াছে সে আপনাকে আজ বাঁচাইয়াছে, নচেৎ এই যে সামনে দেখিতেছেন গর্ত্তটী ইহাতে আপনার কি দশা হইত? ইহার ভিতরে ২।৪টী কুকুর মরিয়াছে। তখন তিনি চমকিত হইলেন, কেহ যে তাঁকে পেছন হইতে টানিয়া নিয়াছে এবং তিনি যে এখানে আসিয়া ছিলেন সে সকল কিছুই মনে হইতেছে না, কাণ্ডখানা কি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিয়া সকলকে বলিলেন, আজ দুর্গানামের প্রভাবে বাঁচিয়া আসিলাম, কাল ভৈরব বা বিশ্বনাথ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এই বলিয়া গদ্‌গদ স্বরে সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

কলিকাতায় একদিন কুমারটুলী হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন, কথাবার্ত্তায় রাত্রি অনেক হইল, সিদ্ধান্তভূষণকে গাড়ীতে পাঠাইতে হীরেন বাবু বলিলে তিনি প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বলিলেন এ অতি সামান্য রাস্তা আমি চলিয়াই যাইতে পারিব গাড়ীর দরকার নাই, তখন আলো দিয়া একটী লোক সঙ্গে পাঠাইবেন হীরেন বাবু বলিলে, বলিলেন তারও দরকার নাই, একজন আলোধারী নিয়া কি হইবে, আমার সঙ্গে চারিজন

বডিগার্ড চলে। হীরেন বাবু বলিলেন কি রকম? তখন সিদ্ধান্তভুষণ বলিতে লাগিলেন,—বজ্রং বজ্রী চক্রমাদায় চক্রী শূলং শূলী দণ্ডমাদায় দণ্ডী।

ধাবত্যগ্রে পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চ দুর্গা দুর্গা বাদিনাং রক্ষণায় ॥

আমি দুর্গা উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছি ও চলিলাম তখন আর ভয় কি?

হীরেন বাবু অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিরত হইলেন।

দুর্গা নাম না লিখিয়া তিনি অন্য কিছুই লিখিতেন না, তাঁর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও স্পষ্ট ছিল। স্বহস্তে বহু পুস্তক লিখিয়াছেন, অক্ষর গুলি মুক্তা-পংক্তি বৎ।

শাস্ত্রীয় পবিত্রদ্রব্য দ্বারা সাবান্ ধূপ, পট্টবাস, ইন্দ্রলুপ্ত প্রভৃতির ঔষধ। গাছেই তুলার বিবিধ রং হওয়া অম্লফলকে মিষ্ট করা ক্ষুদ্রফলকে বড় করা, একই গাছে এক ডালের ফল পাকা ও একডালে কাঁচা থাকা ইত্যাদি বহুবিধ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অন্যান্য বহুবিধ শিল্প ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই এদিকে মুক্তহস্ত হইলেন না।

লুপ্তরত্নোদ্ধার নাম দিয়া একখানা পুস্তক ও একটী কার্য্যালয় কোচবিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন সিংহ নামক এক ভদ্রলোকের কিছু দিন কার্য্য করিয়া ও নানা কারণে ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

শান্তি স্বস্ত্যয়নে বহুস্থানে সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয় প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়াছেন। মৃতবৎসা রোগের উত্তম ঔষধ জানিতেন, কুমারটুলী নিবাসী শ্রীমান্ কালীভুষণ সেন তাঁরই ঔষধে বাঁচিয়া আছেন. পূর্ব্বে বহু ভাই ভগ্নী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য টোটকা ঔষধ ও মন্ত্র যন্ত্র অনেক জানিতেন।

ছেলেদের বিছানায় মূত্রত্যাগ নিবারক ভাল একটী মাদুলী জানিতেন, এক সময়ে কোন সাহেব বাগানে ভাল গোলাপফুল দেখিয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সেই ফুল তুলিয়া পূজা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল এবং সাহেবের বাগানে ফুল তুলিতে লাগিলে সাহেব মালিদ্বারা তাঁকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি ফুল নিতেছ? সিদ্ধান্তভুষণ বলিলেন, এই ফুল দিয়া ঈশ্বরকে পূজা করিব। সাহেব—পূজা করিলে ঈশ্বর কি করেন? সিদ্ধান্তভুষণ, ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন। সাহেব আচ্ছা আমার এই ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে তুমি ঈশ্বরকে পূজা করিয়া ইহা সারাইতে পার? সিদ্ধান্তভুষণ হা পারিব, তাহা হইলে আমাকে ফুল নিতে দিবে ত?

সাহেব হাঁ, যত ফুল চাও তত ফুল নিবে। সিদ্ধান্তভুষণ একটি মাদুলী সাহেবের ছেলেকে দিলে বাস্তবিক ছেলে আর বিছানায় প্রস্রাব করিত না। তখন সাহেব মালিকে বলিয়া দিল, এই পণ্ডিত যত ফুল নিতে পারে নিবে, বাধা দিও না।

পূজাতে সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয়ের ফুল চন্দন ধূপ ধুনারই আড়ম্বর ছিল। অন্য বস্তু সামান্য হইলেই হইত।

শিষ্যগণ দীক্ষা নিতে ফর্দ্দ চাহিলে তিনি ফুল চন্দন ধূপ ধুনারই ফর্দ্দ দিতেন. আর কিছু বলিতেন না।

এই গত অগ্রহায়ণ মাসের ৪ঠা তারিখে অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট সেসনস্ জজ রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক দীক্ষা নিবার সময়ে দশ টাকাতে সকলই হইবে বলিয়া সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়া ছিলেন, গোপাল বাবু কিন্তু চল্লিশ টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। ইহা সিদ্ধান্তভুষনের একটি নির্লোভতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নির্লোভ সম্বন্ধে তিনি মহাভারতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি কত ব্যক্তিকে কতবার যে শুনাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই—শ্লোকটি এই—

স পার্থঃ পার্থিবান্ সর্ব্বান ভূমিস্থোপি রথস্থিতান্।

একো বিনাশয়ামাস লোভঃ সর্ব্বগুণানিব ॥

৺কাশীবাসী হইয়া তিনি প্রত্যহ পুষ্প চয়ণ করিতেন শেষ দুই বৎসর অন্যকে প্রতিনিধি করিয়া ছিলেন।

খড়ম পায়ে দিয়া কেদার ঘাট হইতে জগৎগঞ্জ ভারত ধর্ম্মমণ্ডল পর্য্যন্ত হাটিয়া গিয়াছেন, শেষ চার পাঁচ বৎসর জুতা পায়ে দেন নাই।

সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয় ত্রিশ বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়া বহু গণ্য মান্য রাজা জমিদারের পরিচিত থাকিয়া ও মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইতে কোন চেষ্টা করেন নাই। চেষ্টা করিলে অনায়াসে বা অল্পায়াসেই উক্ত উপাধি পাইতেন।

৺কাশী আসিলেও তিনি সকল বিষয়ের প্রতিগ্রহই ত্যাগ করিয়া ছিলেন, একটী ফুলও প্রতিগ্রহ করিতে চহিতেন না। দুই এক জনের বিশেষ আগ্রহে ফুল নিয়া তাদের কল্যাণেই দেবতাকে দিতেন।

উক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্তভুষণ মহাশয়কে মহামহো-

পাধ্যায় উপাধি দেওয়াইবার জন্য তাঁর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গোপাল বাবুর সে বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাও আছে। লাট সাহেব, ডিরেক্টর, কমিশনার প্রভৃতির সঙ্গে খুব আলাপ। তিনি বিক্রমপুরের মাধবচন্দ্র তর্কচুড়ামণিকে ঢাকা অজিয়তির কালে মহামহোপাধ্যায় করিয়াছেন, এবং তাঁর টোলের বহু উন্নতি করিয়া দেন।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে উক্ত উপাধি নিয়া বহু তর্ক বিতর্কের পর জজ বাবু পরাস্ত হইয়া উপাধি দেওয়াইতে বিরত হইলেন।

ক্রমশঃ

ইন্দিরা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

(১)

আকাশ সেদিন মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় অন্ধকার করিয়া আছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে বহুদূর বিস্তৃত খোলা পথ—দুই একটা ছ্যাক্‌রা গাড়ী সুধু জলে ভিজিতেছে, আর কোথাও কেহ নাই। একটি যুবক চেনা শোনা নাই, আমাদের বাটিতে প্রবেশ করিয়া আমার দাদাকে বলিলেন, আমাকে একটু থাক্‌বার জায়গা দেবেন?

আমাদের নীচেকার দুই একখানি ঘর খালি পড়িয়া থাকিত। দাদা এক খানি ঘরে তাঁহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যুবকটির হাতে একটি বাঁশী ছিল, তাঁহাকে দেখিতে অতি সুন্দর ও সুশ্রী। তিনি বলিলেন, আমি খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারি, যদি কেহ শেখেন ত শেখাইবার ভার লইতে পারি।

যুবকটির নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, নাম? নামে কি হবে,—আমি কনক।

তাঁহাকে আহার দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি কিছুই লইলেন না, সুধু এক

বাটি চা খাইয়া বাঁশীটি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমরা তাঁহার গতি দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে তিনি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘমালা চলাচল বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কখন কখন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকে দেখা যাইতেছিল।

(২)

তারপর দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। তখন যুবক ফিরিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ঘরে খাবার প্রভৃতি দিয়া আসিলাম। কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, যেমন খাবার তেমনই চাপা দেওয়া রহিয়াছে।

সমস্ত দিন তিনি ঘরেই শুইয়াছিলেন। তাঁহাকে চা ভিন্ন কিছুই খাইতে দেখিলাম না। বৈকালের কিছু পূর্ব্বে তিনি বাঁশী লইয়া পূর্ব্ব দিবসের মত পথে চলিলেন। তখন খুব বৃষ্টি নামিয়াছে। পথে দুই চারিটি মাত্র লোক চলিতেছে।

আমাদের সেদিন থিয়েটারে যাইবার কথা ছিল। গাড়িতে উঠিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর যাইবার পর দেখি, রাস্তায় একটা কিসের ভিড় হইয়াছে। কুলি মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় লোক পর্য্যন্ত সকলে সেইখানে ঘিরিয়া দাড়াইয়াছে। আমাদের গাড়ী সেই স্থলে যাইলে দেখিলাম, আর্দ্রবসন কনক উহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া বংশীবাদন করিতেছে। সে বাশীর কত মধুরতা! না শুনিলে কে বুঝিবে? তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়াছে। রাত্রির আগমন ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমাদের বাশী শুনিতে শুনিতে রাত্রি হইয়া গেল, থিয়েটারে যাওয়া হইল না—বাটী ফিরিলাম।

তারপর অনেকক্ষণ পরে কনক বাড়ী আসিয়াছে। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি অমন করে ওখানে প্রতিদিন বাশী বাজান্ কেন? তিনি বলিতে লাগিলেন—যেন কি ব্যাথাকরুণ ভাষায়—

(৩)

ছেলেবেলা থেকেই আমার আভার প্রতি ভালবাসা জন্মে। সে বিধবা! বারবৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। দুই বৎসর পরেই সে স্বামীহীনা হয়। তাহার পিতা আবার বিবাহ দেন। ছয় মাস পরেই আবার সে স্বামী হারায়। একদিন তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে বলিলাম, ভাই আভা আমার একটি কথা আছে, যদি কিছু মনে না কর তবে তোমাকে বলিতে পারি। আভা

বলিল, ভাই কনকদা আমি কি তোমার প্রতি কোনদিন রাগ করিয়াছি. তোমার যাহা বলিবার আছে, বল। আমি বলিলাম, আভা আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসি। তোমার বাবার বিশেষ অমত নাই আমি তোমাকে ... ...।

তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, কনকদা, আমিও তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু তোমাকে আমি হারাইতে চাই না—তোমাকে হারাইলে আর আমি থাকিতে পারিব না। তাড়াতাড়ি বলিয়া সে অন্য ঘরে কাজ করিতে ছুটিয়া গেল।

আমি তাহাদের বাটী হইতে সেদিনকার মত বিদায় হইলাম। পর দিন গিয়া দেখি সবই চুপচাপ—বাড়ী নিস্তব্ধ। আভা কাল রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাড়ার লোকেরা অনেকে অনেক বলিতে লাগিল—আমি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলাম না—আমি ভাবিলাম না আমি তাহাকে আবার পাইব সে ফিরিয়া আসিবে সে আসিবে—

আমি তাই তাহার দর্শনাশায় প্রতিদিন রাস্তার মাঝে বাঁশী বাজাইতে যাই, বহু লোক তথায় জনতা করে—যদি তাহাদের ভিতরে তাহার একবার মাত্র দেখা পাই।

(৪)

আমার চক্ষু দিয়া দুইটি অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। মনে হইল—আহা কোন্ সে হতভাগী এরূপ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন সত্যই কনক আভাকে একটী গাড়িতে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু আভা বলিয়া চীৎকার করিয়া যেমন গাড়িতে উঠিতে যাইবে, অমনি আভার আজ্ঞায় গাড়ি জনতা ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল, কনক একেবারে ট্রাম লাইনের উপর পড়িয়া গিয়া অচৈতন্য হইল।

আমি দেখিতে পাইলাম—আমাদের বারান্দার ধার দিয়া দুইজন কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। পরে দেখিলাম সে সংজ্ঞাশূন্য যুবক কনক। আমরা তাহার বহু সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তারপর সে বলিতে লাগিল, আভা আমায় উঠিতে দিল না, আচ্ছা আমি আবার তোমায় পাইব—তোমায় আবার দেখিব।

বৈকাল হইতে না হইতেই সে আবার বাঁশী লইয়া চলিল। খালি পায়ে গিয়াছে, তাহার চটিজুতা ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে।

(৫)

দুইদিন পরে আবার আভাকে সে গাড়ী চড়িয়া যাইতে দেখিল। সে বলিল, আভা তুমি ফিরে এস—তুমি এস—এস। আভা বলিল, আমি তোমায় যখন ভালবাসিতাম তখন বাসিতাম, এখন আর না—দেখেছ আমি এখন নরকের পথে—থিয়েটারের অভিনেত্রী—ফিরে যাও। গাড়ী চলিতে লাগিল। কনক উঠিতে গিয়া পড়িয় গেল। কয়েকজন রাস্তার লোকের হাতে গাড়ির ভাড়া দিয়া সে উহাকে রাখিয়া আসিবার নম্বর বলিয়া দিল। পথে তাহাকে ফেলিয়া আভা চলিল।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর দরজায় একখানি টেক্সিকার আসিয়া থামিল। দেখিলাম, তাহাতে শায়িত অচেতনাবস্থায় যুবক কনক। আমরা সারারাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার চেতনা হইতে সে বলিতে লাগিল. আচ্ছা আমি আবার তোমায় দেখিব, তোমায় আবার পাইব আমি।

আমার দাদা দুই চারিজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন, ডাক্তারেরা বলিল, হার্টএর বড় ডিফেক্ট—শয্যায় যেন শুইয়া থাকেন, বাহিরে না বেরোন যেন।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কনক বলিতে লাগিল, কই আমার বাঁশী কই, কই। বাঁশী হাতে করিয়া সে পথ ধরিয়া আবার চলিল।

তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা বাহির হওন ডাক্তারের বারণ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া তাহাকে বলিলাম, কনক! তোমার না বাটি হইতে বাহিরে যাওয়া নিষেধ, তুমি এখানে জলে বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া কেন?

কনক—আচ্ছা আমি আবার দেখা পাব বলিয়া গাড়ীতে উঠিল। বাটি আসিয়া সে বলিল, তোমরা কেন গেলে, আভা হয় ত ফিরিয়া গেল।

রাত্রে তাহার ভয়ানক জ্বর হয়।

সকালে উঠিয়া দেখিলাম তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—রৌদ্র মুখেচোখে পড়াতে সে জাগিয়াছে। আমি মাকে এই খবর দিলাম। বাবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—কে ও এখানে জুটিয়েছে। মা বলিলেন, না, না ও থাক, ও ত কিছু ক্ষতি করিতেছে না, থাক।

চারি পাঁচ জন ডাক্তার আনান হইল—সকলেই কোন আশা নাই বলিয়া চলিয়া গেল। আমার বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, না কে বল্‌লে আশা নাই, আশা আছে। আমার মন বলিল, হ্যাঁ আশা আছে।

(৬)

তিনদিনের দিন কনক আমার কাছ হইতে একখানা শ্লিপ কাগজ ও একটা পেন্সিল চাহিল। সে কাগজে কি দুই চারি লাইন্ লিখিয়া শিয়রে রাখিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে সে মরণের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইবার সময় হঠাৎ সে আমায় বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মৃত্যুরিম ঠোট দুইটি আমার ঠোটের উপরে একবার চাপিয়া ধরিল।

সকালে উঠিয়া দেখি কনকের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আমরা তাহাকে শ্মশানে লইয়া গেলাম। সে চিতা দেখিয়া আমার মন আর থাকিতে পারিল না—হায় কনক সে চিতা যে ভুলিতে পারিব না।

বাড়ি ফিরিয়া কালিকের সেই কনকের লিপিখণ্ডটুকু পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে লিখিত রহিয়াছে,—"আভা তুমি এলে না, আর একজনের মাঝে তোমায় পেয়েছি। তবু সব ছেড়ে যেতে হবে—তোমায় ভালবাসি আভা। ইন্দিরার কথা—না থাক।"

পরদিন প্রভাতে আভার লেখা একখানি চিঠি কনকের নামে আসিল। সে লিখিতেছে—"কনক মণি আমার, এসো তুমি ফিরে এসো, আমি আর প'রছি না। তোমায় আর তাড়িয়ে দেবো না। এ জীবন আমার অসহ্য—এসো তুমি ফিরে এসো, মণি আমার—"

এখন সেই সময় মনে জাগিতেছে। ওঃ কি সেই সুন্দর মুখখানির কথা। সেই তার যাবার সময়কার চাওয়া—কি দুঃখে ভরা মাগো—

সে চলিয়া গেল। আমি আভা নই, আমি ইন্দিরা। তবুও সে আমারই মধ্যে তাহার শেষ বিদায়ের বেলায় আভাকে পাইয়াছে। এইটুকুই আমার সারা জীবনের শান্ত্বনা।

ভালবাসার পরপারে।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে গঙ্গাপুর গ্রামে বরদাকান্ত নামে এক দর্জ্জী বাস করিত। একটী ছোট মেটে ঘরে মাচার উপর সে থাকিত। ঘরটীতে রাস্তার দিকে একটি মাত্র জানালা ছিল। গ্রামে বরদাকান্তই একমাত্র দর্জ্জী এবং

সে জাতিতে হিন্দু, সেই জন্য সকলেই তাহাকে কাজ দিত। দর্জ্জীর কাজ সাধারণতঃ মুসলমানেই করিয়া থাকে সেই জন্য বরদাকান্ত হিন্দু পল্লিতে হিন্দু দর্জ্জি হওয়ায় তাহার কাজের অভাব ছিলনা। গ্রামে এমন লোক ছিলনা যে বরদাকান্ত তাহার জামা করে নাই। এইজন্য রাস্তা দিয়া যত লোক যাইত, ছোট জানলা দিয়া তাহার আধখানা দেখিয়াই; মানুষটিকে বরদা ধরিতে পারিত। বরদা বড় সৎ লোক ছিল, সময় অভাব হইলে সে কাজ গ্রহন করিত না, ভাল সুতায় অতি যত্ন সহকারে কাজ করিত এবং কখনও বেশী দাম দাবী করিত না।

ক্রমে ক্রমে বরদার প্রায় ৫০ বৎসর বয়স হইল। সে তখন পরজন্মের চিন্তায় বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতি মধ্যে হঠাৎ তাহার স্ত্রী বিয়োগ হইল। বরদার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল কিন্তু একটিও বাঁচে নাই। কেবল তাহার স্ত্রীর মৃত্যুকালে সারদা নামক একটি তিন বৎসরের শিশু জীবিত ছিল। ঘরে কেহ নাই, ছেলেটির যদি অযত্ন হয়, সেইজন্য বরদা ছেলেটিকে গ্রামের মধ্যেই অনতিদূরে তাহার বোনের বাড়ী রাখিবে মনস্থ করিল। কিন্তু আবার অপরিচিত পরিবারের মধ্যে হঠাৎ আনীত হইলে যদি সারদা ভীত হয় এই ভাবিয়া তাহাকে স্থানান্তরের প্রস্তাব ত্যাগ করিল। বরদার সকল প্রস্তাবই শেষ হইল। ছেলেটি একদিন জামরুল পাড়িতে গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া গেল, দু একদিন জ্বরে ভুগিল ও মারা গেল! সারদা মাত্র তের বৎসর তিন মাসের হইয়াছিল। বরদা অদৃষ্টের এই শেষ আঘাতে অত্যন্ত আহত হইল। ভগবানের সকল করুণাই তাহার বিরম্বনা বোধ হইতে লাগিল। দিবারাত্র সারদা ভিন্ন সে আর অন্য কিছুই চিন্তা করিতে পারিত না। এবং সর্ব্বদা ঈশ্বর নিন্দায় রত হইল যে তিনি কি জন্য তাহাকে রাখিয়া সারদাকে কারিয়া লইলেন। এই বিপদের কথা শুনিয়া বহু আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সমবেদনা প্রকাশ করিতে বরদার নিকট আসিত। এমন কি অভয়চরণ নামে তাহার এক আত্মিয় যে আজ ১০ বৎসর কাল গ্রামে না আসিয়া লক্ষ্ণৌতে তামাকের ব্যবসা করিতেছিল, সেও আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া বরদা বলিল "আমার আর কোন বাসনা নাই, মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র কাম্য বস্তু" ও ভগবানের সংসার পরিচালন নীতির বহু কুৎসা করিল! অভয়চরণ বলিল যে জগৎ তোমার ইচ্ছামত চলিতেছে না এবং চলিবেও

মা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই চিরকাল চলিবে। কোন অশেষ কারনে ও মঙ্গলকামনায় তিনি তোমায় রাখিয়া সারদাকে সরাইলেন। তুমি তোমার নিজ সুখের ইচ্ছার বশবর্ত্তি হইয়া এরূপ শোক বিহ্বল হইতেছ।

বরদা বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "জীবন ধারণের উদ্দেশ্য কি?"

অভয়চরণ বলিল "বরদা, আমরা ভগবানের জন্যই জীবনধারণ করিব, তিনিই আমাদের প্রাণ দিয়াছেন এবং তাঁহার জন্যই আমরা প্রাণ ধারণ করিব, এইটি যে বুঝিবে সে আর কোন দুঃখে কাতর হইবে না এবং সকল কার্য্যই তাহার সহজ বোধ হইবে।"

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বরদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কি প্রকারে ভগবানের জন্য আমরা প্রাণধারণ করিতে পারি।"

অভয়চরণ বলিল "শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয় অর্জ্জুনকে অসংখ্য উপদেশ দিয়াছেন। তুমি লেখাপড়া জান। একখানি গীতা কিনিয়া আন।"

বরদা নিকটস্থ নগরের পুস্তকবিক্রেতাকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাপা একখানি গীতা পাঠাইতে পত্র লিখিল।

প্রথমে বরদা কেবল উৎকৃষ্ট বার তিথিতেই পাঠ করিত। ক্রমে ক্রমে তাহার ইহা পাঠ করিতে এত ভাল লাগিল যে, প্রত্যহ সন্ধ্যায় সমস্তদিন দর্জ্জির কার্য্যের পর, পাঠ করিতে আরম্ভ করিত এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোর কেরোসিন তৈল ফুরাইয়া যাওয়ায় না নিবিয়া যাইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠ করিত। অল্পকাল মধ্যে সে অভয়চরণের কথাগুলির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। এবং আর পূর্ব্ববৎ নিদ্রাকালে সারদা বলিয়া চীৎকার করিতনা বরং গীতায় উল্লিখিত মনা পুরুষগণের নাম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর লোকের নিদ্রা হরণ করিত। ক্রমশঃ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

চিত্র পঞ্জিকা।— আমরা কলিকাতা ৯৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোডস্থ সুবিখ্যাত গ্রামোফন মেসিন রেকর্ড ও কারবাইট ও আলোক বিক্রেতা কে, সি, দে কোম্পানির চিত্র পঞ্জিকা ও ডেটকার্ড উপহার পাইয়াছি। দেওয়াল পঞ্জিকায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ত্রিবর্ণের সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রখানি ভক্তিভাবোদ্দিপক ডেট কার্ডখানিতে ইংরাজি বার মাসের বারখানি করিয়া মাস বার তারিখ সংযুক্ত মুদ্রিত কাড আছে। দুইরকমের দুইখানি প্রাচার পঞ্জিকাই সুদৃশ্য হইয়াছে।

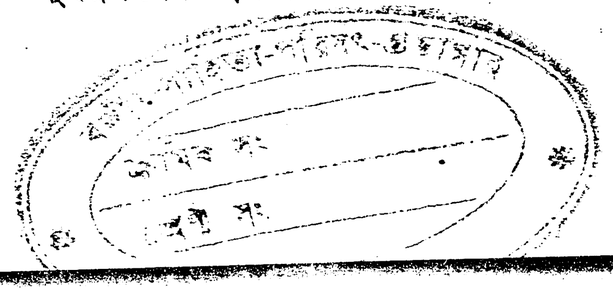

বটকৃষ্ণ পালের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যান্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১।০ মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২।০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

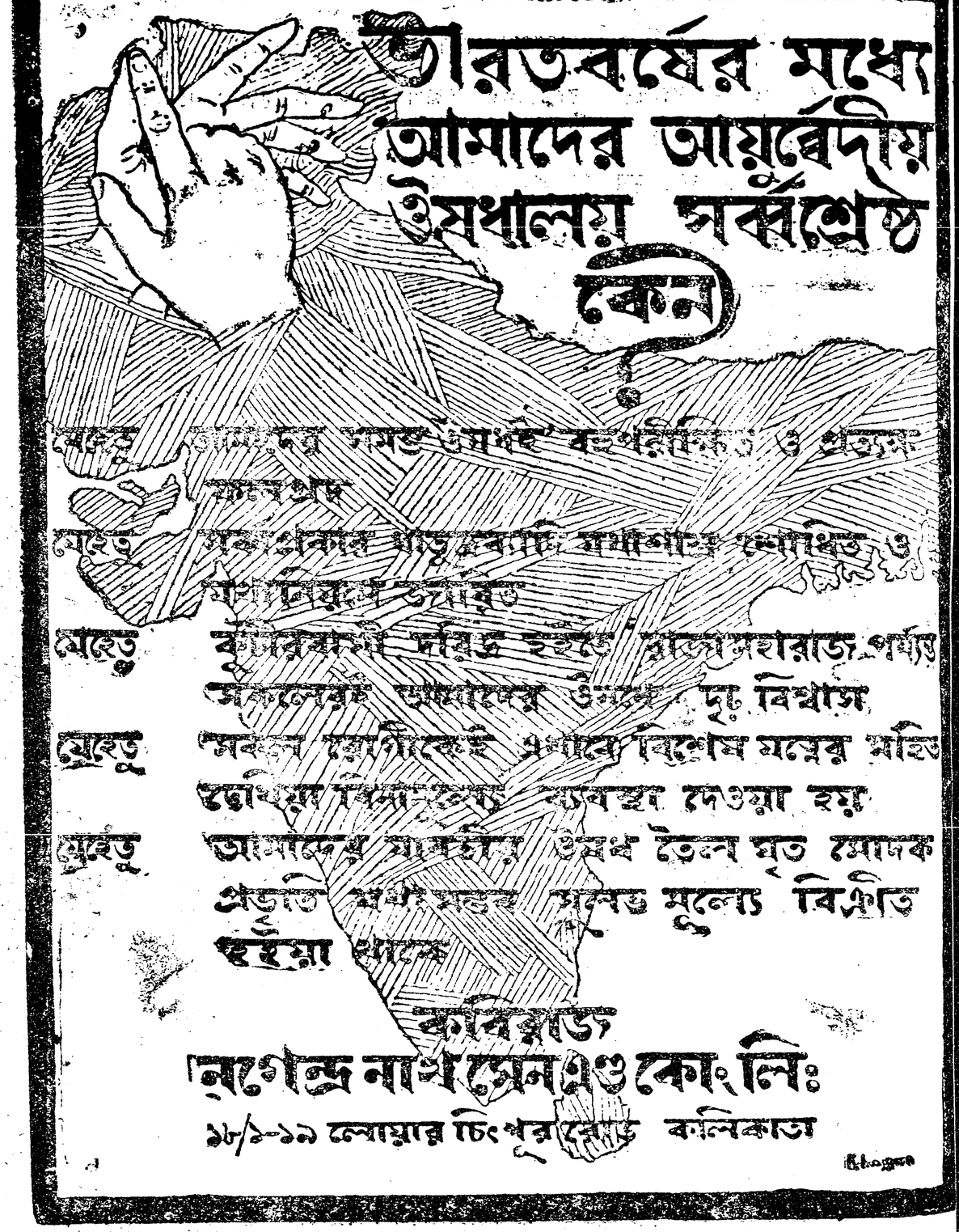

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩১, [১১শ, সংখ্যা

১।	সরস্বতীর বন্দনা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত	৩২১
২।	অশ্রু-কণা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৩২২
৩।	স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জীবন চরিত		৩৬০
৪।	অভিমান	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৩৩৯
৫।	শ্রীশ্রীঅপূর্ণা	... ...	৩৪০
৬।	নারীর কথা	শ্রীমতী পূর্ণিমাপ্রভা রায়	৩৪৩
৭।	বনভূমি	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩৪৬
৮।	জীবন্ত পুত্তলিকা	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	৩৪৮

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কালিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 16-5-25

জ্বরের যম জারমলীন [illegible]

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর

যখন চখের সামনে লেখাগুলি

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

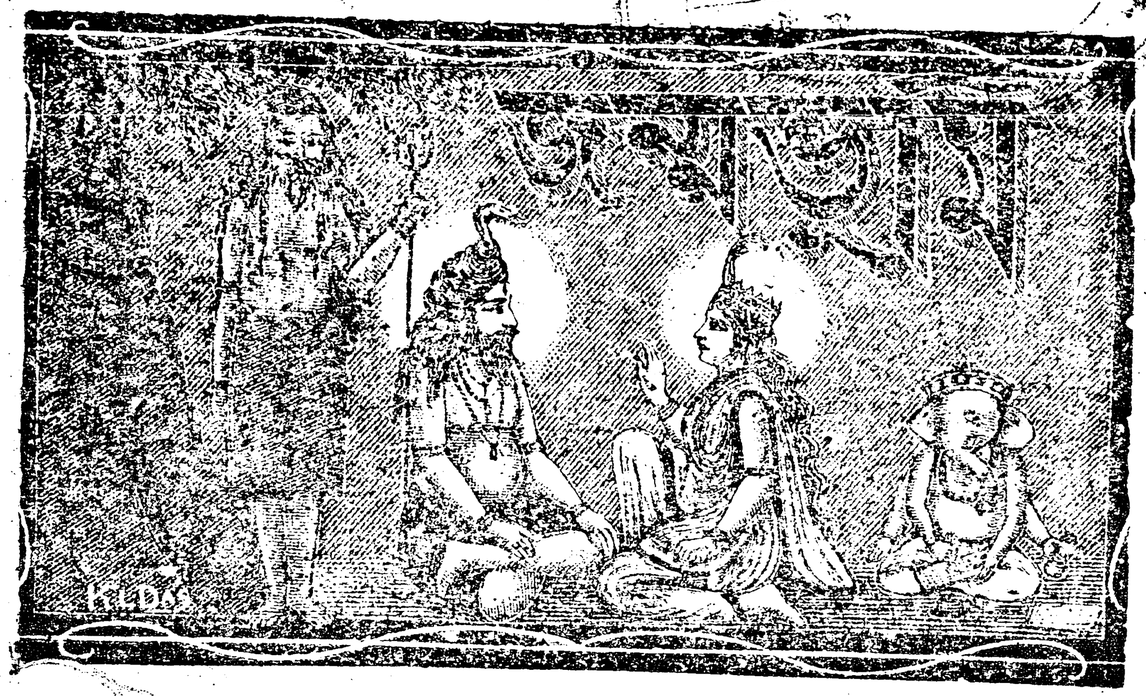

৩০শ, বর্ষ। } ১৩৩১ সাল, ফাল্গুন। { ১১শ, সংখ্যা।

সরস্বতীর বন্দনা।

(পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।)

ললিত—সুরফাঁক তাল।

বিরাজে সরোজে গীর্ব্বাণ বাণী।
কি অনুপ রূপ ছন্দ—
জিনি-কোটী চন্দ্র-উজল বরণী॥
বিধাতা শ্রীমুখ হর চন্দ্র-শেখর,
সেবে পদ-কমল-যুগানি॥
সুর-লয়-ছন্দ সুতান বাজে ঘন ঘন, মৃদঙ্গ, বীণা
গাহে দেবী। গুণ গরিমা বাখানি॥

পুত-প্রণব, ত্রিতাপ-পাপ হর বেদ সুন্দর,
নিরন্তর শুভ সম্পদ পদ-শোভিনি !
রে চিত কি চিন্ত সতত,—পিও দেবী পদ অমৃত ধারা
হ'বি মূঢ় তাহে-অমৃত আপনি ॥
দেহি শ্রীচরণ দীনে কৃপা করি, করুণা করি !
নমে পদ তব কিঙ্কর
বুধ জননী !

অশ্রু-কণা ।

লেখক —শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র ।

(১০)

দাওয়ান পরেশ বাবু, দীনদয়াল বাবু ও প্রমথর নিকট—"শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন হেতু এখন কিছুকাল গ্রামে যাইতে পারিবেন না।" এইরূপ ওজর করেন, তিনি প্রমথর সহিত গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া, কলিকাতায়ই অবস্থান-করিতে ছিলেন। আসলে পরেশ বাবুর কলিকাতার "কলের জল" ও "বালাম চাল" এতাবৎ কাল বেশ ভাল লাগিতেছিল, তাই তিনি এ স্থানটা পরিত্যাগ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন।

সদাশয় জমিদার দীনদয়াল বাবু তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে বাসা খরচ বাবদ মাসিক চল্লিশ টাকা পাঠাইবেন ও তাঁহার যাহাতে কলিকাতায় থাকা কষ্টকর না হয়, তাহা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় একটী দৈব ঘটনা ঘটে, যাহাতে পরেশ বাবু কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

যে দিন রাত্রে প্রমথ জীবনবাবুদের বাটীতে গিয়াছিল, তাহার পরদিবস (অর্থাৎ জীবনবাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রণের দিন) প্রমথ কলিকাতা হইতে নিম্ন লিখিত টেলিগ্রাম খানি প্রাপ্ত হইল,—

"প্রমথ বাবা !
বড় অসুখ ! কে দেখবে ? তোমাকে আমি ছেলের মত মানুষ করেছি, তুমিও আমাকে 'কাকা কাকা' কর—সুবিধা হয় ত একবার এসো।"

শ্রীপরেশকুমার দে।
(দাওয়ান)

প্রমথ টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিয়া, কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, পরক্ষণেই "টাইম টেবিল" খানি খুলিয়া দেখিল, তাহাদের ষ্টেশন হইতে হাওড়ার গাড়ি নয়টা পয়তাল্লিশ মিনিটের সময় ছাড়িবে।

প্রমথ তখনই দীনদয়ালবাবুর কক্ষে যাইবার জন্য উঠিল। দীনদয়ালবাবুর কক্ষের দরজায় ভৃত্য বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। প্রমথ তাহাকে ইঙ্গিতে দাদা মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

রমা বহুদিনের পুরান চাকর। সেও ইঙ্গিতে হাতের আঙ্গুল নাড়াইয়া বুঝাইয়া দিল, বাবু কাগজ পত্র দেখিতেছেন।

প্রমথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার কর্ম্মপ্রবণ পিতামহ চশমা চক্ষে কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছেন ও একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন। প্রমথকে দেখিয়াই দীনদয়ালবাবু ক্ষিপ্রহস্তে কাগজ পত্র গুলি রাখিয়া চশমাটী কেসে পুরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিহে ভায়া ! কি মনে করে সকাল বেলাই আসা হয়েছে ? তোমার হাতে ওটা কি ?"

প্রমথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা মশাই, আমাকে এক্ষুণি কল্‌কাতায় যেতে হবে। কাকা বাবুর বড় অসুখ। তিনি এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।"

দীনদয়াল বাবু টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিয়া বলিলেন, "তা ভায়া, তুমি থাক। আমি সতীশ বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ্যে চীৎকার করিয়া বলিলেন, ওরে গোমস্তা বাবুকে ... ... ।"

প্রমথ দাদা মহাশয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল, "না দাদা মশাই, আমি যাব। তাঁর অসুখ বিসুখের চিকিৎসা করান, ডাক্তার দেখান, এ সব সতীশবাবু আমার মত করতে পারবেন না। আর এক কথা, তিনি আমাকে ছেলের মত মানুষ করেছেন। কলকাতায় আমাকে যে রকম যত্ন ও আদরে রাখতেন, তা আমি মুখে বলতে পারব না। আমিই যাই। আর তিনি আমাকেই যেতে লিখিছেন, আমারই যাওয়া উচিত। তারপর তাঁর এ অসুখের

সময় আমার কি তাঁহাকে একবার দেখা উচিত নয়? তিনি আমাকে কত যত্ন করেছেন বলুন দিকি?"

দীনদয়াল বাবু পৌত্রের উপযুক্ত কথা সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা তুমিই যেও।"

প্রমথ ধীরভাবে বলিল, 'যেও কি দাদা মশাই! এখনই যাই।"

রমা কক্ষে প্রবেশ করিয়া, গড়গড়ার উপর কলিকা বসাইয়া দিল। দীনদয়াল বাবু খুব জোরে দুই এক টান টানিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "কেন? ও বেলা যেও।"

প্রমথ কোমল স্বরে বলিল, "না দাদা মশাই। কাকাবাবু লিখেছেন, বড় অসুখ। আমার এ বেলাই যাওয়া উচিত। আপনি আমায় যেতে দিন।"

দীনদয়াল বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভায়া, তোমার মত একগুঁয়ে ছেলে অতি কম। নেই বল্‌লেই হয়।"

প্রমথ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"যাক্ ও সব কথা, আমি যাই তা হলে?"

দীনদয়াল বাবু আর বাধা দিলেন না—গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ক'টায় গাড়ী?"

প্রমথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে এই কথায় বুঝিতে পারিল, সে সম্মতি পাইবে। প্রকাশ্যে বলিল, "এই নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।"

দীনদয়াল বাবু বলিলেন, "আচ্ছা যাও ভায়া, প্রস্তুত হওগে। দেরী হয়ে যাবে। আর বেশী টাইম নেই।"

প্রমথ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দাদা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়াছে, এমন সময় দীনদয়াল বাবু ডাকিলেন, "ভায়া, শুনে যাও, আর দু' একটা কথা আছে।"

প্রমথ পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিয় দীনদয়াল বাবুর দিকে চাহিয়া সাগ্রহের সহিত বলিল, "কি কথা বলুন?"

দীনদয়াল বাবু আর একবার বেশ জোর করিয়া তামাক টানিয়া বলিলেন, "হাঁ, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম খাজাঞ্চী বাবুর কাছ থেকে সঙ্গে কোরে কিছু টাকা নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ ভায়া, সেখানে গিয়েই কি—কি কি বলে যে, পত্র লিখো। আর খুব সাবধানে থেকো, বুঝলে?"

প্রমথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এমন সময় দীনদয়াল বাবু পুনরায় বলিলেন, 'ভাল কথা ভায়া রমা তোমার সঙ্গে যাক্ না কেন? তোমার সব কাজে সুবিধা হবে?"

প্রমথ একবার অসম্মতি প্রকাশ করিল। পরক্ষণেই কি ভাবিয়া বলিল, "যাক্।"

দীনদয়াল বাবু বলিলেন "দেখ রমা, তোর দাদাবাবুর সঙ্গে কলকাতায় দাতান বাবুর বাসায় যেতে হবে, বুঝলি?"

রমা রেল গাড়ী চাপিতে বড় ভালবাসে। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে।"

দীনদয়াল বাবু বলিলেন, "যা, ঠিক হগে যা।"

প্রমথ সেই মুহূর্ত্তেই দীনদয়াল বাবুর কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া, মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল।

স্নেহশীলা অমিয়বালা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ বাবা, একটু জল খেয়ে যাও।"

প্রমথ অনিচ্ছার সুরে বলিল, "না মা, দেরী হয়ে যাবে। আর গাড়ী ছাড়তে ৩৫ মিনিট সময় আছে। ষ্টেশনে যেতেই ত প্রায় ১৫ মিনিট লাগবে। তারপর টিকিট কিন্‌তে হবে আবার। হয় ত গাড়ী ফেল্ হয়ে যাব। মা আসি, জলখাবার এখন থাক।" প্রমথ মাতাকে প্রণাম করিল।

অমিয়বালা প্রমথর মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা এস বাবা, চিঠি লিখো।"

ষ্টেশনে যাইতে হইলে জীবনবাবুর বাটীর সাম্‌নে দিয়া যাইতে হয়।

জীবনবাবুর বাটীর সাম্‌নে আসিয়া প্রমথর মনে পড়িল, আজ নীহারবালা তাহাকে রাত্রে আহার করিতে বলিয়াছেন, আর সেও আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

প্রমথ ভাবিয়া দেখিল, রাত্রে না আসিলে নীহারবালা দুঃখ করিবেন, আর অশ্রু -(প্রমথর বুকটা দুর দুর করিয়া উঠিল) মনে ব্যথা পাইবে।

তখনই প্রমথ বলিল, "রমা, তুই এইখানে একটু দাঁড়া। আমি এদের বাড়ী থেকে দেখা করে দু'এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।" রমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি সূচক উত্তর দিল।

প্রমথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া নীহারবালার নিকট গমন করিল। নীহারবালা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রমথ বলিল, "মা আজ

য়াত্তিরে আমি আসতে পারব না! আমি দাওয়ান বাবুর অসুখের জন্য কলকাতায় যাচ্ছি! আপনি কিছু মনে কোর্‌বেন না, কলকাতা থেকে যেদিন এখানে আসবো, সেই দিনই আপনাদের বাড়ী এসে খাব। এখন আসি।"

প্রমথ ভূমিষ্ঠ হইয়া নীহারবালার পদধুলি লইল। নীহারবালা বলিলেন, "আচ্ছা এস বাবা।"

প্রমথ বলিল, "মা, অশ্রু কোথায়?" এই কথা বলিয়াই প্রমথর কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। নীহারবালা তাহার সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "ওপরে।"

প্রমথ ক্ষণিক কি চিন্তা করিয়া ক্ষিপ্রপদে অশ্রুকণার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অশ্রু একমনে একখানি ছবি ঝাড়িতেছে। প্রমথর আর এ সব দেখিবার সময় ছিল না, তাই বেশ একটু জোর গলায় বলিল, "অশ্রু!"

সচকিত হইয়া অশ্রুকণা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি প্রমিদা?"

প্রমথ এক নিশ্বাসে বলিল, "আমি এক্ষুণি কলকাতায় চল্লুম। সেখানে আমাদের দাওয়ান পরেশ বাবুর বড় অসুখ। আজ এখানে আমার খাওয়া হবে না। তুমি কিছু মনে কোর না।"

অশ্রুকণা বলিল, "না।" কিন্তু তার মুখে একটা সুস্পষ্ট মলিন ছাপ ফুটিয়া উঠিল।

প্রমথ বলিল, "অশ্রু, সেখানে গিয়ে আমি তোমায় চিঠি লিখবো। কেমন?"

কি দাবী লইয়া প্রমথর মুখ হইতে একথা বাহির হইল, প্রমথ নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার তখন মনে পড়িল; অশ্রুর বিবাহের ঠিক্ হইতেছে। প্রমথ নিজেই একথা বলিয়া নিজেই একটু অপ্রস্তুতের খোঁচা খাইল।

কিন্তু অশ্রুকণা সহজ ভাবে তাহার এ কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না প্রমিদা, মা কি মনে করবেন। ভাববেন আমাকে চিঠি লেখে না,—আর অশ্রুকে লেখে! তার চেয়ে তুমি মাকেই লিখো।"

"তাই হবে!" বলিয়া প্রমথ তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আসিয়াই উভয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

দুইধারে ধান্যক্ষেত্র, চৈত্রের মৃদুল দখিন বাতাস তাহার উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়া যাইতেছে, গাছগুলি আহ্লাদে এক বিচিত্র সুরে শিষ দিতেছে।

তাহাদের সম্মুখ দিয়া এক কৃষক লাঙ্গল কাঁধে গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল,—

বড় সোহাগের একখানি প্রাণ
এসেছি গৃহেতে ফেলিয়া,
সে যেন পিছনে ডাকিছে আমায়
"এস" বোলে বাহু মেলিয়া!

প্রমথ মনে মনে গানের শেষ চরণগুলি ভাবিতে লাগিল,—

কি করিব হায় জীবনের কাজে,
কত আর সুখ পাই হৃদি মাঝে,
প্রায় সব সাধ ভেসে চলে যায়
বারেক হৃদয়ে খেলিয়া।"

কৃষকের গান প্রমথর বড় ভাল লাগিতেছিল। কৃষক তখন উভয়কে ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল, প্রমথ একবার পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিল, তখনও কৃষকটী ধীর মন্থর গতিতে যাইতে যাইতে গাহিতেছিল,—

বড় সোহাগের একখানি প্রাণ
এসেছি গৃহেতে ফেলিয়া।

প্রমথ গ্রাম্য কৃষকের এরূপ সকরুণ সুরের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে মনে মনে বলিল, "আহা উহারাও ত মানুষ।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনে আসিয়া প্রমথ ঘড়িতে দেখিল, আর গাড়ী ছাড়িতে মাত্র সাত মিনিট বাকী আছে। তখনই দুইখানি "ইণ্টার ক্লাস" টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিল।

কিছুক্ষণ পরেই হুস হাস হুস হাস শব্দে ধোঁয়া ছাড়িয়া, ক্রমে ক্রমে বেগ বাড়াইতে বাড়াইতে প্রকাণ্ড লৌহ শকট কত পথ, কত মাঠ, কত জঙ্গল, কত বন, কত ক্ষেত, কত ডোবা পশ্চাতে ফেলিয়া আপনার পথে ছুটিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সমস্ত দেখিতে বেশ, কিন্তু এরই মাঝে প্রমথর প্রাণে আজ কি একটা বিরাট শূন্যতা।

ঠিক্ সেই সময়ই কমলপুর গ্রামে জীবন বাবুদের বাটীর উপরের একটী কক্ষে একজন কিশোরী বাতায়ন পথে প্রমথর গন্তব্য পথের দিকে আত্মহারা হইয়া চাহিয়াছিল—প্রমথর ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

(১১)

যে দিন প্রমথ গ্রামে আসিবার পর জীবন বাবুদের বাটীতে যায়, সে দিন নীহারবালা অশ্রুকণার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, প্রমথ ও অশ্রুকণার মুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন,—প্রমথ অশ্রুকণাকে চায়, আর অশ্রুকণাও প্রমথকে চায়। তিনি মাত্র এ'টুকু ভাবিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন না—তিনি ভাবিলেন, প্রমথ ও অশ্রুকণার মধ্যে কোন একটা এমন গোপনীয় কথা হইতেছিল, যাহা তিনি প্রবেশ করিবামাত্র থামিয়া গেল।

তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া উহাদের মনের অভিপ্রায় ঠিক্ করিবার জন্য নীহারবালার একান্ত ইচ্ছা হইল। তাই তিনি আবার একদিন পরে যখন প্রমথ ও অশ্রুকণার মধ্যে পুনরায় কথা হইতেছিল, তখন তিনি আড়ি পাতিয়া সকল কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে প্রমথ অশ্রুকণাকে ভালবাসে, অশ্রুকণাও প্রমথকে ভালবাসে। তাহারা এ-উহাকে পাইলে সুখী হইবে, নতুবা হা-হুতাশে উভয়ের জীবন দগ্ধ হইবে। বলাও যায়না, হয়ত কোনও কুফল ফলিতে পারে।

এই হেতু তিনি প্রমথও অশ্রুকণাকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা না করিবারও কোন কারণ ছিল না। যেহেতু প্রমথ ধনবান জমিদার পৌত্র রূপে গুণে, কুলে শীলে প্রমথ অদ্বিতীয়। আশ পাশে তাহার সুখ্যাতি ইহার মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর অশ্রুকে সে বাল্যে ও কৈশোরে ভাল বাসিয়াছে এবং এখনও বাসে। অতএব তাহাদের মিলনে নীহারবালার সুখ ভিন্ন দুঃখ হইতে পারে না।

নীহারবালা চিরদিন চতুরা, হাস্য ও কৌতুক প্রিয়া। হঠাৎ নীহারবালার মস্তিষ্কে এই বিষয় লইয়া এক বিচিত্র ফন্দির উদ্ভাবন হইল। নীহারবালা তাহাদের মিলন একটি নূতন রকম চালে করিবেন, ঠিক্ করিলেন। তাহা আর কিছুই নহে—বিবাহের পূর্ব্বে প্রমথ ও অশ্রুকণাকে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ হইতেছে না জানিতে দেওয়া। অর্থাৎ প্রমথ যেন বুঝিতে না পারে, তাহার সহিত অশ্রুর বিবাহ হইতেছে, আর অশ্রুও যেন বুঝিতে না পারে, তাহার প্রমিদার সহিত বিবাহ হইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুচতুরা নীহারবালা ইহার উপায় বাহির করিয়া, স্বামী জীবন বাবুকে তাহার অভিসন্ধি বলিলেন, জীবনবাবু প্রমথে তাহার এই চালে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "হয়ত বিবাহের আগে কোন কুঘটনা ঘটতে পারে।"

কিন্তু বুদ্ধিমতী চতুরা নীহারবালা বলিলেন, "সে কোন কুঘটনাই হবে না, সে বিষয়ে আমি সাবধান থাকব।"

জীবনবাবু ও নীহারবালার মধ্যে কি কুঘটনার কথা হইল জানি না, তবে বোধ হয় (প্রমথর ও অশ্রুকণার একের অপরের সহিত বিবাহ হইল না বোলে) একের অথবা উভয়ের আত্মহত্যা! যাহা হউক জীবনবাবু আরও একবার অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীহারবালা স্বামীর কোন আপত্তিতেই কর্ণপাত করিলেন না। তাহার একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া জীবন বাবু অগত্যা সম্মত হইলেন।

সম্মত না হইয়াই বা কি করেন? কে না তখনই হয়ত অভিমানের পাল্লা বসিয়া যাইবে—শেষে মানিনীর মান রাখতে যাইয়া তাহার কথাও রাখিতে হইবে—কাজে কাজেই জীবনবাবু অগ্র হইতেই সম্মত হইলেন।

জীবনবাবুকে সম্মত করিয়া নীহারবালা বলিলেন, "আচ্ছা কি উপায় করা যায় গা?"

জীবনবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি উপায় ফুপায় কিছু বুঝি না, তুমি বল কি উপায়।"

নীহারবালা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাছের কোন গাঁয়ে কি তোমার চেনা কোন লোক নেই?"

জীবনবাবু নীহারবালার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আছে।" জীবনবাবুর চাহিবার ভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝা গেল, তিনি যেন এই ফন্দির সূত্র সম্যক্ ধরিতে পারেন নাই। অথচ তিনি ধরিয়াছি বলিয়া অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন।

জীবনবাবুর মুখে 'আছে' এই কথা শুনিয়াই নীহারবালার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নীহারবালা বলিলেন, "তাকে সব কথা বলে দু' এক দিনের মধ্যে অশ্রুকে দেখে যেতে বল।"

জীবনবাবু আগ্রহের স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা তা না হয় হল। তারপর প্রমিদের বাড়ীতে এ বিষয় কি করে ঠিক করবে?"

নীহারবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি দিদিকে (অমিয়বালা) সব বুঝিয়ে বলে ঠিক কোরে ফেলবখন।"

জীবনবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তুমি বুঝি সেখানে যাবে?"

নীহারবালা চমকিত স্বরে বলিল, "কেন, কখনও বুঝি সেখানে যাই নি?"

জীবনবাবু এতক্ষণে হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তা বল্‌চি না।"

নীহারবালা কৃত্রিম গম্ভীর ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তবে কি বল্‌চ ?"

জীবনবাবুও গম্ভীর ভাব ধরিয়া বলিলেন, "তোমাকে তা হলে সেখানে যেতে হবে ?"

নীহারবালা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।"

জীবনবাবু আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যা হোক চালাক তুমি।"

নীহারবালা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁগো হ্যা, তা না হ'লে চল্‌বে কেন।"

জীবনবাবু নীহারবালার পরামর্শানুসারে তাহাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিজয়পুর গ্রামে তাহার অন্যতম সুহৃৎ হরেনবাবুকে সকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া আসেন। হরেন বাবুও অশ্রুকণাকে দেখিয়া যাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হন।

জীবনবাবু বাটীতে আসিয়া অশ্রুকে দেখতে আসবে, এই কথা রটাইয়া দেন। এই কথা শুনিবার পর হইতে অশ্রুকণার মন ভাঙ্গিয়া গেল !

যে যাকে পায়না—তাকেই বেশী আগ্রহের সহিত চায়। অশ্রুকণা যখন বুঝিল তাহার অপরের সহিত বিবাহ হইবে, সে তখন প্রমথর দিকে সমস্ত প্রাণ লইয়া ঝুকিয়া পড়িল।

গ্রামে আসিবার পর, যেদিন প্রমথ দ্বিতীয়বার জীবনবাবুদের বাটীতে আসে, সেদিন বুদ্ধিমতী নীহারবালা বলিয়াছিলেন, "প্রমি! অশ্রুর বে'র ঠিক কর্‌ছি, অশ্রুকে দু'এক দিনের মধ্যেই দেখতে আসবে।" সত্য হইলেও ইহা কৌতুক প্রবঞ্চনা। আসলে অশ্রুকণাকে বুঝিতে দেওয়া তাহার হরেন বাবুর পুত্রের সহিত বিবাহ হইতেছে। তাহার উপর প্রমথর মুখের ভাব লক্ষ করা ইত্যাদি ঘনটা গুলি পাঠক পাঠিকা আপনারা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কোনও রাজবাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন করিতে গিয়া সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নির্লোভ ফর্দ্দ দেখিয়া তদীয় পুরোহিত তাঁকে বলিয়াছিলেন, "আপনি কি আমাদের

ভাত মারিতে আসিয়াছেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় অপ্রতিভ হইলেন। ৩০ বৎসর বয়সেই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নিত্য হোম বলি বৈশ্বাদেব আরম্ভ করিয়া আসিয়াছেন। যৌবনের প্রথম হইতেই মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষ ১০।১২ বৎসর যাবৎ একাহার করিয়া আসিয়াছেন।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের প্রায় কার্য্যই নিয়মবদ্ধ ছিল, হিত ও মিত আহার ছিল, তাহাও শাস্ত্র সঙ্গতই ছিল।

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত, পঞ্চার্দ্রঃবহু ভুঞ্জীত।

এই শাস্ত্রানুসারে একদিনও শুষ্ক পায়ে ভোজন করিতে দেখি নাই। রাজারের ঘৃত খাইতেন না, অধিক আহার করিতেন না, নিমন্ত্রণ খাইয়াও রাত্রিতে আহার করিতেন, অধিক আহার করিয়া গড়াগড়ি দেওয়া অভ্যাস ছিল না।

দ্বৌভাগৌ পূরয়েদন্নে ভাগমেকং জলেনতু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় ভাগৈকমবশেষয়েৎ॥
শুচিহিতমিত ভোজী বায়পার্থারশায়ী।
সবিতৃ রুদয়কালে যঃ সদা পাদচারী॥
উপবন বিজীহির্ষা যাস্য কোষ্ঠাগ্নিশুদ্ধি।
প্রভবতি দিবসাদৌ তস্য বৈদ্যেন কি স্যাৎ॥
ভুক্তোপবিশতঃ কুক্ষিঃ শয়ানস্য বপুর্মহৎ।
আয়ুশ্চং ক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥
জীর্ণেহিত মিতভোজী শতপাদ গামী বামশায়ি চ।
অবিক্ষিত মিশ্র পুরিধা নগেন্দ্র সোহরুক্ ত॥

ইত্যাদি শ্লোক তৎকৃত "জীবন শিক্ষাতে" উদ্‌ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এই সকল শাস্ত্রবাক্য প্রতিপালনে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। এবং চেষ্টার ফলও পাইয়াছেন।

অনেক ধনী দরিদ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভে আসিলে কুশলাদি প্রশ্নে ডিস্পেপসিয়া অম্বল ইত্যাদি পেটের অসুখের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, কিরূপে যে এই সকল রোগ হয়, বুঝিতে পারি না, এই যাবৎ এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার পেটের অসুখ নাই, ভদ্রলোকের পেটের অসুখ কেন হবে ? তোমরা ত লোহা আহার করিয়া হজম করিতে পার ? এই দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আজ পর্য্যন্ত পেটের অসুখ কি জানিনা এবং পরেও হবে না, (আকস্মিক মৃত্যু

পর্য্যন্ত পেটের কোন অসুখ হয় নাই,) অন্তিম সময়ে এক বিন্দু মল মূত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নিত্যই অগ্নিসার কপালভাতি প্রভৃতি কতকগুলি যোগ নিত্য অভ্যাস করিতেন। যোগ ও তপস্যা বলে তাঁর কোন ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হয় নাই।

তাঁর ৺কাশীলাভ অতি অলৌকিকবৎ প্রতীয়মান হয়।

একশায়ী দ্বিভুঞ্জানঃ সখত্রী দ্বিপুরীষসী।

মাসান্মৈথুন দেবীচ নরো বৈশ্যং ন পশ্যতি॥

এই শাস্ত্রাদেশানুসারে চিরদিন দুইবার প্রাতঃ ও বৈকালে শৌচ করিতেন, মৃত্যুর পূর্বে ১৫ ঘণ্টা কাল একবিন্দু মলমূত্র পাত হয় নাই, এরূপ পবিত্রতা হাজারে একটি দৃষ্ট হয় না।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জন্ম কুণ্ডলী।

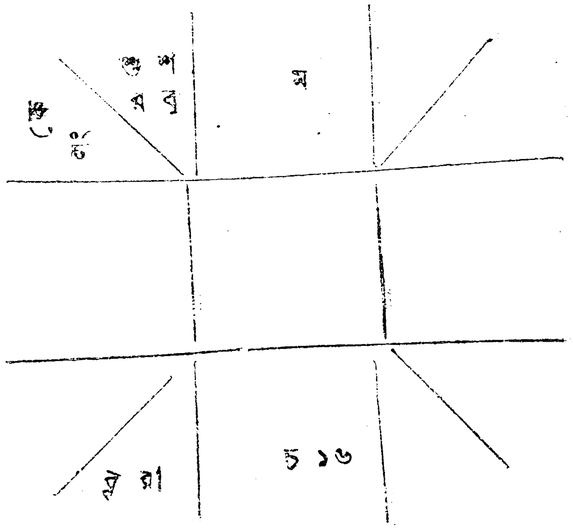

অধ্যয়নের সময় হইতেই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত শ্লোক রচনা ও সংস্কৃতে বক্তৃতা করা অভ্যাস করিলেন, ক্রমশঃ ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। দেশের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার দত্তপাড়া দেওয়ানজী বাবু প্রভৃতির সাহায্যে সংস্কৃত চন্দ্রিকা নামক সভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সংস্কৃত বক্তৃতাদি শিক্ষা ও পরীক্ষা পারিতোষিকাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশের উন্নতি করিতে ছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশের কতিপয় লোক তাঁর প্রতি অর্থলোভ প্রভৃতি কয়টী অপবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এরূপে দেশের কল্যাণ অসম্ভব মনে করিয়া ঐ সভা ত্যাগ করেন এবং সভাও তদভাবে লুপ্ত হইয়া যায়।

এক প্রকারে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিরস্ত হইলে, অন্য প্রকার পন্থা অবলম্বন করিলেন। সংস্কৃত চন্দ্রিকা নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ছাপাইয়া ঐ পত্রিকা প্রচারে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি বিধান করিতে কৃতসংকল্প ও কিছু দিন মধ্যে কৃতকার্য্য হইলেন।

ব্যাপক বস্তু ব্যাপ্য স্থানে থাকিতে পারে না, তাই তিনি ১২৯২ সালে একবার পুনর্ব্বার কলিকাতা ৺কালীঘাটে আসিয়া অধ্যাপনার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং ত্রিকোণেশ্বর তলার নিকটে একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া গোল পাতার কুটীর করিয়া টোল করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি নিজগৃহে পঁচিশ ত্রিশ জন ছাত্রকে অন্নদান করিয়া অধ্যয়ন করাইতে থাকেন। তখন পণ্ডিত নিমন্ত্রণাদি উপজীবিকা হইল। এই সময়েও তিনি সংস্কৃত বক্তৃতা করিতেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁকে একদিন বক্তৃতার পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করাতে, সেই হইতে বক্তৃতা ত্যাগ করেন।

সংস্কৃত ভাষায় তিনি তিন চার ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি সহরে তাঁর সংস্কৃত সরল দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া জনগণ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতেন।

কালীঘাটে থাকা কালে ক্রমশঃ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কীর্ত্তি বিস্তার হইতে লাগিল, হাইকোর্টের চিপজষ্টিস স্যর ৺রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত পরিচয় ও তাঁহাদের সাহায্য লাভ হইতে থাকে। সংপ্রতিক ভাগবত চতুষ্পাঠীর সৃষ্টির প্রথম অধ্যাপক সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়। রমেশ চন্দ্র তাঁকে বড়ই মান্য গণ্য করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। বহু অর্থ সাহায্য করিতেন। এক সময়ে রমেশবাবু তাঁর টোলের সাহায্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একশত টাকা দিলে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কোনও বন্ধু বলিয়াছিলেন, একশত যখন না চাহিতেই দিয়াছে, তখন চাহিলে হাজার টাকা দিত। সিদ্ধান্ত ভূষণ তুমি নিতান্ত বোকা কেন চাহিলে না। সিদ্ধান্তভূষণ উত্তর করিলেন, আজ চাহিয়া হাজার টাকা নিলে এই পর্য্যন্তই আমার পাওয়া শেষ হইয়া যাইবে, ভবিষ্যতে আর তাঁর নিকটে চাহিতে পারিব না, এই একশত টাকাতে আমাকে সন্তুষ্ট ও নির্লোভ জানিয়া, আমাকে ভবিষ্যতে অনেক টাকাও দিতে পারেন, আমি বলিতেও পারি না ও পারিব না। তখন বন্ধুবর নীরব হইলেন।

তখন সংস্কৃত চন্দ্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এবং তাহাতে সরল ভাষায় দেশ ভঙ্গিকর প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে, তন্মধ্যে একটী প্রবন্ধের হেডিং "বৎস কেন তানেন নিত্যাসি।"

খ্যাতনামা আনন্দমোহন বসুর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় সিদ্ধান্তভূষণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয় বলুন দেখি—আমাদের আনন্দমোহন কেন অকালে মারা গেল, তার ভাল আহার বিহারাদি ছিল, যাতে আয়ুবৃদ্ধিই হইতে পারে, ইহার কারণ কি? সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তৎকালে কোনও উত্তর না দিয়া সংস্কৃত চন্দ্রিকাতে "পূর্ব্ব কালীনাঃ কস্যাং দীর্ঘায়ুষ" এই নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম ত্যাগই অকাল মৃত্যুর মূল কারণ। তাহার অনুবাদ স্বরূপ "জীবন শিক্ষা" নামে এক প্রবন্ধ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে ৺ভূদেব বাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব বাবু ঐ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করে এবং দ্বিতীয়বারে কুমারটুলীর শ্রীমান্ কালীভূষণ সেন কবিরাজ প্রকাশিত করে।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় একদিন রমেশচন্দ্র মিত্রের বৈঠকখানার টেবিলের উপর ঋগ্‌বেদ সংহিতা দেখিয়া হাত বাড়াইয়া নিয়া পড়িবার ইচ্ছা করিতেই রমেশ বাবু বলিলেন, 'বেশত পণ্ডিত মহাশয়, আমাদের রমেশ দত্তের ঋগবেদ সংহিতা খানা দেখুন দেখি, কেমন হইয়াছে?" এ কথা শুনিয়াই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় হাত গুটাইয়া বলিলেন, "তবে আর ইহা ধরিব না।" রমেশচন্দ্র—কেন? সিদ্ধান্তভূষণ—রমেশ দত্তের ঋগবেদ কেন দেখিব? আমাদের অনাদি ঋগ-বেদইত আছে? রমেশচন্দ্র মিত্র বলিলেন,—না, না, তাহা নহে, সেই ঋগবেদই রমেশ দত্ত অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা তাহাই। সিদ্ধান্তভূষণ বলিলেন, "সে কি রকম? রমেশ দত্ত মহাশয় চিরদিন ইংরাজী পড়িলেন, বিলাতে যাতায়াত করিলেন, কবে ব্যাকরণাদি পড়িলেন যে, অনুবাদ করিয়াছেন।" রমেশ মিত্র বলিলেন; পণ্ডিত মহাশয় এত খেপলেন কেন? শুনুন না? ভট্ট মোক্ষ-মূলারের নাম শুনিয়াছেন ত? তাঁর ইংরাজীতে অনুবাদ করা ঋগবেদ রমেশ দত্ত বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়াছেন; এখন আপনার মনের ধাঁধা গেল ত? সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলিলেন, তবে ত ইহা একেবারে অস্পৃশ্য। রমেশচন্দ্র মিত্র—কেন, কেন পণ্ডিত মহাশয়? সিদ্ধান্তভূষণ—কি আর মাথামুণ্ড বলিব, ২৬ অধ্যায় সে ভাষার মূল এবং যিনি বৈদিক ব্যাকরণাদি পড়েন নাই, যে বেদের জন্য, বঙ্গ ভাষার ৫০টী অক্ষরও পর্য্যাপ্ত বা প্রচুর নহে, সেই মোক্ষমূলার বেদের অনুবাদ করিবেন ইহা অগ্রাহ্য। বেদের জন্য এক অকারই পচিশ প্রকারে বিভক্ত, এরূপ অন্যান্য বর্ণও বহু প্রকার, তাহা না জানিলে কি বেদের

অনুবাদ হইতে পারে? এই বলিয়া "যথেন্দ্র শত্রুঃ স্ববতোহপরাধাৎ।" এই বৃহস্পতি ও শুক্রচার্য্যের দৈত্যযজ্ঞীয় প্রস্তাব শুনাইলেন। রমেশ মিত্র অবনত মস্তকে সিদ্ধান্তভূষণের যুক্তিমূলক বাক্য গ্রহণ করিলেন।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে রমেশ বাবুর অনেক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক চলিত, তর্ককালে রমেশ বাবু চিপজজ বলিয়া সিদ্ধান্তভূষণ মমাশয়ের জ্ঞান থাকিত না, তর্কের পরে স্মরণ হইলে সিদ্ধান্তভূষণ চমকিত হইলে, রমেশ বাবু বুঝিতে পারিয়া, ভক্তির স্রোত বাড়াইয়া দিতেন, আন্তরিক সন্তুষ্টই হইতেন, নির্ভীকতানি গুণ দর্শনে মুগ্ধ হইতেন।

রমেশ মিত্রের পুত্র শ্রীমান প্রভাস মিত্র বিলাত হইতে দেশে আসিলে সমাজে আন্দোলন চলে এবং পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ কালে রমেশ মিত্র সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভাবিয়া ছিলেন, এইবার হইতে আমি রমেশ বাবুকে হারাইলাম, অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ মত না দিলে রমেশ বাবু কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন না, শাস্ত্র বিরুদ্ধ মতও দিতে পারিব না। আজ এই প্রধান সম্বলটী হারাইতেই হইবে। বস্তুতঃ রমেশ বাবুর অনুকুল মত দিলেন না, ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, আসিবার কালে রমেশ বাবু বলিয়া ছিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয় আপনি মত দিলেন না, আমি কিন্তু বহু মতই পাইব। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলিলেন, তাহা সত্যই, কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন।

দুই তিন দিন আর রমেশ বাবুর তথায় যান নাই। একদিন রমেশ বাবু গাড়ী পাঠাইলেন। সিদ্ধান্তভূষণ রমেশ বাবুর তথায় গেলেন, রমেশ সহাস্য মুখে বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! আপনি আমার মতানুবর্ত্তন করিতে পারেন নাই বলিয়া, আমাকে ত্যাগ করিবেন কেন, আমিইবা ত্যাগ করিব কেন? আমিত একজন বিচারক, আপনি তৎকালে নির্ভীক মত প্রকাশ করিলেন এখন ভয় কিসের? পূর্ব্ববৎ পায়ের ধুল দিবেন।

কিছু দিন পরে রমেশ বাবু প্রায়শ্চিত্ত বিবেক পড়িবার জন্য মত প্রকাশ করিলে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, হাজার হাজার টাকা বেতন পাইয়াও তৈলবট (ব্যবস্থাদির টাকা নেওয়া) নিতে আকাঙ্ক্ষা কেন? সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত বিবেক উত্তম রূপে পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে রমেশ বাবু বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয় আপনার মতই সত্য, আমার ধারণা ছিল, আপনারা কেবল বচন

গুলির অর্থই বুঝিয়া যান, যুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখেন না, কিন্তু আমার সেই ধারণা আজ দূর হইল। অর্থাৎ বিলাত গেলে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্রেরই অভিপ্রায়, আপনারা যথার্থই বলিয়াছেন। আজ হইতে আপনার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

উক্ত রমেশ বাবুর পত্নী একবার শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ কার্য্যে সিদ্ধান্তভূষণকে ব্রতী করিলেন এবং বৈকালে তাহার ব্যখ্যা পূর্ব্বক কথকথাতে ৺কৃষ্ণকুমার কথক মহাশয়কে বরণ করেন। পাঠের দক্ষিণা হইতে কথার দক্ষিণা দ্বিগুণ হওয়া নিয়ম, তদনুসারে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে দুইশত টাকা দক্ষিণা দিলে কথক মহাশয় দ্বিগুণ আপত্তি করিলেও, রমেশ বাবু তাহা শুনিলেন না, বলিলেন যে, এমন সুন্দর মধুর পাঠের দক্ষিণা কথার দক্ষিণা হইতে কিছুতেই কম হইতে পারে না, আমি তাহাই করিলাম।

ভবানীপুরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিদ্ধান্তভূষণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। দেবেন্দ্রঘোষ, গোবিন্দ কুমার চৌধুরী, ভুবনমোহন রায় চৌধুরী, দ্বারিকা নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তন্মধ্যে বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। হিতবাদীর সত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ইদানীন্তন হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী প্রভৃতি তাঁর প্রিয়তম ছাত্র। কাশীধাম হিন্দুধর্ম্ম বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্ক চুড়ামণি মহাশয় তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ মধ্যে অন্যতম।

একদা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদে থাকিয়া অধ্যয়ন করাইবার জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিশেষ অনুরোধ করিতে থাকেন এমন কি কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশও যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সিদ্ধান্তভূষণের দুই হাত দুইজনে ধরিয়া রহিলেন এবং যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তৎপদে ব্রতী হইতে কর্ত্তৃতা পূর্ব্বক অনুরোধ করিতে ছিলেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহা বিপদে পড়িলেন। কিরূপে এরূপ অনুরোধ ত্যাগ করা যায় ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব প্রভাবে বলিলেন, আমার সর্ব্বাগ্রজ মহাশয় এখানে আছেন তাঁকে এক-বার জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তথা হইতে আসেন। জ্যেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐ রূপ গৌরবের পদে যাইতে মতদিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ভাবিলেন, আমার বংশে অদ্যাবধি

কেহই চাকুরী করেন নাই, আমি বংশহীন, আমিই এই পথে প্রথম পরর্ত্ত হইব কেন, ইত্যাদি। ফলতঃ তাহাদিগকে বিনয় সহকারে পত্র দিয়া ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রভৃতি প্রকাশক রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় পুস্তক অনুবাদের কার্য্যে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে দেখিলেন, কর্ম্মচারিগণ আফিসে আসিবামাত্র কর্ত্তা ঘাড় ফিরাইয়া ঘড়ি দর্শন করেন, সিদ্ধান্তভূষণ যথা সময়ে আসা যাওয়া করিতেন। সামান্য সময়ও লঙ্ঘন করিতেন না এবং অনুবাদ কালে বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না, অপর কর্ম্মচারিগণ তাঁকে বলিতেন, পণ্ডিত মহাশয়! এত কার্য্য করিলে চলে? আসুন একটু গল্প সল্প করা যাউক ইত্যাদি। কিন্তু সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই। এক দিন একটী শ্লোক বিশেষ জটিল ছিল, তার অর্থ করিতে অনেক সময় চলিয়া গেল, ফলতঃ অনুবাদ সামান্যই হইল, যাওয়ার সময় মনিবকে বলিলেন, ১।২টী শ্লোক অত্যন্ত জটিল ছিল, বিধায় আজ কাজ অল্পই হইয়াছে, এখনও তার অনুবাদ ঠিক করিতে পারিতেছি না। মনিব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সেকি এত কম কার্য্য হইলে চলিবে কেন? দেখি কি এমন কঠিন শ্লোক? যার অনুবাদে এত সময় যাইতে পারে? সিদ্ধান্তভূষণ সেই শ্লোক দেখাইলে, মনিব বলিলেন, এ আর কঠিন কি এরূপ অর্থই হয়, সিদ্ধান্তভূষণ সেই অর্থে আপত্তি করিলে, বলিলেন, যাহা হউক এইরূপই অনুবাদ লিখিয়া দিন ও আবার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?

এইরূপ শাস্ত্র প্রহার দেখিয়া সেই দিন হইতেই তাঁর কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং করিলেন। বলাবাহুল্য এখানে নয় দিন মাত্র কার্য্য করিয়া ছিলেন। তিনি চাকুরী আর কখনও করেন নাই, চাকুরীতে ঘৃণা ও ধর্ম্মভয় এই ঘটনা বেশ বুঝা গেল।

সিদ্ধান্তভূষণ বহুস্থানে আহ্বান পত্র পাইতেন, কলিকাতায় পণ্ডিত বিদায়ে তাঁর বাদ প্রায় হইত না। কোনও বড় লোকের বাড়ীতে যেদিন দেখিলেন, পণ্ডিতগণের উপরে দারোয়ান বেত্র প্রহার করিতেছে, সেই দিন হইতে পণ্ডিত বিদায় ত্যাগ করিলেন।

কলিকাতা আহিরীটোলার ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজ শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সৎসঙ্গ লাভ করিবার জন্য দুই দিন তাঁকে নিয়া যাইতে লোক পাঠাইলেও তিনি গেলেন না। তৃতীয় দিনে সিদ্ধান্তভূষণ রাজেন্দ্র

বাবুর বাড়ীতে গিয়া বলিলেন, বাবু! আমার জন্য এত খেদ কেন? আমার অপরাধ কি? রাজচন্দ্র বাবু বলিলেন, আপনারা আমাদের পরম পূজ্য আপনাদের উপদেশ পাইব; ইহাই আমাদের আশা। সিদ্ধান্তভূষণ বলিলেন, যদি এতই আপনার হৃদয়ের ভাব, তবে একবার কি আমার বাড়ীতে নিজে গিয়া উপস্থিত হইতে লজ্জা মনে করিয়া বার বার কেন লোক পাঠাইলেন, আমি যদি আপনার জন্য লোক পাঠাইতাম, তবে আপনি কি করিতেন? সিদ্ধান্তভূষণের ঐরূপ নির্ভীক তেজস্বিতা ভাব দেখিয়া, রাজেন্দ্র বাবু ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁর প্রতি অধিক ভক্তি কারতে লাগিলেন। অত্যন্ত ভালবাসা হইতে লাগিল।

একদিন উভয়ের কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, আমরাত আপনার দাস পদ সেবক। সিদ্ধান্তভূষণ কৌতুক করিতে সেই কথার উপর বলিলেন, রাজেন বাবু তৎক্ষণাৎ পদ সম্বাহন করিতে অগ্রসর হইলে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় হয়েছে হয়েছে, আর না, আর না, এই বলিয়া হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

পণ্ডিত আনন্দমোহন বসু (খ্যাতনামা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র) সিদ্ধান্তভূষণকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং বহু পুস্তক দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁকে বিশ্বকোষ গ্রন্থ বিনামুল্যে দান করিরাছিলেন।

পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী হরিচরণ বসু যখন শব্দকল্পদ্রুম দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করেন, সিদ্ধান্তভূষণ সেই সময় ঐ পুস্তকের পরিবর্দ্ধাদি কার্য্য করিতেন, হরি বাবু উপর তলাতে তাহার আওয়াজ শুনিলেই সিদ্ধান্তভূষণের শ্রুতিগোচর মতে বলিতেন, বাঙ্গাল বাঙ্গাল গন্ধ বেরুচ্ছে? সেই হরিবাব সিদ্ধান্তভূষণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে মন্ত্র নিতে বহু চেষ্টা করিয়া, যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন একদিন বেলা দশটার সময় সিদ্ধান্তভূষণের মাণিকবসুর ঘাটের বাসা বাড়ীতে গিয়া পুনরপি যত্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষ এইরূপ বলিলেন যে, আপনি আমাকে দীক্ষিত না করিলে আমি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্নান পূজাদি করিতে গেলেন এবং সকল কার্য্য সারিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিতে আসিয়া দেখেন, হরি বাবু সেই ভাবে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন অগত্যা হরিবাবুকে মন্ত্র দিতে সিদ্ধান্তভূষণ স্বীকার করিয়া তাকে শান্ত করিলেন।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় শিষ্যের পরীক্ষা না করিয়া এবং যাহার গুরু বংশ আছে, তাকে মন্ত্র দিতেন না। বহু অহিন্দু আচারী বড় লোক মন্ত্র নিতে চাহিলে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তিনি কোন রূপ অব্যবস্থা দিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত তৈলবট দিতে চাহিলেও তিনি অতি ঘৃণার সহিত তাহা ত্যাগ করিয়া পবিত্র রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের ইংরাজী শিক্ষা এবং আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার তিনি একেবারেই অনুমোদন করিতেন না। "জীবন শিক্ষা" ও "আর্য্য স্ত্রী শিক্ষা" তাহার পূর্ণ নিদর্শন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

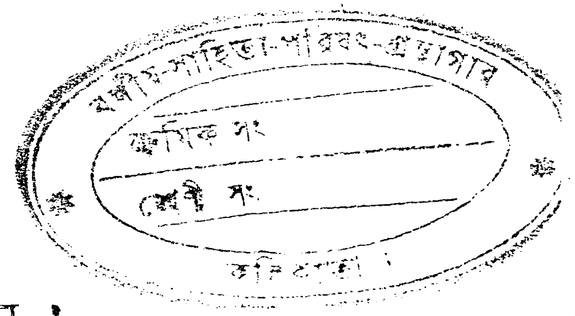

অভিমান।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

আমি তোমার দ্বারে যাইনি
কইনি কোন কথা।
তুমিই নিজে আপন প্রাণে
এলে সেদিন হেথা॥
আমি তোমার চরণ ধরে
চাইনি কোন দান।
তুমিই নিজে ইচ্ছে করে
বিকিয়ে গেলে প্রাণ॥
আমি তোমার কানের কাছে
কইনি আশার কথা।
তুমিই এসে সেধে আমায়
দিচ্ছ এসে ব্যথা॥
আমিতো নিজে ইচ্ছে করে
দিইনি তোমায় দেখা।

তবুও তোমার আমার পানে
বিষ নয়ন বাঁকা ॥
আমি আমার নিজের মনে
ছিলেম সেথা একা ॥
তুমিই নিজ স্বপন ঘোরে
দিয়েছ এসে দেখা ॥
আমি আমার আঁধার ঘরে
কাটাচ্ছিনু রাতি ।
তুমিই সেথা আদর করে
জ্বাললে এসে বাতি ॥
না হয় আমি ম্লান হতুম
নিদাঘ সমীরণে ।
না হয় আমি শুকিয়ে যেতুম
জলদ কণা বিণে ॥
না হয় আমার পাপড়ী গুলি
উঠতো নাকো ফুটে ।
না হয় প্রেমোন্মত্ত ভ্রমর
আসতো নাকো ছুটে ॥

শ্রী শ্রীঅন্নপূর্ণা ।

শ্রী শ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা। নিরন্ন—বুভুক্ষু—নিত্য অভাবের জ্বালায় জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর ঘরে দেবী অন্নপূর্ণার শুভাগমন হইবে।

সেই পূজার কথা বলিতে গিয়া সেকালের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা—হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজ পদ্ধতি ও সাধন সংস্কারের কথা সমস্তই মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে—আমাদের পিতৃ পুরুষগণ সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য কত রকম অনুষ্ঠানেরই না আয়োজন করিয়াছিলেন।

মধুমাস—কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জে মাধবী ফুল ফুটিয়াছে। অশোক, চম্পক, বকুল প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। সমুদয় রবিশস্য গৃহজাত হইয়াছে। ক্ষেত্রে এক টুকরা তৃণ পর্য্যন্ত পড়িয়া নাই—সমস্তই গৃহে আহৃত হইয়াছে। কেবল আহৃত নহে—ধান্যরাশি অন্নের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে এই নয়ন জুড়ান ও মন ভুলান দৃশ্য। এই সময়ে এমন দিনে, অন্নপূর্ণার না পূজা করিয়া কি অন্ন অধিকারী থাকিতে পারেন?

অন্নপূর্ণার পূজায় আমরা নর নারায়ণের পূজা দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

'ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদঞ্চ বিষ্ণুন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহম্ ভূতনিবায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবামি তেষাম্॥"

অর্থাৎ নিখিল জীব, এই অন্ন ও আমি—এ সমস্তই বিষ্ণুর স্বরূপ। কারণ, বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছুই তো নাই। এইজন্য সমুদায় ভূতও আমা হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং সমুদয় প্রাণীর তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিলাম। এই ভাব লইয়াই এদেশের অধিকাংশ পর্ব্বোৎসব গড়িয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, অন্নপূর্ণা পূজার অন্তরালেও ঐ ভাবই লুকান আছে। বিশ্বাত্মাকে পূজা করিলে বিশ্ব পরিতুষ্ঠ হয়, এবং বিশ্বকে পরিতৃপ্ত করিলে বিশ্বাত্মাকে পূজা করা হয়। হিন্দুর চক্ষে বিশ্ব ও ব্রহ্ম একই। অন্নপূর্ণা প্রতিমায় আমরা দেখিতে পাই যে, মা আমার দক্ষিণ হস্তে রজত দর্বী এবং বাম হস্তে স্বর্ণপাত্র লইয়া সিংহাসন আলো করিয়া বসিয়া আছেন—আর সম্মুখে ভিখারী বেশে শঙ্কর আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে অন্ন জগতের প্রাণ, যে অন্নের জন্য জগৎ লালায়িত, সেই অন্ন জগতে বিলাইবেন বলিয়া পুরুষ আদি প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতি অন্নপূর্ণা রূপে দেখাইয়া দিতেছেন যে, তিনি থাকিতে দুঃখ দৈন্য কিসের? তিনি থাকিতে মানুষে না খাইতে পাইয়া মরে কেন?

এই অপূর্ব্ব চিত্র দুর্ব্বাসার পারণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্রৌপদী যখন স্থালী সংলগ্ন অবশিষ্ট শাকান্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহা আহার করিলেন, তখন সেই আহারে দুর্ব্বাসার দশ সহস্র শিষ্যের ক্ষুধা দূর হইয়া গেল, দুর্ব্বাসার পারণ, অন্নপূর্ণার প্রতিমার যেন অপরাংশ বলিয়া বোধ হয়, অন্নপূর্ণাও আশুতোষকে অন্ন দান করিয়া বিশ্বকে অন্ন দান করিতেছেন।

বিষ্ণুপুরাণের আর এক স্থানে আছে,—

"স্বাধ্যায় গোত্রচরণমপৃষ্ট্বাপি তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্তেতাভ্যাগতং গৃহী॥"

অর্থাৎ অতিথির বেদজ্ঞান, গোত্র, আচরণ ও কুল কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না। বিষ্ণুরূপ ভাবিয়া তাহাকে পূজা করিবে। এই দয়ার শিক্ষা, এই প্রেমের পাঠ অন্নপূর্ণার প্রতিমায় পূর্ণ প্রকট। অতিথি অভ্যাগত, ক্ষুৎপীড়িত অভাবগ্রস্থ প্রভৃতি তো দেবতারই মূর্ত্তি। যিনি দয়া ধর্ম্ম ও প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিতে আসেন. তিনি দেবতা নয়তো কি? অন্নসত্রে আমরা যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহা তো দেবত্বেরই লীলাবিকাশ।

পরকে কেমন করিয়া আপন করিতে হয়, দীনদুঃখীকে কেমন করিয়া ভালবাসার শৃঙ্খলে বাঁধিতে হয়, আপনার আত্মীয়-স্বজনকে কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, বাঙ্গালার বারমাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু বিলাতী শিক্ষার চশমা চোখে আঁটিয়া আজ আমরা উহার মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়াছি। তাই এখন উচ্চ ও নীচ, ধনী ও নির্ধনের মধ্যেও সহৃদয়তাও কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের পক্ষে—জাতির পক্ষে যে উহা সাংঘাতিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পর্ব্বোৎসব যতদিন দেশে প্রবলভাবে চলিয়াছিল, ততদিন আর যাহা হউক পরস্পরের মধ্যে প্রীতির আদান প্রদান বন্ধ হয় নাই। আজ এই পাটিশান সুটের যুগে সেই সব কথা মনে পড়িয়া চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। মা আমার ঘরে আসিয়াছেন, কিন্তু ঘরে সে উল্লাস উৎসাহ, সে প্রেম প্রীতি স্নেহ কারুণ্যের চিত্র আজ কোথায়? কেন বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত হইয়া এই উৎসবের মাহাত্ম্য ভুলিল? কেন আজ বলিতে হইতেছে,—

"অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমার ভাগ্যে একাদশী।"

হয়ত এই অমঙ্গলের ভিতর দিয়াই মঙ্গলের আবির্ভাব হইবে। আত্ম শক্তির উদ্বোধন পক্ষে হয়ত ইহা সহায়তা করিবে। কিন্তু আর কতদিন—এই চৈতন্যোদয় হইতে বিলম্ব আছে? ধৈর্য্যের বাঁধ যে মা—দুঃখ দারিদ্র্যের প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। তুমি আজ তোমার সন্তানের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দাও। কায়মনোবাক্যে আজ প্রার্থনা করিতেছি, মা তোমার আশীষ ধারায় বাঙ্গালীর বক্ষ হইতে ময়লা মাটি সব ধৌত হইয়া যাউক। তোমার উৎসবের মাহাত্ম্য বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করুক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

নারীর কথা।

লেখিকা,—শ্রীমতী পূর্ণিমাপ্রভা রায়।

আজ কাল চতুর্দ্দিক হইতে একটা রব উঠিয়াছে. "নারীর শিক্ষা, নারীর শিক্ষা" নারীকে ঘরের বে'র কর, নারীকে তার নারীত্ব বিকাশের সুযোগ দেও, ওগো নারীকে আর অবরোধ শৃঙ্খলে বেঁধে রেখো না, নির্ম্মম অধীনতারূপ নিগড়পাশাবদ্ধা রমণীজাতির আজ জাগরণের দিন সমুপস্থিত। কাগজে পত্রে সভা সমিতিতে মনিষী লেখক ও বক্তাগণের মুখেও একথাটা স্থান পাইতেছে। বর্ত্তমানে নারী সমস্যা লইয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, সে আন্দোলনে আবার দলাদলি আড়া আড়ির তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে। যাক্ সেকথা, আমাদের বলিবার যাহা বলিয়া ফেলি, যে নারী নিয়া সম্প্রতিক দেশের উপর দিয়া নব যুগের নব হাওয়া ছুটছে. সেই নারীগণের তাহাতে কতদূর আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ পায়, সেটা ভাবনার বিষয় নহে কি? সত্যের অপলাপ না করিয়া বলিতে গেলে স্পষ্টতঃ একথাই বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা পাশ্চাত্যানুকরণপ্রিয়া নব্য ভাবাপন্না বিদুষী মহিলাগণ ছাড়া খাটি হিন্দু ঘরের মেয়েদের স্বাধীনতা লাভের বা ইবাসন ব্রাউনিং পড়িবার ও অ্যানাটমীর নোট কণ্ঠস্থের প্রচেষ্টাও নিতান্তই অনাবশ্যক। যে সকল সুসভ্যা মহিলাগণ আমাদিগকে আধুনিক বেশ বিন্যাস বর্জ্জিতা শাঁখা সিন্দুর শোভিতা মোটা বসন পরিহিতা দর্শনে সময় সময় পাড়াগেঁয়ে বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার এই অযৌক্তিকতামূলক প্রবন্ধ দেখিয়া কি বলিলেন বলিতে পারি না। কাহারো প্রাণে কোন প্রকার কষ্টানুভূতি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে এ প্রবন্ধ রচিত হয় নাই। তবে সমাজ, ধর্ম্ম সদাচার ও হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে যতদূর সম্ভব সংযত হইয়া সংক্ষিপ্তভাবে নারীর অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রাদেশের প্রতি নির্ভর করিয়াই লিখিত হইল। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, শক্তিহীন শিবও শব স্বরূপ।

"তত্র স্ত্রীণাং সমুৎপত্তিং বিনা সৃষ্টিন জায়তে।"

স্ত্রী ব্যতীত জগতে সৃষ্টিই হইতে পারে না।

"দশ পুত্রসমা কন্যা দশপুত্রান্ প্রবর্দ্ধয়ন্।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তল্লভ্যং কন্যয়ৈকয়া॥" স্কন্দ পুরাণ।

একটী কন্যা দশটী পুত্রের সমান. দশটী পুত্র পালন দ্বারা যে ফল লাভ হয়, একটী কন্যাদ্বারাই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্যই সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন পূজনীয়া কুলাঙ্গনা। কুলাঙ্গা সর্ব্বদাই পূজনীয়া ইহাও বলিয়াছেন। সুতরাং সেই পূজ্যপাদ শাস্ত্রকারগণের উপরই বা নারীর হীনতা সম্বন্ধে কিরূপে অযথা দোষারোপ করা যায়? যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, অনুসূয়া, লোপামুদ্রা, লীলাবতী, বিহুলা, মৈত্রেয়ী, খনা ও গার্গী প্রভৃতি অধ্যাত্ম-জ্ঞানশীলা নারীগণ জন্মিয়াছিলেন এবং যাহাদের পন্থানুসরণ করিয়া ভারত নারীগণ ধর্ম্ম সদাচার ও সমাজকে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহা-দিগরে অজ্ঞানা মুর্খা বলিবার কি থাকিতে পারে? নারীর ধর্ম্মকর্ম্ম, নারীর শিক্ষাদীক্ষা, নারীর আচার ব্যবহার ব্রত নিয়মাদি আদি যুগ হইতেই পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। গৃহকর্ম্মাদিতে নারীগণেরই সম্পূর্ণরূপে পুরুষাধিক অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। দেব পূজা, অতিথিসেবা, পারিবারিক পূজনীয় গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা, দাসদাসীকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করা ও আত্মীয় কুটুম্বাদির প্রতি যথোচিত সাদর সম্ভাষণ ইত্যাদি সাংসারিক ছোটবড় সকল কাজেই নারীর শ্রেষ্ঠতা প্রকটিত। যে গৃহ মানবগণের জন্মস্থান ও আজীবনের বাসভূমি, সেই ঐহিক পারত্রিক উভয়কালের সম্বলস্বরূপ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৃহিণীকে দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধা বা কুসংস্কারবদ্ধা বলা সজ্জনগণের মুখে কতদূর শোভনীয় হয়? আর সেই গৃহিণীই কি গৌরবানুভব না করিয়া নিজেকে অপমানিতা বোধে, বাহ্যিক স্বাধীনতার জন্য লালায়িতা হইতে পারেন? ঐ বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়াই বলিতেছি যে, যে সকল গৃহিণী পারিবারিক রীতিনীতি, নারীগণোচিত আচার নিয়মাদি অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে প্রকৃত নারীধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ঘরের বা আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে হীনচক্ষে উপেক্ষাকরত বাহ্যিক স্বাধীনতার জন্য কখনই স্বতঃপ্রবৃত্তা হইবেন না। বিদেশী চটকে ভুলিয়া গিয়া যখনই আমাদের পুরুষজাতি স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম স্বনীতিকে তুচ্ছ করিয়া বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া যান, তখনই আর্য্যনারী—ভারত নারীগণ ধর্ম্মের বন্ধন, সংসার উদাহরণ ও স্বাজাত্য স্নেহের অনুরাগ দেখাইয়া তাঁহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। তাই বুঝি শাস্ত্র বলিতেন— নরং নারী প্রোদ্ধরতি মজ্জন্তং ভববারিধৌ। নরকে নারী ভববারিধি হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু বর্ত্তমানে রমণীগণও স্বজাতি স্বনীতি ভুলিয়া পুরুষভাবাপন্ন হইয়া

বিদেশী বিজাতীয় মোহে মোহিত হইয়া যাইতেছেন। ইহাতে যে সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া না যাইবে তাই বা কে বলিতে পারে? নারীগণই এতকাল বাহিরের আগুন নিবাইয়া আসিতেছিলেন, এবার ঘরে বাইরে আগুন লাগিলে সে আগুন নিবাইবে কে? পুরুষ কি ভিতরের আগুন নিবাইতে পারিবেন?

আমরা দরিদ্র ভারতমাতার দরিদ্রা কন্যা, আমাদিগকে বাহিরে গিয়া বিবি সাজিলে চলিবে কেন? আমরা চিরন্তন নীতি অনুসারে ঘরে থাকিয়াই গৃহকর্ম্মাদি করিয়া পুরুষের সহায়তা করিতে পারি। আমাদের মতে নারীধর্ম্মে পরিবারবন্ধনে থাকিয়া আমরা যতদূর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে অধিক স্বাধীনতার দরকার কি আছে। শাস্ত্রকার পুরুষগণ আমাদিগকে বলিয়া থাকেন,—

"সখা ভ্রাতা সুহৃদ্ ভৃত্যো গুরুর্মিত্রং ধনং সুখম্।
শাস্ত্রমায়তনং দাসঃ সর্ব্বং ভর্ত্তুঃ কুলাঙ্গনা ॥"

কুলাঙ্গনাগণ গুরু, মিত্র, ধন, সুখ, ভ্রাতা, শাস্ত্র, দাস প্রভৃতি সকলেরই পরম যত্ন ও পোষণ করিয়া থাকেন। এ জন্যই কুলনারীগণ সকলেরই পরম পূজনীয়া।

এই পূজনীয়া নারীগণই রন্ধনশালার অধিকারিণী। মাতাই রন্ধনকার্য্য করিবেন, অন্যথায় ভগিনী বা সুগৃহিণীরা তাহা করিবেন। শাস্ত্রে আছে,— সর্ব্বাসু ভগিনীহস্তাদ্ ভোজনে বলবর্দ্ধনম্। বলুন শিক্ষিতা ভগিনীগণ! আমরা যদি এই অন্নপূর্ণার অধিকার পাককার্য্য খানসামার হাতে তুলিয়া দেই তাহলে সেটা নিজেদের সম্মান নিজেরাই হারাইয়া স্বপদে কুঠার আঘাতের ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয় না কি? আহারের সহিত মানবের কতদূর ঘনিষ্ঠতা তাহা লইয়া বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকদিগের ভিতরেও মহা আন্দোলন চলিতেছে। আমরা ইহাকে নূতন বোধ করিতেছি, আমাদের শাস্ত্রকারগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কাহার ভোজ্য কিরূপ ভোজ্য ত্যাজ্য, কাহার ভোজ্য সেব্য, তাহা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞাত কুলশীল, ধর্ম্মাচারবিহীন, চরিত্রহীন, কদাচার, পীড়িত লোভী, স্বার্থপর, বেতনভোগী, অর্থলোলুপ নীচ ও রন্ধন কার্য্যে অপটু এবং মূর্খ অজ্ঞান লোকের প্রস্তুত অন্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে।

শুনিয়াছিলাম, একদা এক মেম সাহেব তাঁহার বাবুর্চ্চিকে থুথু দ্বারা বিস্কুট

তৈয়ার করিতে দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়াছিলেন, বাবুর্চ্চি উত্তরে বলিয়াছিল সে সর্ব্বদাই এইরূপ করে কারণ তাহাতে বিস্কুট চটচটে এবং মুখরোচক হয়। মেম সাহেব তদবধি আত্মপাক ভোজন করেন।

আমাদের আত্মীয়া কোন মহিলা চাকরের প্রস্তুত ডাইলের ভিতর মৃত বেঙ পাইয়াছিলেন।

ইত্যাকার নানাবিধ বীভৎস ও ঘৃণিত খাদ্য চাকর বামুন বাবুর্চ্চি ও হোটেলের পাকে প্রতিনিয়তই দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের তাহা অবিদিত নাই।

স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার দিক্ ব্যতীত ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি করিলেও সুগৃহিণীদের হাতে রন্ধন কার্য্যে বহুপরিমাণ ব্যয়সঙ্কোচ হইয়া নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। আমরা নারীগণ যদি গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া চাকুরী করিতে যাই, তবে পারিবারিক স্বাধীনতা কিছু দেখা যায় সত্য; কিন্তু মনিবের কঠোর অধীনতাই চির আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কথায় বলে,—

"যা কিছু ছিল বসে শুয়ে দ্বিগুণ হল বৈদ্যে ছুঁয়ে।"

বেঙের মুখ হইতে সাপের মুখে পড়ার ন্যায় বাহিরের স্বাধীনতার আশায় ঘরেরটুকুও হারাইতে হয়। চাকুরী যে কত কষ্টের কার্য্য তাহা কোমল-প্রাণা, স্নেহশীলা দয়ার্দ্র হৃদয়া অসূর্য্যম্পশ্য রমণীর পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়। যেহেতু—

"সুদুঃসাধ্যং সেবকানাং কর্ম্ম সম্মানবর্জ্জিতম।
ভ্রমন্তি জড়বৎ নিত্যং নৃত্যপুত্তলিকা ইব॥

চাকরের কার্য্য বড় কঠিন। সর্ব্বদাই মনিবের ইচ্ছায় ছায়াবাজীর জড় পুত্তলিকার মত ভ্রমিতে হয়। আমাদের আকাশ কুসুমের ন্যায় একটি সংসার পোষণ উপযোগী চাকুরী পাইতে কত সময় ও অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

আমাদের পুরুষগণ রাশি রাশি অর্থ ব্যয় বা পৈতৃক সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া গ্রাজুয়েট হইয়াও চাকুরীর অভাবে বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া ফিরিতেছেন, এমন কি সময় সময় কাহারো কাহারো পরিবার পরিপালনের অক্ষমতায় আত্ম-গ্লানি ও অর্থকষ্টের দরুণ আত্মহত্যার বিবরণও শুনিতে পাওয়া যায়। এইত পুরুষের বর্ত্তমান শিক্ষার পরিণাম। ভারতবর্ষে নারীর সম্মান, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভালবাসার অভাব নাই। মাতৃ আজ্ঞায় পঞ্চ পাণ্ডবের এক

পত্নী গ্রহণ ভগিনী সুভদ্রার সম্মান রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রবল অনুরাগ এমন কি স্বয়ং ধর্ম্মরাজের ও স্বীয় ভগিনী যমুনার পরিতুষ্ট মানসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পাপী-গণের দণ্ড নিবারণ, ভার্য্যা ইন্দুমতীর মৃত্যুতে মহাত্মা অজরাজের প্রাণত্যাগ, ভগবান শঙ্কর সতীবিরহে অস্থির হইয়া সতী দেহ লইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ছিলেন। আপন প্রাণ দ্বারা রুরুমুনির স্বীয় ভার্য্যার প্রাণ প্রাপ্তি এবং সৌভাগ্য লক্ষ্মীর জন্য মহারাজা তালধ্বজের অপরিসীম খেদোক্তি নারীমর্য্যাদারই পরি-চায়ক বটে। তালধ্বজ বলিয়াছিলেন, হায়, শ্রীরামচন্দ্র আজ নাই, এই পত্নী বিরহ দুঃখ আর কে বুঝিতে পারিবে? শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীলোকের প্রতি দয়া পরবশ হইয়াই সহমরণ বিধান করিয়া স্ত্রীলোকেরই উপকার করিয়া গিয়াছেন, হায়! পুরুষগণের জন্য সে ব্যবস্থা কেন না করিলেন, তাহা হইলে ত চির দিন বিরহ চিতানলে দগ্ধ হইতে হইত না ইত্যাদি আর কত লিখিব।

আজ কাল নারীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আন্দোলনের দিনেই চারিদিকে বড় বড় সহরে ধর্ম্মহীন সমাজ বন্ধন শূন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী অপরিণামদর্শী ছদ্মবেশী মুখে নারীর স্বাধীনতার ডঙ্কা বাদক নব্য শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত কোনও কোনও যুবককেও নারী নির্য্যাতনে আদালতে দণ্ডিত হইতে দেখা যায়, হায়! কোথায় সেই নারীজন প্রিয়তা, কোথায় তাঁহাদের সর্ব্বজীবে সমদর্শিতার হে নব শিক্ষিত যুবকগণ! আপনারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ভারতবাসীগণকে নিরেট মূর্খ বা আহাম্মক নিষ্ঠুর বলিয়া গালি দেন, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে এরূপ নারী নির্য্যাতন ও কখনও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আমরা ভারতের জাতীয় শিক্ষা ভারতীয় নারীর ধর্ম্মকর্ম্ম, ভারতীয় নারীর সদাচার, সদ্জ্ঞান, ভারতীয় নারীর জাতীয় আচার ব্যবহার, জাতীয় বেশভূষা ও ব্রতাচারাদি প্রাণপণে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। বিলাসিতা বর্জ্জিতা হইলে বিদেশী বিদ্যা, বিদেশী নীতি, ভাষা বা জ্ঞানলাভে আমাদের বিন্দু মাত্রও আপত্তি থাকিতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বেকার নারীদের মর্য্যাদাও যেরূপ ছিল, তাঁহারা তদ্রূপ বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও গুণবতী ছিলেন। আমাদের ভারতনারী কখনও মূর্খ বা অজ্ঞানা ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন, মূর্খত্বং মরণাদপি কষ্টদায়ক। তাই মহাজ্ঞানশীলা কুমারী দময়ন্তী তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন,—

"ধিগ্ মৈত্রী মূর্খভূপালে বৃথা সর্ব্বসমন্বিতে।
মূর্খের সহ সংবাসো মরণং তৎক্ষণে ক্ষণে॥"

... ... দেবী ভাগবত।

বৃথা গর্ব্ব সমন্বিত মুর্খ ভূপালের সহিত মিত্রতায় ধিক্, মুর্খ সহবাসে ক্ষণে ক্ষণে মরণ ঘটে!

মুর্খ নারী কিংবা পুরুষই হউক, নগরে বা গ্রামেই থাকুক, কখন কখন মুর্খেরা এরূপ সব কার্য্য করিয়া বসে—যাহাতে দু'একটী মাত্র উল্লেখ করিলেই সমস্ত জাতির সুকৃতি ও সদ্জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ হয়। ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত জাতিকে—সমস্ত ভারতবাসীকে দোষী করা যায় না! এরূপ দোষী লোক বিদেশী সমাজে বা শিক্ষিত সম্প্রদায়েও বিরল নহে। শিক্ষা মানুষকে মানুষ করিয়া দেবত্বের পথে লইয়া যায়, শিক্ষা ভিন্ন মানব জীবন বৃথা। এই শিক্ষা আমাদের নারীসমাজে অরুন্ধতি, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, সতী, সীতা, গার্গী, বেদবতী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বহু নারীতে ছিল, বর্ত্তমানেও অতি গুপ্তভাবে বহু ভারতনারীতেই আছে। এই শিক্ষার জাঁক জমক নাই, বৃথা বাহ্যাড়ম্বর নাই, উপাধি ব্যাধির ছড়াছড়ি নাই, ইহা নীরবে নির্জ্জনে হিন্দুর গৃহাঙ্গনে পবিত্র অন্তঃপুরেই স্বকীয়সীরূপে বিস্তারলাভ করিতেছে। পুরমহিলাগণ এই শিক্ষায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভ ধর্ম্মলাভ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের একটী আত্মীয়া কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক বলিতেন, তিনি বলিতেন, তাঁহার শ্বশুরের নিকট শুনিয়া দিনে দিনে শিক্ষা করিয়াছেন।

কন্যাকে নারীকে সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে শিক্ষা দিবে এবং পালন করিবে, ইহা আমাদের চিরপ্রথা, অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, শাস্ত্রের মুখ্য আদেশ, যথা—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ।"

শিক্ষা দেওয়া নূতন কিছু নয়। আমরা চাই—সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুলাচার, ধর্ম্মাচার, সদাচার, সত্যব্রতাচার ও শাস্ত্রাচার পালন করিয়া রন্ধনাদি সর্ব্বপ্রকার গৃহ কর্ম্মে নারীর একাধিকার।

বনভূমি।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

কোন বন্ধনীতে
বেঁধেছ তুমি, হে বনভূমি,
ফাল্গুনের গন্ধগীতে।

গিয়াছ কি তবে
মন্দার বনে, সুগন্ধগণে,
আনিতে ভবে?

অথবা বৈজয়ন্তপুরে
চুপে চুপে, তস্কর রূপে,
আসিতে কিন্নর সুরে?
দিয়াছে প্রকৃতি
তবে কি তোমায় শুষ্ক বীণায়
মুখর ঝঙ্কৃতি?
অথবা পবন
এ সুরভি, এ পূরবী,
আনিয়াছে এ বন ভবন?
যাক্ সে কথা!
হে দৃপ্ত, এখন তৃপ্ত,
নহ কি তুমি কি ব্যথা?
ফিরে চাহ তবু—
রক্ত কিংশুক, বিন্দু হিংসুক,
নহে কভু!
দাও নাই তা'রে
এক রতি বাস, তাই পরিহাস,
করে সবে বারে বারে!
ঐ রজনীগন্ধার
আছে বলে রূপ, গন্ধ অপরূপ,
এত অহঙ্কার!
তেমনি গোলাপ
রূপে গন্ধে, ত্রিসন্ধ্যে,
দিতেছে গঞ্জনা প্রলাপ!
বল তুমি—
কি সর্ব্বনাশ, করেছে পলাশ,
হে বনভূমি?
কৃষ্ণ কোকিলে
দিয়াছ রাগিণী, মনোহারিণী,
মোহিতে অখিলে।
তবু কত পাখী
রহিতে সুন্দর দাও নাই স্বর!
যবে ডাকাডাকি।
করে সবে মিলে—
তাদের সে স্বর, দর্পী পিকবর,
(দেখি) তাচ্ছল্যে ডুবায়ে দিলে!

যদি বসুধায়
রহিত আলোক, নিত্য অপলক,
তবে কে বুঝিত কি রহস্য তমসায়?
যদি সর্ব্বময়
রাজিত সুবাস, তাহলে মূল্যের হ্রাস
হত নিঃসংশয়!
কোমলতা আছে বলে
বল তবে কে কবে
কঠিনতা ভাল বলে?
যে অধর
নিতিনিতি গাহে সুধাগীতি,
অফুরন্ত তাহার কদর!
কিন্তু ভাবেনা হায়!
অহমিকা কি জ্বলন্ত শিখা
প্রাপঞ্চিক হিয়ায়?
কে নীচ কে তুচ্ছ?
ধরাপরে, পরস্পরে,
কে হেয় কে উচ্চ?
সুগন্ধ সুতান—
আছে বলে গোলাপ কোয়েলে
এত হেয়জ্ঞান।*
আর শিমুল ফুল?
কি বিনয়ী হের অই
বনপ্রান্তে সদা অনাকুল!
না হয় না দিয়েছ তুমি
হে বনভূমি, গোলাপ তুল্য
গন্ধ আর সুতরা ভূমি।
কিন্তু বিনতি যার
হৃদিমাঝে নাহি বাজে,
কি ফল জনমে তার?
ব্যর্থ বিফল ছিছি!
এত আত্মজ্ঞান এত অভিমান
এরি লাগি মিছিমিছি?

* কিংশুক প্রভৃতি বহু পুষ্পের গন্ধ নাই, বায়স প্রভৃতি পক্ষীর সুস্বর নাই, গোলাপ কিংশুকে গঞ্জনা দেয়, কোকিল অন্য পক্ষীকে হেয়জ্ঞান করে।

জীবন্ত পুত্তলিকা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু ঘরের মেয়েদিগকে একটা জীবন্ত পুত্তলিকা বলিলে কিছু বেশী বলা হয় না। পুত্তলিকার সব আছে, নাই কেবল প্রাণ নড়ন চড়ন শক্তি। বাঙ্গালার মেয়েদেরও হস্ত, পদ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয় আছে—নাই কেবল কোন সাড়া। একটা দেশের অর্দ্ধ জাতিকে—ভগবানের একটা শক্তি স্বরূপিণী সৃষ্টিকে—এই ভাবে পায়ের তলায় রাখিবার প্রবৃত্তি কেবল ভারতবর্ষেই দৃষ্ট হয়। মানুষ মাত্রেই হৃদয়ে—কাহারও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। কোন্ বিষয়ে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা—নিকৃষ্টতর তাহাত আমি খুঁজিয়া পাই না। বিশ্বধারা বাক্, অপালা, লোপমুদ্রা, অদিতি, চমী, শশ্বতী, উর্ব্বশী, ঘোষা, সূর্য্যা, জুহু, ইন্দ্রানী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, দেবহুতি, মদালসা, আত্রেয়ী, ভারতী, লীলাবতী, খনা, মীরাবাই, করমেতি বঙ্গা,প্রভৃতি—হিন্দু ললনাগণ কি—বিদ্যাবত্তা, কি মনীষা কি সংযম, কি ব্রহ্মচর্য্য, কোন বিষয়েই তদনিন্তন কালের পুরুষের অপেক্ষা—হীন ছিলেন না; ঐতিহাসিকগণ বলেন, রাজপুত বীরাঙ্গনা—দুর্গাবতী, পদ্মিনী প্রভৃতি প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া ছিলেন; বীর বাদল জননী যে ভাবে দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র বাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া ছিলেন তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। এ দেশেরি তাঁতারি পত্নী যুদ্ধের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিবার জন্য মাথার কেশ কাটিয়া দিয়াছিলেন। এ দেশেরই কুন্তী ব্রাহ্মণ পরিবারকে বক রাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপন পুত্রকে রাক্ষসের মুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সব ত প্রাচীন কালের কথা, বর্ত্তমানেও এই সেদিনের রাণী রাসমণী, রাণী ভবানী, রাণী শরত সুন্দরী যে ভাবে যোগ্যতার সহিত জমীদারির কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক জমিদার রাজা মহারাজাও পারেন না। সে কি এ দেশেরই মা কোশল্যা নহেন? অথচ এত বড় একা বিরাট শক্তিশালিনী স্ত্রীজাতিকে আমরা নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার সমস্ত শক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি। যে জাতি দুনীয়ার দিকে না তাকাইয়া শুধু প্রাচীন সংস্কার লইয়া পড়িয়া থাকে—সে জাতীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা এখনও দুই

চক্ষু বুজিয়া আছি, মরিতে বসিয়াছি তবুও চৈতন্য আমাদের হইল না। জাপান, চান, জার্ম্মাণী—স্ত্রীলোককে বসিয়া বসিয়া খাইতে দেয় না, তাহাদের স্ত্রীরা প্রায় পুরুষের ন্যায়ই কার্য্যক্ষম। তাহার ফলে সে সমস্ত দেশ ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে, আর এ দেশ যাহা হইতেছে সে ত সকলে স্বচক্ষেই দেখিতে পাইতেছেন। অধিক দূরে যাইবার দরকার কি? এই নিকটে মারাঠিজাতির প্রতি দৃকপাত করুন না কেন? মারাঠিজাতি খৃষ্টান নহে—ব্রাহ্ম নহে—ইহুদি নহে, তাহারা নিষ্ঠাবান হিন্দু। বাঙ্গালীর হিন্দু অপেক্ষা শাস্ত্র, পুরাণ, দেব দ্বিজে তাহাদের ভক্তি কম নাই; কিন্তু সেই মারাঠিদের স্ত্রীলোকেরা রীতিমত পথ ঘাট চলেন, ঘোড়ায় চড়েন আর স্বাধীন ভাবে যথা ইচ্ছা তথা যাইতে ইতঃস্তত করেন না। তাহাতে তাহাদের সতীত্ব ধর্ম্ম একটুও ক্ষুন্ন হয় না। আর বাঙ্গালীজাতি নিজেদের কায়িক মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়াছে। আপন হিত সব জাতিই বুঝে, বুঝেনা কেবল এই—বাঙ্গালার মানুষ। এই মসীজীবি কেরাণী বাবুদের পরিবারকে লইয়া যদি গঙ্গা স্নানে যাইতে হয় তখনও একখানা গাড়ী চাই। বলি তিনি যত বড় ধনী হৌন না কেন দরিদ্র জাতির আবার এত বাবুয়ানা কেন? স্ত্রীলোক গুলি যেন বাঙ্গালাদেশে একটা খোলার সামগ্রী। সেদিন একটা লোক বিবাহ করিয়া আসিল, তাহার নিজের খাইবার পরিবার সংস্থান নাই, পরিবার পালন ত দূরের কথা! অথচ বিবাহ করা চাই, বংশ বৃদ্ধি না করিলে অন্তিমে তাহার মুখাগ্নি হইবে না। ভারত গবর্মেণ্ট সতীদাহ প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন! কিন্তু এই যে সব জীবন্ত সতীদাহ প্রথা চলিতেছে, তাহার প্রতি কারের ব্যবস্থা কি? অনেকে এক স্ত্রী থাকিতে আবার একটী বিবাহ করিয়া পূর্ব্ব স্ত্রীকে অমানুষিক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দেন এই দুর্ব্বিত্তদের কি শাস্তি নাই? অনেকে টাকাদিয়া কন্যাকে নিমতলার যাত্রীর হস্তে অর্পণ করেন, তাহারও কি প্রতিবিধান কোন নাই? অনেক সংসারে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামীর অত্যাচারে বধূ আত্ম হত্যা করে, অথচ সমাজ এই অত্যাচারিদের কোন শাস্তি দেন না। সমাজের দিকে আর হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার এখন সমাজ নাই—সমাজিক শাসন নাই। বাঙ্গালায় যদি সামাজিক শাসন দণ্ড থাকিত তবে মদ্যপায়ী ব্যভিচারী চোর, দস্যু, দুবৃত্ত অনায়াসে সমাজে মিশিতে পারিত না? সমাজের মূল্য এখন চৈতনধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পাদ-পদ্মে চারি আনার দক্ষিণার মধ্যে আবদ্ধ। এখন যার টাকা আছে, সেই

সমাজের হত্যাকর্ত্তা বিধাতা। আজ যে দিক দিয়াই দেখি, স্ত্রীলোকের দুঃখ দূর করিতেই হইবে। তাহাদের ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা দিতেই হইবে—তাহারা যে মানুষ' পুরুষের দাসী নহেন, এ ভাব তাহাদের মনে জাগাইতেই হইবে। নইলে এ জাতীর আর উত্থানের আশা নাই। স্ত্রীলোকের শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু সে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে নহে।* চাই জাতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, মারঠি, তেলেগু প্রভৃতি আপন আপন দেশীয় ইতিহাস, ভুগোল, রাজনীতি, সমাজ নীতি, আয়র্ব্বেদ, হাকিমি চিকিৎসা, ধাত্রী বিদ্যা, বিজ্ঞান রসায়ন ও শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা যদি জীবনে কোন প্রকার কার্য্যকরি না হইল, তবে তোতা পাখীর মত কতকগুলি পড়া মুখস্থ করিয়া লাভ কি? মেয়েদিগকে প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহা হইবে বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রোপযোগী।

আমাদ্দের দেশের নেতাগণ নানাভাবে অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু মেয়েদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের শক্তি বিকাশের কি চেষ্টা করিতেছেন? তাঁহারা ত একটা জাতীয় মহিলা বিশ্ববিদালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন! মেয়েরা চিকিৎসা বিদ্যা শিখিবেন, কিন্তু এলোপ্যাথিক—হোমিওপ্যাথিক নহে, শিখিবেন কবিরাজী, কেন না এই কবিরাজীর উপাদান তাহার ঘরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। নিজে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা এখনও আমাদের হইল না। এক একটা বড় বড় সাহেব কেমন আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন অথবা রাজনীতির অনুশীলনকার—এক একটা শ্বেতাঙ্গী রমণী কেমন আজীবন অবিহিতা থাকিয়া দেশের সেবারনা হাতের পরিচর্য্যা করেন, আর আমাদের দেশের পুরুষের পক্ষে বিবাহ গতানুগতিক প্রথা আর স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ করাটা হইয়াছে একেবারে কম্‌পালসারি—বাধ্যতামুলক। দেশের মুখের দিকে কেহ একবার তাকাইবে না। সকলেই আপন আপন শ্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। ঘর সংসার হইয়াছে ইহাদের সর্ব্বস্ব ঘর সংসার হইতে "দেশটা" যে বড় এ চিন্তা আমাদের এখনও ফুটে নাই। এখন কি আর কাল বিলম্ব করিবার সময় আছে? এরূপ নারীরূপী জীবন্ত পুত্তলিকার সেবা করিয়া এরূপ জীবন্ত "লগেজ" ঘরে ঘরে বাঙ্গালার প্রুরুষ জাতি আর কত দিন চলিবে। হৃদয়ে বল কর, সন্দেহ প্রবৃত্তি দূর কর, স্ত্রীলোক মায়ের জাতি, সতিত্বের জ্বাজ্জ্বল্যমান-মুর্ত্তি তাহাদিগকে আজ এই সাধনা বেদিতে সমান আসনে অচিরে স্থান দাও। দেখিবে আমাদের ধর্ম্ম সংসারে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডসটনিক বা

য়্যান্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১||০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১||০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২||০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

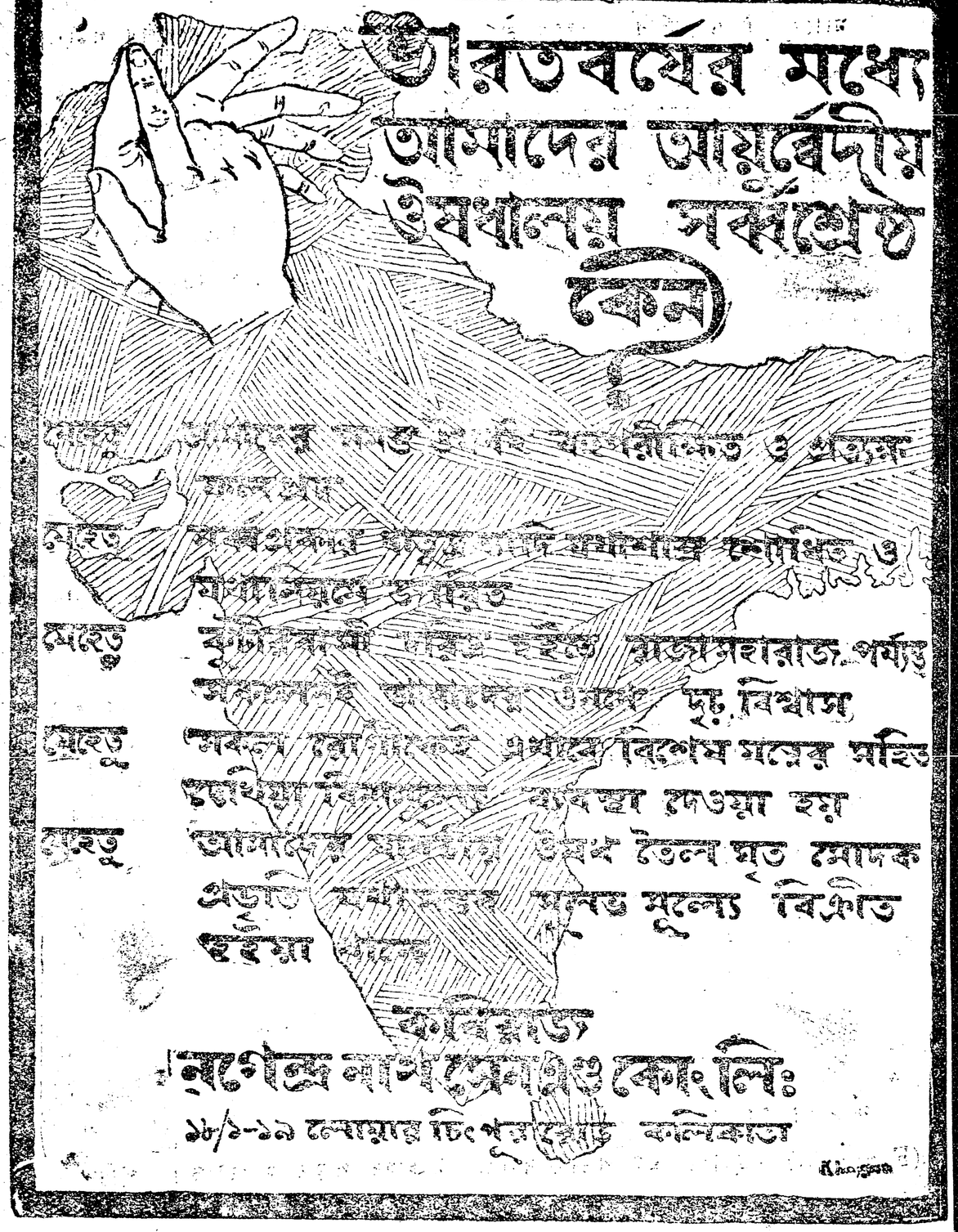

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩০শ, বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩১, [১২শ, সংখ্যা

১।	বর্ষসূচী		
২।	বসন্ত সমাগম	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৩
৩।	অশ্রু-কণা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৩৫৬
৪।	বিধির কলম বন্ধ	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস	৩৬২
৫।	শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	৩৮১
৬।	রক্তচিতা	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	৩৮৫

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 28-5-25

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
ঐরূপ নড়ে চড়ে যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসুম তেল
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

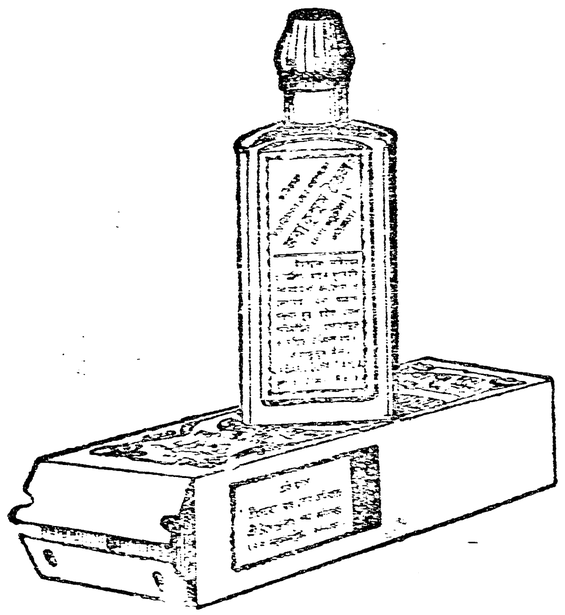

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং: ২৭১০ কলি:
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী]

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ত্রিংশভাগ—ত্রিংশ বর্ষ।

(১৩৩১ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৩১ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta at the
"JANMABHUMI PRESS"
39, Maniek Bose's Ghat Street,
CALCUTTA.
1925.

বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা।] [ডাঃ মাঃ ছয় আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ত্রিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অক্ষমতা (পদ্য)	শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্র নাথ মিত্র	২৯
২।	অনিলের বৈরাগ্য (গল্প)	" কালীদাস চক্রবর্ত্তী	১৪৯
৩।	অশান্তি (পদ্য)	ডাঃ " নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১৮২
৪।	অশ্রুকণা (গল্প)	* হরিধন মিত্র	২২৬, ২৬৮, ২৯১, ৩২২, ৩৫৬
৫।	অভিমান (পদ্য)	ডাঃ " নরেশচন্দ্রভট্টাচার্য্য এম, বি,	৩৩৯
৬।	আনন্দমেলা (পদ্য)	* মোজাম্মেল হক্	৫
৭।	আমার নিবেদন	" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
৮।	আর্য্য মহিলা	" জিতেন্দ্র নাথ সেন এম, এ	৮২
৯।	আবাহন (পদ্য)	" মনোমোহন বিদ্যারত্ন	১১৭
১০।	আলকাতরা	" বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৮
১১।	ইন্দিরা (গল্প)	" কমলাকান্ত বসু	৩১৪
১২।	কল্যাণী (গল্প)	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	১৬১
১৩।	কে এ (পদ্য)	শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র হুই	১৯৫
১৪।	কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	২৪২
১৫।	জীবন্ত পুত্তলিকা	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	৩৫০
১৬।	তোমরা কি মানুষ	" শ্যামলাল গোস্বামী	১৪
১৭।	ত্যাগী বিশ্বপতি	* প্রভাস চন্দ্র প্রামাণিক	৯৫
১৮।	তুমি (পদ্য)	...	৩০৬

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১৯।	দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য সাহিত্য	শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ,	৬১
২০।	দীপশলাকাগ্র	" যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮
২১।	দাদার প্রাণ (গল্প)	" প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	২১৪
২২।	নব বর্ষারম্ভ	... ...	১
২৩।	নারীর কথা	শ্রীমতী পূর্ণিমাপ্রভা রায়	৩৪৩
২৪।	প্রাচীন ভারতে তাড়িত বার্ত্তা	" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১১৭
২৫।	প্রাপ্তি-স্বীকার	... ...	১২৮, ৩২০
২৬।	প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীমতী মোক্ষদাবালা বিশ্বাস	১২০
২৭।	প্রণাম (পদ্য)	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	৯৭
২৮।	বঙ্কিম বাবুর প্রভাব	" মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ	২
২৯।	বলিদান	" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এচ, জি, টী	৯৩, ২৫৮
৩০।	বক্রেশ্বর পথে	* বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩
৩১।	বসন্তের ফুল (পদ্য)	শ্রীমতী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	১৮৬
৩২।	বিপদে প্রার্থনা (পদ্য)	" নগেন্দ্রনন্দিনী দাসী	২১৪
৩৩।	বিরহিণী	" শৈলরাণী বসু বি, এ,	২১৯
৩৪।	বিদায় (পদ্য)	শ্রীযুক্ত জীবজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	২২৫
৩৫।	বিমুক্ত	* কমলাকান্ত বসু	২৫২, ২৫৬
৩৬।	বনভূমি (পদ্য)	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩৪৮
৩৭।	বসন্ত-সমাগম (পদ্য)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৩
৩৮।	বিধির কলম রদ্ (গল্প)	* শ্যামাচরণ বিশ্বাস	৩৬২
৩৯।	"ভ"কারে ভূমিকা	ডাঃ " সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৮৭
৪০।	ভালবাসার পরপারে	" বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৮
৪১।	ভাব প্রকাশ	ডাঃ * নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১১৫
৪২।	মাষ্টার মহাশয় (গল্প)	" হরিধন মিত্র	৪৩

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৪৩।	মরকত-মোহিনী (উপন্যাস)	" যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৪৭, ৭৩, ১০৪, ১৩৯, ১৬৭, ২০৩, ২৪৩
৪৪।	মন্ত্র মুগ্ধ (গল্প)	" কমলাকান্ত বসু	৬২
৪৫।	মধু-বাসর (পদ্য)	" জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	৬৫
৪৬।	মিনতি (পদ্য)	" প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	২৫৭
৪৭।	মায়াবী ও পথিক (গল্প)	" কমলাকান্ত বসু	২৭৭
৪৮।	রক্তচিতা (গল্প)	" কমলাকান্ত বসু	৩৮৫
৪৯।	রূপকথা	স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী	২৪
৫০।	শ্রীচৈতন্য (পদ্য)	" প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	৪১
৫১।	শ্যামের বাঁশী (পদ্য)	" রমাবিলাস কাব্যবিনোদ	৩৩
৫২।	শ্রীকুঞ্জ-ভঙ্গ (পদ্য)	" দুর্গাদাস কাব্যতীর্থ	৪২
৫৩।	শাস্তি (গল্প)	" হরিধন মিত্র	১১৮
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব (পদ্য)	পণ্ডিত " শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	১২৮
৫৫।	শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা	... ...	৩৪০
৫৬।	শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন কালে ব্রজবাসীর উক্তি (পদ্য)	...	১৯২
৫৭।	শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা	পণ্ডিত ,, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	৩৮১
৫৮।	সাধক-কমলাকান্ত	" দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮, ৩৭, ৬৭, ৯৮, ১৩০, ১৬২, ১৯৪, ২৩৬, ২৬০	
৫৯।	সাধক সঙ্গীত	পণ্ডিত " শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ ২৩, ৪৬, ৯২, ২২২	
৬০।	স্বাস্থ্য ও সাহিত্য	ডাঃ " রমেশ চন্দ্র রায় এল, এম, এস	৩০
৬১।	সমালোচনা	... ... ৩২, ৯৬, ২২৪, ২৫৬	
৬২।	স্নেহের জয় (গল্প)	" হরিধন মিত্র	১৮২
৬৩।	স্বর্গীয় জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জীবন চরিত	... ... ২৮০, ৩০৭, ৩৩০	
৬৪।	স্বপনে (পদ্য)	ডাঃ " নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	২৮৭
৬৫।	সুরের হাওয়া	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	২৮৯
৬৬।	সরস্বতীর বন্দনা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩২৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

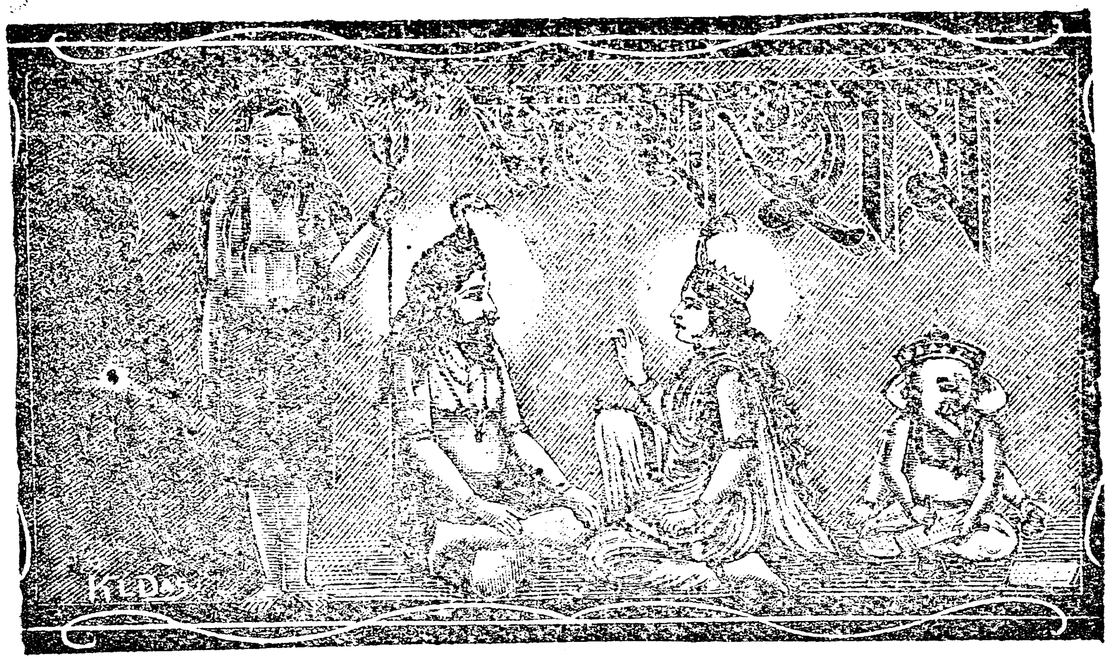

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩০শ, বর্ষ। | ১৩৩১ সাল, চৈত্র। | ১২শ, সংখ্যা।

বসন্ত সমাগম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্ত এস হে ফিরে,
নব পত্র তরু শিরে,
তুমি ত এলে না ফিরে,
নব বাসে তুমি ঘিরে ?

নব পুষ্পে ভরা লতা,
নব প্রেমে পতিরতা,
বিশ্বে এস সজীবতা,
নব ভাব প্রবণতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
গ্রন্থ সং

নব তানে পিক গায়,
নব রাগে অলি ধায়,
সকলি বরিতে চায়,
নূতনে সুন্দর কায়।

তুমি কেন আসিবেনা ?
নব বাস পরিবেনা ?
নব গৃহ রচিবেনা ?
নব সাজে সাজিবেনা ?

মেদুর মলয় বায়,
বিফলে বহিয়া যায়,
খেলেনা কুন্তল তায়,
পুলকে শিহরি কায়।

সরোবরে স্বচ্ছ জল,
সুশীতল সচঞ্চল,
হয়ে কত কুতুহল,
চুমিতে চরণ তল।

ঘাটে যেতে ঋজু পথ,
পায়না চরণ রথ,
চেয়ে বুঝি আশা পথ,
পুরে যদি মনোরথ।

গৃহ তব অন্ধকার,
শূন্য করে হাহাকার,
পড়ে আছে দীপাধার,
নিভে গেছে দীপ তার।

অতিথি অনাথ কত,
ফিরে নিত্য আশা হত,
শিশু দুটি মর্ম্মাহত,
বলে—"মাতা স্বর্গগত"।

দিন রাত্রি আসে যায়,
ষড় ঋতু বর্ষে তায়,
তুমি কেন পুনরায়,
আসিবেনা সুস্থ কায় !

বিধির বিচিত্র নীতি,
বুঝেছি সংসার রীতি,
ছিঁড়িলে মায়ার গ্রন্থি,
থাকেনা মোহের ভ্রান্তি,

ত্যজ দেহ সঙ্গে সব,
মুছে যায় অনুভব,
প্রীতি, ভক্তি, অনুরক্তি,
যত কিছু স্নেহা শক্তি,
কিন্তু যারা গড়ে থাকে,
সুখ স্মৃতি যেগে বুকে।—
কওনা তাদের কথা,
শুন না তাদের ব্যাথা।—

অভিশপ্ত ভাগ্যহীন,
অতি দীন, অতি হীন,
অন্ধকার অশ্রু নীরে,
গুরু শাস্তি বহে শিরে।

দয়াময় নাম তব,
কত দয়া আর স'ব ?
তব তত্ত্ব তুমি জান,
অজ্ঞ আমি নাহি জ্ঞান।

তব পদে যাচি আমি,
তুমি ত আমার স্বামী,

কাঁদি তাহে ক্ষতি নাই,
অন্তে যেন অন্ত পাই।

অশ্রু-কণা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

(১২)

মানুষ আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা রকম উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকে। যদি তাহার ভাগ্যক্রমে একটা উপায় জুটিয়া যায়, তাহা হইলে সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। নীহারবালারও তাহাই হইল।

তিনি যেদিন প্রমথর মুখ হইতে শুনিলেন,—সে কলিকাতায় যাইতেছে, সেদিন তিনি নাচিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি দেখিলেন, তাহার দীনদয়াল বাবুদের বাটীতে যাইয়া অমিয়বালার সহিত পরামর্শ করিবার বেশ সুবিধা হইল।

বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগ। দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আগুনের মত উত্তপ্ত বাতাসের হল্‌কা ফুল, ফল, গাছ পালা ইত্যাদি ঝল্‌সাইয়া দিতেছে। পাখীরা গাছের ডালে ছায়ায় বসিয়া এক একবার ডাকিয়া পরক্ষণেই চুপ করিতেছে। সমস্ত গ্রাম নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও একটু সাড়া বা শব্দ নাই। গ্রামের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকজনের চিহ্ন নাই। এমন সময় এই জনহীন গ্রামের পথ দিয়া নীহারবালা দীনদয়াল বাবুদের বাটী প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রায়ই উঁহাদের বাড়ী গিয়া থাকেন। অমিয়বালার সহিত নীহারবালার "ভালবাসা" পাতান।

অমিয়বালা নীহারবালার হাত ধরিয়া আপনার কক্ষে লইয়া গেলেন। কক্ষের মেঝের উপর একখানি মাদুর বিস্তৃত ছিল। অমিয়বালা নীহারবালার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "বস ভাই, বস। এই রোদে এসেছ? কর্ত্তাটী যে বড় এমন সময় ছেড়ে দিয়েছেন, ভাই?"

নীহারবালা মাদুরের এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "তুমি বস দিদি; কষ্ট আবার কি ভাই? বড় দরকারী কথা আছে, তাই এলুম।"

অমিয়বালা উদ্বেগের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "এমন কি দরকারী কথা ভাই?"

নীহারবালা অঞ্চলের একপ্রান্তে মুখমণ্ডলের স্বেদ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, প্রমির বে'র আমায় ঘটকালিগিরি কর্‌তে হবে।

অমিয়বালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বেশ ভাই! কনের ঠিক্ কর।

নীহারবালাও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন, ঠিক্ করেছি!

অমিয়বালা নীহারবালার মুখের দিকে আগ্রহের সহিত চাহিয়া বলিলেন, কার মেয়ে? কোন গ্রামে বাড়ী? আর মেয়ের নাম কি?

নীহারবালা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, দিদি, একেবারে অত গুলির উত্তর। আচ্ছা বেশ গ্রাম হল কমলপুর। মেয়ের নাম অশ্রুকণা। আর প্রাণচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা। তবে প্রাণচন্দ্র বসুর আসল নামটা কি জান? অই প্রাণ শব্দটার স্থলে এমন একটা শব্দ বসিয়ে নাও, যাহার মানে প্রাণ হবে।

গরমে এইটুকু পথ আসিতেই সুন্দরী নীহারবালার মুখে একটু একটু লাল রংয়ের ছোপ ধরিয়াছিল, তাহার উপর এই কথা বলিতে তাহার মুখে একটা সুমিষ্ট রঙ্গের আভা ফুটিয়া উঠিল, নীহারবালা সলাজ হাসি হাসিতে লাগিলেন।

অমিয়বালা নীহারবালার হাতটা একটু টিপিয়া দিয়া বলিলেন, কত রকমই শিখেছিস্ ভালবাসা! কিন্তু এই কথা বলিয়াই পরক্ষণে অমিয়বালার মুখ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেল। হায়! তাহারও যে একদিন ছিল। যখন সেও নীহারবালার সহিত এইরূপ রহস্যালাপ করিত।

নীহারবালা, অমিয়বালার মুখের ভাব দেখিয়া প্রাণে একটা ব্যথা পাইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ও ভাব কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলেন, কি দিদি, রাজী আছ?

অমিয়বালা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, এত আমার অতি সৌভাগ্যের কথা তবে প্রমি যদি রাজী হয়।

নীহারবালা বলিলেন, দিদি, অশ্রু প্রমিকে ভালবাসে, প্রমিও অশ্রুকে ভালবাসে। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদের বিষয়ে প্রত্যেক ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ও স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

অমিয়বালা প্রমথ ও অশ্রুকণা সংক্রান্ত সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম

বক্তৃতার সুরে বলিলেন, ভাই! অশ্রুর মত সুন্দরী ও সরলা বালিকাকে কে না তাহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবী করিয়া পূজা করিতে চায়? কেনা ঠাকুর পোর (জীবন বাবুর) মত সৎ ও গুণবান ব্যক্তিকে তাহার শ্বশুর ও কেনা তোমার মত স্নেহাশীলা ও করুণাময়ী রমণীকে শ্বশ্রূ করিতে চায়? প্রমি ত কোন ছার।

নীহারবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দিদি, তোমার বক্তৃতা শুনে হাসি পায়। ও কথা বোলো না। কেননা প্রমির মত সৎ ও সুশ্রী চরিত্রবান যুবককে আপনার হৃদয়ের অর্ঘ্য দান করিতে কোন্ কিশোরী পশ্চাদ্‌পদ হয়? কে স্বর্গের দেবীর মত রমণীর পুত্রবধূ হইতে না চায়?

অমিয়বালা হাসিতে হাসিতে টানা স্বরে বলিলেন, তুমিও বক্তৃতায় কি কম গেলে ভাই?

তাহার পর সহজকণ্ঠে অমিয়বালা পুনরায় বলিলেন, যাক্ ওসব কথা। আমি আজই বাবাকে বোলে রাজী করাব। প্রমি কল্‌কাতা থেকে আসুক, তারপর তাকে বলে সব ঠিক্ করে ফেল্‌ব।

নীহারবালা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, না, তা হবে না দিদি। প্রমিকে জান্‌তে দেওয়া হবে না, যে তার সঙ্গে অশ্রুর বে হচ্ছে। তাইতে আমি প্রমি গেছে বলেই তোমার সঙ্গে এই তক্কে পরামর্শ করতে এলুম।

অমিয়বালা বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে নীহারবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্রমিকে জান্‌তে দেওয়া হবে না—সে কি রকম?

নীহারবালা বলিলেন, আমার বড় ইচ্ছে হয়, তাদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে একটু তামাসা করি। সেটা কি রকম জান—প্রমিকে আর অশ্রুকে প্রথমে একটু কষ্ট দিয়ে তারপর সুখী করা।

অমিয়বালা নীহারবালার দিকে আগ্রহ দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন,—সে কি রকম?

নীহারবালা বলিলেন, কি জান দিদি, প্রমথকে আর কোন মেয়ের সঙ্গে বে হচ্ছে জানিয়ে, অশ্রুর সঙ্গে বে দেওয়া হবে। অশ্রুকেও প্রমথর সঙ্গে বে হচ্ছে আগে জানতে দেওয়া হবে না।

অমিয়বালা কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া বলিলেন, তা হতে পারে না। কেননা প্রমি অবশ্য কারও কাছ থেকে ঠিক্ জানতে পারবে, যে তার সঙ্গে অশ্রুর বে হচ্ছে।

নীহারবালা একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—কেন জান্‌তে পারবে?

অমিয়বালা বলিলেন, কেন জান্‌তে পারবে না?

নীহারবালা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দিদি, তবে আমি যা বলি শোন, আর আমার কথার উত্তর দাও—ও গ্রামে কি তোমাদের কোন চেনা লোক নেই?

অমিয়বালা আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আছে, সন্তোষ বাবু আমাদের চেনা লোক, বাবার সঙ্গেও খুব ভাব আছে।

নীহারবালার মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া গেল। নীহারবালা বলিলেন, তার কি বের যুগ্যি কোন মেয়ে আছে?

অমিয়বালা বলিলেন,—না।

নীহারবালার মুখে একটা উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। নীহারবালা বলিলেন, তবেই মুস্কিল!

অমিয়বালা হঠাৎ খুব জোরে হাসিয়া বলিলেন, ওঃ সব কায়দানী বুঝতে পেরেছি এবার।

নীহারবালাও হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বুঝেছ ত, এইবার বল দিকি কি করা যায়?

অমিয়বালা বেশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ভাই ভালবাসা! সন্তোষ বাবুর মেয়ে থাকুক আর নেই থাকুক কিছু এসে যায় না। কেননা প্রমি কলকাতায় থাকত সে সন্তোষ বাবুর বাড়ীর সম্বন্ধে কিছু জানে না। আমি আজই বাবাকে রাজী করে গোমস্তা সতীশ বাবুকে দিয়ে সন্তোষ বাবুকে ডাকিয়ে আনব। তারপর বাবা সন্তোষ বাবুকে এ বিষয় সব বুঝিয়ে বল্‌বেন, আর প্রমি এলে যখন তাঁকে খপর দেওয়া হবে, তখন তিনি এসে প্রমিকে দেখে যাবেন। তা হলে প্রমি বুঝবে, যে তার ঐ ভদ্রলোকটীর কোন সম্পর্কের মেয়ের সঙ্গে বে হচ্ছে। আর তুমিও ওদিকে অশ্রুকে জানতে দিওনা যে, তার প্রমির সঙ্গে বে হচ্ছে।

নীহারবালা আপনার কৌতুক সফল হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া উঠিলেন। নীহারবালা বলিলেন, সে আমি আগেই ঠিক্ করে রেখেছি, ও গ্রামের হরেন্দ্রভূষণ বাবু কাল অশ্রুকে দেখে গেছে! অশ্রুও বুঝেছে যে, তার হরেন বাবুর ছেলের সঙ্গে বে হবে। প্রমিও অশ্রুকে দেখ্‌তে আসবে

একথা শুনে গেছে, সে তো তোমাকে আগেই বলেছি দিদি। এই কথা ভাল বলিবার সময় নীহারবালার কণ্ঠে বেশ একটা তৃপ্তির স্বর ফুটিয়া উঠিল।

অমিয়বালা বলিলেন,—ওঃ তুমি ওদিকে প্রায় কাজ এগিয়ে রেখেছ। আর কিছু বলতে হবে না। কোন কথা জিজ্ঞেস করতে হলে ঝিকে দিয়ে জিজ্ঞেস করে পাঠাব। কেমন?

নীহারবালা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, কিন্তু দেখো দিদি, বেশীলোক যেন এ সব জানতে না পারে, তা হলে সব ফেঁসে যাবে।

অমিয়বালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কিছু ভয় নেই ভাই। কেউ জানতে পারবে না, প্রমথ তো নেই। তবে জানবার মধ্যে তুমি আমি বাবা, আর ঠাকুরপো (জীবনবাবু) কেমন ত?

নীহারবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হ্যাঁ আরও দুই এক জনকে জানাতে হবে।

অমিয়বালা আগ্রহ সূচক স্বরে বলিলেন, কেন?

নীহারবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বাঃ সন্তোষ বাবু হরেন বাবু না জান্‌লে কি করে এ সব কাজ হবে? হরেন বাবু তাঁর বাড়ীর সকলকেই এ কথা জানিয়েছেন, তবে কথাটা গোপন থাকবে। আর সন্তোষবাবু শিগ্‌গীর জানতে পারবেন।

অমিয়বালা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, ভাই সকলেই নিজেদের কোলের দিকে ঝোল টানতে মজবুত। আমি আমাদের কথা ভেবেছি, ও দিকটা একদম মনেই ছিল না। যাক্ আর কিছু বলতে হবে না। আমি সব এদিকে ঠিক করি। ঝিকে পাঠাব। যা কিছু পরে আর আর বলবার হবে ঝিকে বলে দিও। তারা আমাদের অনেক দিনের পুরাণো ঝি, ও আমাদের কথা কাউকে বল্‌বে না।

নীহারবালা বলিলেন, প্রমি যদি সন্তোষ বাবুর সম্পর্কের মেয়ের সঙ্গে বে কর্‌তে অরাজী হয়?

অমিয়বালা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—না সে অরাজী হবে না। যদি অরাজী হয় বলব—বাবা তোকে এত কোরে মানুষ কর্‌লাম, আর এখন তুই আমার কথা রাখবি না? তা হলেই সে শুনবে, আর আমার কথায় অমত করতে সাহস কর্‌বে না।

নীহারবালা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—তবে আজ আসি দিদি। তুমি ত সব বুঝেছ, যা ভাল হয় কোরো।

(১৩)

প্রমথ কলিকাতায় দাওয়ানজীর বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, পরেশবাবু সাংঘাতিক পীড়িত। সেই বাসায় দুইটী ছাত্র তাহার শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতেছে। তাহার শরীরের উত্তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রি। টাইফয়েড বলিয়া প্রমথর ধারণা হইল।

বৃদ্ধ দাওয়ানজী প্রমথকে দেখিয়া বলিল,—বাবা প্রমথ, তুমি নিজেই এসেছ, কেন লোকজন পাঠালে না? আমার ত বাঁচবার কোন আশাই নাই।

প্রমথ বিষণ্ণ ভাবে বলিল, কাকাবাবু, আমি কি আপনার অসুখ শুনে লোকজন পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? আপনি আমায় এই কল্‌কাতায় কত স্নেহে, যত্নে আদরে লালন পালন করেছেন বলুন দিকি? আমি কি সে সব ভুলে গেছি? তার ওপর আপনি আমায় লিখেছিলেন, আমার কি আসাই ঠিক্ হয় নি? আর বাঁচবার কোন আশা নেই, কেন বলছেন—ও কথা শুনলে আমার যে বড় কষ্ট হয়, আর ও কথা বলবেন না। প্রমথর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পরই প্রমথ দুইজন ভালো ভালো চিকিৎসক লইয়া আসিল ও রমার সহিত দিবারাত্র রোগীর সেবা করিতে লাগিল।

এত চেষ্টা ও অর্থব্যয় ভাগ্যক্রমে বিফল হইল না। সুদক্ষ চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় প্রমথ ও রমার স্নেহ পরিচর্য্যায়, এক সপ্তাহকাল পরে পরেশবাবু আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং একপক্ষ কাল পরে তিনি পথ্য পাইলেন।

তাহার পথ্য পাইবার দুই তিন দিবস পরে, একদিন প্রমথ বলিল, কাকাবাবু চলুন এবার দেশে যাই। আর কেন মিথ্যে এই কলকাতায় পড়ে থাকবেন, তার চেয়ে বাড়ী চলুন। এখানে আপনাকে দেখবার কে আছে? ধরুন কোন দিন শরীরটা খারাপ হল, কে একটু সাগু, ভাল খাবার করে দিয়ে উপকার করবে বলুন ত? যদিও কেউ করে দেয়, তা খুব যে ভাল হবে না, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

প্রমথর কথায় পরেশ বাবু কোন আপত্তি করিলেন না। বেশ ধীরভাবে বলিলেন, বাবা, চল দেশেই যাই। তোমার কথা কি আমি ঠেল্‌তে পারি?

আমার আর আপনার বল্‌তে কে আছে? তখন তোমার সঙ্গে দেশে না গিয়েই বড় অন্যায় করেছিলুম। তাই আমি এ সাজা ... ...।

প্রমথ বাধা দিয়া বলিলেন, আপনার বল্‌তে অনেক লোকই আছে। আমি আছি, মা আছেন, দাদামশাই আছেন, আর আছেন একজন—সকলকার চেয়ে বেশী আপনার—যার কেউ নেই, তারও একজন আছেন, কে বুঝেছেন, তিনি।

পরেশবাবুর চক্ষু দুটী অশ্রুভরা হইয়া উঠিল। বলিলেন, বাবা প্রমথ কথা গুলি তোমার উপযুক্ত বটে। তুমি ধন্য—আর তিনি, যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি শত শত বার ধন্য।

প্রমথ আত্ম সুখ্যাতি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরেশবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, তা বেশ, কবে দেশে যাবার ঠিক করলে বাবা?

প্রমথ বলিল,—পরশু।

পরেশ বাবু বলিলেন, আচ্ছা বাবা।

তারপর যথা দিবসে পরেশ বাবু প্রমথ ও রমা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দেশে যাবার জন্য গাড়ীতে চাপিল। গাড়ীতে পরেশ বাবুর দুই একবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছিল, ইহা কিসের জন্য বলিতে পারি না, বোধ হয় কলের জল ও বালাম চা'লের জন্য।

বলা বাহুল্য—মাকে দাদা মহাশয়কে ও অশ্রুর মাতাকে পত্র দিতে প্রমথ ভুল করে নাই। আর একজনের নিষেধ অনুসারে তাহাকে পত্র না লিখিলেও তাহার সুন্দর মুখখানি ও সহস্র স্মৃতি প্রমথ মানস পটে আঁকিয়া রাখিয়াছিল। কার্য্যাবসানে সেই সুন্দর মুখখানি প্রমথ প্রাণ ভরিয়া দেখিত, আর তারি মধুর স্মৃতি লইয়া পুলকে মাতিয়া উঠিত।

বিধির কলম রদ্।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস।

কাঞ্চিনগরে গুণসিন্ধু নামে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজাবৎসল স্বধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়বান রাজা ছিলেন। রাজ্ঞী শান্তিদেবী রাজার ন্যায় গুণ-

শালিনী ছিলেন। রাজা অশেষ গুণবান হইয়াও—তিনি অপুত্রক ছিলেন। তজ্জন্য তিনি বিষণ্ণ মনে কালাতিপাত করিতেন। সময় সময় অনুতাপ সহকারে কহিতেন, 'হায়! বিধাতা যদি আমাকে একটী মাত্র পুত্র সন্তান প্রদান করিতেন, তবে আমার প্রসাদ অতি শোভনীয় হইত। পুত্র হীন মানবের মুখ দর্শন করিতে নাই। যে গৃহে পুত্র নাই, সে গৃহ শশ্মান সদৃশ।" রাজ্ঞীও প্রতিদিন পুত্রলাভের প্রত্যাশায় কত ব্রত, কত দেবতার মানস করিয়া ষোড়শোপচারে ভক্তি সহকারে পূজা করিতেন।

একদিন রাণী রাজাকে বলিলেন, "আমি এমনি হতভাগিনী—আমা হতে তোমার বংশ লোপ হ'ল! আমি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ ক'রে এসেছি; সেই পাপে এজন্মে আমি পুত্র মুখ দর্শনে বঞ্চিত হ'লাম।" এইরূপ বহুপ্রকার অনুতাপ করিয়া নয়ন জলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন।

রাজা রাণীকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, 'বৃথা অনুতাপ ক'রে কোন ফল নাই। বিধাতা আমাদের পুত্র মুখ দর্শনে বঞ্চিত ক'রেছেন। বিধির বিধানের উপর হাত দিতে মানবের ক্ষমতা নাই। যদি ক্ষমতা থাকত, তবে এতদিন তুমি পুত্র মুখ দর্শন কর্‌তে পার্‌তে! এ ঐশ্বর্য্য ভগবানের;—আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র রাজা। আমার কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নাই। লোকে আমাকে রাজা বলে, সম্বোধন ক'রে থাকে। ভগবানই মানবের প্রকৃত রাজা, তিনি যা করবেন তাই হবে। আমি তার রাজ্যে একজন সামান্য প্রজা মাত্র!"

রাণী কহিলেন, 'তুমি যা বল্লে তা সত্য বটে; কিন্তু তোমার বংশ রক্ষার জন্য ত চেষ্টা করা উচিত।"

রাজা কহিলেন, "আমি চেষ্টা করলে কি হবে! যাহা বিধি প্রদত্ত তাহা কি কখন মানবের চেষ্টায় হইতে পারে।"

রাণী কহিলেন, "সবই আমি বুঝি, কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না। অতএব তুমি পুনরায় দার পরিগ্রহ ক'রে বংশ রক্ষা কর?"

এই কথা শুনিয়া রাজা বড় দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন, "দেখ মহিষি মর জগতে দাম্পত্য প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ! দাম্পত্য প্রেম হীন মানব কি কষ্টে কালযাপন করে, তাহা ধারণার অতীত। তোমার পাণি গ্রহণ করা অবধি আমি যে কত সুখে কালযাপন কর্‌ছি তাহা তোমাকে কি বলবো! যদিও পুত্র না হওয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু তোমার সুধামাখা কথা শ্রবণ যুগলে প্রবেশ কর্‌লে তখনি সমস্ত দুঃখ বিস্মরণ হয়ে পরমানন্দ উপভোগ করে থাকি?

তোমার মনে দুঃখ দিয়ে আমি কখনই অন্য কোন রমণীর পাণি গ্রহণ করবো না।

এইরূপ দুঃখালাপ হইতেছে, এমন সময়ে এক দাসী আসিয়া কহিল, দিব্যকান্তি সমন্বিত জটাজুট মণ্ডিত, একজন উগ্রতপা সন্ন্যাসী আপনার দর্শন অভিলাষে আগমন করিয়াছেন।

রাজা দাসীর মুখের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আগমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি বড়ই মনদুঃখে কাল যাপন কর- ছেন। যাতে আপনার মনদুঃখ অচিরে অবসান হয়, তজ্জন্য আমি কিছু উপদেশ দিতে এসেছি।"

রাজা কহিলেন, "প্রভো! আমার কিসের দুঃখ বলুন?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "যদিও আপনার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্যই আছে, কিন্তু একটী জিনিষের অভাবে আপনার প্রাসাদ শোভাহীন হয়েছে। যেমন মৎস্য হীন সরোবর, ফল পুষ্প হীন তরু, গন্ধহীন পুষ্প, গুণ হীন মানব, জগতে শোভা পায় না, তেমনি শিশু হীন গৃহও শোভনীয় নহে। মহারাজ, আপনি অপুত্রক, সেই জন্য মহাদুঃখে কাল যাপন করছেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী তপোবলে সবই করতে পারেন। আমার দুঃখের যদি কোন প্রতিকার করিতে পারেন, তবে চরিতার্থ হই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনার জন্ম পত্রিকা খানি একবার আনিতে আদেশ করুন।"

রাজা তখনি জন্মপত্রিকা খানি আনয়ন করাইলেন। সন্ন্যাসী পত্রিকা খানি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়া কহিলেন,—

জায়ায়া যৌবনান্তে পুত্রং কুর্য্যাৎ শুভন্তযাদন তুর্য্য।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র ভাব শুভ। কিন্তু চতুর্থ স্থানে শুভগ্রহের যোগ হেতু আপনার মহিষি যৌবনান্তে পুত্র প্রসব করবেন। আরও দুই একটী গ্রহ বড়ই বিরূপ আছে। অতএব আপনি একটী সর্ব্ববিঘ্নহর যজ্ঞ করুন, যাহার প্রভাবে সকল গ্রহই আপনার অনুকূল হবে।"

রাজা সন্ন্যাসীর উপদেশ মত তখনি যজ্ঞের উপকরণ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ

করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আজ্ঞামাত্র যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ ও দ্রব্যাদি আয়োজন হইল। সন্ন্যাসী তৎপর দিবস রাজা ও রাণীকে উপবাসী থাকিতে কহিলেন, এবং পর দিন প্রভাতে নিজেই যজ্ঞের হোতা হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বেদ মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিয়া মহারাজকে কহিলেন, "আপনার পুত্র ও কন্যা দুইই হইবে; কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ আপনার কিছুদিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! একটী কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। রাণীর পুত্র জন্মের সময় উপস্থিত হইলে, এরূপ একটী সূতিকা গৃহ প্রস্তুত করাইবেন যে, সেই গৃহের একটী দ্বার ব্যতীত যেন আর কোথাও ছুঁচ পরিমাণ ছিদ্র না থাকে। সেই সময় আমাকে সংবাদ দিবেন। আমি আপ- নার জমিদারির মধ্যে হিমালয়ের পাদমূলে অশোক আশ্রমে তপস্যা করে থাকি। যদি সংবাদ না দেন, তবে আপনার ঘোর অনিষ্ট হবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কালক্রমে রাণীর গর্ভ হইল। রাজা পরমানন্দে সন্ন্যাসী বর্ণিত একটী সূতিকা গৃহ প্রস্তুত করাইলেন এবং রাণীর প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসীকে সংবাদ দিলেন। সন্ন্যাসী যথা সময়ে আগমন করিলেন। রাণী যথাকালে পুত্র প্রসব করিলেন। তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, "রাজন্! এই সূতিকা গৃহে রাণী ও নবজাত শিশু ব্যতীত আর কেহ থাক্‌তে পারবে না। মহারাজ তখনি ধাত্রীগণকে সরাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী তখন সূতিকা গৃহের দ্বারদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিয়া দ্বার আগলাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। ষষ্ঠ দিবসে নবজাত বালকের অদৃষ্টে জীবনের ফলাফল লিখিবার জন্য বিধাতা পুরুষ আগমন করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী দ্বার আগলাইয়া শুইয়া থাকাতে তিনি তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন অন্য স্থান দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও ছুঁচ পরিমাণ ছিদ্র পাইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সন্ন্যাসীকে জাগাইয়া কহিলেন "কে আপনি দ্বারে শুইয়া আছেন?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনি কে পরিচয় দেন।"

বিধাতা বলিলেন, "আমি বিধাতা। বালকের অদৃষ্টে জীবনের ফলাফল লিখতে এসেছি। অতএব পথ দেন গৃহে প্রবেশ করি।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, আমাকে ডিঙ্গাইয়া যান না?

...পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বিধাতা কহিলেন, সেটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

সন্ন্যাসী কহিলেন, তবে দাঁড়াইয়া থাকুন।

বিধাতা কহিলেন, আপনার উদ্দেশ্য কি বলুন না ?

সন্ন্যাসী কহিলেন, আমার উদ্দেশ্য—এই বালকের অদৃষ্টে যাহা লিখবেন তাহা যদি আমাকে বলে যান, তবেই দ্বার ছেড়ে দিব, নতুবা কিছুতেই দ্বার ছাড়বো না।

বিধাতা কহিলেন, ইহা কখনই সম্ভব নয়। আমি এযাবত নরলোকে কাহাকেও আমার লিখিত বিষয় বলি নাই।

সন্ন্যাসী কহিলেন, যদি বলতে না চান তবে দাঁড়াইয়া থাকুন। আজকের দিন রাত্রিটা গত হলে আর আপনার লেখার দরকার হবে না।

বিধাতা পুরুষ বড়ই ফাঁফরে পড়িলেন এবং মনে মনে কহিলেন, যেরূপ নাছোড় বান্দা সাধু দেখছি, এখানে এর কাছে এড়ান দায়। অন্য কোন পথ নাই যে, সেই স্থান দিয়ে প্রবেশ করি, আমার লিখিত বিষয় না বল্‌লে এ সাধু কিছুতেই দ্বার ছাড়বে না! আবও আজই আমার লেখার দিন, যদি এই দিন কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হয়, তবে আর আমার লেখার অধিকার থাকবে না। এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন, আমি আমার লিখিত ফলাফল বলতে পারি, যদি আপনি আর কাহাকেও না বলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি কাহাকেও বলবো না। আপনি জানলেন আর আমি জানলেম।

বিধাতা পুরুষ বলিয়া যাইবেন, বলিয়া স্বীকার করিলেন। সন্ন্যাসী দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। বিধাতা পুরুষ বালকের অদৃষ্টের ফলাফল লিখিয়া যাইবার সময় কহিলেন, এই বালকের নাম অজিতকুমার। পরমায়ু নব্বই বৎসর। বড়ই ঘোড়া প্রিয় হইবে। ঘোড়া ছাড়া একপাও চলিবে না। বিদ্যা বুদ্ধি ভাল হইবে না। স্বভাব ভাল হইবে না। বাল্য জীবনে ও যৌবনের কয়েক বৎসর অত্যন্ত সুখ ভোগ করিবে। বয়স যখন বিংশতি বৎসর হইবে, তখন ইহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদয় নষ্ট হইবে। তখন এই বালক মাতা পিতা ভ্রাতৃগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিল্বগ্রামে হরিহর তন্তুবায়ের গৃহে ছদ্মনাম ধারণ পূর্ব্বক বাস করিবে। পরে অন্য জাতীয় এক রমণীর পাণিগ্রহণ করে, বসবাস করিবে। পরদার হরণ, জীবহত্যা, গোহত্যা, দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি অধর্ম্মাচারণ করিবে। রাজদ্বারে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অনেকবার কারাবরণ করিবে এবং দুঃখ

কষ্টে কাল কাটাইবে ইত্যাদি। শেষ জীবনে কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া বহুদিবস ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই বলিয়া বিধাতা পুরুষ অন্তর্ধ্যান হইলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় পুত্র জন্মের সময় হইলে আমাকে সংবাদ দিবেন, মহারাজকে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় রাজকুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সূতিকা গৃহের দ্বারে পড়িয়া থাকিয়া বিধাতা পুরুষের নিকট—অদৃষ্টে যাহা লিখিবেন, আমাকে বলিয়া যাইবেন—স্বীকার করাইয়া লইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। বিধাতা পুরুষ বালকের অদৃষ্টে জীবন ফলাফল লিখিয়া যাইবার সময় কহিলেন, "এই বালকের নাম যোধকুমার। পরমায়ু আশী বৎসর। দ্বাদশ বৎসর বয়সে কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া চার বৎসর পরে রোগ মুক্ত হইবে। বিদ্যা সামান্য হইবে। ভীরু কাপুরুষ হইবে। বড়ই মৎস্যাসক্ত হইবে। মাছ ছাড়া একদিনও আহার করিবে না। বাল্য জীবনে সুখ ভোগ কতক দিন করিবে। বয়স যখন আঠার বৎসর হইবে, তখন ইহার পিতার রাজ্য শত্রু কবলে পতিত হইবে। সেই সময় এই বালক মাতা পিতা ভ্রাতাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিষ্ণুপুর গ্রামে মিছারাম ধীবরের বাড়ীতে বাস করিবে এবং ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ঘর জামাই হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে কাটাইবে ইত্যাদি। অন্তকালে জলোদর রোগে প্রাণত্যাগ করিবে।" এই বলিয়া বিধাতা অন্তর্ধ্যান হইলেন। সন্ন্যাসীও রাজাকে তৃতীয় সন্তান জন্মের সময় সংবাদ দিবেন, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় কুমার জন্ম গ্রহণ করিলে, সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় বিধাতা পুরুষকে স্বীকার করাইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। বিধাতা পুরুষ জীবনের ফলাফল লিখিয়া যাইবার সময় কহিলেন, এই বালকের নাম সনৎকুমার। পরমায়ু ছিয়ানব্বই বৎসর। দুগ্ধই ইহার জীবন ধারণের সম্বল হইবে। বড় দুষ্ট হইবে। বাল্য জীবনে সুখ ভোগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে ইহার পিতার রাজ্য শত্রু কবলে পতিত হইলে, এই বালক পিতা মাতা ভাই ভগ্নিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাস পুর গ্রামে অজিত ঘোষের বাড়ীতে বাস করিবে। তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবে। তখন ঘোর অহঙ্কারী দাম্ভিক হইবে। সেই সময় এক নীচ জাতীয় রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া বসবাস করিবে। পরে কুসীদবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিবে ইত্যাদি ঘোর

পাপাচার বশতঃ শেষ জীবনে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" এই বলিয়া বিধাতা পুরুষ অন্তর্ধান হইলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় সন্তান জন্মিলে সংবাদ দিবেন। রাজাকে কহিয়া গমন করিলেন।

প্রায় দেড় বৎসর পরে মহারাজের একটী সুন্দরী লাবণ্যময়ী রাজ কুমারী জন্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীও আসিয়া পুত্রের ন্যায় বিধাতা পুরুষের নিকট যাহা লিখিবেন, বলিয়া যাইবেন, স্বীকার করাইয়া লইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। বিধাতা পুরুষ বালিকার অদৃষ্টে ফলাফল লিখিয়া যাইবার সময় কহিলেন, "এই বালিকার নাম প্রভাবতী। পরমায়ু সত্তর বৎসর। বাল্য জীবনে যথোচিত তের বৎসর বয়সে বিদ্যানগরের বড় রাজকুমারের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবে। পূর্ব্বজন্মের পাপাচার বশতঃ এই বালিকা রাজরাণী হইয়াও একজন সামান্য কোটালের প্রেমে মুগ্ধ হইবে। স্বামী ইহার পিতার সাপক্ষে যুদ্ধে গমন করিলে কোটালের সহিত নিশীথ রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিবে। কিছুদিন তাহার সঙ্গে থাকিয়া পরে বারবিলাসিনী হইবে এবং বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া অতুল ধনের অধীশ্বরী হইবে। এই বালিকা যাহাকে উপপতি রূপে মন মধ্যে কল্পনা করিবে, তাহাকে তদ্দণ্ডে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত বসবাস করিতে পারিবে ইত্যাদি। শেষ জীবনে পাপাচার বশতঃ ঘোরতর ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া কষ্টভোগ করিবে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" এই বলিয়া বিধাতা পুরুষ অন্তর্ধান হইলেন। সন্ন্যাসী মহারাজকে কহিলেন, আপনার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি এই পুত্র কন্যা লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুন। রাজা সন্ন্যাসীর নিকট বহু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিলেন।

বিধি লিখিত সময় উপস্থিত হইলে, গুণসিন্ধু রাজার সহিত শত্রুরাজ কল্লোদের ঘোর মনোমালিন্য চলিতে লাগিল। অবশেষে সেই মনোমালিন্য যুদ্ধে পরিণত হইল।

উভয় পক্ষের রণভেরী বাজিয়া উঠিল এবং ঘোরতর সংগ্রাম হইল। অবশেষে কাঞ্চিরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভার্য্যার সহিত পলায়ন করিয়া অপর এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুত্রগণ পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া বিধি লিখিত স্থানে গমন করিলেন।

সন্ন্যাসী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কাঞ্চি রাজ্যটা

লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে। শত্রুগণ সেই রাজ্যের রাজা হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছে। প্রজাগণ তাহাদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি কর্ত্তব্য। এই শত্রুগণকে তাড়াইয়া গুণসিন্ধুকে পুনরায় রাজ্যপাটে বসাইতে হইবে ও বিধাতা তাঁহার পুত্র কন্যার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ্ করাইয়া ভাল ফল লিখাইয়া লইতে হইবে। এই দুই কার্য্য আমায় করিতেই হইবে। তাহাতে যদি সমস্ত তপোবল নষ্ট করতে হয়, সেও স্বীকার। এইরূপ চিন্তা করিয়া কাঞ্চি রাজ্যটা একবার ভ্রমণ করিয়া লইলেন এবং প্রথম রাজকুমার অজিত কুমারের উদ্দেশে বিল্বগ্রামে হরিহর তাঁতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অজিত কুমার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, বসিতে আসন দিলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, তোমায় যেন চিনি চিনি অনুমান হচ্ছে, তোমার বাড়ী কাঞ্চি নগরে নয়?

অজিত কুমার চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনার অনুমান ঠিকই। এ কথা কাহাকেও বললেন না, আমি এখানে ছদ্মনাম ধরে পলাইয়া আছি। যদি শত্রুরাজ জান্‌তে পারে, তবে আমাকে ধরে কারারুদ্ধ করবে।

সাধু কহিলেন, ভয় নাই! আমি তোমার অপকার করতে আসি নাই—উপকার করতে এসেছি। যদি আমার উপদেশানুযায়ী কাজ কর, তবে তোমার সকল দুঃখ দূর হবে এবং ভবিষ্যতে তোমার পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হবে। আর যদি আমার কথা না শুন, তবে তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না।

অজিত কুমার কহিলেন, প্রভো, কি করবো বলুন।

সাধু কহিলেন, সম্মুখে যে ঘোড়াটী বান্ধা আছে, ওটী বোধ হয়, তোমারই ঘোড়া?

অজিত কুমার কহিলেন, হাঁ প্রভো, আমারই।

সাধু কহিলেন, এই ঘোড়াটী ভারী অলক্ষুণে; এটীকে আজই বিক্রী করে ফেল।

অজিত কুমার কহিলেন, ঘোড়াই যে আমার প্রাণ। আমি ঘোড়া ছাড়া এক পাও চলতে পারি না। ঘোড়া বিক্রী করে ফেললে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়বো।

সাধু কহিলেন, তোমার সে চিন্তা করবার দরকার নাই। আমার উপদেশ মত বেচে ফেল, যাতে তোমার কষ্ট না হয়, সে উপায় আমি করে যাবো।

অজিত কুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সাধু কহিলেন, আমার উপদেশ অমান্য কর না। এতে তোমার খুব ভাল হবে। আরও অর্থ কষ্ট যে কারে বলে তার ঠিক পাবে না।

অজিত কুমার কহিলেন, আপনার উপদেশ অমান্য করছি না। তবে এই ভাবছি, ঘোড়া বেচে ফেললে আমার গতি কি হবে।

সাধু কহিলেন, তার উপায় আমি কাল সকালে করে দিব। তুমি ঘোড়া বেচে ফেল দেখি।

এমন সময়ে একজন ঘোড়ার খরিদ্দার আসিল। অজিত কুমার সাধুর কথায় ঘোড়া বেচিয়া ফেলিলেন। সাধু সে রাত্রি তথায় রহিলেন।

পরদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অজিত কুমার দেখিলেন, তাহার সেই ঘোড়ার খোটায় কার একটী ঘোড়া বান্ধা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া সাধুকে কহিলেন, প্রভো, আমার ঘোড়ার খুটায় কার একটি ঘোড়া বান্ধা রহিয়াছে।

সাধু কহিলেন, ও ঘোড়া তোমারই। তুমি সমস্ত দিন ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যা কালে ঘোড়া বেচে ফেলবে, দেখবে, সকাল বেলা আর একটি ঘোড়া তোমার জন্য বান্ধা আছে।

এইরূপ রোজ রোজ ঘোড়া বিক্রী করে যে, অর্থ পাবে তার দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে তোমার চল্‌বে। এখন আমি আসি। এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় কুমারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিষ্ণপুর গ্রামের সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। এমন সময়ে এক জালিয়া জাল স্কন্ধে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাধুকে প্রণাম করিল। সাধু আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, তোমার বাড়ী কি এই গ্রামে?

জালিয়া কহিল, হা এই গ্রামেই।

সাধু কহিলেন, তোমার ব্যবসা কি মাছ বিক্রী?

জালিয়া কহিল, উপস্থিত আমার ব্যবস মাছ বিক্রী হইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল না। কোন পাপে যে আমার এ দুর্দ্দশা হল তা আমি বুঝতে পারলেম না—বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

সাধু কহিলেন, তুমি কান্দছ কেন বাপু? ব্যাপার কি আমার কাছে স্পষ্ট করে বল দেখি?

জালিয়া তখন জীবনের ইতিহাস তাঁহার নিকটে কহিল। সাধু তাহাকে যোধকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়া কহিলেন, যাতে তোমার এই দুর্দ্দশা মোচন হয়, তজ্জন্য তোমাকে কিছু উপদেশ দিব। সেই উপদেশ অনুসারে চলিলে, তোমার সকল দুঃখ শীঘ্র দূর হইবে।

জালিয়া কহিল, প্রভু! যদি এই দয়া করেন, তবে এ দাস কৃত-কৃতার্থ হয়।

সাধু কহিলেন, এখানে কি খুব মাছ পাওয়া যায়?

জালিয়া কহিল, আমি সকাল হতে দশ বার জাল ফেলে এই মাছ কটা পেয়েছি, তাই খাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

সাধু কহিলেন, তুমি ও মাছ কটা বিক্রী করে ফেল। তাতে বেশ তোমার দু' পয়সা হবে।

জালিয়া কহিল, মাছ বিক্রী করে ফেললে খাব কি? আমি যে মাছ ছাড়া এক তাঁসও ভাত খেতে পারি না। মাছই যে আমার জীবন।

সাধু কহিলেন, তুমি মাছ বিক্রী করে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় এই সরোবরে এমন স্থান দেখায়ে দিচ্ছি—সেখানে একবার জাল ফেললে প্রচুর মাছ পাবে।

জালিয়া সাধুর কথায় মাছ বিক্রয় করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। কিয়ৎদূর গমন করিয়া সাধু কহিলেন, তুমি এই স্থানে জাল ফেল, দেখি—প্রচুর মাছ পাবে।

জালিয়া কহিল, প্রভু, আমি রোজই একবার করে, এই স্থানে জাল ফেলে থাকি, কিন্তু কোন দিন একটা পুটীও পাই নাই।

সাধু কহিলেন, আমার কথায় আজ ফেল, মাছ পাও কিনা তার প্রমাণ এখনি পাবে।

জালিয়া সেই স্থানে জাল ফেলিল, অমনি জালের মধ্যে বহু মাছ লাফাইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জাল গুটাইয়া দেখিল, অনেক মাছ পড়িয়াছে। তখন সাধু কহিলেন, আমার উপদেশ শোন! তুমি প্রত্যেকবার জাল ফেলে যে মাছ পাবে, সে গুলি অমনি বিক্রী করে পুনরায় জাল ফেলবে। তাহা হলে তুমি প্রত্যেক বারে প্রচুর মাছ পাবে। কদাচ মাছ বিক্রী না করে জাল ফেল না। যে বার তোমার জালে মাছ না পড়বে, সেই বার জাল গুটাইয়া বাড়ী যাইবে। সে দিন আর জলে জাল ফেল না, যদি ফেল, তোমার ঘোর অনিষ্ট হইবে।

জালিয়া কহিল, তাহা হলে খাবার মাছ পাবো কোথায় ?

সাধু কহিলেন, আমি যে উপদেশ দিলাম, এই অনুসারে চল্‌লে তোমার অর্থ কষ্ট দূর হবে এবং খাবার মাছও পাবে। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আজ পরীক্ষা করে দেখলে, বুঝতে পার্‌বে। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

জালিয়া তাঁহার কথা মত জাল ফেলিয়া প্রত্যেক বারে বহু মাছ পাইতে লাগিল। সে গুলি বিক্রয় করিয়া পুনরায় জাল ফেলিল, এইরূপ সে দিন বেশ দুই টাকা উপার্জ্জন করিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া শেষ বারে যাহা পাইল তাহা লইয়া গৃহে গমন করিল। তাহার সাধুর কথায় ধ্রুব বিশ্বাস হইয়া গেল।

পরদিন সাধু তৃতীয় রাজকুমারের উদ্দেশে বিলাসপুর গ্রামের অজিত ঘোষের বাড়ীতে বিকাল বেলা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সনৎকুমার একটী গাভীর পরিচর্য্যা করিতেছে। হঠাৎ একজন জটাজুট সাধুকে বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া সনৎকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং পাদ্য অর্ঘ্য ও বসিতে আসন দিলেন। সাধু আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন; এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপান্তে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, এই যে গাভীটি বান্ধা আছে, এটি কি তোমার ?

সনৎকুমার কহিলেন, হাঁ আমারই।"

সাধু কহিলেন, তোমার পোষাক পরিচ্ছদ যেরূপ দেখছি, তাতে অনুমান হচ্ছে তোমার ঘোর অর্থ কষ্ট। তুমি এই গাভীটি বিক্রী করে অর্থ কষ্ট দূর কর না কেন ?

সনৎকুমার কহিলেন, আমার জীবন ধারণের জন্য দুধই সম্বল। দুধ ছাড়া আর কিছুই খেতে পারি না। গাভীটি বিক্রী করলে, সেই দিনই মারা যাবো।

সাধু কহিলেন, যদি তুমি আমার উপদেশ শোন, তবে দুধও পাবে এবং তোমার অর্থ কষ্টও দূর হবে।

সনৎকুমার কহিলেন, আপনার উপদেশ কি আজ্ঞা করুন।

সাধু কহিলেন, তুমি যদি আজই এ গাভীটি বিক্রী করে ফেল, দেখিবে কাল তোমার গোয়ালে আর একটি গাভী বান্ধা আছে।

সনৎকুমার কহিলেন, এও কি সম্ভব পর ?

সাধু কহিলেন, সম্ভব কিনা পরীক্ষা করে দেখ।

সনৎকুমার কহিলেন, প্রভু ঠিক ত ?

সাধু কহিলেন, আমি সন্ন্যাসী, আমি কোন সার্থের বশীভূত নহি। যাতে জীবের মঙ্গল হয়, সেই কামনা অহরহ করে থাকি। তুমি আজ গাভী বিক্রী কর—কাল যদি তোমার গোয়ালে আর একটী গাভী বান্ধা না থাকে, তবে আমার জটা মুড়ায়ে দিও। আজ আমি এইখানেই থাকবো।

সনৎকুমার গাভী বিক্রী করিয়া ফেলিলেন। পরদিন সকাল বেলা শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, আর একটি সুন্দর গাভী বৎস গোয়ালে বান্ধা রহিয়াছে। তখন বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন, প্রভু! এ গাভীটি কে বান্ধিয়া রাখিয়া গেল।

সাধু কহিলেন, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি প্রত্যহ তোমার উপযোগী দুধ দু'য়ে লয়ে, সন্ধ্যাকালে গাভী বিক্রী করে ফেলবে। তাতে তুমি দুধও পাবে এবং অর্থ কষ্টও দূর হবে। দেখ যেন আমার উপদেশ অবহেলা কর না। এই বলিয়া প্রভাবতীর উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাকালে এক সমৃদ্ধশালী নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রভাবতী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছে। তখন তিনি তার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

একজন দাসী আসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—ঠাকুর এখানে কি দরকার ?

সাধু কহিলেন, এ বাড়ী কার ?

দাসী কহিল, প্রভাবতী নামে একজন স্ত্রীলোকের।

সাধু কহিলেন, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চাই। একটু দরকার আছে।

দাসী কহিল, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ কেন ?

সাধু কহিলেন, আমি অর্থ কামনায় আসি নাই। অন্য বিষয়ে বিশেষ দরকার আছে, সেই জন্য এসেছি।

দাসী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে প্রভাবতীর নিকটে লইয়া গেল। প্রভাবতী একজন জটাজুট মণ্ডিত সন্ন্যাসীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সাধু 'পতিব্রতা হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রভাবতী কহিলেন. ঠাকুর, এ আপনার কি রকম আশীর্ব্বাদ? আমি পতিত রমণী—কেমনে করে পতিব্রতা হব?

সাধু কহিলেন, কেমনে হবে, তাহা পরে জান্‌তে পারবে।

প্রভাবতী তখন ও কথা চাপা দিয়া কহিল. ঠাকুর! এখানে আপনার আগমনের কারণ কি বলুন?

সাধু কহিলেন. তোমার নিকট আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্য এসেছি। তুমি যদি আমার কথামত কাজ কর, তবে তোমার মঙ্গল হবে, নতুবা কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থ হবে।

প্রভাবতী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, বলুন আপনার কথামত কোন কাজ করবো। যদি আমার ক্ষমতাধীন হয়, এখনি করতে রাজী আছি।

সাধু কহিলেন, আমার কথামত কাজ করতে তোমার পক্ষে কোন শক্ত নয়। তুমি অবাধে তাহা করতে পারবে।

প্রভাবতী কহিল, আজ্ঞা করুন কি করবো।

সাধু কহিলেন, আজ তুমি উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিতা হয়ে, বিধাতা পুরুষকে উপপতি করিবার মানস করে, ঘর সাজাইয়া বসিয়া থাক—এই আমার কথা।

প্রভাবতী কহিল, বিধাতা পুরুষ দেবতা, তিনি কেমনে আমার উপপতি হবেন।

সাধু কহিলেন, কেমনে হবেন, সে চিন্তা করা তোমংর দরকার নাই। আমি যা বল্‌লাম, তাই কর। আমি তোমার বারান্দায় শুইয়া রহিলাম। বিধাতা আসিলে কিছুতেই ছাড়িবে না, তাঁর সহিত রাত্রি যাপন করবে।

প্রভাবতী সন্ন্যাসীর কথানুযায়ী বিধাতা আজ আমার উপপতি মনন করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া রহিলেন।

অনতিবিলম্বে বিধাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া কহিলেন. ঠাকুর! এ তোমার কি রকম উপদেশ। দেবতারা কখনও কামের বশীভূত নয়, কেমনে এই নারীর উপপতি হইব?

সাধু কহিলেন, যেমনি অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তেমনি এখন হন।

বিধাতা কহিলেন, ওটা আমার ভুল বশতঃ লেখা হয়েছে।

সাধু কহিলেন, ওঃ আপনার বেলায় ভুল, আর যত দোষ মানবের বেলায় মানব যদি ভুল বশতঃ একটা পাপ করে, তবে কি ধর্ম্ম তাকে রেহাই দেয়? অমনি কুম্ভীপাকে ডুবায়।

বিধাতা কহিলেন, আমি যদি কোন নারীর সাহত রাত্রি যাপন করি, তবে যে আমাকে স্বর্গভ্রষ্ঠ হয়ে, নরলোকে বাস করতে হবে।

সাধু ক্রোধ ভরে কহিলেন, তাতে আমার কি?

বিধাতা কহিলেন, দেখুন, একটা ভুলের জন্য আর আমাকে নরলোকে বাস করাবেন না,—অনুমতি করুন চলে যাই।

সাধু কহিলেন, আমার কাছে কেন মশায়? যে আপনাকে ডেকেছে, তার কাছে যান না? সে যদি আপনাকে যেতে বলে, চলে যান।

বিধাতা তখন প্রভাবতীর নিকট গেলেন। প্রভাবতী তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া বসাইতে গেল।

বিধাতা পুরুষ সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আমায় ছুঁও না। তোমার অভিপ্রায় কি বল? কি জন্য আহ্বান করেছ?

প্রভাবতী কহিল, আপনার সহিত বসবাস করবো বলে মনন করেছি। আজ হইতে আপনিই আমার গৃহে বাসকরেন।

বিধাতা কহিলেন, তাই কি কখন হয়? দেব ও নরে কখনও মিলন হতে পারে না। অতএব আমার বাঞ্ছা ত্যাগ করে অন্য কোন নরকে পতিরূপে কামনা কর—আমাকে এখন ছেড়ে দাও।

প্রভাবতী কহিল, আমি আপনাকে ছাড়তে পারি না। তবে যদি ঐ সাধু ছেড়ে দিতে বলেন, তবেই ছাড়তে পারি। নতুবা কিছুতেই নয়। অতএব আপনি সন্ন্যাসীর নিকট যান।

তখন বিধাতা পুরুষ একবার সন্ন্যাসীর নিকট, একবার প্রভাবতীর নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিধাতাকে নাজেহাল করিয়া সন্ন্যাসী ছাড়িয়া দিতে কহিলেন। বিধাতা পুরুষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং অন্তর্ধ্যান হইলেন।

পর দিবস সন্ন্যাসী কহিলেন, আজ তুমি শ্রীহরিকে পতিরূপে পাইব মনে করিয়া বসিয়া থাক।

প্রভাবতী তাহাই করিল।

ক্ষণকাল পরে শ্রীহরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভাবতীর মন ভাব অবগত হইয়া কহিলেন, তোমার মন ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি অক্ষম। আমি দেব তুমি নর সুতরাং আমাদের মিলন হতে পারে না। তুমি কোন নরকে আহ্বান কর। আমায় যেতে বল।

প্রভাবতী কহিলেন, যদি অসম্ভব হয়, তবে ঐ ঠাকুরের কাছে যান, উনি যদি যেতে বলেন--তবে চলে যান।

এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া কহিলেন, দেখুন, আমি কখন কামনার বশীভূত নই, তবে নরের সহিত মিলন অসম্ভব। আরও দেবতারা নরের সহিত মিলিত হইলে, স্বর্গভ্রষ্ট হয়। সুতরাং দেব নরে মিলন অসম্ভব। অতএব আমাকে যেতে অনুমতি করুন।

সাধু কহিলেন, বিধাতার লিখন অনুসারে প্রভাবতী আজ আপনাকে পতিত্বে বরণ করেছে, ইহাতে আমি কি করবো বলুন?

শ্রীহরি কহিলেন, আপনার মনের ভাব আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু আমি পালন কর্ত্তা। আমার কোন হাত নাই। যদি আপনি বিধির কলম রদ্ করতে চান, তবে আমাদের ছেড়ে দিয়ে মহাদেবকে আহ্বান করুন। তার দ্বারা আপনার মন বাসনা সিদ্ধি হবে। এই কথা শুনিয়া শ্রীহরিকে ছাড়িয়া দিতে কহিলেন। শ্রীহরি অন্তর্ধ্যান হইলেন।

পর দিবস সন্ন্যাসী কহিলেন, আজ তুমি মহাদেবকে পতিরূপে বরণ করিবার মানস করে বসে থাকবে।

প্রভাবতী তাহাই করিল; কিয়ৎকাল পরে ভোলানাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিল।

মহাদেব কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় ডেকেছ?

প্রভাবতী কহিলেন, আজ আপনি আমার পতি হবেন, এই জন্য ডেকেছি।

মহাদেব কহিলেন, কি পতি! আমি মদনজয়ী ভোলানাথ আমাকে পতি করতে বাসনা?

প্রভাবতী কহিলেন, আপনি মদনজয়ী হন, আর যাই হন, আজ আমার উপপতি হতেই হবে।

মহাদেব কহিলেন, কি এত বড় আস্পদ্ধা! আমাকে পতি করতে তোর বাসনা? যদি এই বাসনা ত্যাগ না করিস, তবে এখনি এই ত্রিশূলের দ্বারায় তোকে ভস্ম করবো!

তখন সন্ন্যাসী আসিয়া কহিলেন, ভোলানাথ! অত ক্রোধ করবেন না।

মহাদেব ক্রোধ ভরে কহিলেন,—তুমি কে হে? তুমিই বুঝি এর মন্ত্র দাতা?

সাধু কহিলেন, হাঁ, আমিই মন্ত্রদাতা। বিধাতা এই কন্যার কপালে কি লিখেছেন, জানেন?

মহাদেব কহিলেন, কি লিখেছেন?

সাধু কহিলেন, বিধাতা লিখেছেন, যাকে ইচ্ছা তাকেই পতি করতে পারবে। সেই জন্যই ত আপনাকে ডেকেছে। বিধাতার লিখন অনুসারে আপনি নরের পতি হউন।

মহাদেব কহিলেন, কি; বিধাতা নরের অদৃষ্টে এইরূপ লেখে। আমি এত কাল ধরে তপস্যা করে মদনকে জয় করে যে, মদনজয়ী হয়েছি, বিধাতা এক কলমের খোচায় তা শেষ করবার যোগাড় করেছে। আচ্ছা, দেখি বিধাতার কলমের জোর কত, আর আমার ত্রিশূলের জোর কত। আমি আজই বিধাতার সৃষ্টি অতল জলধিতলে নিমজ্জিত করবো, তবে ছাড়বো। এই বলিয়া ক্রোধ ভরে হুঙ্কার প্রদান করিয়া সেই প্রলঙ্করী ত্রিশূল বিধাতার সৃষ্টির উপর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে শ্রীহরি স্ব স্ব ব্যস্তে ও দেবগণ তিষ্ঠ ভোলানাথ! তিষ্ঠ ভোলানাথ! এখনও প্রলয়ের সময় হয় নাই, বলিয়া ত্রিশূলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মহাদেব কহিলেন, বিধাতার অন্যায়টা দেখুন ত? নরের অদৃষ্টে লেখে কিনা, যাকে ইচ্ছা তাকেই পতি করতে পারবে। অমন বিধাতার সৃষ্টি থেকে কাজ নাই। আপনি একটু সরুন, সৃষ্টি সহিতে বিধাতাকে একবার ঘুরিয়ে দেই। যাতে আর সৃষ্টি করতে না হয়, তাও করে দেই।

শ্রীহরি কহিলেন, ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক ত্রিশূল সংযত কর। আমি এর প্রতিকার করছি।

মহাদেব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশূল সম্বরণ করিলেন। তখন শ্রীহরি সন্ন্যাসীকে কহিলেন, আপনার মনগত ভাব কি স্পষ্ট করে বলুন দেখি?

সাধু কহিলেন, যদি বিধাতা তাঁহার লেখা রদ্ করিয়া আমার কথানুযায়ী এই বালিকার অদৃষ্টে লেখেন, এবং এই বালিকা যে পাপ করিয়াছে, তাহা কাটিয়া দিতে ধর্ম্মকে বলেন ও ইহার ভ্রাতাগণের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও যদি রদ্ করে আমার কথামত লেখেন এবং ইহাঁর পিতার ঐশ্বর্য্য যেরূপ ছিল, সেইরূপ করে দিতে স্বীকার করেন, তবেই আমি ক্ষান্ত হইব, নতুবা এই কন্যার দ্বারা একে একে সর্ব্ব দেবগণকে ভূতলবাসী করাইব।

মহাদেব বিধাতাকে কহিলেন,—কি বিধি, স্বীকার আছত? যদি

স্বীকার না কর—তবে এখনও বল—ত্রিশূল ঘুরায়ে কণ্টক দূর করে দেই।

বিধাতা আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, একবার লিখে কেমন করে কাটি।

মহাদেব কহিলেন, যদি না পার, তবে তোমার লেখার জন্য সব দেবতা মর্ত্তাভূমে এসে বাস করতে পারবেন না। অতএব তোমার সৃষ্টি ধ্বংশ করাই উচিত। এই বলিয়া আবার ত্রিশূল উঠাইলেন।

বিধাতা তখন সন্ন্যাসীর কথামত লিখিতে স্বীকার করিলেন।

মহাদেব কহিলেন; তবে তাড়াতাড়ি লিখে ফেল। ধর্ম্মও খাতা হইতে পাপ গুলি কেটে দাও।

ধর্ম্ম কহিলেন, এই বালিকা মহাপাপ করেছে। এই পাপের ফল ভোগ এর করতেই হবে। আমি কিছুতেই কাটতে পারবো না।

সাধু কহিলেন, যদি পাপই না গেল, তবে বিধির কলম রদ্ করে কোন ফল নাই। আপনারা সব চলে যান, আমার মনে যা আছে তাই করি।

মহাদেব কহিলেন, দেবগণের স্বধর্ম্ম সহজে কোন কাজ কিছুতেই করবেন না। যেই একজনের কাছে গুতো খাবেন, অমনি দু'শবার তাকে বাবা বলবেন, আর ঠাণ্ডা হয়ে সে কার্য্য তখনি সম্পাদন করবেন; এই সন্ন্যাসী একটা গুতো দিয়েছেন, অমনি সব দেবগণ তটস্থ হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তবু গোঁ ছাড়বেন না! আর একটা গুতো যেই দোব, সেই তখন ধীরে ধীরে করে সব পাপ কেটে দিবে। তুমি ত এই বিধাতার সৃষ্টি নিয়েই ধর্ম্ম। আচ্ছা আমি সেই সৃষ্টিটা প্রলয় করে দিচ্ছি, তুমি কোথায় থাক দেখি?

ধর্ম্ম কহিলেন, আপনি যতই গালাগালি দেন না কেত, পাপ ধ্বংস না হইলে, আমি কিছুতেই কাটতে পারবো না! আরও এই বলিয়া যে পাপ করিয়াছ, তাহা সামান্য নয়। স্ত্রী জাতির পর পুরুষ গমনের মত পাপ ভূভারতে নাই। শাস্ত্রানুসারে এই পাপের ফল কোটী কল্প পর্য্যন্ত রৌরব নরকে বাস! এই পাপ যদি কেটে দিই, তবে আমার ধর্ম্ম নাম লোপ হবে।

মহাদেব কহিলেন, তবে তুমি এর পাপ কাটতে পারবে না?

ধর্ম্ম কহিলেন, যদি আপনি এর পাপকে ধ্বংস করে দেন, তবে পাপ কেটে দিতে পারি, নতুবা নয়।

মহাদেব কহিলেন, যদি এ সৎকর্ম্ম করে, তবে এর পাপ ধ্বংশ হয় কিনা?

ধর্ম্ম কহিলেন, পুণ্য কর্ম্মের দ্বারায় পাপ কর্ম্ম ধ্বংশ হয় না। যদি হ'ত তবে রাজা যুধিষ্ঠির সারা জন্ম পুণ্য কর্ম্ম করে, সামান্য একটু পাপে নরক দর্শন করতে হত না।

মহাদেব কহিলেন, তবে কিসে পাপ ধ্বংস হয়?

ধর্ম্ম কহিলেন, যেমন সামান্য একটু অগ্নি প্রকাণ্ড এক ইন্ধন রাশিকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মিভূত করতে পারে, তেমনি জীব হৃদয়ে ভাব অগ্নির আবির্ভাব হইলে তখনই সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। তার আর কোন পাপ থাকে না।

মহাদেব কহিলেন, ওহো মনে হয়েছে।

একবার যে হরি নাম করে।
জীবের বাবার সাধ্য কি যে এত পাপ করে॥

আমি এখনি একে দিয়ে হরিনাম বলাচ্ছি, তাহা হলেই সব পাপ ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন প্রভাবতীকে কহিলেন,—"মা, তুমি একবার মন প্রাণে ঐক্য করে হরি হরি বলে ডাকত? অমনি শ্রীহরি তাহার মনরূপ প্রাঙ্গণে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রভাবতী প্রেম ভরে কহিলেন, "হরি হে, এই অধম পতিতার প্রতি দয়া কর। এই কথা বলিতে বলিতে বাক রুদ্ধ হইয়া গেল ও নয়নদ্বয় হইতে অবিরাম বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বালিকা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

ধর্ম্ম তখন খাতা হইতে পাপ কাটিয়া দিলেন। বিধাতা পুরুষ তখন পূর্ব্বকার লেখা রদ্ করিয়া, সন্ন্যাসীর কথানুসারে লিখিলেন, এই বালিকা পতিবল্লভা হইবে। আদর্শ পতিব্রতা হইবে। রাজরাণী হইবে। স্বামী ইহার অশেষ গুণবান হইবে। বড়ই ধর্ম্মপ্রিয় হইবে। ইহার যশঃ স্বামীর সহিত ভুবনে ঘোষিত হইবে। পতিপুত্র কন্যা জামাতা পৌত্র দৌহিত্র লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। অন্তকালে স্বামীর সহগমন করিবে এবং অক্ষর স্বর্গপদ প্রাপ্ত হইবে। এই কথা লিখিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন, আর আমি ঘোড়া যোগাইতে পারি না, চলুন এখনই অজিতকুমারের কাছে যাই। তখন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া সেই নিশিথ রাত্রে অজিতকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বকার লেখা রদ্ করিয়া লিখিলেন, এই বালক সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইবে। পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিবে। প্রজারা ইহার গুণ শত মুখে কীর্ত্তন করিবে। কোন বিদুষী রাজ কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবে। ছোট ভ্রাতাগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিবে। মহা সাহসী

বীর পুরুষ হইবে। দেব দ্বিজ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে অত্যন্ত ভক্তি করিবে। পরম বৈষ্ণব হইবে। পুত্র কন্যাদি লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। অন্তকালে হরিনাম করিতে করিতে জাহ্নবীজলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইবে।

অজিতকুমারের অদৃষ্টে লেখা শেষ হইলে কহিলেন, "আর আমি মাছ যোগাইতে পারি না। চলুন, এখনি যোধকুমারের কাছে যাই। তখন সেই রাত্রিতে ঘুমন্ত যোধকুমারের অদৃষ্টে লিখিলেন, এই বালক রামলক্ষণের মত ভ্রাতৃভক্ত হইবে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে, প্রধান কর্ম্মকুশল হইবে, অত্যন্ত সাহসী ও ঘোর বিক্রমশালী হইবে। হিমালয়ের মত নিশ্চল হইয়া কার্য্য করিবে, কখন কর্ম্মে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে না, বিদুষী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, পুত্র কন্যা লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। অন্তকালে ব্রহ্মপদ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে।

এই কথা লিখিয়া কহিলেন, আমি আর গাভী যোগাইতে পারি না, চলুন সনৎকুমারের কাছে যাই। তখন সেই নিশিতে সনৎকুমারের অদৃষ্টে লিখিলেন, এই বালক সাহসী ধীর শান্ত সুধীর হইবে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে, বিবাহ করিবে না, পরম ভাগবত ভক্ত হইবে, অহর্নিশি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিবে। শ্রীহরির কৃপা অভিলাষে উন্মাদের ন্যায় হইবে, হরি ব্যতিরেকে ইহার চিত্তে আর কিছুই স্থান পাইবে না, বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিবে। অন্তকালে গোলক বাসে গমন করিয়া শ্রীহরির পার্ষদ হইয়া থাকিবে।

সকলের অদৃষ্টের লেখা শেষ হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রুগণকে তাড়াইয়া গুণসিন্ধু রাজাকে পুনরায় রাজ্যপাটে বসাইয়া বিধাতা অন্তর্ধান হইলেন। সন্ন্যাসীও প্রস্থান করিলেন।

প্রভাতে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন, তাহারা কাঞ্চিনগরের রাজ প্রাসাদে উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। এত দিন কোথায় ছিলেন এবং কি করিয়াছেন, তাহার কিছুই স্মরণ হইল না। প্রভাবতী মুচ্ছা ভঙ্গে দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর পদসেবা করিতেছেন। সকলেরই অতীত জীবন যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল। গুণসিন্ধু পুত্র পৌত্র দৌহিত্র লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের বাসন্তী দোলযাত্রার পূর্ণিমা তিথির সায়ংসন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় হয়। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এই ভক্তিময়ী তিথিকে শ্রীগৌর-পূর্ণিমা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দের দোললীলা স্বভাবতঃই প্রেমিক ভক্তগণের আনন্দদায়িনী, তাহার উপরে আবার বাসন্তী দোলা লীলা! বসন্ত ঋতুর উন্মেষে জড়জগতের শীত জড়তা অপসারিত হয়, প্রাণের স্পন্দন সুস্পষ্ট হয়, বিশাল বিশ্বের প্রতি অণুতে পরমাণুতেই আনন্দ বিকম্পন অনুভূত হয়। বেদান্ত সূত্রকার "কম্পনাৎ" এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং "আনন্দ ময়োঽভ্যাসাৎ" এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বই স্বরূপ ভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

"আনন্দাৎ হি এব খল্বেমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আনন্দ হইতেই এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব, আনন্দেই ইহার স্থিতি এবং আনন্দেই লয়। বসন্ত ঋতুর উন্মেষে এই জড়জগতে উদ্ভিদ্‌রাজ্যে এবং এই ভূতধাত্রী ধরিত্রির প্রাণি নিচয়ের প্রাণশক্তির অন্তরালে স্বভাবতঃই আনন্দ-স্পন্দন ও আনন্দ কম্পন অনুভূত হয়! শ্রীগোবিন্দের দোললীলা এই আনন্দ কম্পনেই শাশ্বত আবির্ভাবস্থল! আন্তর্জ্জাতিক রহস্যময়ী বাসন্তী দোললীলার আনন্দময় বাসরেই আনন্দ লীলারসবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব। দুঃখময় জগতে প্রেমানন্দ প্রচারের জন্যই যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপ আনন্দ বাহুল্যের পুণ্য বাসরে তাঁহার আবির্ভাব অবশ্যই গভীর অর্থদ্যোতক। এই নিমিত্ত ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌর অবতরণের ভক্তিময়ী তিথিকে অভিনবরূপে সম্মানিত করার জন্য দোল পূর্ণিমা বা ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে শ্রীগৌর পূর্ণিমা আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীভগবানের এ জগতে অবতরণ জীবগণের মহাভাগ্য। ভগবানের অর্থ এই যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের এই জগতে, জাগতিক প্রাণী সমূহের মধ্যে প্রকটিত হওয়া। উদ্দেশ্য—জীবের দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি ও তজ্জনিত আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেওয়া।

এ জগতে জীবের কল্যাণকর কত সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা আছে, তন্মধ্যে ভগবদ্-অবতরণের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা আর কিছুই নাই। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সাধূগণের পরিত্রাণের জন্য দুস্কৃতিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

এই কথা যুগাবতারের জন্য। কেননা যুগাবতারগণই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহারাই ভূভার হরণ করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর যুগাবতার নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং অবতারী। তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য আরও গূঢ়তর এবং উহা জগতের পক্ষে আরও অধিকতর সৌভাগ্যজনক। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈল শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হয় যে মশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতার সেই কালে।
অন্য অন্য অবতার তাতে আসে মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম তার অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি-লোকে করিবে প্রচারণ॥

ইত্যাদি অনেক প্রকার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মানব সমাজে হরিনাম প্রেমধর্ম্ম প্রচার ও প্রেমরসাস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার শিক্ষা প্রভাবে জগতে জীবে দয়া, মৈত্রী সার্ব্বভৌমিক প্রীতি ও শ্রীভগবানে প্রেম ভক্তি জাগিয়া উঠিল, তাই পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদাস বলিতেছেন,—

আরেরে নিন্দুক ভাই, তোর কিরে বোধ নাই,
বৃথাই ধরিলা দোন আঁখি।
সব অবতার সার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার,
তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি॥
সুরাপান অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার,
কুতান্ত্রিকে ভারত ব্যাপিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি,
জীব সবে পূজিতে লাগিল॥
দেখিয়া জীবের দৈন্য, প্রভু মোর শ্রীচৈতন্য,
নবদ্বীপে প্রকট হইলা।
তারক ব্রহ্ম হরি নাম, যাচি সবে করি দান,
ধর্ম্মের সে গ্লানি ঘুচাইল॥
জগাই মাধাই আদি, দুস্কৃতের নিরবধি,
হরিনামে করিলা উদ্ধার।
ব্রাহ্মণে যবনে মিলি, করাইল কোলাকুলি,
বিশ্বপ্রেমে পূরিল সংসার॥
নাস্তিকে করিলা ভক্ত, খঞ্জে কৈলা গতিশক্ত,
অন্ধেরে করিলা চক্ষু দান।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, নহিল ইথে বিশ্বাস,
কিসে আর পাবে পরিত্রাণ॥

বঙ্গের শত সহস্র পদকর্ত্তা এইরূপে শ্রীশ্রীগৌর ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা প্রভৃতি নিখিল দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন কোটি কোটি সংসার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীবর্গের পরম গুরু কাশীবাসী পরম পূজ্যপাদ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ ও অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহোদয় বিবিধবার ভূয়োদর্শন জনিত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান প্রভাবে যাহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিয়াছিলেন, তৎকালিক দুর্দ্দণ্ড শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাব, বৈভবগৌরবে গরীয়ান্ মহারাজ প্রতাপ রুদ্র যাহাকে দর্শনমাত্র স্বয়ং ভগবদ্জ্ঞানে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যাহার শ্রীচরণে শরণ লইয়া ছিলেন, হরিনামাবতার পবিত্রবেত্তা সংসারত্যাগী ব্রহ্ম হরিদাস যাহার শ্রীচরণতলে আশ্রয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম জপ করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজাধিরাজ অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত শ্রীমৎ রায় রামানন্দকে যিনি এক মুহূর্ত্তে ভোগ বিলাসোপকরণ পরিপূরিত স্বীয় রাজপ্রাসাদ হইতে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া তুলিয়া স্বীয় পদাঙ্কে টানিয়া আনিয়াছিলেন, দুর্দ্দান্ত পতিত পাষণ্ড জগাই মাধাইয়ের

নীরকীয় হৃদয়ে যিনি গোলোকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে যবনরাজ হোসেন সাহের প্রধানতম মন্ত্রী শ্রীপাদ সনাতন ও তদনুজ রাজকীয় প্রভুত্ব তৃণবৎ তাচ্ছিল্য করিয়া তদীয় কৃপাপ্রাপ্তির জন্য কৌপীন-কন্থাধারী ভিখারী হইয়াছিলেন, মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলেই যাহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এই বঙ্গদেশে সেই কলিপাবন স্বয়ং শ্রীভগবান এই ভক্তিময়ী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি তারকব্রহ্ম হরিনামের বন্যাপ্রবাহে সমগ্র ভারতে পুণ্য পবিত্রতা ও প্রেমের বিপুল তরঙ্গলহরীর সৃষ্টি করিয়া জন-সমাজকে ধর্ম্ম জীবনে অনুপ্রাণিত করিয়া ছিলেন, এই তাঁহারই আবির্ভাবের পুণ্যতিথি। শ্রীল কবিরাজ কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,—

সর্ব্বসদ্ গুণপূর্ণাং ত্বং বন্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোহবতীর্ণঃ কৃষ্ণ নামভিঃ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হৈঞা।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন —

শচীগর্ভে বৈসে সর্ব্বভূবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা কারণ প্রচার॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥
(অপিচ) পরম পবিত্র তিনি ভক্তি স্বরূপিনী।
যহি অবতীর্ণ হৈলা গৌর দ্বিজমণি॥

আজ আবার সেই সর্ব্ব মঙ্গলময়ী সর্ব্ব ভক্তিময়ী ফাল্গুনী পূর্ণিমা সমাগতা হইয়াছেন। এই পুণ্য পবিত্র বাসরে সকলেই সেই প্রেমময় শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণে, কীর্ত্তনে, স্মরণে, মননে, স্বীয় জীবন পবিত্র করুন, তাঁহার সেই ভুবন মঙ্গল কনক সমুজ্জ্বল আনন্দ লীলারস বিগ্রহের অনুধ্যান ও নিদি-ধ্যাসনে আপন আপন অন্তরাত্মাকে, প্রেমরসাভিসিক্ত করুন, মানাপমান হিংসাদ্বেষ, রোষদম্ভাদি পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রীতির মন্দাকিনী বন্যা প্রবাহের

জন্য প্রেমময়ের শ্রীচরণে সরল ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করুন, আর শ্রীমৎ প্রেমদাসের গৌর কীর্ত্তন সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলুন,—

এমন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন নাম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচিঞা যে ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির, সুদুর্লভ প্রেম,
জগতে ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইল, নাচিল মজিল,
বাজাইল করতালি॥
হাসিয়া কান্দিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে পুরিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ?
ডাকিয়া হাকিয়া, খোল করতালে,
গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়া,
কপাট টানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ,
রতি না জন্মিল মোর॥

পতিত উদ্ধারণ আনন্দপ্রেমরসবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরনামামৃত সুন্দরের শুভ আবির্ভাবের ভক্তিময়ী পবিত্র তিথিতে ইহাই আমাদের স্মরণীয়, ইহাই আমাদের বন্দনীয়—ইহাই ধ্যেয়—ইহাই গেয়।

ওঁ আনন্দলীলারসবিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়
তস্মৈ মহাপ্রেমরস প্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে।

রক্তচিতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

সে অনেক দিনের কথা। কি কারণে আমি যাচ্ছিলুম সেখান দিয়ে মনে নেই—সেদিনই আমি বাঁচিয়েছিলুম তাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে। নদীর

বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সে—কি যেন কি এক অসহ্য ব্যথা চিরবিরতির জন্য।

বয়েস বেশী নয়, ছোট একটি মেয়ে সে। কুলে বুঝিবা আমি ভিন্ন আর অপর শ্রোতা ছিল না তখন। বালিকা বলতে লাগল—বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কেঁপে কেঁপে, একটা ভীতি ও ঔৎসুক্য সে কাহিনীকে আলিঙ্গন করল শুধু।

"বাবা আমার নৌকা বাহেন। ঐ আমাদের কুঁড়ে। ছেলেবেলায় মাকে জন্মের মত হারাই, আজ বাবা ছাড়া আমার পৃথিবীতে আপনার বল্‌বার কেউ নেই—কিছুক্ষণ আছগ বাবা আমাকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছেন, ওপারে একজন লোককে পার করে দিতে। মাঝ গঙ্গা বরাবর ডিঙ্গা যখন হাজির হয়েছে, ঠিক্ এমনি সময়ে কি এক ভীষণ ঝড় উঠলো। এখনো দেখ আকাশে চেয়ে সে ছবি ভাল মোছেনি। কি উচূ উচু ঢেউ সব ছুটতে লাগল, নাও তখনি উল্‌টে গিয়ে দেখতে দেখতে বুঝি একেবারে ডুবে গেল। যাঃ বাবাকে আর দেখতে পেলুম না। ঘরে একলাটী বসে থাক্‌তে আমার ভাল লাগছিল না, তাই বেরিয়ে এসে এই জলের কিনারায় বসেছিলুম। সে কি জলের আওয়াজ, বুঝি কখনও শুনিনি আগে! "বাবা, বাবা" বলে যত জোর ছিল তত জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম। বুঝি এ ডাক কাণে তাঁর পৌঁছিল না, প্রতিধ্বনি আমাকে দিগন্তে গিয়ে উপেক্ষাভরে সে শব্দ ছুঁড়ে দিলে আবার, তারপর. কে আছে আর আমার? কে আমাকে এতটুকু ঠাঁই দেবে? পিতৃ-শোকে বিহ্বল হয়ে জলে ঝাঁপ দিতে এয়েছি। এই জলে পিতার শব আছে, পিতার কাছে যাব বলে আমিও তাই যোগাড় করছিলুম। কিন্তু তা হল কই? কে গা তুমি——"

বালিকা আর বলতে পারলে না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আঁখির কোল হতে আমার সহানুভূতির একফোঁটা জল ঝরেছিল কি না তখন—আঁখিই জানে। হৃদয় কেঁদেছিল কিনা—হৃদয়ই জ্ঞাত। সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেয়ে ছিল কি না অধরই জানে।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। বালিকা আমাদের বাড়ীতেই আছে। দরিদ্র আমরা—অতি দরিদ্র! একদিন খেতে পাই ত দু'দিন খেতে পাই না, তাও আধপেটা দু'দিন জোটে ত সাত দিন জোটে না আবার। অনাহার উপবাস যেন বিধবার নির্জলা একাদশীর মতই আমাদের উপর মাসের অর্দ্ধেক দিন ঘুরে ফিরে আসত। মেয়েটিকে অনাথালয়ে পাঠাবার জন্য বাড়ীর মধ্যে কত তর্ক কত উহা উঠত, তা শুনলে পরে প্রাণ সুধুই কেঁদে উঠত। যাকে

নিজে সঙ্গে করে ডেকে এনেছি, তাকে বিদায় দিতে হলে—আর ভাবতে পারতুম না! মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কাতর নিশ্বাস ফেলতাম, জলে চোখ ভরে উঠত। কিছু বল্‌বার ছিল না।

দারিদ্র্য আমাদের অতি শৈশবের প্রত্যুষ হতে জীবনের শেষ দিনটি অবধি চির সাথী। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কখনও যে আমাদের ওপরে পড়েছিল বলে মনে হয় না! চিরকাল সমান আমরা।

বৃদ্ধ পিতা ও মাতা, আর কে আছে বাড়িতে আমার? বাল্যে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাই নি কখনও। উদয়াস্ত পিতার সহিত সহস্র ঘোরাঘুরির পর যেদিন কিছু পেতুম, সেদিনই এক রকম চলে যেত আমাদের। তাও কি সব দিন? ছাই, আজ পাই, কাল আবার পাই না। দারিদ্র্য এমনিই। খেতে যে দিন পেতুম মেয়েটিকে বেশীর ভাগই ধরে দিতুম। কেনই বা দোব না? নানা ওজর আপত্তিতে 'খেয়েছি' 'খাবনা' ইত্যাদি বলে সে দিনটা কাটিয়ে দিতুম। বালিকার সারল্য কখনো আমাকে সন্দেহ করেনি। কোনও কথা বলত না সে। গোপনে সব বুঝেও সহে যেত।

তারপর এমনিভাবে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন কত কেটে গেছে, হিসেব নেই। নিয়তির নির্দ্দয় অভিশাপে পিতা ও মাতা উভয়কেই ইতিমধ্যে কাল জলে বিসর্জ্জন দিয়েছি। থাকবার ভেতরে আমি আর সে,—আর কেউ নেই।

তাকে বল্‌লুম,—"চল তবে, লক্ষ্মীটি ভাই, এখান থেকে আমরা চলে যাই অন্য গাঁয়ে। এখানে আর থেকে কি হবে, এখানে আর সুবিধে নেই, জগতে তোমারো কেউ নেই, আমার কেউ নেই। আজ দৈবনিয়ন্তার বিধানে আমরা সমদুঃখী—উভয়েই ব্যাথার ব্যথী। চল তবে——"

কত চকিত ভীত ভাবে কথা শেষ করেছিলো সে জানিনা—"কোথায় যাব? এইখানেই তো বেশ আছি। আর কোথা, নতুন গাঁয়ে গিয়ে লাভ কি? কোথায় থাকব সেখানে? এখানে পেটে একমুঠা অন্ন না জোটে ক্ষতি নেই, কোন রকমে মাথা গুজে থাক্‌বার কষ্ট হবে না। এতটুকু জায়গার জন্য দোরে দোরে মাথা পাততে হবে না। সেখানে কে কাকে চেনে? সেও নতুন তুমিও নতুন। এই ত বেশ ঠাঁই—সবে ভিটে ছাড়ছ কেন?

আমি বলেছিলুম,—"এ দারিদ্র্য আর সহ্য হয় না। যদি কোথাও গিয়ে ভালভাবে দিন কাটাতে পারি, তার চেষ্টা করব। তোমায় এনেছি যখন—লক্ষ্মীটি ভাই, এসো আমার সঙ্গে। এ ভিটা থাক্। থাক্‌বার ঠাঁই দেখে নেব আমরা পরে গিয়ে।"

মাঘের হিম। কন্‌কনে শীত, যেতে যেতে মাঝ পথে তার সে কি অসুখ—

কি জ্বর! মুহূর্ত্তের তরেও গায়ে তার হাত ঠেকান যায় না। কি আগুন গা! নিদাঘের অনাবৃষ্টির আকাশ হতে আগুন ঝরা শিখার মতোই তপ্ত—গরম যেন।

নানা দুশ্চিন্তায় কত রাত ভোর হল, ঠিক ঠিকানা নেই তার। সারা দিনরাত পাশে তার বসে থাকি আমি, আর আপনি আপনাকে শত ধিক্কার দেই! এমন অবস্থাতে কেউ বা না দিয়ে থাকে? কত কি ভাবি।

এখানে কোথায় আছি? কেন সে মন্ত্রণা শুনিনি তার! কেন দেশের মাটী ছেড়ে এলুম এখানে? কে আছে এখানে, সত্যি কে আছে দেখবার আর? হা দারিদ্র্য তোমার অপবাহের জন্য উদ্যোগ করতে গিয়ে এ আবার কি নূতন আপদে পড়লম আমি! এ যন্ত্রণা ভোগ করতে দেহ মন শিউরে উঠে বড় ভয় হয়। না জানি এ কোন জন্মের সঞ্চিত পাপের পরিণাম?

মাঝপথে থাকবার স্থান পাব কোথা, দেবেই বা কে? এক চাষার এক্‌-চালার পেছনে একটুখানি পড়ো জায়গায় আছি আমরা। মুখে কারো টু' শব্দ নেই। খাওয়া নেই, ঘুম নেই! যেন কি নীরব অভিনয় অলক্ষ্যে আমাদের দু'জনের ওপর কৌতুকভরে খেলে যাচ্ছে সর্ব্বক্ষণ—বোঝা যায় না। চারিদিক খোলা, মাথার ওপর হিমকণা ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ছে। ছাউনি নেই, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, কি শীত!

কিছুদিন বাদে একটা রাত কেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসব নিশির ফুল ঝরে গেছে সব, দেউটি নিভেছে, অভিনয়ের শেষ যবনিকা পড়ে গিয়েছে, বাঁশী থেমেছে।

শ্মশানের চিতায় শা—য়ি—ত সে! আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ধিকি ধিকি সে শব দহিতে লাগল। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটি তার যেন বল্‌ছে দিচ্ছিল, "পাপিষ্ঠ, করলি কি?" সে চোখের দিকে চাওয়া যায় না।

হায় রে, কেন তারে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলম সে দিন? যে যাবার সে ত যাবেই, গেলও তো। রাখতে ত কই পারলেম না আমি। অত করেও কি পরিণাম!

ওঃ মরণের পাশ এড়াবে কে? কৃতান্ত! কৃতান্ত! নিয়েছ নিয়েছ তাকে, বেশ করেছ। আমিই নিতে দিইনি এতদিন, অবুঝের মত বাধা দিয়েছিলুম, আজ নিয়েছ—ভালই করেছ। এখন বাকী আমি, সকলকে নিয়েছ, কবে তোমার শিঙ্গা বাজবে? ডাক পড়বে আমার?

হৃদয়ে চিতার বহ্নি জ্বলে উঠছে আমার। সে কি নিভবে কখনো? পশ্চিমে ঐ গোধূলি নভে দগ্ধ রক্তচিতা বুঝি আমারই অনুভূতিতে প্রজ্জ্বলিত আজ। কিন্তু এ চিতা আর জ্বলবে কতক্ষণ? সন্ধ্যায় বোধ হয় নিভে যাবে ঠিক। কিন্তু আমার এ রক্তচিতা ওরই সঙ্গে নিভে যাবে কি? শ্মশানের রক্তচিতা খানিক পরে নির্ব্বাপিত হবে, আকাশের রক্তচিতা খানিকপরে নির্ব্বাপিত হবে, কিন্তু হৃদয়ের এ রক্তচিতা বুঝি নির্ব্বাপিত হবে না আমার, সে চিতায় চিরদিন বুঝি সে সমিধ যোগাবে? সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে না গেলে এ আর থামবে না!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্‌ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমতা... আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Foamula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ, প্রতি শিশির মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কে ... ষ্ট ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড ... তা।

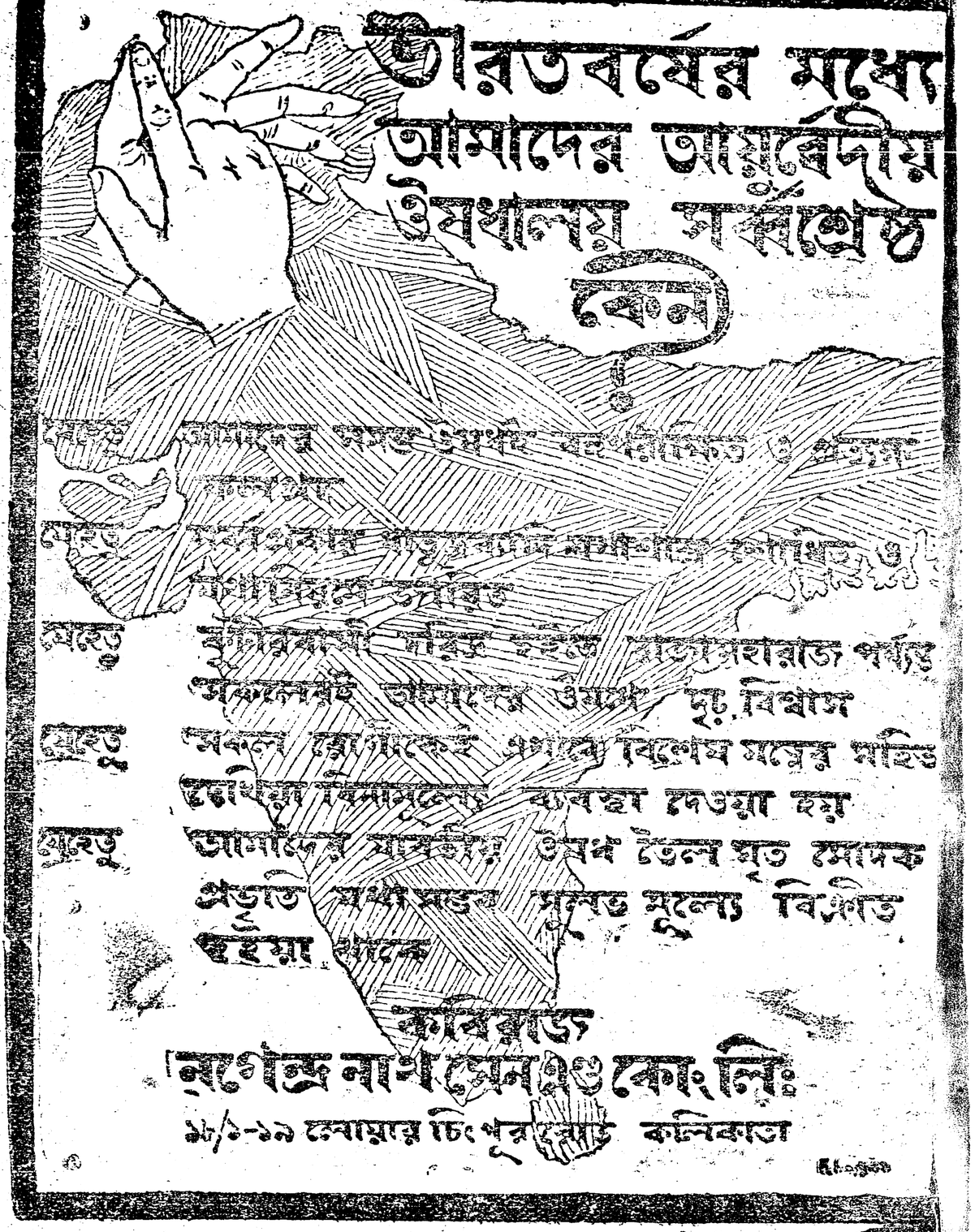

Printed by—M... at the Janmabhumi Press,
39, M... Street, Calcutta.